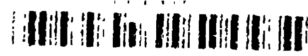
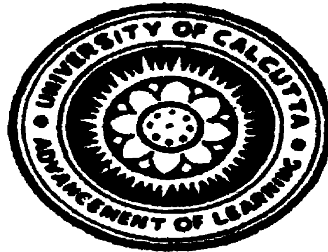

॥श्रीनमोविश्वकर्मणे॥
स्थापत्यविशारद

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা

(১৯৫৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে প্রদত্ত ধারাবাহিক বক্তৃতাসমূহের সারাংশ অবলম্বনে সঙ্কলিত)



শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্থাপত্যবিশারদ



কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৫৭

PRINTED IN INDIA

PRINTED AND PUBLISHED BY SIBENDRANATH KANJILAL,
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS,
48, HAZRA ROAD, BALLYGUNGE, CALCUTTA.

1872B.—March, 1957—A.



ভারতরাষ্ট্রপতি মহামান্য ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ

উৎসর্গ-পত্র

ভারতরাষ্ট্রপতি মহামান্য ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ মহামহিমার্ণবেষু—

১৩৪৮ চৈত্রমাসের এক সায়াহ্নে জাহ্নবীবারিবিধৌত পাটলিপুত্রের 'সদাকৎ' আশ্রমের আম্রকাননে পাদচারণকালে, কী এক ভাবের আবেশে ভবদীয় হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে এক বাণী উৎসারিত হইয়াছিল: "শ্রীশবাবু, পাটলিপুত্রের লুপ্ত গৌরবকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে।" আমি বলিয়াছিলাম—"আপনারা ভারতবর্ষকে স্বাধীন করুন; আমি পাটলিপুত্রসহ সমগ্র ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্পের গরিমময় নববিকাশে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।" সেই দিনই পূর্ব্বাহ্নে, মহাশয়ের সমভিব্যাহারে আমি প্রিয়দর্শীর বিশাল প্রাসাদের মর্ম্মন্তুদ অবশেষ অবলোকন করিয়াছিলাম। অস্তাচলগামী দিনমণির লোহিত কিরণরঞ্জিত আম্রকুঞ্জের মুকুলসুরভিত স্নিগ্ধ বীথিকায় ভ্রমণকালে আমরা উভয়ে অশোকের পাটলিপুত্রের গৌরবগরিমার চিন্তায় নিমগ্ন ছিলাম।

পর বৎসর পাটলিপুত্রের উদাত্ত প্রেরণাপ্রসূত মৎসঙ্কলিত Magadha Architecture and Culture আপনার আনুকূল্যে প্রকাশিত হয়। আপনি আমাকে রাজেন্দ্রোচিত উৎসাহ প্রদান এবং আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

আজ ভারতবর্ষ রাহুমুক্ত। সর্ব্বজনবাঞ্ছিত মহাসম্রাট্‌রূপে আপনি আসমুদ্রহিমাচল ভারত মহাসাম্রাজ্যের স্বর্ণ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের সাম্যনীতি অনুসারে প্রজাপালন করিতেছেন। আপনার 'রাজেন্দ্র' নাম সার্থক ও বিশ্ববরেণ্য হইয়াছে।

বৈদান্তিক ভারতের ধর্ম্মময় কর্ম্মজীবনের বর্ত্তমান যুগোপযোগী নববিকাশ প্রয়াসে পরিকল্পিত 'দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা', দীন গ্রন্থকারের গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ, ভবদীয় শ্রীকরকমলে উৎসর্গীকৃত হইল। নিজগুণে গ্রহণ করিলে কৃতকৃতার্থ হইব।

আত্মানম্‌ অমৃতং কৃধি ॥ ও শান্তিঃ ॥

আশ্রব

কলিকাতা
৪৯, মলঙ্গা লেন

শ্রী-শ্রীশচন্দ্র-চট্টোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রস্তাবনা

দেবায়তনের ইতিহাসের যোগ একটি দেশের বা জাতির ধর্মের ইতিহাসের সঙ্গে নয়, ইহার যোগ জাতির সামগ্রিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে। বিভিন্ন দেশে দেবতা বিভিন্ন ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছেন; আবার দেবকল্পনার বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া দেবায়তনের পরিকল্পনাতেও বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছে। দেবতার পরিকল্পনায় জাতির আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রকাশ; দেবায়তনের পরিকল্পনায় সেই আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের সহিত আবার ব্যবহারিক মূল্যবোধের নিবিড় সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। তাই জাতিহিসাবে ভারতবর্ষের যে সমগ্র পরিচয় তাহার একটি বৃহত্তর-অংশ অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে, এবং বিভিন্ন কালে পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত দেবায়তনের রূপায়ণে। ইট-পাথরের ব্যঞ্জনাময় ভাষার ভিতর দিয়া ঐ রূপকে বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রসিদ্ধ স্থাপত্যবিদ্ শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা' গ্রন্থখানির মাধ্যমে ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি সুষ্ঠু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। লেখক এ বিষয়ে তথ্য- ও তত্ত্ব-পরিবেশনের যথার্থ অধিকারী। এই ইট-পাথরে রচিত ভারতবর্ষের দেবায়তনের অন্তরাত্মার স্বরূপ সুধীসমাজে প্রকাশিত করিয়া তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

নির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত

এম.এ. (ক্যান্টাব.),
উপাচার্য্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের পর থেকেই ধীরে ধীরে তার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটতে থাকে; এক বিরাট্ মানসিক পরিবর্ত্তন শুরু হয় তার মধ্যে, আর তাতেই বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার এক অভিনব যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সে প্রকৃতিকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে; এই চেষ্টা থেকেই মানবসভ্যতার উদ্ভব। পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে, কোন্ যুগে, এই সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয়েছিল তা আজও পণ্ডিতসমাজের বিচার্য্য বিষয়। তবে একথা নিশ্চিত, যেদিন পৃথিবীর বুকে দু'পায়ে ভর দিয়ে মানুষ উঠে দাঁড়ালো, অপূর্ব্ব রহস্যময় হয়ে উঠলো বিশ্বপ্রকৃতি তার কাছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত মহাকাশ সূর্য্য-চন্দ্র-নক্ষত্র-খচিত; আর পদতলে বিপুল পৃথিবী, কোথাও শুষ্ক ও কঠিন, কোথাও সরস ও বনজঙ্গলাকীর্ণ, কোথাও বা ধবল তুষারাচ্ছন্ন। ভূমার এই অভিব্যক্তি ও প্রকৃতির এই অসীম বৈচিত্র্য তার মনে জাগিয়েছিল এক অনন্ত জিজ্ঞাসা—বিশ্বসৃষ্টি ও বিশ্বস্রষ্টার মূল রহস্য অবারিত করার এক অদম্য আকাঙ্ক্ষা। সেই দিন থেকেই হলো বিশ্বস্রষ্টার প্রথম উপলব্ধি ও মানবসভ্যতার সূচনা।

মানবসভ্যতা-বিকাশের নানা সূত্র অনুসরণ ক'রে ভারতের দেবায়তনের ইতিহাস ও সেই প্রসঙ্গে তার অধিবাসীর ধর্ম্ম, সমাজ, কৃষ্টি ও রাষ্ট্রজীবনের ক্রমবিকাশ ও প্রসারের বিশদ আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে। মাদ্রাজে আবিষ্কৃত আদি প্রস্তরযুগের কতকগুলি অমসৃণ অস্ত্রশস্ত্র থেকে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, সেই যুগে ভারতে মানুষের বসতি ছিল। আদি প্রস্তরযুগের পর নব্য প্রস্তরযুগ; বিংশ শতাব্দীর ১০।১৫ হাজার বছর পূর্ব্বেকার এই নব্য প্রস্তরযুগের শ্রমশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় মাদ্রাজের বেলাড়ি প্রদেশে প্রস্তরের অস্ত্র- ও যন্ত্র-নির্ম্মাণের কর্ম্মশালাসহ কর্ম্মশালায় নির্ম্মিত দ্রব্যসম্ভার থেকে। নব্য প্রস্তরযুগের পর আসে ধাতুযুগ—দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে ধাতুযুগের কতকগুলি তাম্র- ও ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত অস্ত্র এবং নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, মাদুরা ও মহীশূর অঞ্চলে সমাধির অভ্যন্তরে ধাতুনির্ম্মিত পাত্র আবিষ্কৃত

হয়েছে। প্রায় ৩০ বছর আগে পশ্চিম পাঞ্জাবের হড়প্পা ও সিন্ধু প্রদেশের মোহেন-জো-দড়োতে প্রায় ৫ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। শুনলে বিস্মিত হতে হয় যে, এই দুটি নগরীতে সেই যুগেও নগরনির্ম্মাণ, শিল্পরচনা, সামাজিক ও পৌর রীতিনীতি সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রিত হোত। অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকে নির্ম্মিত এক থেকে ত্রিতল বাসগৃহ, প্রাসাদ, ভোজনাগার, পানাগার, স্নানাগার, শস্যাগার, পণ্যশালা, রন্ধনশালা, প্রমোদশালা, দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ ও সিন্ধুনদ-তটবর্ত্তী বিশাল বাঁধের জীর্ণ ভিত্তি এই উভয় নগরেই আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রমাণ হয় যে প্রাচীন ভারতবর্ষ সেই অতীত যুগেও ছিল সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতির এক গৌরবময় শিখরে।

আর্য্য মহাজাতির একটি শাখা ভারতে আসে বাইরে থেকে, বসতি স্থাপন করে হিমালয়ের সানুদেশে। প্রাকৃতিক শোভায় ঐশ্বর্য্যশালী এই ভারতভূমি আর্য্যদের চিত্ত জয় করেছিল। প্রকৃতির সেই শান্তসমাহিত মনোরম লীলাক্ষেত্রে তারই ধ্যানে সুদীর্ঘকাল নিমগ্ন থেকে আর্য্যগণ সূর্য্য, পবন, বরুণ, রুদ্র, উষা, সরস্বতী ইত্যাদি প্রাকৃতিক মহাশক্তির প্রতীক দেবদেবীগণের যে পরিকল্পনা করেন তারই বর্ণনায় সৃষ্টি হয় বেদমন্ত্রের। নিগূঢ় অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিশ্বের অন্তর্নিহিত তেজ ও শক্তির মূলগত ঐক্য উপলব্ধি করে তাঁরা ঘোষণা করেন যে, বিশ্বের সর্ব্ব শক্তি ও সকল দেবদেবী এক পরম পিতা পরব্রহ্মের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। বিশ্বের প্রথম সাহিত্য বিরাট্ বেদগ্রন্থ তাঁদেরই রচনা। আর্য্যজাতি ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে নাগ ও দ্রাবিড় সভ্যতার সঙ্গে তাদের সভ্যতার মিশ্রণ ঘটে। খ্রীষ্টপূর্ব্ব ভারতের প্রায় সব প্রদেশেই আর্য্য ও অনার্য্য সংস্কৃতি ও শিল্পের মিলন হয়। ধর্ম্মক্ষেত্রে এদের মিলনের ফলেই হিন্দুজাতি ও হিন্দুসভ্যতার উদ্ভব। তারপর বহু যুগ ধরে এই সভ্যতার বিকাশ হতে থাকে নানা অবস্থা ও নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। প্রায় ৫ হাজার বছরের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ভারতের বুকে ঘটে গেছে বহু রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজ্যসাম্রাজ্যের উত্থান-পতন ও ভারতবাসীর জীবনে, সমাজে ও জীবনাদর্শে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও দর্শনের বিপুল সংঘাত; কিন্তু তার সভ্যতার মূল অমৃতধারা রয়ে গেছে অব্যাহত। 'একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি' ভারতের এই অপূর্ব্ব মৈত্রীমন্ত্র মানুষের মনকে নিয়ে গেছে উদারতার উচ্চতম শিখরে।

"দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা" গ্রন্থে গ্রন্থকার অতি সুন্দর এবং প্রাঞ্জল ভাষায় পরিবেশন করেছেন ভারতের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারা, যার অভিব্যক্তি পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে তার প্রাচীন দেবালয়ের স্থাপত্যে। ভারতের মহান্ আত্মা যেন রূপ পরিগ্রহ করেছে এই ইট-পাথরে-গড়া দেবালয়ের সৌন্দর্য্যে; দেবায়তনের গগনস্পর্শী চূড়ায় যেন অনন্তের অভিব্যক্তি মূর্ত্ত হয়ে আছে। স্থাপত্য-শিল্প, বিশেষ করে দেবায়তনের স্থাপত্যই জাতির অন্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। গ্রন্থকার বহু চিত্রসহযোগে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সহজ ও সরল ভাষায় অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। তথ্যবহুল এই গ্রন্থে রয়েছে ভারতের মহান্ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও তার অবদানের আলোচনা, এর সন্ধান মিলেছে ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি ও শিক্ষায়তনে, দর্শন ও ধর্ম্মে, বিজ্ঞান ও শিল্পে, স্থাপত্যকলায়, নগরনির্ম্মাণ-পদ্ধতি ও উদ্যান-পরিকল্পনায়।

ভারতের অমর আধ্যাত্মিক বাণী আজ নব-জাগ্রত ভারতের মাধ্যমে হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীকে করুণা ও মৈত্রীমন্ত্রে দীক্ষিত করুক। জ্ঞানদীপ্ত নবীন ভারত দেশে দেশে বিভিন্ন জাতির প্রাণধারায় সঞ্চারিত করুক স্থায়ী সুখ, শান্তি, সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলাপ্রতিষ্ঠার মহান্ প্রয়াস। সেই অমৃতধারায় অবগাহন করে বিশ্বমৈত্রীর সাধনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠুক সমগ্র মানবজাতি।

এই গ্রন্থরচনায় গ্রন্থকার ভারতের মহামানবের জীবনধারা, তার সৃষ্টি, সাধনা, সৌন্দর্য্যবোধ ও মৈত্রীমন্ত্রের গভীর মর্ম্মস্পর্শী বাণী প্রচারিত করার পুণ্যব্রত গ্রহণ করেছেন। এই মহান্ ব্রতে তাঁকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রীজ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

৩/১১/৫৬

ডি.এস্-সি., এফ.এন.আই.,
ভারতীয় পরিকল্পনা পরিষদের শিক্ষাসদস্য

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা

কোন্ অতীত যুগে ভারত সভ্যতার ভিত্তি ও দেবায়তন-গঠন সূচিত হইয়াছিল ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই। অজ্ঞানতার অন্ধকার অপসারিত করিয়া ভারত গগনে জ্ঞানের প্রথম আলোক যখন উদ্ভাসিত হয় অনার্য্য দ্রাবিড়, দানব, অসুর এবং নাগ তখন পরস্পরের প্রতি প্রতিবেশীর মত সহানুভূতিপরায়ণ। প্রাচীন ভারতের সিন্ধু-সভ্যতার গরিমাময় যুগ এবং বুদ্ধ-পূর্ব্ব আর্য্য-ব্রাহ্মণ-সভ্যতার শান্তিপূর্ণ যুগ বর্ত্তমান সময়ের অন্যূন পঞ্চ ও ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। সভ্যতার ইতিহাসের সেই সূত্রগুলিকে অনুসরণ করিয়া ভারতীয় দেব-দেউলের অর্থাৎ দেবায়তনের ইতিবৃত্ত ও সেই প্রসঙ্গে সনাতন হিন্দুর ধর্ম্ম, সমাজ, কৃষ্টি ও রাষ্ট্রজীবনের ক্রমবিকাশ ও প্রসারের আলোচনার্থ এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

আদি-প্রস্তর-যুগ, নব্য-প্রস্তর-যুগ ও ধাতু-যুগের ভারতবর্ষ

সিন্ধু-সভ্যতার প্রথম সঙ্কেত পাওয়া গিয়াছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে যখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর-জেনেরল জেনেরল কানিংহাম হড়প্পার ধ্বংসস্তূপ হইতে খোদিত শীলমোহর প্রভৃতি সংগ্রহ করিতেছিলেন। স্থানীয় পুরাতত্ত্বে এবং ঐতিহ্যে অজ্ঞতাবশতঃ তিনি সেই অজ্ঞাত সভ্যতার অস্তিত্বকে তখন অনুমান করিতে পারেন নাই। ফলতঃ শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ কাল সিন্ধু-সভ্যতা সাধারণের অগোচর ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্ ব্রুসফুট সেই সময়ে মাদ্রাজ প্রদেশে আদি-প্রস্তর-যুগের প্রস্তরের কতকগুলি অমসৃণ অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করেন। তদ্দ্বারা আদি-প্রস্তর-যুগে ভারতে মানবের যে বসতি ছিল তাহা প্রমাণিত হয়। দক্ষিণ

ভারতের অন্যত্রও সেই যুগের প্রস্তরের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। মধ্য ভারতেও ক্রুসফুট আদি-প্রস্তর-যুগের শ্রমশিল্পের নিদর্শন পাইয়াছিলেন। ১৯৩৫ সালে হিমালয় ও তরাই অঞ্চলে ইয়েল ও কেমব্রিজ বিশ্ববিত্তালয়ের মিলিত অভিযান সিদ্ধান্ত করিয়াছিল যে, আদিম মানব উত্তর হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া, সিন্ধু ও ঝিলাম উপত্যকার মধ্য দিয়া পশ্চিম পঞ্জাব, শিবালিক ভূভাগ ও কাশ্মীর ভূভাগের জম্মুতে উপনীত হয়। সেই সকল প্রদেশে যাযাবর শিকারীদের ব্যবহৃত প্রস্তরের অস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে। পঞ্জাবে, রাজস্থানে, গুজরাটে, মধ্য ভারতে এবং নর্ম্মদার উপত্যকায় অমসৃণ, স্থূল অস্ত্রশস্ত্র এবং মধ্য ভারতে সিঙ্গনপুর পর্ব্বত-গুহাগাত্রে রেখাচিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। আদি-প্রস্তর-যুগের ভারতবাসীরা 'নেগ্রিটো' জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। গুর্জ্জরে সেই যুগের সপ্তসংখ্যক নরকঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। কঙ্কালগুলি 'হেমেটিক নিগ্রয়েড' জাতীয় মনুষ্যের। সেই জাতীয় মনুষ্য বর্ত্তমান যুগে কেবলমাত্র আন্দামান দ্বীপে পরিদৃষ্ট হয়—খর্ব্বাকার, কৃষ্ণবর্ণ, কুঞ্চিত-কেশ ও স্থূল নাসিকাবিশিষ্ট। পরবর্ত্তী কালের ভারতে উক্ত জাতি হয়ত অবলুপ্ত অথবা অন্য জাতির সহিত মিশ্রিত হইয়াছিল।

আদি-প্রস্তর-যুগের কয় লক্ষ বৎসর পরে নব্য-প্রস্তর-যুগ। বিংশ শতাব্দীর দশ পনর সহস্র বৎসর পূর্ব্বেকার নব্য-প্রস্তর-যুগের শ্রমশিল্পের নিদর্শন—মাদ্রাজের বেলাড়ি প্রদেশে আবিষ্কৃত প্রস্তরের অস্ত্র ও যন্ত্রনির্ম্মাণের কর্ম্মশালাসহ কর্ম্মশালায় নির্ম্মিত দ্রব্যগুলি। আদি-প্রস্তর-যুগে বৃক্ষশাখায় ও পর্ব্বতগুহায় অবস্থান, বনের ফল-আহরণ ও পশুপক্ষী-শিকার—ইহাই ছিল মানুষের বৃত্তি। কিন্তু নব্য-প্রস্তর-যুগে পশুচর্ম্মাবৃত কোণশীর্ষ বৃত্তাকার তাঁবুঘর নির্ম্মাণ, পশুপালন ও কৃষিকার্য্যের সূচনা হয়। সেই যুগের প্রবর্ত্তক 'নিগ্রয়েড'দের পরবর্ত্তী 'প্রোটো অস্ট্রলয়েড' জাতি। তাহারা মৃৎপাত্র নির্ম্মাণ করিত। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য সূচল প্রস্তরের অথবা কাষ্ঠখণ্ডের দ্বারা জমি খনন করিত। এদেশে 'অস্ট্রিক' সংস্কৃতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল তাহারাই। ক্রমে ক্রমে উত্তর ও পূর্ব্ব পার্ব্বত্যাঞ্চল হইতে মোঙ্গলীয় জাতি এবং তৎপরে 'নিউ-মেডিটারেনিয়ান,' 'আল্‌পাইন,' 'আরমেনয়েড' ও 'নর্ডিক' জাতি পশ্চিম প্রান্ত হইতে ভারতে প্রবেশ করে। নব্য-প্রস্তর-যুগের চিত্রাঙ্কিত মৃৎপাত্রের বহুবিধ নিদর্শন উত্তর-পশ্চিম ভারতে ও বেলুচিস্তানে পাওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন নানা স্থানে ভূ-প্রোথিত মাটির

জালার মধ্যে মৃতদেহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সমাধির উপরে প্রস্তরের খুঁটিতে হেলায়মান প্রস্তরাচ্ছাদন। এই সকল সমাধি 'ডলমেন' নামে পরিচিত। সেই যুগে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র 'ডলমেন' ব্যবহৃত হইত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতের পার্ব্বত্য ও বন্য ভূভাগের বর্ত্তমান মনুষ্যদের অনেকেই নব্য-প্রস্তর-যুগের মানবের বংশধর।

নব্য-প্রস্তর-যুগের পরে ধাতু-যুগ। সম্প্রতি দক্ষিণ-হায়দ্রাবাদ প্রদেশে ধাতু-যুগের কতকগুলি তাম্র- ও ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত অস্ত্র এবং নাগপুর, হায়দ্রাবাদ, মদুরা ও মহীশূর অঞ্চলে 'ডলমেন' ও অন্যবিধ সমাধির অভ্যন্তরে ধাতুনির্ম্মিত পাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজস্থান, ছোটনাগপুর, সিংহভূম ও উড়িষ্যা প্রদেশে তাম্র সংগৃহীত হইত। তাম্র ও ব্রোঞ্জের প্রসার উত্তর ভারতে যেরূপ হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যে তদ্রূপ হয় নাই। সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা লৌহের ব্যবহার জানিত না, ব্রোঞ্জ ব্যবহার করিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিক্ষিপ্ত সমাধি-স্তূপগুলির কোনওটিতে নব্য-প্রস্তর-যুগের শিল্পসামগ্রীর সহিত লৌহাস্ত্র, কোথাও বা তাম্র- অথবা ব্রোঞ্জ-নির্ম্মিত অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। আর্য্যভারতে 'অয়স্' ধাতুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল; তাহার উল্লেখ ঋক্ মন্ত্রে পাওয়া যায়। অয়স্কে কেহ বলিয়াছেন লৌহ, কেহ বলিয়াছেন তাম্র। সেই যুগে দক্ষিণ ভারতে লৌহের ব্যবহার জ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি পশ্চিম বাংলার বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বনঅসুরিয়াতে নব্য-প্রস্তর-যুগের প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠার (১ চিত্র) এবং বর্দ্ধমান বিভাগীয় দুর্গাপুর অঞ্চলে দশ সহস্র বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তরের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। সুকল্পিত-ভাবে খনন পরিচালিত হইলে উভয় স্থানেই প্রত্নতাত্ত্বিক বহুবিধ উপকরণ সংগ্রহের সম্ভাবনা।

আর্য্য-পূর্ব্ব দ্রাবিড়-সিন্ধু সংস্কৃতি ; প্রাগৈতিহাসিক দেবদেবী ও দেবায়তন

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দক্ষিণ পঞ্জাবের হড়প্পা ও সিন্ধু-প্রদেশের মোহেন্-জো-দড়ো মহানগরীদ্বয়ের অন্যূন পঞ্চ সহস্র বৎসরের প্রাচীন অবশেষ আবিষ্কৃত হয়। উত্তরে হড়প্পা হইতে দক্ষিণে মোহেন্-জো-দড়ো নগরীর দূরত্ব ৩৫০ মাইল। খননের প্রসারের

অনুক্রমে উভয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে বহুসংখ্যক বসতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রামের সংখ্যাই অধিক, কয়টি ক্ষুদ্র শহর। অনুমান করা যায় যে, একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের দুইটি রাজধানী (প্রধান নগরী) ছিল—হড়প্পা ও মোহেন্-জো-দড়ো (২ চিত্র)। হড়প্পা প্রদেশে ছয়টি এবং মোহেন্-জো-দড়ো প্রদেশে নয়টি নগর আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন স্তরের উপরে তাহারা অবস্থিত। মোহেন্-জো-দড়োর বহু নিম্ন স্তরে খনন করা সম্ভব হয় নাই, যেহেতু তাহা জলমগ্ন।

সিন্ধু, পঞ্জাব ও বেলুচিস্তানের নানা স্থানে হড়প্পা এবং মোহেন্-জো-দড়ো ব্যতীত অন্যান্য গ্রাম্য-বসতির চিহ্ন বর্ত্তমান—সিন্ধু-প্রদেশে 'আমরি', বেলুচিস্তানে 'নাল' প্রভৃতি। অনুমিত হইয়াছে যে, তাহারা হড়প্পা ও মোহেন্-জো-দড়ো অপেক্ষা প্রাচীনতর সভ্যতার নিদর্শন। হড়প্পার একটি নগর একটি গ্রাম্য বসতির ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উক্ত গ্রামগুলির গৃহনির্ম্মাণে প্রস্তর ব্যবহৃত হইত। কয়েকটি গৃহের প্রস্তরময় ভিত্তির অবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান। রৌদ্রশুষ্ক ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ-প্রাচীর। তাহার অভ্যন্তরভাগে ইষ্টক অথবা অমসৃণ প্রস্তরের গাঁথনির উপর চূণের 'পলস্তরা'।

হড়প্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর সহিত গ্রাম ও জনপদগুলির অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক সংযোগ ছিল। কৃষি ও কৃষকের অবদানের পটভূমিকায় নগরীয় সভ্যতা বিকশিত হইয়াছিল। সেই নগরীয় সভ্যতা পল্লী ও জনপদে সঞ্চারিত হইয়াছিল (৩ চিত্র)। গ্রামের উদ্বৃত্ত শস্যগুলি এবং অরণ্যের ফলমূল-লতাগুল্ম-মধু প্রভৃতি উভয় রাজধানীর খাদ্য ও ঔষধের সংস্থান করিত। রাজধানীর শ্রমশিল্পোৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময় গ্রামোৎপন্ন শস্যাদির সহিত চলিত। নগরনির্ম্মাণ, শিল্পরচনা, সামাজিক ও পৌর রীতিনীতি সুপরিকল্পিত বিধিব্যবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। সিন্ধু-সভ্যতায় গ্রামীয় অবদান প্রচুর থাকিলেও উহা সম্পূর্ণরূপে নগরীয় ব্যবসায়ী, শিল্পী ও শ্রমিকসঙ্ঘ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত। পক্ষান্তরে, বৈদিক আর্য্যসমাজ কৃষিজীবি-সম্প্রদায় ও পশুপালকের পল্লীজীবনের প্রতিচ্ছবি।

আর্য্য-পূর্ব্ব যুগের এবং আর্য্য-আগমনের সমসাময়িক ভারতবাসীদের কিয়দংশ হড়প্পা ও মোহেন্-জো-দড়ো সংলগ্ন অরণ্য-সমাকীর্ণ ভূভাগে বাস করিত। উভয়

চিত্রফলক ১



চিত্র—নব্য-প্রস্তরযুগের কুঠারফলক (পঞ্চদশ সহস্র বৎসর পুরাতন)



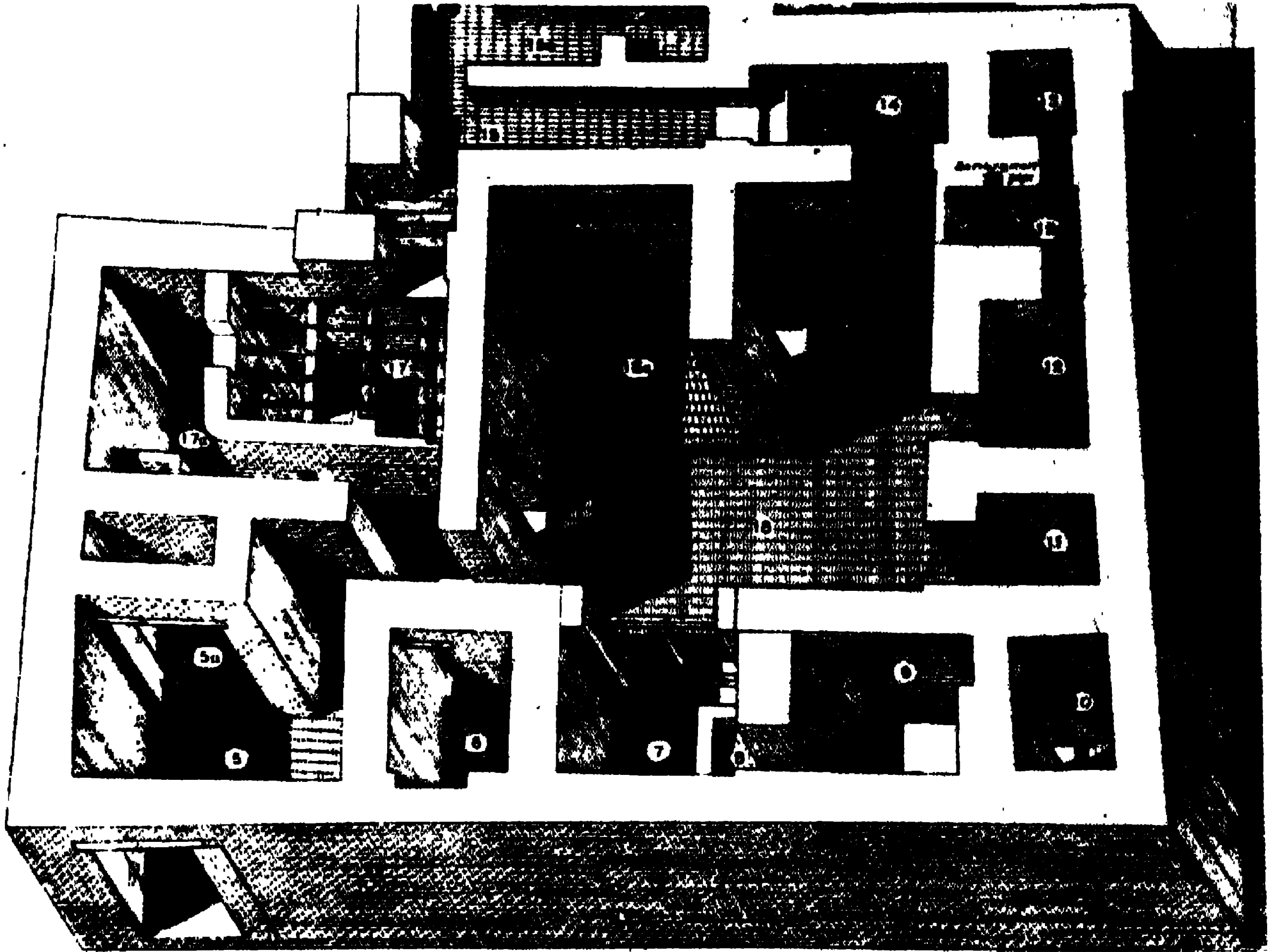
২ চিত্র —মোহেন্-জো-দড়ো (বিন্যাস-চিত্রাংশ)

চিত্রফলক ২



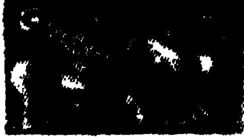
১ চিত্র—বহু প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকাবাসীর পল্লীজীবন

চিত্রফলক ৩



৪ চিত্র—বাসগৃহ, মোহেন্-জো-দড়ো

চিত্রফলক ৪


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11

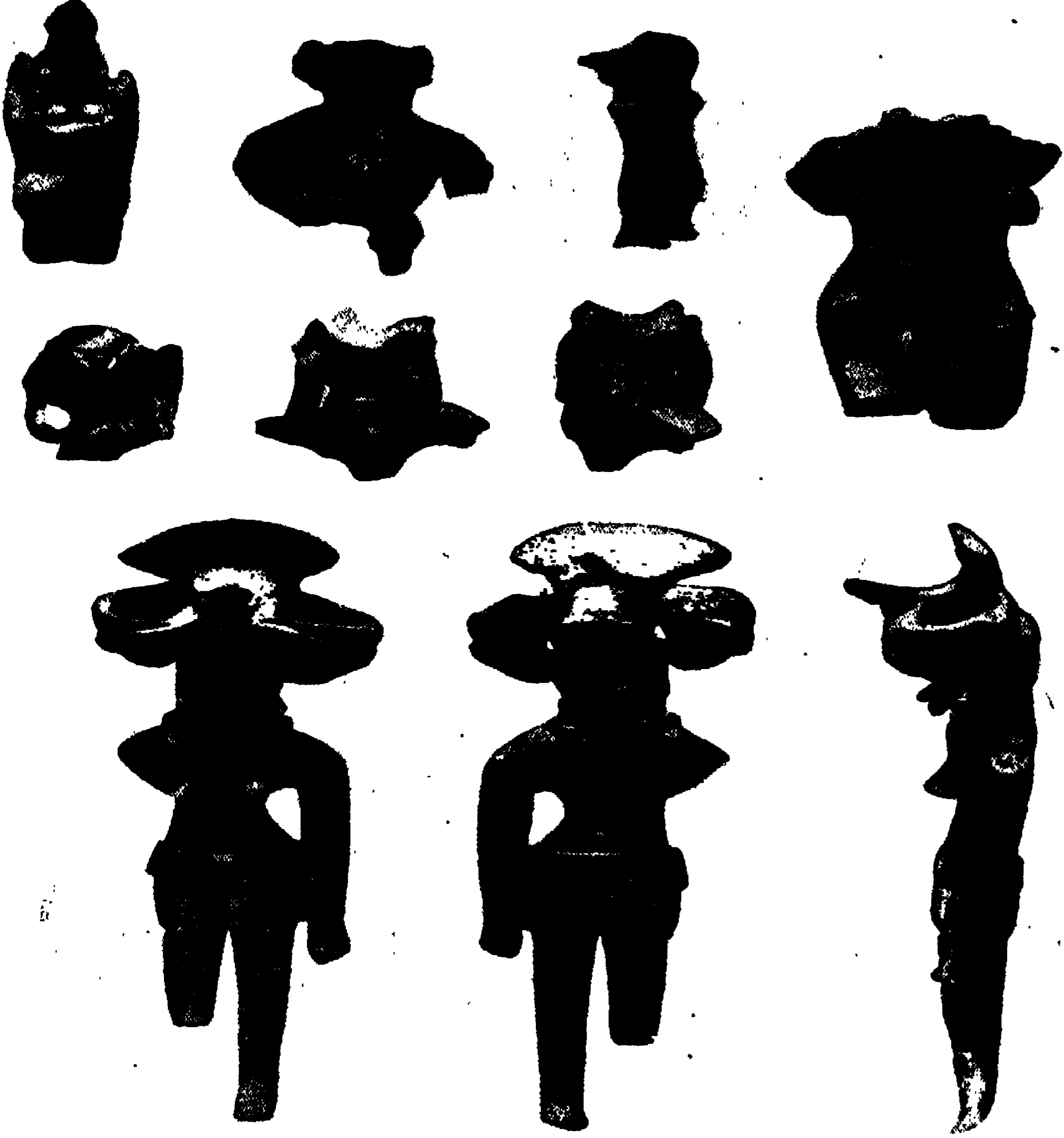

12


13


14

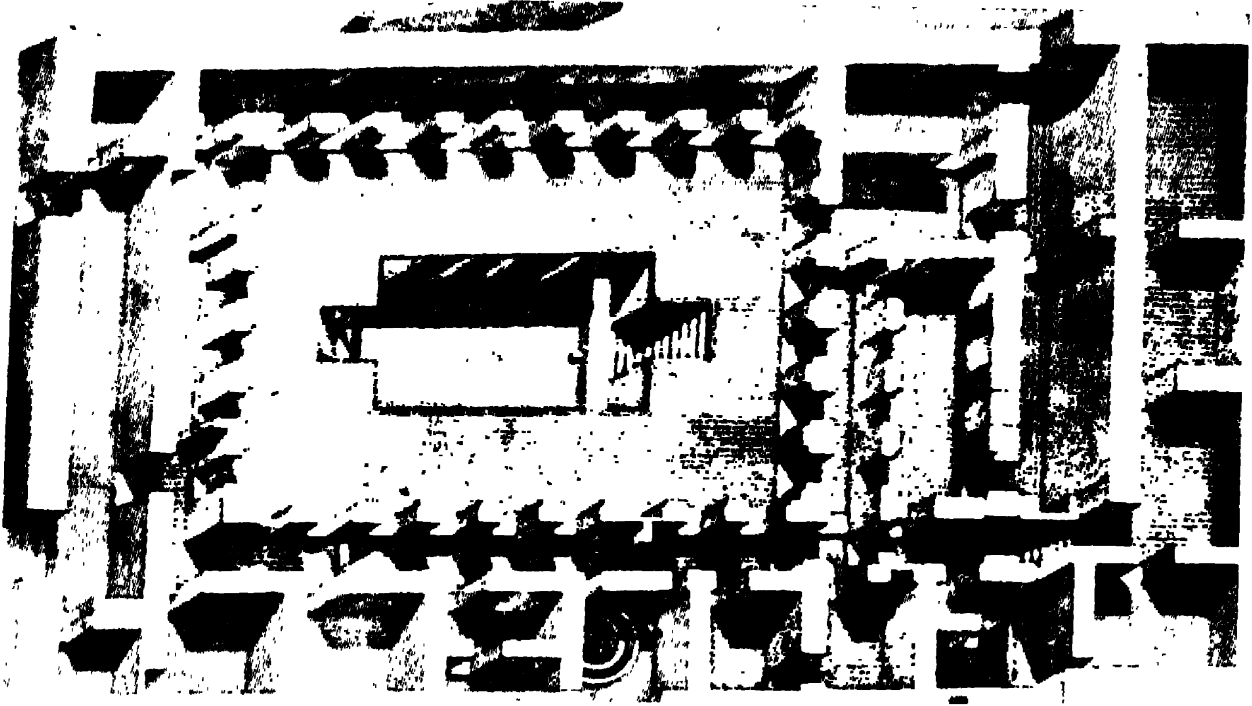
৫ চিত্র— শীলমোহর, মোহেন্-জো-দড়ো

চিত্রফলক ৫



৬ চিত্র—মাতৃকা, মোহেন্-জো-দড়ো

চিত্রফলক ৬



৭ চিত্র—সন্তরণবাপী, মোহেন্-জো-দড়ো



৮ চিত্র—পয়ঃপ্রণালী, মোহেন-জো দড়ো

চিত্রফলক ৭

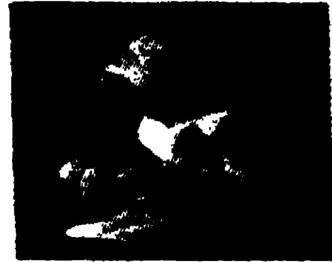


৯ চিত্র মৃৎশিল্প, মোহেন-জো-দড়ো

চিত্রফলক ৮



1. Pottery figure of horned deity.



2. Glazed figure of monkey?



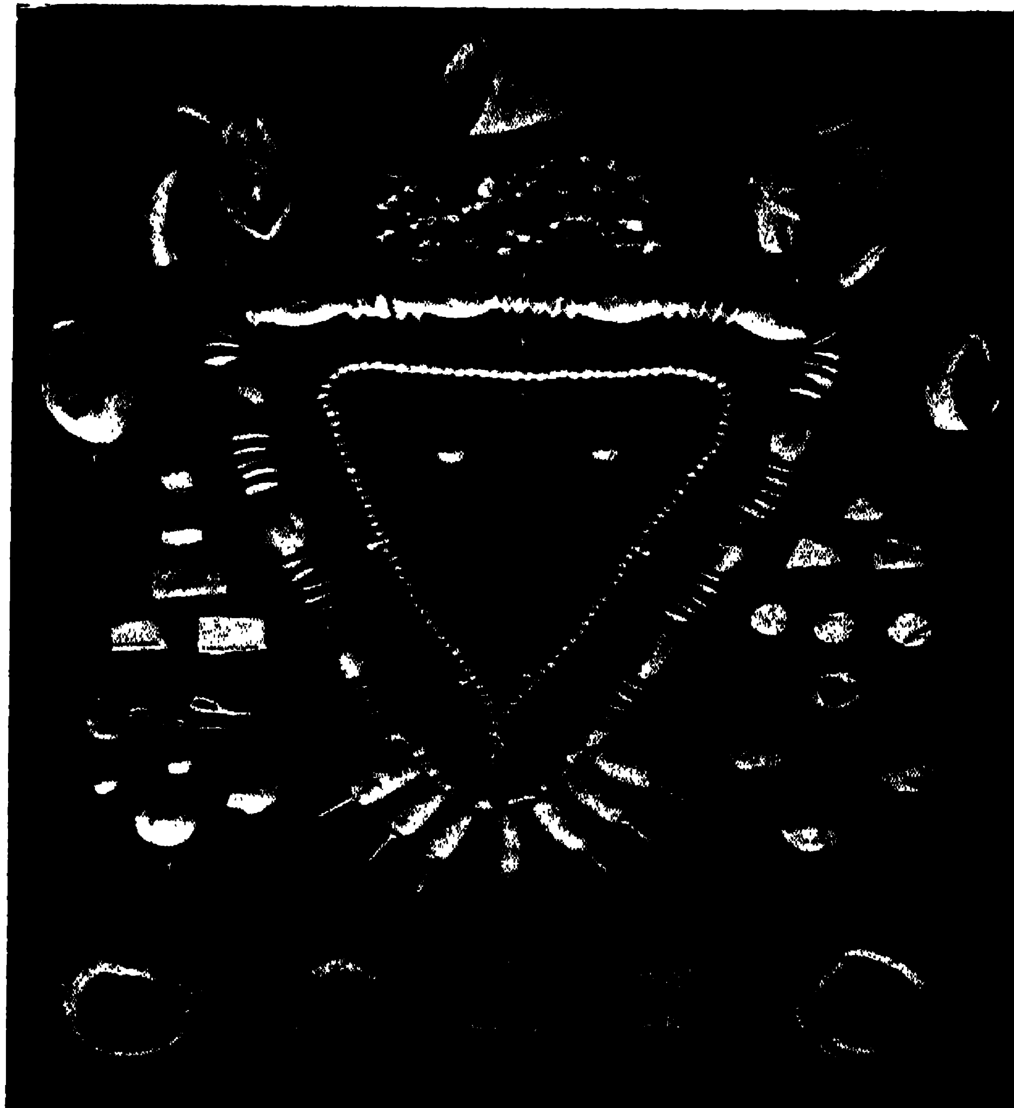
3. Steatite pectoral, once mounted in metal and filled with inlay.



4. Unfinished figure of monkey and young.

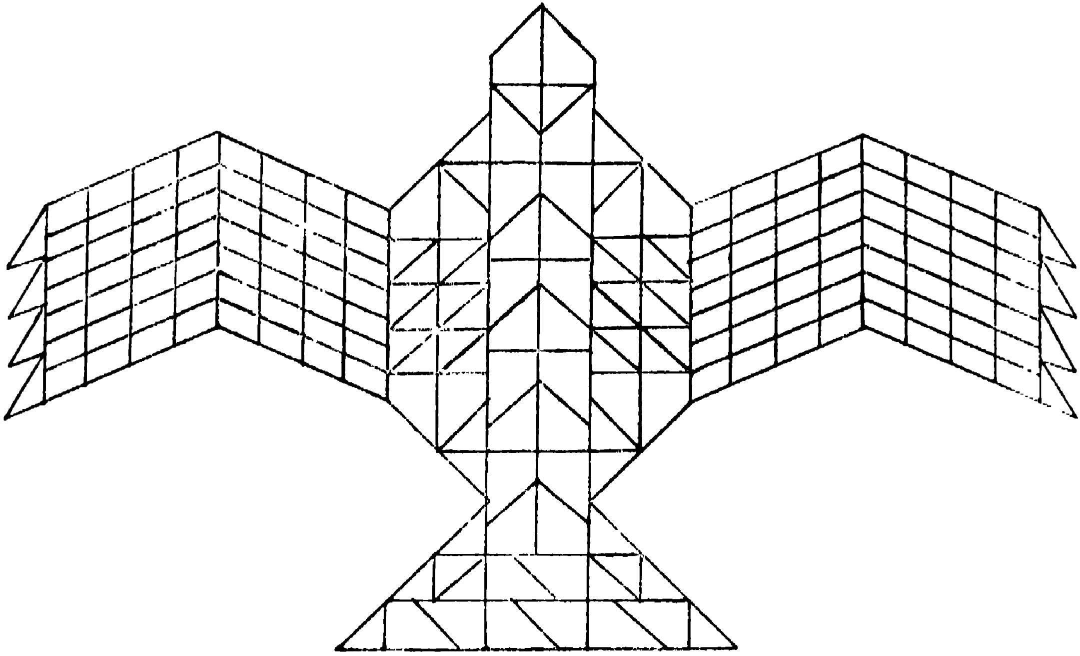
১০ চিত্র—মূর্ত্তি ও কবচ, মোহেন্-জো-দড়ো

চিত্রফলক ৯



১১ চিত্র—অলঙ্কার, মোহেন্-জো-দড়ো

চিত্রফলক ১০



১২ চিত্র—বৈদিক যজ্ঞবেদী (শ্যেনচিতি)

নগরেই আবিষ্কৃত হইয়াছে—অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকে[1] প্রস্তুত এই যুগের দ্বিতল ত্রিতল বাসগৃহ, প্রাসাদ, ভোজনাগার, পানাগার, স্নানাগার, পণ্যশালা, প্রমোদশালা, দুর্গপ্রাকারের ভগ্নাবশেষ ও সিন্ধুতটবর্তী বিশাল বাঁধের জীর্ণ ভিত্তি। দ্বিতল ও ত্রিতল বাড়ীর নিম্নভাগের প্রাচীরগুলি রৌদ্রশুষ্ক অথবা অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকে প্রস্তুত। উপরিভাগের প্রাচীর রৌদ্রশুষ্ক ইষ্টকের অথবা কঞ্চির জাফরির উপর পুরু মৃত্তিকালিপ্ত। ছাদের কড়িকাঠ ধারণের জন্য প্রাচীরমধ্যে দণ্ডায়মান কাষ্ঠস্তম্ভ। কড়িকাষ্ঠের উপরে তক্তা পাতিয়া তদুপরি খড় ও মাটির অথবা খাপরার প্রস্তুত সমতল অথবা ঈষৎ-ঢালু ছাদ। প্রথম তলে, অধিকাংশ বাটীতে, বাতায়ন থাকিত না। উপর তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষ থাকিত। দ্বিতলে ও ত্রিতলে অপরিসর বারান্দার উপর দিয়া কক্ষগুলির মধ্যে গমনাগমন হইত। উপরের জল, দগ্ধমৃত্তিকার চুঙীর মাধ্যমে নিম্নে জলনিকাশে পড়িত (৪ চিত্র)। এইরূপ বাটী উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানে এবং পঞ্জাব প্রদেশে অদ্যাপি দৃষ্ট হয়।

সেই প্রাচীন যুগে সিন্ধু-ভূভাগে দেবায়তনের অবস্থিতি অনুমান-সাপেক্ষ। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খননের অভাবে তৎসম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় নাই। হড়প্পায় একটি মৃন্ময় শীলমোহরে ক্ষুদ্র একটি মন্দিরের আনুমানিক আভাস পাওয়া যায়। মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরে মৎস্যাকৃতি-ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট একটি দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। উহা দ্রাবিড় দেশে 'তাণ্ডব' নামে পরিচিত শিবের সমতুল। একটি মোহরে হস্তী, গণ্ডার, শার্দ্দূল ও মহিষ-পরিবেষ্টিত শৃঙ্গধারী দেবতা (৫ চিত্র)। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধিনায়ক স্যর জন মার্শাল সেই মূর্ত্তিকে 'পশুপতি' দেবতা রূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন।[2] ত্রিশূলচিহ্নিত একটি ধাতুফলক

---

১ হড়প্পার অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকের আয়তন (১৭½″ × ১১″ × ৩″) বহু যুগ পরবর্তী বুদ্ধগয়া মন্দিরের অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকের সদৃশ ছিল।

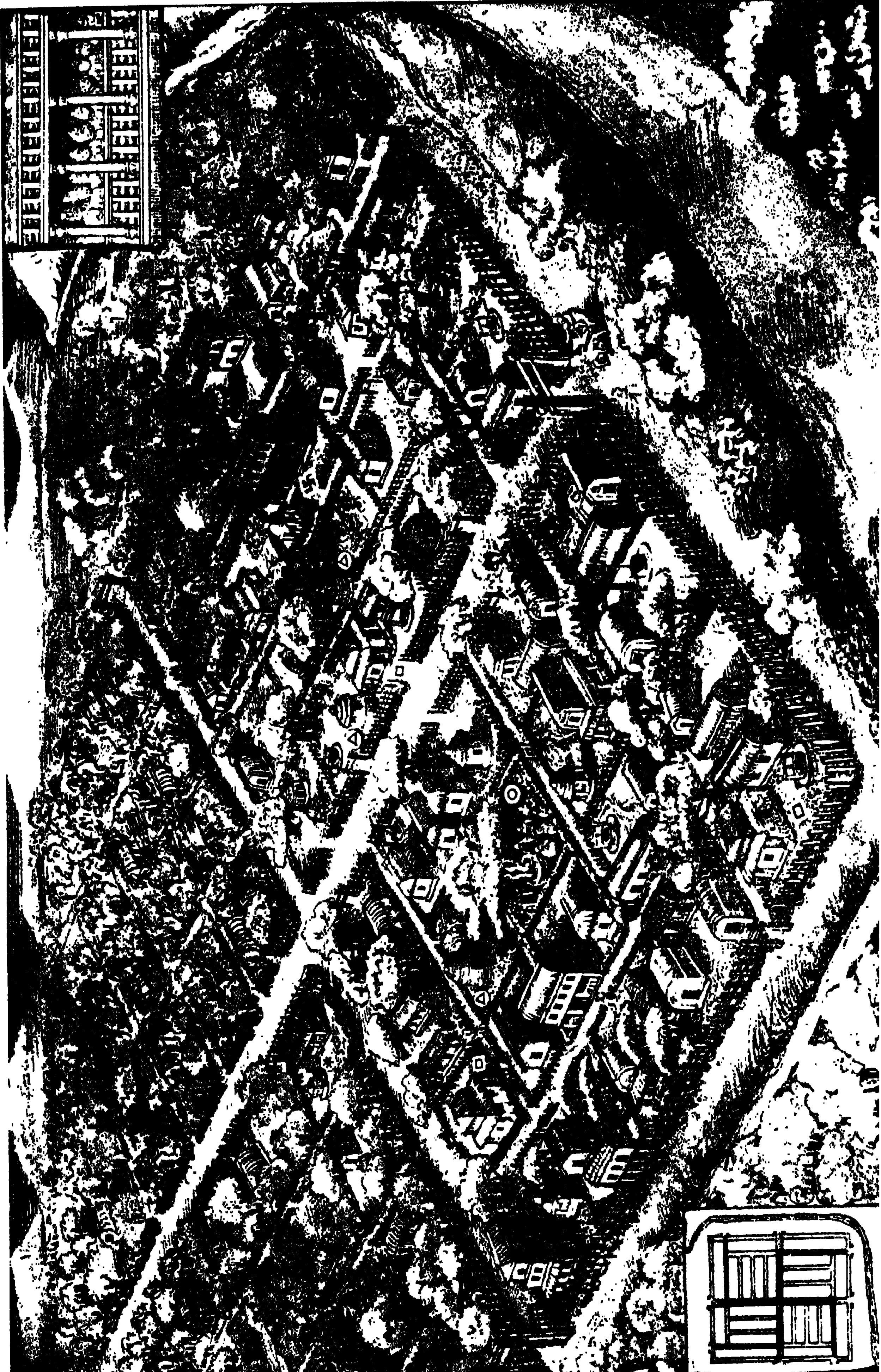
২ উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহু প্রাচীন নাগজাতি বৃক্ষ ও শিবের পূজা করিতেন। নাগদম্পতি বৃক্ষকে আবেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান, এইরূপ নিদর্শন মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহরে পাওয়া গিয়াছে। তথায় বৃক্ষ, সর্প ও জীবজন্তু পূজার প্রচলন ছিল। তাহার তিনসহস্র বৎসর পরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ভরহুৎ স্তূপের তোরণে খোদিত হইয়াছিল—নাগেরা বোধিবৃক্ষকে পূজা করিতেছেন।

অরণ্যসঙ্কুল সিন্ধু-ভূভাগে, সিন্ধুতটবর্ত্তী সমতল নগর ও পল্লীতেই হিন্দুধর্ম্ম তথা হিন্দুসভ্যতা অঙ্কুরিত হইয়াছিল। সিন্ধুর অরণ্যাবৃত সমতটভাগই প্রথম মানবসভ্যতার জন্মভূমি, অদূর ভবিষ্যতে তাহা প্রমাণিত হইবার আশা তাঁহারা করেন।

মোহেন্-জো-দড়ো নির্ম্মাণের যুগ মিশরের প্রথম পিরামিড যুগের সমসাময়িক। কিন্তু হড়প্পার উন্নতধরণের পল্লী- ও নগর-নির্ম্মাণের সূচনা হইয়াছিল প্রথম পিরামিড-সৃষ্টির অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হড়প্পা প্রদেশীয় একটি নগর গ্রাম্য বসতির ভিত্তির উপরে নির্ম্মিত হইয়াছিল; সেই গ্রাম্য বসতি রাজধানী হড়প্পা এবং মোহেন্-জো-দড়ো অপেক্ষা প্রাচীন। সিন্ধু-উপত্যকার খনন বিধিমতভাবে পরিচালিত হইলে হয়ত ইহাই প্রমাণিত হইবে যে, ভারতের বহুপ্রাচীন সভ্যতা সুমেরীয় ও মিশরীয় সংস্কৃতির অগ্রজ। মিশরে ও পশ্চিম এশিয়ায়, অন্যবিধ সামগ্রীর সহিত, চিত্রাক্ষর, 'প্যাপিরাস' ও শিলালিপি সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের পাঠোদ্ধার করিয়া তদ্দেশীয় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু-উপত্যকায় যে সকল চিত্রলেখনযুক্ত শীলমোহর প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে অদ্যাপি তাহাদের পাঠোদ্ধার হয় নাই। ইহা হইলে সিন্ধু তথা ভারত সভ্যতার ধারাবাহিক একটি ইতিহাস প্রণয়নের সম্ভাবনা আছে। মিশরের খনন সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু-উপত্যকার খননকার্য্য অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই।

১৯৩১ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখের New York Times পত্রিকার Science Supplementএ স্যর আর্থর কীথ্ স্যর জন মার্শালের গ্রন্থের উপর মন্তব্য স্বরূপ লিখিয়াছিলেন, "প্রাচীন ভারতবর্ষ সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতির উচ্চ শিখরে আসীন ছিল। পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্যত্র তাহার সমকক্ষ ছিল না। . . . . সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য ও শিল্পসম্বন্ধীয় সমস্যাগুলির সমাধানকারী হড়প্পা ও মোহেন্-জো-দড়োর সুপরিকল্পিত, সুবিন্যস্ত, নগর-নির্ম্মাণ-বিজ্ঞানের তুলনা মিশর ও মেসোপটেমিয়াতে পাওয়া যায় নাই . . . মোহেন্-জো-দড়ো নির্ম্মিত হইয়াছিল খৃঃ পূঃ ত্রয়স্ত্রিংশ শতকে ঈজিপ্টের প্রথম ফ্যারাও বংশের প্রথম নরপতির রাজত্বকালে . . .।" *American Academy of Political Science* পত্রিকার ১৯৪৪ সালের মে সংখ্যায় অনুরূপ বিবৃতি প্রকাশিত হয়। ইতিহাসবেত্তা এইচ. আর. হল

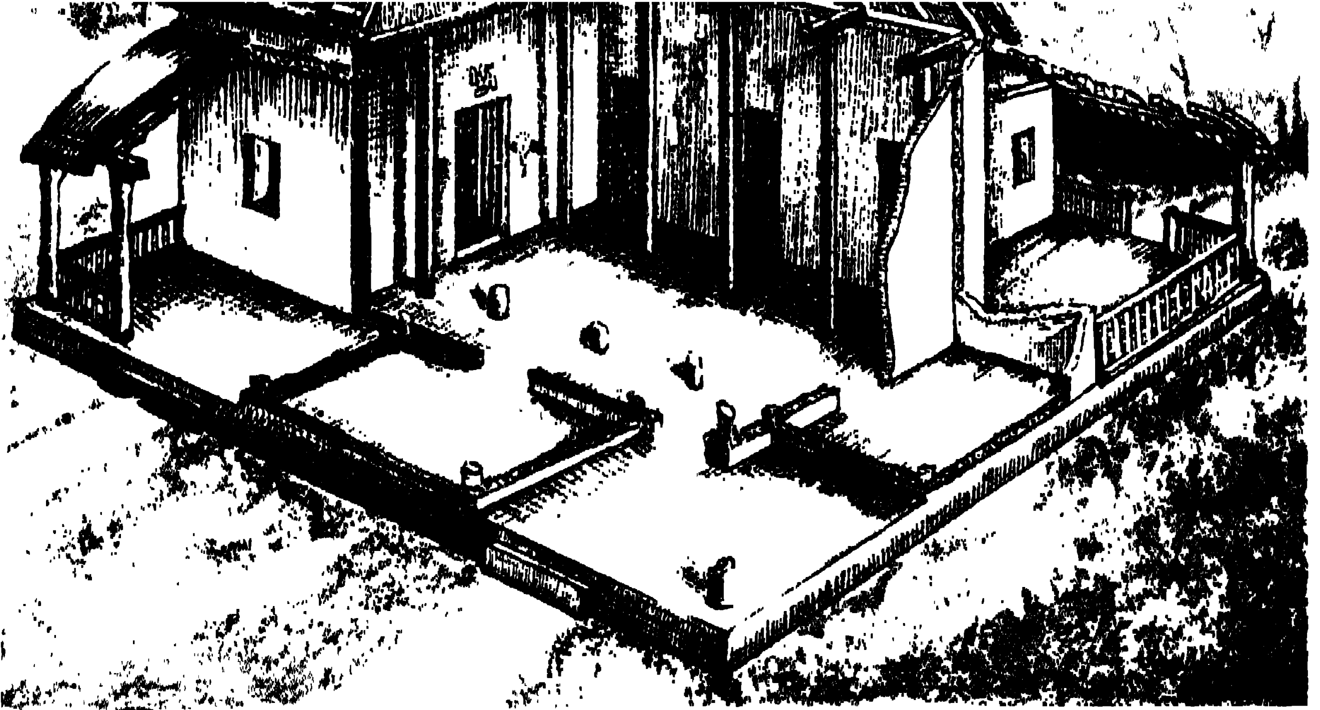
চিত্রফলক ১১



১৭ চিত্র—বৈদিক গ্রাম

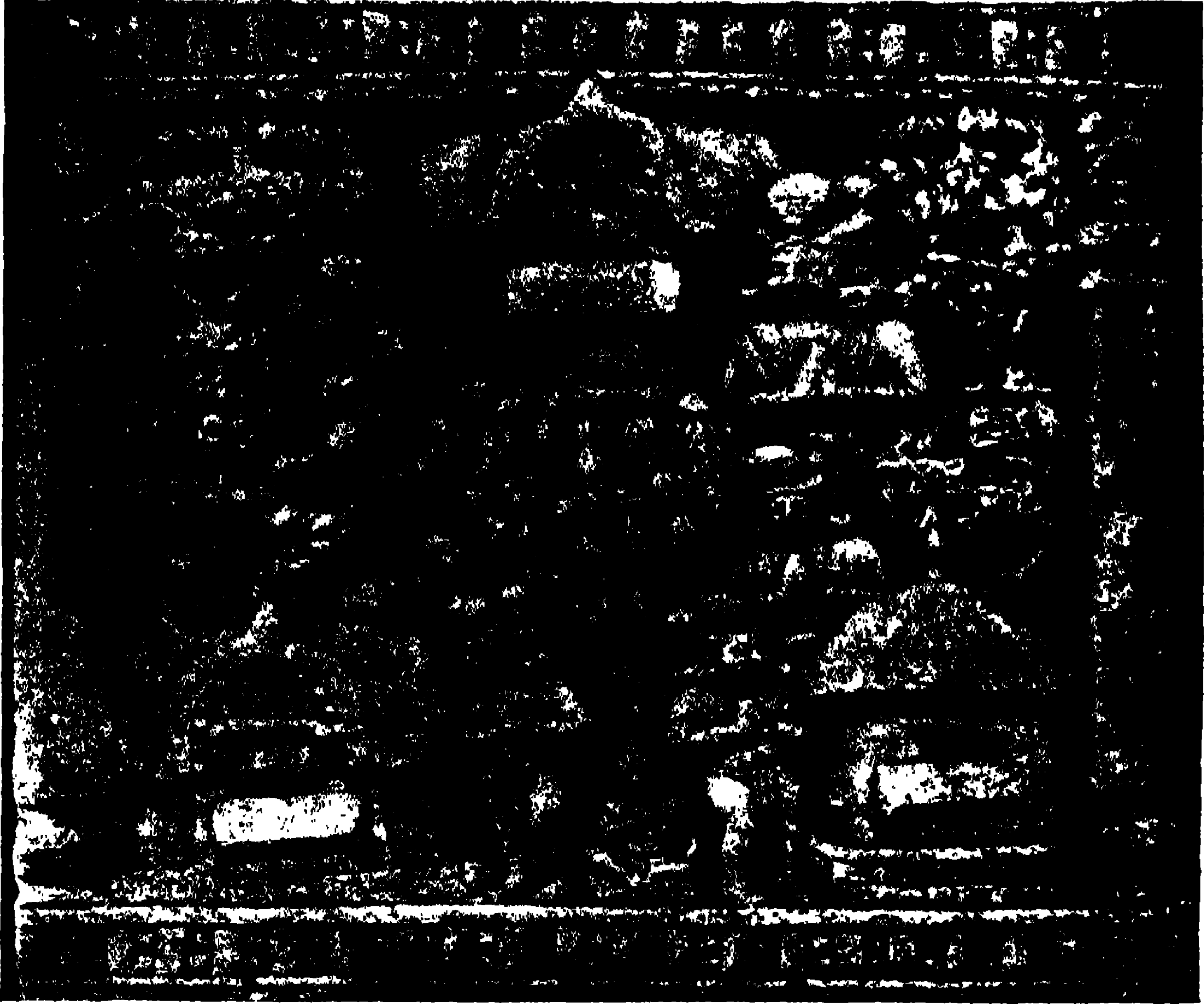
[লেখক কর্তৃক পরিকল্পিত]

চিত্রফলক ১২



১৪ চিত্র- বৈদিক ব্রাহ্মণাবাস

চিত্রফলক ১৩



১৫ চিত্র—সাচিফলকে গামীষ স্তূপ (?)

চিত্রফলক ১৪

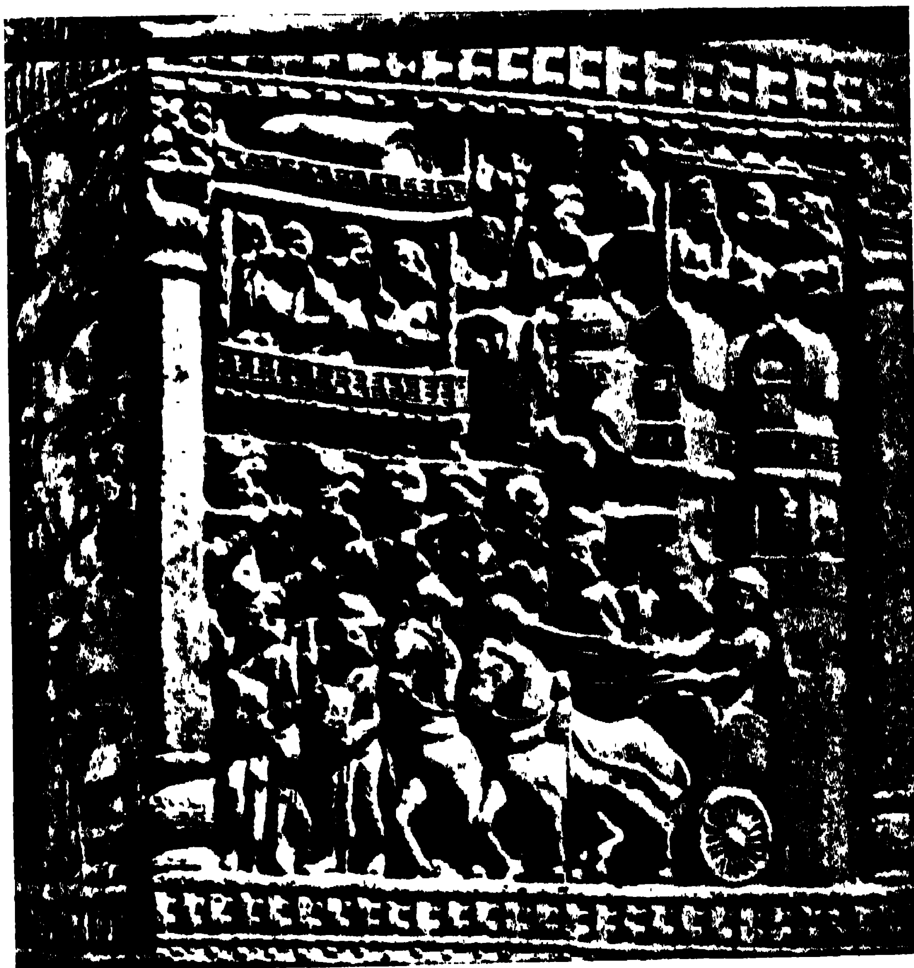


১৬ চিত্র—যক্ষী, বাঁকড়া, পশ্চিমবঙ্গ

চিত্রফলক ১৫



১৭ চিত্র—বৈদিক আশ্রম



১৮ চিত্র—সাঁচিফলকে রাজগৃহ

চিত্রফলক ১৬



১৯ চিত্র— মনসা, উত্তরবঙ্গ



২০ চিত্র— অশোক স্তম্ভ, সাঁচি

বলেন, ভারতবর্ষ সুমেরীয় সংস্কৃতির জনক। অধ্যাপক গর্ডন চাইলড্ বলেন, বাবিলনীয় মৃত্তিকায় সুমেরীয় সভ্যতা অঙ্কুরিত হইয়া বিকশিত হইয়াছিল ভারতবর্ষ হইতে প্রেরণা পাইয়া।

ভারতে আর্য্য-আগমন ও আর্য্য-সংস্কৃতির বিকাশ

আর্য্য মহাজাতির উৎপত্তিস্থান, বসতি ও বিস্তৃতিপ্রসঙ্গে বহু প্রকার অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাপি কোনওরূপ সিদ্ধান্ত হয় নাই। প্রবল পক্ষের অভিমতে উত্তর-পশ্চিম ভারত-সীমান্তের 'খাইবার' ও 'গোমাল' গিরিপথগুলি অতিক্রম করিয়া আর্য্য জাতির একটি শাখা এদেশে আগমন করেন এবং হিমালয়ের সানুদেশে 'সপ্তসিন্ধব' ভূভাগে বসতি করেন। তাঁহারা দীর্ঘদেহ, গৌরবর্ণ এবং উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিলেন। পশুপালন-, কৃষি- ও শিল্প-নিপুণ আর্য্যগণ গণতান্ত্রিক সমাজ-গঠনেও নিপুণ ছিলেন।

প্রাকৃতিক শোভাময়, নৈসর্গিক বৈচিত্র্যময়, ভারতভূমি নবাগতদের সবল সরল চিত্তকে মুগ্ধ করিয়াছিল। শীত, বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষায়—তুষারপ্রবাহ, শ্যামলশ্রী অরণ্যানী এবং সঙ্গীতমুখরা খরস্রোতার সহযোগে—হিমালয় উদ্ভিদ্ ও জীব-জগতের সৃজন, পালন ও সংহারের লীলা করিতেন। এই যে লীলাচক্র, ইহারই ধ্যানে সুদীর্ঘ কাল নিমগ্ন থাকিয়া আর্য্যগণ সূর্য্য, পবন, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র, উষা, সরস্বতী, পৃথিবী প্রভৃতি—প্রাকৃতিক মহাশক্তির প্রতীক—দেবদেবীগণের যে পরিকল্পনা করেন তাহারই বর্ণনাপ্রসঙ্গে বেদমন্ত্রের সৃষ্টি হইল। অমিততেজা দেবদেবীগণের তুষ্টির জন্য যজ্ঞ ও উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইল (১২ চিত্র)। অপরিমিত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বের অন্তর্নিহিত তেজ ও শক্তিনিচয়ের মূলগত ঐক্যের সন্ধান পাইয়া তাঁহারা ঘোষণা করিলেন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বশক্তি, সকল দেবদেবী এক পরমপিতা পরব্রহ্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছেন। বিশ্বের প্রথম সাহিত্য বিরাট্ বেদ (জ্ঞান) গ্রন্থ তাঁহারাই রচনা করিলেন। বেদশাস্ত্র চারি ভাগে বিভক্ত : ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব। চারি বেদের প্রত্যেকটি তিন ভাগে বিভক্ত : সংহিতা, ব্রাহ্মণ (আরণ্যক

ও উপনিষদ্‌সহ) এবং বেদাঙ্গ বা সূত্র। দেবতার স্তবস্তুতিমূলক পদ্যাংশের নাম সংহিতা। যজ্ঞের প্রণালী ও উদ্দেশ্যজ্ঞাপক, গদ্যে লিখিত ব্রাহ্মণ অংশের শেষ ভাগ আরণ্যক নামে আখ্যাত। আরণ্যকের শেষ পর্ব উপনিষদ্‌ তথা বেদান্ত নামে অভিহিত। অরণ্যবাসী মুনিঋষি ব্রহ্মচারিগণের দার্শনিক চিন্তাধারা আরণ্যক ও উপনিষদে উপলব্ধ হয়। বেদের অবশিষ্ট অংশ বেদাঙ্গ বলিয়া পরিচিত। খৃঃ পূঃ ২০০০—১২০০ অব্দে ঋক্‌ সংহিতা, ব্রাহ্মণ খৃঃ পূঃ ১২০০—৬০০, উপনিষদ্‌ খৃঃ পূঃ ৮০০—৬০০ এবং বেদাঙ্গ খৃঃ পূঃ ৬০০—২০০ অব্দে বিরচিত, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে। তপস্যাপরায়ণ ব্রহ্মর্ষিগণ, সুগভীর ধ্যান এবং অপ্রাকৃত অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা পরা প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, বেদমন্ত্রের সৃষ্টি করেন। বেদের প্রথম পর্য্যায়ে আর্য্য-আরাধ্য প্রধান দেবদেবীরূপে বরণীয় এবং বরণীয়া হইয়াছিলেন—স্বর্গের দেবতা, জগৎপিতা 'দ্যৌ' এবং জগন্মাতা ভূদেবী (শ্রী, অদিতি)। সৌরমণ্ডলের প্রধান দেবতা সূর্য্য, বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবশক্তিগণ যে একই অদ্বিতীয় মহাশক্তি পরব্রহ্মের অংশ বিকাশ, ঋক্‌ বেদে তাহার উল্লেখ আছে। অতঃপর বেদের (শ্রুতি) দুরূহ ও নিগূঢ় অর্থকে সাধারণের বোধগম্য করিতে তাঁহারা স্মৃতি নামক কতকগুলি সহজ ও সরল গ্রন্থ রচিত করেন। স্মৃতি তিন ভাগে বিভক্ত: ইতিহাস, পুরাণ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র। রামায়ণ ও মহাভারত ইতিহাসের ভাগে। অগ্নি পুরাণ, মৎস্য পুরাণ প্রভৃতি অষ্টাদশ গ্রন্থ পুরাণের অন্তর্ভুক্ত। শাস্ত্রের নামে শ্রুতি ও স্মৃতি বোঝায়। গীতা সাংখ্যযোগ, ন্যায়, বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিক মোক্ষ শাস্ত্রগুলির পর্য্যায়ে। পাণিনি মহাভাষ্যে বেদের সহস্রাধিক অংশের উল্লেখ আছে। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞের ব্যবস্থা, উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান এবং পুরাণে অবতারবাদ ও ভক্তিতত্ত্ব নিহিত আছে। যজ্ঞ-ক্রিয়ার সাহায্যে স্বর্গলাভ অপেক্ষা পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিয়া মোক্ষলাভ করাই বৈদিক ধর্ম্মজীবনে অধিকতর বাঞ্ছনীয় ছিল। বৈদিক (সনাতন-ব্রাহ্মণ) ধর্ম্মই পরবর্ত্তী কালে হিন্দুধর্ম্মে রূপান্তরিত হইয়াছে। বেদের প্রথম পর্য্যায়ে ইহলোকে কাম্য ধনজন ও পরলোকে প্রার্থিত স্বর্গের উল্লেখ আছে। ধর্ম্মার্থে যজ্ঞ, যজ্ঞের জন্য পশুবলি। ক্রমশঃ বৈদিক ব্রাহ্মণ জীবহিংসা বর্জ্জন করিয়া অহিংস নিষ্কাম ধর্ম্ম, নিরামিষ ভোজন,

জন্মান্তর ও মায়াবাদ, যোগ- ও বৈরাগ্য-সাধন, ব্রত ও উপবাসে তৎপর হইয়াছিলেন। দ্রাবিড় সভ্যতার প্রভাবে অতঃপর ভারতীয় ধর্ম্মসাধনায় ভক্তি ও প্রেম সঞ্চারিত হয়। বৈদিক যুগে সর্ব্বপ্রথম একচ্ছত্র-সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা 'ভরত' রাজার নামানুসারে এদেশের নাম হইয়াছিল 'ভারতবর্ষ', এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

আর্য্য-ব্রাহ্মণ-স্থাপত্য ও চৈত্য-মন্দিরের ক্রমবিকাশ

বৃক্ষের কোটরে এবং বৃক্ষশাখায় পরিদৃষ্ট পক্ষীর নীড়গুলি বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মানবকে পর্ণকুটীর-নির্ম্মাণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। প্রথম-সভ্যতা-পরিপুষ্ট, প্রথম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাতা প্রাচীন 'সপ্তসিন্ধব' আর্য্যগোষ্ঠী হিমালয় অধিত্যকার অরণ্যে অরণ্যে লতাপত্র, বৃক্ষের ত্বক্ ও শিকারলব্ধ পশুচর্ম্মের উপাদানে বৃত্তভিত্তি ধান্যগোলার সমতুল পর্ণকুটীর নির্ম্মাণকরতঃ তন্মধ্যে অবস্থান করিতেন—পশুপালন এবং উর্ব্বর অধিত্যকায় হলকর্ষণ করিয়া কৃষিকর্ম্মে তথা গো-সেবায় জীবন যাপন করিতেন। শাখাপ্রশাখা, পরিণত কঞ্চি এবং বটের ঝুরি অথবা বেতস লতার দ্বারা কোটরাকৃতি কুটীরদ্বার প্রস্তুত হইত। অরণ্যের মধ্যে ইতস্ততঃ-বিক্ষিপ্ত আর্য্যগণের কেহ কেহ বটবৃক্ষের ঝুরিগুলির অন্তরালের মাঝে শাখাপ্রশাখা ও লতাপত্রের আবরণ এবং পশু-চর্ম্মের বৃষ্টিরোধী আচ্ছাদন সন্নিবদ্ধ করিয়া পিঞ্জরের মত কুটীরকক্ষে বাস করিতেন। অনেকে তাঁবুর অনুরূপ চর্ম্মকুটীর নির্ম্মিত করিয়া চর্ম্মাচ্ছাদিত ঢালু শীর্ষে, চর্ম্মপ্রাচীরে এবং চর্ম্মনির্ম্মিত ক্ষুদ্র দ্বারে 'সুধা'র (চূণ) প্রলেপ লাগাইতেন। অরণ্যান্তরে অবস্থান করিবার ব্যপদেশে তাঁহারা তাঁহাদের পূর্ব্ব বাসগৃহগুলির উপাদানসমূহ উন্মোচিত করিয়া তৎসাহায্যে নূতন বাসস্থানে নব নব কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালনে ব্রতী হইতেন। জলাকীর্ণ নিম্নভূমিতে সারিবদ্ধ বাঁশ অথবা শালের খুঁটি প্রোথিত করিয়া তদুপরি দারুময় মঞ্চগৃহ-নির্ম্মাণের প্রচলন ছিল। বহু প্রাচীনকালে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র মনুষ্যাবাস-নির্ম্মাণে উক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হইত।

আদি বৈদিক যুগে (খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ) পরিণত শালের অথবা পরিপক্ক বাঁশের স্তম্ভকে কেন্দ্র করিয়া তৃণ ও মৃত্তিকার অথবা শাখা ও পত্রের উপাদানে কোণশীর্ষ

শিবিরের অনুরূপ চালা-ঘর প্রস্তুত হইত (১৩ চিত্রে Δ চিহ্নিত চালা দ্রষ্টব্য)। স্তম্ভের শীর্ষভাগে দেবদারু, সেগুণ অথবা বংশখণ্ডের একটি আচ্ছাদন (জাফরি) 'পেণা' (বন্ধনী) দ্বারা সংযুক্ত করা হইত। তৎপরে আচ্ছাদনটি বৃহৎ বৃহৎ তালপত্র, গুচ্ছীকৃত তৃণ অথবা চর্ম্ম দ্বারা আবৃত হইত। আচ্ছাদনের ভার ধারণ করিত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত শালের অথবা বাঁশের খুঁটিগুলি। খুঁটিগুলির মধ্যে মধ্যে দৃঢ় বল্কল অথবা লতাপত্র ও কঞ্চির আবরণ এবং চেঁচা বাঁশের উপর কাঠের বাতা ও আড়া নিবদ্ধ ঝাঁপ (দ্বার) নির্ম্মিত হইত। বৈদিক যুগের শেষভাগে রৌদ্রশুষ্ক ইষ্টকে গৃহপ্রাচীর নির্ম্মাণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল (১৩ চিত্রে □ চিহ্নিত গৃহ এবং ১৪ চিত্র দ্রষ্টব্য)। গুপ্তকালীন বাস্তুশাস্ত্রে কুটীরের বৃক্ষকাণ্ডনির্ম্মিত স্তম্ভগুলিকে 'ব্রহ্মকান্ত, বিষ্ণুকান্ত, রুদ্রকান্ত' প্রভৃতি নামে, দ্বারসংলগ্ন বাজু দুইটি 'শাখা' নামে এবং দ্বারশীর্ষস্থ সর্দ্দল 'উদুম্বর' অভিধায় অভিহিত হইয়াছিল।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে বাস্তুবিধান বহুধা উন্নত হয়। সেই সময়ে অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকে এবং অমসৃণ প্রস্তরে আবাস-নির্ম্মাণে শিল্পিগণ সারবান্ কাষ্ঠের বৃত্তখণ্ডাকৃতি অথবা ধনুরাকৃতি ঢালু ছাদ ব্যবহার করিতেন (১৪ এবং ১৫ চিত্র)। খৃঃ পূঃ চতুর্থ-তৃতীয় শতকে চৈত্যমন্দিরের খিলান-ছাদগুলি ধনুরাকৃতি ছাদেরই বিকাশ। নালন্দার 'বেশর' স্থাপত্য, ভুবনেশ্বরের 'বৈতাল দেউল', গোয়ালিয়রের 'তেলিকা মন্দির' এবং উত্তর ব্রহ্মের 'আনন্দ মন্দির' প্রাচীন ভারতীয় খিলানাকৃতি ছাদের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। আধুনিক 'বাংলো' ধরণের বহু গৃহের আচ্ছাদনসমূহ বৈদিক গৃহের আচ্ছাদনী হইতে অধিক পৃথক নহে।

প্রাচীন কুটীরের দারুময় স্তম্ভগুলি, কীটের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে, মৃন্ময় কুম্ভকমধ্যে স্থাপিত হইত। সেই কুম্ভক অতঃপর সাঁচি, ভরুৎ, কার্লি ও নাসিকের স্তূপ-বেদিকার তথা চৈত্যমন্দিরের সুশোভন কারুকার্য্য খোদিত রমণীয় স্তম্ভাবলীর অলঙ্করণে অনুসৃত হইয়াছিল। ১৫ চিত্রের উভয় পার্শ্বস্থ স্তম্ভ দুইটির পাদভাগ কুম্ভকমধ্যে রক্ষিত। কুম্ভক-সমন্বিত 'রুদ্রকান্ত' স্তম্ভই মধ্যযুগীয় রাজস্থানী স্থাপত্য শৈলীর 'সুড়ংদার খাম্বা'য় এবং বঙ্গদেশীয় চণ্ডীমণ্ডপের ও বাসগৃহের পূজা-দালানের সংলগ্ন, কুম্ভকোপরি কদলী তরুর প্রতীক, সুগোল সুডৌল স্তম্ভে রূপান্তরিত হইয়াছে।

আর্য্যদের ভারতে আগমনের পূর্ব্বে—পূর্ব্ব ভারতে অসুর, দক্ষিণে দানব ও দ্রাবিড় এবং পশ্চিম ভারতে নাগজাতি বাস করিতেন। তাঁহারা ইষ্টক দ্বারা, অংশ-বিশেষে প্রস্তর দ্বারা, বাস্তুগৃহ নির্ম্মাণ করিতেন। ব্রহ্মাবর্ত্তে কয়েক শত বৎসর অবস্থানের পরে আর্য্যগণ ইষ্টক ও কাষ্ঠের মনোরম বাস্তুনির্ম্মাণে নিপুণ হইয়াছিলেন। অধ্যাপক তারাপদ ভট্টাচার্য্য বিচার করিয়াছেন যে, ঋক্‌বেদীয় যুগে মহর্ষি অগস্ত্য প্রথম বাস্তু-বিদ্যার প্রণয়ন করেন। বেদে বরুণ দেবের সহস্রদ্বারযুক্ত বিশাল প্রাসাদের, মিত্র দেবের সহস্র-স্তম্ভ সৌধ-বাটিকার, পাষাণনির্ম্মিত শত নগরীর এবং শতভুজ-প্রাকার-বেষ্টনীর উল্লেখ আছে। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে, সায়ণের মতে বৈদিক যুগে ত্রিতল অট্টালিকা ছিল। গান্ধারাধিপতি অসুর নগ্নজিৎ সম্ভবতঃ ঋক্‌বেদের যুগের স্থপতি ছিলেন। ঋক্‌বেদে উল্লেখ আছে যে, অগস্ত্য (মান) একটি দ্রাবিড়-বাস্তু-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ক্রমশঃ আর্য্যপ্রভাব সমগ্র ভারতে বিস্তৃত হয়। রামায়ণের আর্য্যগণ দক্ষিণ ভারত জয় করার যুগ হইতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে এবং পূর্ব্ব ভারতে আর্য্যসংস্কৃতির সম্পূর্ণভাবে প্রচলন করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা আর্য্য- ও দ্রাবিড়-সংস্কৃতি ও শিল্পের সংমিশ্রণ ঘটে। হ্যাভেল বলেন, মৌর্য্যযুগের সুদামা গুহা-মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ এবং দক্ষিণ-দ্রাবিড় মন্দিরের কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি উপরিভাগ ঋক্‌বেদে বর্ণিত সমাধিস্তূপের আকারের অনুরূপ। বৈদিক সমাধিস্তূপের আদর্শেই পরবর্ত্তী যুগের বৌদ্ধ স্তূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। বৈদিক এবং বৌদ্ধ স্তূপের ভিত্তি (আসন) যথাক্রমে সমচতুষ্কোণ ও গোলাকার হইত। বৈদিক স্তূপে পাদপীঠ থাকিত না; কিন্তু অনার্য্য (অসুর) স্তূপে পাদপীঠ থাকিত। শ্মশানে চিতাভূমির উপরে আর্য্যগণ সমাধিস্তূপ (চৈত্যমন্দির) নির্ম্মাণ করিতেন। প্রাথমিক বৈদিক কালে আর্য্যরা মৃতদেহ মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিতেন। ক্রমশঃ দাহপ্রথার প্রচলন হয়। দাহান্তে অস্থিগুলি মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত এবং তদুপরি স্তূপ নির্ম্মিত হইত। শতপথ ব্রাহ্মণে উহার উল্লেখ আছে। রামায়ণে এইরূপ চৈত্যের (মন্দির) উল্লেখ আছে। এইকালেও গয়াধামে ফল্গু নদীর তীরে শ্রাদ্ধক্রিয়া-ব্যপদেশে বালির স্তূপ নির্ম্মিত হয়। স্তূপ ও চৈত্যস্থাপনে বৌদ্ধরা সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণ্য আচারানুষ্ঠান অনুসরণ করিতেন। নাগস্থপতিই চৈত্যের স্রষ্টা। আর্য্যগণ নিজ নিজ যজ্ঞশালার সান্নিধ্যে

নাগের আদর্শানুযায়ী চৈত্য নির্ম্মাণ করিতেন। আর্য্য-চৈত্যের আদর্শে বৌদ্ধগণ তাঁহাদের চৈত্যবিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

আর্য্যজাতি এই দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে নাগ ও দ্রাবিড়-সভ্যতার সহিত আর্য্য-সভ্যতার মিশ্রণ ঘটে। বাস্তুগ্রন্থপ্রণেতা আর্য্য মহাস্থপতি বিশ্বকর্ম্মাসৃষ্ট স্থাপত্য এবং অগস্ত্যপ্রণীত আর্য্য-বাস্তুগ্রন্থ দ্রাবিড়-স্থাপত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তৎকালীন স্থপতিদের মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা, শুক্র, নগ্নজিৎ ও ময়দানবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বহু পরবর্ত্তী কালে, বরাহমিহিরের যুগে, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে অন্য এক নগ্নজিৎ স্বতন্ত্রভাবে একটি দ্রাবিড়-বাস্তুগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যপ্রবর্ত্তিত ইষ্টক ও কাষ্ঠের স্থাপত্য এবং উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে অনার্য্যসৃষ্ট ইষ্টক ও প্রস্তরের স্থাপত্য বেদবেদান্তের যুগ হইতে রামায়ণ মহাভারতের যুগ পর্য্যন্ত যথাক্রমে বিশ্বকর্ম্মা ও ময়ের নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়াছিল। আর্য্য-স্থাপত্যের বিকাশের অনুক্রমে দ্রাবিড়-স্থাপত্যও বিকশিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ আর্য্য-স্থাপত্যের সহিত দ্রাবিড়-স্থাপত্য মিলিত হইয়া বিশিষ্ট একটি স্থাপত্য শৈলী উদ্ভাবিত করে। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে, আর্য্যশিল্পী ও দ্রাবিড়শিল্পী একযোগে একটি যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নরপতি শেষ নাগ এবং জ্যোতির্ব্বিদ্ গর্গ (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) নাগর-স্থাপত্যের সৃষ্টি এবং 'বাস্তু নাগ' গ্রন্থ সঙ্কলিত করেন। পরবর্ত্তী স্থপতিগণ নাগর-রেখ শৈলীর ক্রমবিকাশ করেন। বুদ্ধগয়া মন্দির সেই শৈলীর নিদর্শন। উভয় সংস্কৃতির মিলন সুফলপ্রসূ হইয়াছিল। তাহার প্রমাণ কৈলাস (এলোরা), শিবপুরা (এলিফাণ্টা) ও বিরূপাক্ষ (পট্টদকল) প্রভৃতি পরবর্ত্তী যুগের মনোহর দেবায়তনে প্রতীয়মান।

হিন্দুধর্ম্মের উৎপত্তি

খৃষ্ট-পূর্ব্ব ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই আর্য্য ও অনার্য্য সংস্কৃতি ও শিল্পের মিলন সংঘটিত হয়। তাহা হইতে যক্ষ, যক্ষী ও মনসা প্রভৃতির উৎপত্তি (১৬ চিত্র)। ভারতের বহু প্রদেশেই অনার্য্য ও আর্য্য দেবদেবী সমভাবে পূজিত হইতে থাকেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে উভয় জাতির মিলনের ফলে হিন্দুজাতি ও হিন্দু সভ্যতার উন্মেষ।

আর্য্য ও অনার্য্য সংস্কৃতি ও শিল্পের মিলনের ফলে হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের উন্মেষ। বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্য্যদের ধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রম নীতি এবং আর্য্যশিল্প বিজিত প্রদেশগুলিতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়াছিল। সম্প্রতি কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অনুমান করিয়াছেন যে, আর্য্যরাই মোহেন্-জো-দড়ো, হড়প্পা প্রভৃতি নগরগুলির ধ্বংস এবং ক্রমে ক্রমে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মোহেন্-জো-দড়ো, হড়প্পা, মাকরান প্রভৃতি খননের নিম্নস্তরে আর্য্য-পূর্ব্ব দ্রাবিড়, আর্য্য এবং আর্য্য-ইরান-পামিরীয় নরকপাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিন্ধু-দ্রাবিড় সভ্যতার সহিত অসুর অর্থাৎ অস্ট্রিক ও বৈদিক সভ্যতার ক্রমবর্দ্ধমান মিশ্রণের ফলে উপনিষদ্, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের যুগে যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত হইয়াছিল। আর্যাদের উপাসনাবিধি এবং দ্রাবিড়ী ধর্ম্মাচরণ যথাক্রমে যজ্ঞ এবং পূজারূপে পরিচিত হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মাচরণ উভয়ের মিশ্রণ হইতেই সম্ভূত। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সত্যদ্রষ্টা ঋষি তপস্বী কর্ত্তৃক উপলব্ধ মহাসত্যের বজ্রবেদিকার উপরে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। হয়ত আর্য্য-পূর্ব্ব সিন্ধু-সভ্যতায় হিন্দুসংস্কৃতির মূল নিহিত এবং হিন্দু-সংস্কৃতি সিন্ধু-সভ্যতার অভিনব বিকাশ। সিন্ধু ও অস্ট্রিক-ভারতীয় সংস্কৃতি আর্য্য-সংস্কৃতির সহিত মিশিয়া আর্য্যসংস্কৃতির আসল রূপকে পরিবর্ত্তিত করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হয় না।

বৈদিক-ব্রাহ্মণ ও অনার্য্য-সংস্কৃতির মিশ্রণের উপরে হিন্দুর সমাজ, মন্দির ও পূজানুষ্ঠানের ভিত্তি ; মূর্ত্তিপূজার প্রথম পর্য্যায়

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের দার্শনিক ভিত্তির উপরে হিন্দুর জাতীয়তা সুপ্রতিষ্ঠিত। আকার, প্রযোজনা ও প্রকাশগত কথঞ্চিৎ পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের প্রদেশে প্রদেশে একই সনাতন হিন্দুধর্ম্মের প্রেরণায়, সমান আদর্শে, মন্দিরের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণের সূত্রপাত। সমগ্র ভারতব্যাপী সেই বিরাট হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু-স্থাপত্য, হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুর সমাজগঠন কালে দ্রাবিড়ের মহাস্থপতি, শিল্পিশ্রেষ্ঠ বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্ট আর্য্যস্থাপত্য হইতে অনুকূল উপকরণ লইতে দ্বিধা করেন নাই।

তৎকালীন দক্ষিণ-ভারতবাসীরা তাঁহাদের নূতন আবাস ও মন্দিরের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণকল্পে, প্রাদেশিক বাস্তুগৃহ-নির্ম্মাণের পূর্ব্ব প্রচলিত রীতিপদ্ধতি ও উপাদান বহুল পরিমাণে অনুসরণ ও গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য। কিন্তু তদ্বিষয়েও দ্রাবিড় দেশবাসিগণ আর্য্যাবর্ত্তের অমোঘ প্রভাব অতিক্রম করিতে অক্ষম ছিলেন। বরঞ্চ উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারতের দুইটি অনার্য্য শাখা--নাগ এবং অসুর—তাহাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অধিক পরিমাণে অব্যাহত রাখিয়াছিল। প্রাচীন আদর্শে গঠিত অসুরের স্তূপ ও নাগের চৈত্যমন্দিরের সান্নিধ্যে হিন্দুর নব্যস্থাপত্যে পরিকল্পিত প্রাসাদমন্দির নির্ম্মিত হইত। রাজনীতিক্ষেত্রেও উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব্ব ভারতের আর্য্য-পূর্ব্ব ব্রাত্যক্ষত্রিয় রাষ্ট্রের সহিত প্রতিবেশী আর্য্যক্ষত্রিয় নরপতির সংঘর্ষ বাধিত না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে নারদ ঋষি গান্ধারাধিপতি স্থাপত্যবিশারদ নগ্নজিতের শিক্ষাগুরু ছিলেন এবং ঋক্‌বেদের যুগেও অসুর ও দ্রাবিড় বাস্তুশিল্পের অস্তিত্ব ছিল। পরবর্ত্তী বৈদিক এবং উপনিষদের যুগের বাস্তুবিধান ও স্থাপত্যশৈলী নিগূঢ় রহস্যবাদ (mysticism) এবং প্রতীকচিহ্ন (symbol) দ্বারা প্রকটিত হয় এবং তদ্দ্বারাই যূপ, যজ্ঞবেদী (১২ চিত্র) ও সমাধিস্তূপের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণপদ্ধতি নিরূপিত হয়। শিল্পশাস্ত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি কয়েক শতাব্দী পরে ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতের প্রাথমিক শিল্পকলা প্রাচীন বেদের যুগেই অঙ্কুরিত হয়। পরবর্ত্তী রামায়ণ এবং মহাভারতে উল্লিখিত প্রাসাদসমূহের মনোহারী বর্ণনাগুলি প্রতিপন্ন করে যে, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে বিশ্বকর্ম্মা ও ময়দানবের স্থাপত্য ও সৌধনির্ম্মাণ-পদ্ধতি প্রভূত পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল। অধ্যাপক ডক্টর প্রসন্নকুমার আচার্য্য এবং অধ্যাপক ডক্টর তারাপদ ভট্টাচার্য্য প্রণীত গবেষণামূলক বহুমূল্য গ্রন্থ *Indian Architecture* এবং *A Study of Vastuvidya* এই বিষয়ে সুবিশদভাবে আলোচনা করিয়াছে।

ভারতের বহু প্রাচীন সাহিত্যে—বেদে, উপনিষদে ও বেদান্তে আর্য্য সভ্যতার প্রথম পরিচয় জড়িত আছে। বৌধায়ন সূত্র, বৃহৎসংহিতা, অগ্নিপুরাণ, মহামুনি আপস্তম্বের কল্পসূত্র এবং ধর্ম্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থে, এবং কৌটিল্য-সঙ্কলিত অর্থশাস্ত্রে, প্রাচীন ভারতের পুরনির্ম্মাণ-পদ্ধতির, প্রাথমিক স্থাপত্যের ও চারুশিল্পের আভাস পাওয়া যায়। বৈদিক স্থাপত্যশোভিত দারুময় সৌধবাটিকার অস্তিত্ব, সম্ভবতঃ,

পরবর্ত্তী কোনও যুগে বিলুপ্ত হইয়াছিল। বৈদিক জনগণের আবাসে, আধ্যাত্মিক, পারিবারিক এবং সামাজিক উপাসনা ও উৎসবের জন্য কোনও প্রকার মন্দিরের প্রয়োজন ছিল না; তাঁহারা নিজ নিজ গৃহে রক্ষিত অগ্নিশালায় অগ্নির মাধ্যমে প্রকৃতির অর্চ্চনা করিতেন। সেইজন্য বেদের সূক্তে মন্দিরের ও বিগ্রহের উল্লেখ নাই। কোন কোন গৃহস্থের গৃহপ্রাঙ্গণে যজ্ঞশালা নির্ম্মিত হইত (১৩ চিত্রে ⊞ চিহ্নিত যজ্ঞশালা দ্রষ্টব্য)। যজ্ঞশালায় সযত্নরক্ষিত অগ্নিকুণ্ডে হোমাহুতি প্রদানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জনগণ প্রকৃতির প্রসাদলাভে প্রয়াস করিতেন। কুণ্ডের 'স্মার্ত্ত-অগ্নি' সতত প্রজ্বলিত রাখা হইত; নির্ব্বাপিত করা হইত না। হিমালয়ে কেদার-বদরী তীর্থপথে ত্রিযুগী নারায়ণ মন্দিরে এইরূপ একটি কুণ্ড আছে। হর-পার্ব্বতীর বিবাহ-কাল হইতে তাহার অগ্নি অদ্যাপি জ্বলন্ত বলিয়া প্রবাদ। প্রত্যহ যজ্ঞ করার কালে কুণ্ডের অনলে কাষ্ঠের ইন্ধন দেওয়া হয়। বারাণসীর বিশ্বেশ্বর মন্দিরের যজ্ঞকুণ্ড বৈদিক ঋষিদের ব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তদবধি কুণ্ডটি সতত অগ্নিপূর্ণ রহিয়াছে, এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

আর্য্যগণ ভারতে আসিয়া কাবুল ও গোমল নদীর উপত্যকা হইতে পঞ্চনদ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ 'সপ্ত সিন্ধব' ভূভাগে প্রথম অবস্থিতি করেন। সেই স্থানে ঋক্‌বেদ বিরচিত হয়। কয়েক শত বৎসর মধ্যে তাঁহারা কুরুক্ষেত্র ও ইন্দ্রপ্রস্থের পশ্চিমে সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী 'ব্রহ্মাবর্ত্তে' ছড়াইয়া পড়েন এবং বেদের 'ব্রাহ্মণ' অংশ সঙ্কলিত করেন। তথা হইতে ক্রমে ক্রমে, উত্তর ভারতের হিমালয় ও গঙ্গা নদীর অন্তর্বর্ত্তী বিশাল ভূখণ্ডে অভিযান করিয়া তাঁহারা কুরু (দিল্লী), পাঞ্চাল (বেরিলী), কোশল (অযোধ্যা), কৌশাম্বী (এলাহাবাদ), কাশী (বারাণসী), বিদেহ (উত্তর বিহার) প্রভৃতি রাজ্য স্থাপিত করেন। মহাভারত যুদ্ধের পূর্ব্বে আর্য্যগণ ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে বিন্ধ্যগিরি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া মগধ (পাটনা), অবন্তী (মালব) প্রভৃতি রাজ-তান্ত্রিক এবং শাক্য, ব্রিজ্জি প্রভৃতি গণতান্ত্রিক রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

১৩ চিত্রে বৈদিক যুগের শেষভাগে ব্রহ্মাবর্ত্তে দৃশদ্বতী তীরে অবস্থিত একটি সমৃদ্ধ গ্রামের আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পনর-কুড়িটী পর্ণকুটীরে অবস্থান কালে বিশ-পঞ্চাশ জন আর্য্য নরনারী যখন এক-একটি দলে আরণ্য সমাজের অনাড়ম্বর

সরল জীবন যাপন করিতেন—চিত্রে সেই প্রথম বৈদিক সমাজের পরিচয় পাওয়া যায় না। সেই সমাজের আংশিক পরিচয় ১৭ চিত্রে পাওয়া যাইবে। তাহার সহস্র বৎসর পরে যখন বর্ণাশ্রমী বৈদিক জনগণ অরণ্য কাটিয়া, উন্মুক্ত স্থানে, অর্থনীতিসঙ্গত সুবিন্যস্ত 'মহাগ্রাম'গুলি পরিগঠিত করিয়া, শ্রেণী-সঙ্ঘবদ্ধ সমৃদ্ধ জীবন যাপন করিতেন—একতল, দ্বিতল, ত্রিতল বাসভবনে বাস করিতেন—কল্পনামূলক চিত্রখানি সেই মহান্ বৈদিক-ঔপনিষদিক সভ্যতার কর্ম্মকুশল ধর্ম্মজীবনকে প্রতিবিম্বিত করিতেছে। তৎকালীন উন্নত গ্রামবিন্যাস-বিধান হয়ত অতঃপর জরাসন্ধের সপ্ততল প্রাসাদশোভিত রাজধানী রাজগৃহের পরিকল্পনায় আরোপিত হইয়াছিল। তৎকালীন উন্নত গ্রামনির্ম্মাণ-বিজ্ঞান ক্রম-বিকশিত হইয়া সম্ভবতঃ কৌটিল্য-নির্দ্দেশিত এবং মানসার, ময়মতম্ ও কালিকাগমে উল্লিখিত বিবিধ গ্রামের সৃষ্টি করিয়াছিল। বৈদিক যুগের বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী কালে বিরচিত 'মানসারে' বর্ণিত 'স্বস্তিক' পর্য্যায়ী গ্রামগুলি বেদ-ব্রাহ্মণ-উপনিষৎযুগের দার্শনিক ধ্যানোপলব্ধ সূর্য্য-চক্র-গতিপথের প্রতীকরূপী স্বস্তিকের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইত, এইরূপ অনুমান করা যায়। জ্যোতিষসঙ্গত 'স্বস্তিক'-ছন্দী গ্রামবিন্যাস-বিধান সামাজিক জীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সাধন করিত। হয়ত 'মানসারে'র 'স্বস্তিক' পল্লী, পঞ্চবিংশ শত বৎসর পূর্ব্বে, ব্রহ্মাবর্ত্তের ধ্যান-দর্শনক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হইয়াছিল। এতদ্বিষয়ে দর্শন, জ্যোতিষ ও প্রাচীন নগরনির্ম্মাণ-বিজ্ঞান-সম্মত বিধিমত গবেষণা বাঞ্ছনীয়।

'স্বস্তিক' গ্রামের বিন্যাসপ্রণালী ১৩ চিত্রের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রদর্শিত হইয়াছে। গ্রামটি সুদৃঢ় শালের আটটি সু-উচ্চ তোরণসহ সারবান্ কাষ্ঠের প্রাকার-বেষ্টিত। গ্রামের উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্বে অরণ্যানীর ক্রোড়ে গভীর পরিখা। গ্রামের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রান্ত বেষ্টন করিয়া দৃশদ্বতী প্রবাহিতা। পল্লীর পূর্ব্বভাগে পশ্চিমমুখী দ্বিতল বাটীর সম্মুখে, ফলফুলের তপোবন-সমন্বিত, বিহগকূজন-মুখরিত, বিস্তৃত প্রাঙ্গণে ✠ চিহ্নিত সাধারণ যজ্ঞশালা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অভিজাতবর্গ যে কাষ্ঠমঞ্চ হইতে যজ্ঞক্রিয়া অবলোকন করিতেন, তাহার আনুমানিক আকৃতি চিত্রের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে দ্রষ্টব্য। পশ্চিমভাগে সুনিবিড় ছায়াপ্রসারী বৃহৎ বটবৃক্ষমূলে গণতন্ত্রী পঞ্চায়েৎ সভার জন্য O চিহ্নিত অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকের প্রশস্ত বেদী চত্বর। কৃষি, পশুপালন,

ব্যবসা-বাণিজ্য, শ্রমশিল্প ও কারুকলাসংক্রান্ত পৌরসঙ্ঘের সদস্যগণ * চিহ্নিত মন্ত্রণামণ্ডপে উপবেশন করিয়া সমাজসংক্রান্ত কর্ম্মসূচির আলোচনা করিতেন। দক্ষিণ তোরণ সম্মুখে দেখা যাইতেছে—অদূর জনপদে অবস্থিত একটি 'মহাগ্রামে' 'রাজন্'-পরিচালিত কেন্দ্রীয় সভার অধিবেশনে যোগদান করিয়া এই স্বায়ত্তশাসিত, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, প্রাচুর্য্য-পরিপূরিত স্বস্তিক গ্রামের 'গ্রামণী' (অধ্যক্ষ) মহোদয় স্বীয় অশ্বযানে স্বীয় ত্রিতল ভবনাভিমুখে গমন করিতেছেন।

অরণ্যের অভ্যন্তরে, স্রোতস্বিনী তীরে, উর্ব্বর অধিত্যকায়, কাষ্ঠের তোরণ ও প্রাকারবেষ্টিত ফলোদ্যানের মধ্যে, সাধারণতঃ বৈদিক পল্লী বিন্যস্ত হইত। পল্লীবাসী প্রধান ঋষি অথবা মহর্ষির নামানুসারে পল্লীসহ তাঁহার আশ্রম ও স্থানীয় অরণ্য পরিচিত হইত। অর্ব্বুদ (আবু) পাহাড়ের দক্ষিণ প্রান্তের বর্ণাঢ্য অরণ্যে বশিষ্ঠাশ্রম অবস্থিত ছিল। অন্য একটি বশিষ্ঠাশ্রম কামাখ্যা (গৌহাটি) মন্দিরের অদূরে ছিল। বর্ত্তমান নাসিকের দ্বাদশ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে অগস্ত্যাশ্রমসহ অগস্ত্যপল্লী এবং এলাহাবাদে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম (প্রয়াগবন) বিরাজ করিত। সিপ্রানদীর তীরে সন্দীপ মুনির আশ্রমে শ্রীকৃষ্ণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। শৃঙ্গী, নাগার্জ্জুন প্রভৃতি সপ্তসংখ্যক ঋষির নামে মগধ সাম্রাজ্যের সাতটি পর্ব্বতশৃঙ্গ পরিচিত। শৃঙ্গগুলির গাত্রে গাত্রে নাগার্জ্জুন, লোমশ, সুদামা, দুর্ব্বাসা প্রভৃতি ঋষিগণের গুহা আছে। জরাসন্ধ-রাজধানী গিরিব্রজকে (রাজগৃহ) বেষ্টন করিয়া যে পর্ব্বতমালা দণ্ডায়মান, তাহার ঋষিগিরি শৃঙ্গের গুহায় গুহায় ঋষিগণ অবস্থান করিতেন। বৈভবগিরি, বিপুলগিরি, রত্নগিরি ও উদয়গিরি নামক আরও চারিটি শৃঙ্গ উক্ত পর্ব্বতের অন্তর্গত। শৃঙ্গগাত্রে সিদ্ধাচার্য্যগণের আশ্রম এবং মুনিঋষির বাসগুহাসমূহ ছিল। কপিলবাস্তু হইতে গয়া যাইবার পথে রাজকুমার সিদ্ধার্থ উক্ত আশ্রম ও গুহাগুলির অধিবাসী সিদ্ধাচার্য্য ও ঋষিগণের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। 'পিপ্পল' গুহায় অবস্থানকালে তিনি যোগাভ্যাস করিতেন। সপ্ততল রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন রমণীয় সৌধাবলী-সমন্বিত রাজগৃহের ও পাটলীপুত্র মহানগরীর উন্নত নগরনির্ম্মাণ-বিজ্ঞানসম্মত বিস্ময়প্রদ পরিকল্পনার প্রসঙ্গে লেখক-প্রণীত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত *Magadha Architecture and Culture* পুস্তকে সচিত্র বিবরণ পাওয়া যায়।

সুবিন্যস্ত আর্য্যবৈদিক পল্লীসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইত প্রকৃতির লীলানিকেতনে। ছেঁচা বাঁশের ছিটেবেড়া-বেষ্টিত ফলোদ্যানের মধ্যে চেরা-তক্তা ও কাঠের বাতা-মণ্ডিত আবরণ এবং তৃণগুচ্ছ, তালপত্র অথবা 'খাপরা'র আচ্ছাদন-বিশিষ্ট 'চতুঃশালা'য় অথবা গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকানির্ম্মিত কোণশীর্ষ কুটীরে গৃহস্থ বাস করিতেন। তদ্রূপ কুটীরের আকৃতি সাঁচি ও ভরুতের তোরণে ও বেদিকায় খোদিত আছে (১৫ চিত্র)। বৈদিক জনগণের দারুময় বাটিকার অনুকৃতি সাঁচির পাষাণফলকে রাজগৃহের চিত্রে খোদিত আছে (১৮ চিত্র)। উড়িষ্যা এবং উত্তর ও মধ্য ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ হিমালয় প্রদেশে তদ্রূপ গৃহপল্লীর আভাস অদ্যাপি পাওয়া যায়। 'উপমিত, প্রতিমিত' অথবা 'পরিমিত' পর্য্যায়ী চতুঃশালা আবাসের মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ কক্ষের চারিপার্শ্বে গৃহস্থের অগ্নিহোত্র সম্পাদনের, যজ্ঞক্রিয়ার সরঞ্জাম ও আসবাবপত্র সংরক্ষণের এবং গৃহিণীর অবস্থানের জন্য চারখানি ঘর থাকিত (১৪ চিত্র)। কুটীরের চারি কোণে চারিটি কাষ্ঠের অথবা বংশের হস্তিপদাকৃতি স্থূল স্তম্ভ বসান হইত। সাধারণের জন্য অরণ্যজাত শাল, উদুম্বর, শাক (সেগুণ), দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষকাণ্ডের উপাদানে 'একভূমি' অর্থাৎ একতল বাটী নির্ম্মিত হইত। বাটীগুলি 'পদ্মিক, স্বস্তিক, বর্দ্ধমান, নন্দ্যাবর্ত্ত' প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীতে পরিকল্পিত হইত। অভিজাত ব্যক্তির অনাড়ম্বর তক্ষণশিল্প শোভিত দারুময় দ্বিতল গৃহের অভ্যন্তরভাগ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত অথবা রঞ্জিত করা হইত। ফলফুলের উদ্যানবেষ্টিত—শস্যশালা, যন্ত্রশালা, ইন্ধনশালা, রন্ধনশালা, ঢেঁকিশালা, গোশালা এবং জলকূপ-সমন্বিত—গৃহস্থ বাটীর মৃন্ময় প্রাচীরের এবং অলিন্দের উপরে তুঁষ, পাটের কুচা অথবা গাছের ছাল এবং এঁটেল মাটি একসঙ্গে মিহি করিয়া ছানিয়া লেপা ও পেটা হইত, দুই অঙ্গুলি পুরু। সম্মুখের দাওয়ার 'খড়িটি' করা দেওয়ালগুলি প্রত্যহ নিকাইয়া আতপ তণ্ডুল ও রঙীন গিরিমাটি চূর্ণের উপাদানে আলিপন চিত্রিত করা হইত।

মৌর্য্য, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য-সুঙ্গ এবং অন্ধ্র ভারতেও ইষ্টক ও প্রস্তরের চৈত্য ও বিহার নির্ম্মিত হইত। উহাদের গঠন পূর্ব্বতন যুগের দারুময় স্থাপত্যের অনুকারী। প্রাচীন আর্য্যগণ উচ্চশ্রেণীর সৌধনির্ম্মাণে অনুরত ছিলেন না। সুকুমার শিল্পসৃষ্টি তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না। বিষয়বৈভবে অনাসক্ত সমাজপতি ব্রাহ্মণ পর্ণকুটীরকেও

বাহুল্য মনে করিতেন। প্রভাবশালী গোষ্ঠীপতিরা, রাজর্ষি জনকের মত, পার্থিব ঐশ্বর্য্যে উদাসীন ছিলেন। বিবিধ উপনিষদের উপদেষ্টা, ব্রহ্মবিদ্যাবিদ্, রাজর্ষি প্রবাহণ জৈবলি, অজাতশত্রু, অশ্বপতি কৈকেয় প্রভৃতি দর্শনাচার্য্যগণ দর্শন ও মোক্ষ শাস্ত্রালোচনাতেই সরল জীবন অতিবাহিত করিতেন। ক্ষত্রিয়রাজ বিশ্বমিত্র তদীয় প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞান ও কঠোর তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মর্ষির মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়া সতত ব্রহ্মজ্ঞানেই মগ্ন থাকিতেন। সেই কারণে বৈদিক ভারতে আবাসগৃহের পরিকল্পনায় অলঙ্কারবহুল স্থাপত্যের প্রেরণা আসিত না।

প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে এবং আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও গবেষণার ফলে জানা যায় যে, বৈদিক ভারতের দ্রাবিড় ও দানবের বাস্তুবিদ্যা ও গৃহ-নির্ম্মাণ-বিধান তাঁহাদের অন্যান্য পার্থিব বিদ্যার অনুরূপ উন্নত ছিল। বৈদিক সাহিত্যে বংশ ও কাষ্ঠনির্ম্মিত আবাসের প্রচুর উল্লেখ পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে অনার্য্য-অসুর-অধ্যুষিত বিরাট অয়স্-ধাতু-পুরীর উল্লেখও বর্ত্তমান। জাতকে (খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতক) উল্লেখ আছে যে, একটি রাজপ্রাসাদের শিখর লৌহদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। পদ্মপুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে, বিষধর সর্পের দংশন হইতে নববিবাহিত লখিন্দর এবং বেহুলাকে রক্ষা করিবার জন্য চম্পা নগরের চাঁদ সদাগর একটি লৌহাবাস নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থধামে রাজসূয় যজ্ঞ সম্পাদনপ্রসঙ্গে পাণ্ডবের আভিজাত্য-গৌরবোচিত সভামণ্ডপ এবং রথাকৃতি যজ্ঞশালার গরুড়চিতি-সমন্বিত যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণকার্য্যে দ্রাবিড়-স্থপতি ময়দানবকে নিযুক্ত করেন। ইহার দ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, অসুর, রাক্ষস বা দানব নামধারী অনার্য্য জাতি সেই যুগে স্থপতি-বিদ্যায় শ্রেষ্ঠ ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা এবংবিধ যুক্তির সমর্থন করিয়াছেন। মহাভারত-কারের মতে দক্ষিণ ভারতে দানব-স্থপতি ময়ের এবং উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম ভারতে দেব-স্থপতি বিশ্বকর্ম্মার প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। দানবপতি বৃষপ্রভের 'স্ফটিকস্তম্ভ শোভিত রাজসভা' ময়ের সৃষ্ট। সর্ব্ব-শাস্ত্র-শিল্প-বিশারদ বিশ্বকর্ম্মা বৈবস্বতের সভা, ইন্দ্রপুরী এবং দেবনগরী অমরাবতীর পরিকল্পনা করেন। ঋক্‌বেদে তিনি বিশ্বস্রষ্টারূপে অভিনন্দিত হইয়াছেন। বনবাসকালে রামচন্দ্র প্রকৃতির সুন্দর আবেষ্টনে নদীতীরে, তাঁহার কুটীরপ্রতিষ্ঠার উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহার পরিকল্পনামত শাল,

দেবদারু প্রভৃতি সারবান্ কাষ্ঠের সুদৃঢ় আবাস নির্ম্মাণ করিতে লক্ষণকে নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। স্থপতির বংশধর বোধিসত্ত্ব একদা চৈত্য, বিহার ও গৃহনির্ম্মাণ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার শেষ জন্মে বুদ্ধরূপে তিনি শিষ্যদের বাস্তুনির্ম্মাণে নির্দ্দেশ দিতেন। নাগজাতি শতপথ ব্রাহ্মণের যুগে, ইষ্টক ও প্রস্তরের সৌধ ও চৈত্যনির্ম্মাণে অভ্যস্ত ছিলেন। মৌর্য্যসম্রাট অশোকের যুগে প্রাকৃতভাষী আর্য্যগণের ইষ্টক ও পাষাণসৌধের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণপ্রণালী পূর্ব্বতন কাষ্ঠাবাসের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণবিধির অনুসরণ করিয়াছিল। অশোকের স্থপতিরা, উন্নতধরণের কোনও প্রকার বাস্তুনির্ম্মাণ-কৌশল উদ্ভাবনের প্রয়াস না করিয়া, কাষ্ঠাবাস নির্ম্মাণের পূর্ব্ব-প্রচলিত পদ্ধতিমত, গতানুগতিকভাবে, ইষ্টক ও প্রস্তরের চৈত্য, বিহার, বাসগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বকর্ম্মা, ময় ও শেষনাগ প্রবর্ত্তিত স্থাপত্য-শৈলীনিচয়ের সমন্বয়ে অশোকের স্থাপত্য উদ্ভূত হইয়াছিল। অশোকের এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যুগে ইষ্টকনির্ম্মিত বাসগৃহের ইষ্টক-নির্ম্মিত ছাদ এবং প্রস্তরাবাসের প্রস্তরের ছাদ যথাক্রমে 'ইষ্টকাচ্ছাদনং' এবং 'শিলাচ্ছাদনং' নামে পরিচিত ছিল। 'শিবিকাগর্ভ, নালিকাগর্ভ এবং হর্ম্ম্যগর্ভ' বাটীগুলির 'পকুথ' অর্থাৎ বারান্দা থাকিত এবং অধিকাংশ বাটীর সম্মুখ ভাগে অলিন্দ সংযুক্ত হইত।

বৈদিক যুগের শেষভাগে সূত্রের যুগে ভারতে মূর্ত্তিপূজার সূত্রপাত হয়। অনার্য্য-প্রভাবিত ব্রাহ্মণ্য-ভারতে তাহার বিকাশ এবং বিস্তার। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে শিল্পের পর্য্যায়ে তক্ষণ ও ধাতুমূর্ত্তি, কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত এবং নৃত্যকেই বুঝাইত। ঋক্‌বেদের ব্রাহ্মণ-পর্য্যায়ভুক্ত 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ'-প্রণেতা মহর্ষি ঐতরেয় ছিলেন ব্রাহ্মণ ঋষির শূদ্রা-পত্নীর গর্ভজাত। তাঁহার কল্যাণে, আর্য্য ও অনার্য্যের ক্রমমিলনে, যে চৌষট্টি কলা সৃষ্ট হইয়াছিল—নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, সাজসজ্জা, কেশবিন্যাস, আলেখ্য, বর্ণবিন্যাস ও চিত্রকরণ, প্রতিমূর্ত্তি-নির্ম্মাণ, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ, পাকপ্রণালী, তক্ষণ, চরখাচালনা, ভূষণরচনা, বাস্তুবিদ্যা, খনিবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রভৃতি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত। সেইকালে কোনও ধর্ম্মযাজকের মৃত্যু হইলে তদীয় সমাধিস্তূপের অভ্যন্তরে, চিতাভস্ম ও অস্থিসহ, সুবর্ণ ফলকে খোদিত ধরিত্রীদেবীর

চিত্র রক্ষিত হইত। গৃহসূত্রে সেই প্রকার মূর্ত্তিচিত্রের উল্লেখ আছে। মোহেন্-জো-দড়োতেও মূর্ত্তিখোদিত ধাতুফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎকালে বৈদিক অভিজাত সম্প্রদায়ের কেহ কেহ মূর্ত্তিপূজা করিতেন। তাঁহাদের প্রবর্দ্ধমান পৃষ্ঠপোষকতা ভারতের মন্দির ও মূর্ত্তিশিল্পের ক্রমবিকাশের পথ প্রসারিত করিয়াছিল।

প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণসমাজ কিন্তু মূর্ত্তিপূজা গ্রহণ করেন নাই। প্রতিমাবলম্বনে আরাধনা ও উপাসনা, প্রতিমাতে আরাধ্য দেবতার অধিষ্ঠানকল্পনা, অজ্ঞ ও হীনমতি ব্যক্তিবর্গেরই উপযুক্ত বলিয়া প্রাচীনপন্থীরা বিবেচনা করিতেন। ব্রাহ্মণ সাগ্নিক হইবেন এবং মন্দিরে দেবার্চ্চনা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ, এইরূপ ব্যবস্থা স্বয়ং মনু বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদগান ব্যতীত শিব ও বিষ্ণুর জন্য নৃত্যগীত করা নিষিদ্ধ ছিল। রামায়ণ ও মহাভারত বর্ত্তমান রূপ-পরিগ্রহণের বহু পূর্ব্বে অধুনা-বিলুপ্ত 'মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র' সঙ্কলিত এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে মূর্ত্তিপূজার উল্লেখ ছিল কি না তাহা অজ্ঞাত। পরন্তু সাগ্নিক উপাসনার ব্রাহ্মণ্যযুগেও, দ্রাবিড় দেশে এবং অরণ্য-সমাকুল অনার্য্য ভূভাগে, গ্রামীয় দেবদেবীর পূজা প্রচলিত ছিল। পূজার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেউল প্রতিষ্ঠিত হইত। অনাড়ম্বর সেই দেবালয়ের অনুষ্ঠানরীতি যুগে যুগে বিকশিত ও উন্নত হইয়া সনাতন হিন্দুর ধর্ম্ম ও সামাজিক জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। সুদূর গণ্ডগ্রামের ঝোপে ঝাড়ে, অশ্বত্থ বটের সুনিবিড় ছায়াতলে, মৃত্তিকার অথবা ক্ষুদ্র ইষ্টকের ক্ষুদ্র স্তূপের কুলুঙ্গির মধ্যে, সিন্দূরলেপিত পুষ্পভূষিত মনসাদেবী (১৯ চিত্র), ওলাবিবি, ষষ্ঠীমাতা, সত্যনারায়ণ অথবা পঞ্চানন (পাঁচু) ঠাকুরের মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। রাজপুতানার ভীল জনপদে শিরীষ বনের শান্তশীতল পর্ণকুটীরে, গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকার বেদীর উপরে, অশ্বারূঢ় ভৈঁরো (ভৈরব) ঠাকুরের তেজোদীপ্ত মৃন্ময় মূর্ত্তি শিল্পরসিক দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করে। প্রাচীন কালের কোল, সাঁওতাল, খন্দ, চেঞ্চু, ওঁরাও, শবর, কুকি, মুণ্ডা প্রভৃতি অনার্য্যদের মন্দির ও বিগ্রহ সেইভাবে পরিকল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত হইত।

প্রাচীন ভারতে স্থাপত্যশিল্প

খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকের মগধের রাজধানী রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ (২১-২৫ চিত্র), প্রাচীন নাগরী (মাধ্যমিকা) দুর্গের পাষাণপ্রাকার, অশোকযুগের পিপ্রওয়াস্তূপ, অশোকস্তম্ভ (২৭ চিত্র), সাঁচি (২৬ চিত্র) ও ভরুৎস্তূপ, গরুড়স্তম্ভ, উড়িষ্যার রাণী-গুম্ফা ও শিশুপালগড়, অমরাবতীস্তূপের অলঙ্কারমণ্ডন, নাগার্জ্জুনিকোণ্ডার কারুকলা, কার্লি, ভাজা, নাসিক, অজণ্টা ও এলোরার চৈত্য, বিহার ও মন্দির প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের উদাহরণ। বেদের প্রথম যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত বাস্তুর ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানরীতি বৈদিক ধর্ম্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং 'বাস্তু যাগ' নামে প্রচলিত রহিয়াছে। মগধ সাম্রাজ্যে সম্রাট্ অশোকপ্রবর্ত্তিত বৌদ্ধ-স্থাপত্য, প্রকৃতপক্ষে বিশ্বকর্ম্মার আর্য্য-স্থাপত্য, নাগ এবং দ্রাবিড়-স্থাপত্যের মিশ্রণে উদ্ভূত হইয়াছিল। ডক্টর তারাপদ ভট্টাচার্য্য অনুমান করিয়াছেন যে, কোনও দ্রাবিড়ী স্থাপত্যবিশারদই অশোকস্তম্ভের পরিকল্পয়িতা—পারসীক অথবা গ্রীকস্থপতি দ্বারা উহা পরিকল্পিত হয় নাই। তিনি অনুমান করেন যে অশোকস্তম্ভ, স্তূপ, চৈত্য, বিহার ও হর্ম্ম্য প্রভৃতি দ্রাবিড়ী শিল্পীদেরই নির্দ্দেশমত পরিকল্পিত ও গঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ মোহেন্-জো-দড়োর শিল্প পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন।[৪] অশোকই সর্ব্বপ্রথম এই দেশে প্রস্তর-স্থাপত্যের ব্যাপক প্রচলন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালে

[৪] ইতিহাসবেত্তা এইচ. আর. হলের মতে সুমেরীয়গণ ছিলেন প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু-সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট, উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় দ্রাবিড় জাতির শাখা বিশেষ। পারস্যের মধ্য দিয়া তাঁহারা এশিয়া মাইনরে প্রবেশ করেন। সিন্ধুপ্রদেশই তাঁহাদের জন্মভূমি। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, সিন্ধুনদের মৎস্যদেব (মৎস্যাবতার) ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকে, পারস্য উপসাগরের মধ্য দিয়া, সুমেরীয়াতে লইয়া যান। সিন্ধু এবং সুমেরীয় নগরগুলি খননকালে মাতৃকামূর্ত্তি, শীলমোহর, মৃন্ময় পাত্র, প্রস্তরের অস্ত্র, উদ্গাত চিত্র প্রভৃতি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উক্ত কিংবদন্তীর সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, উভয় জাতির অতীত সভ্যতা ও শিল্পের মধ্যে আশ্চর্য্যজনক সাদৃশ্য ছিল। ষ্টুয়ার্ট পিগ্‌গট তাম্রযুগের সিন্ধুকৃষ্টির সহিত সমসাময়িক মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন।

চিত্রফলক ১৭



২১ চিত্র—জরাসন্ধকা বৈঠক, রাজগৃহ



২২ চিত্র- দক্ষিণ তোরণের অবশেষ, রাজগৃহ

চিত্রফলক ১৮

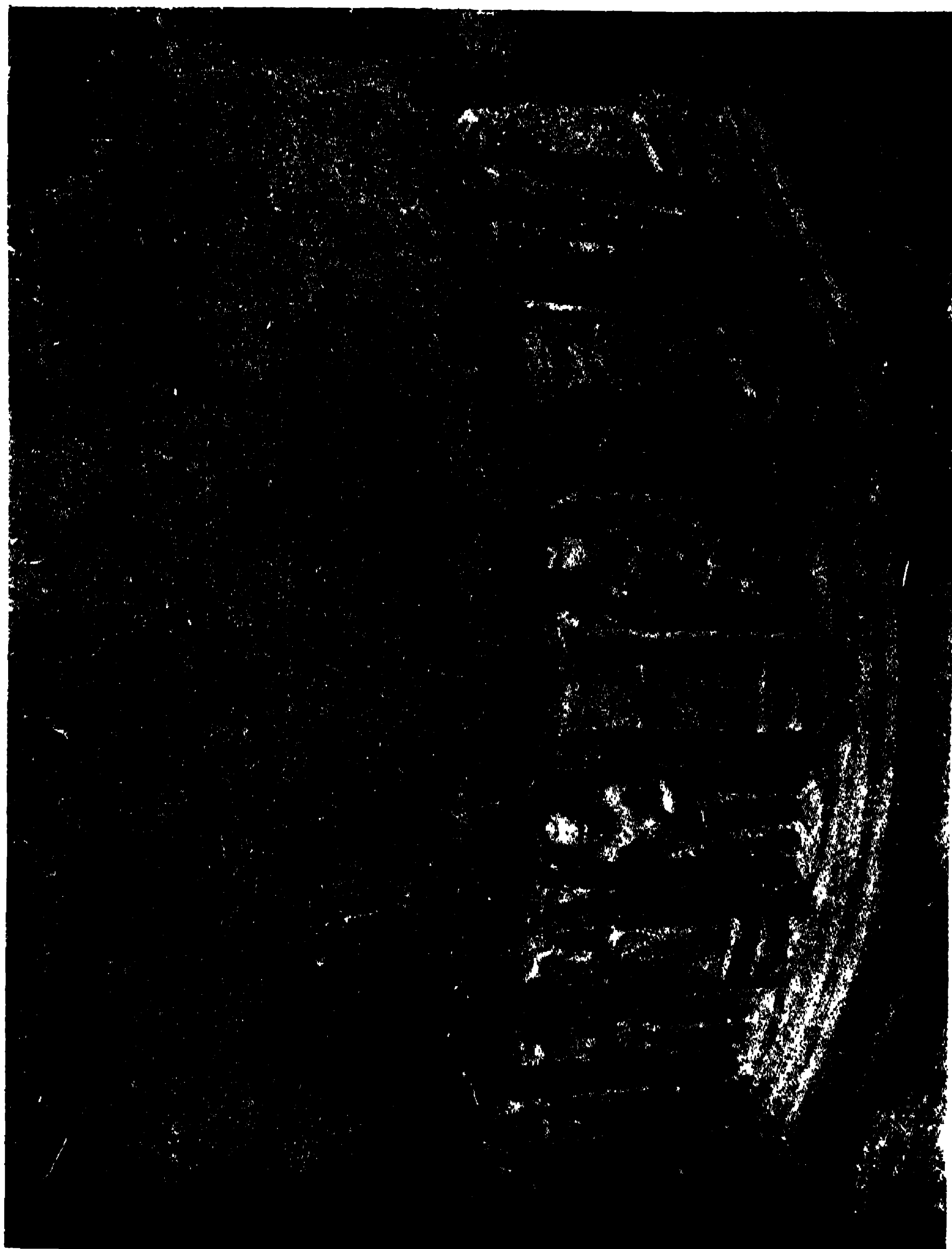


২৩ চিত্র মনিয়ার মঠ রাজগৃহ



২৪ চিত্র—সোনার ভাণ্ডার গুহা, রাজগৃহ

চিত্রফলক ১৯



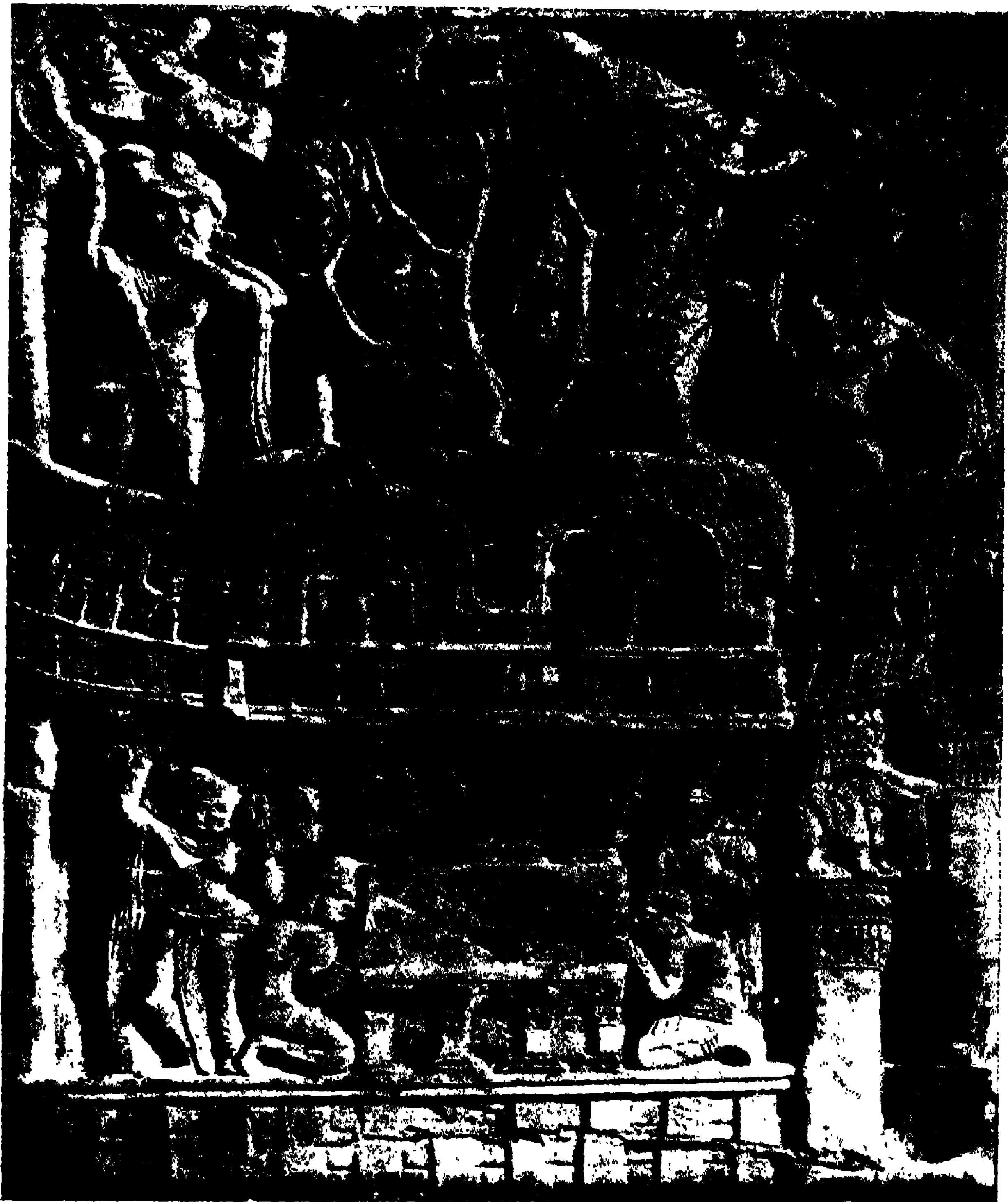
২৫ চিত্র – উৎকীর্ণ ভাস্কর্য, মণিয়ার মঠ, রাজগৃহ

চিত্রফলক ২০



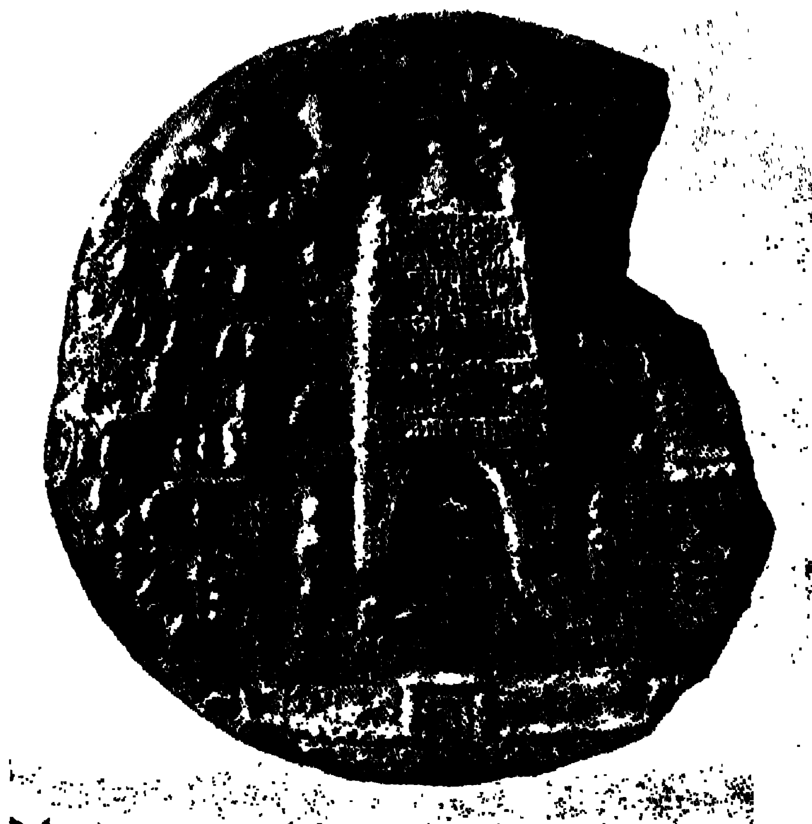
২৬ চিত্র—সাঁচিস্তূপ ও উত্তর তোরণ

চিত্রফলক ২১



২৭ চিত্র—বুদ্ধগয়া মন্দিরের অলংকৃত

চিত্রফলক ২২



২৮ চিত্র—হুবিষ্কনির্মিত হার্মিকাশীর্ষ মন্দির, বুদ্ধগয়া



২৯ চিত্র—পুনর্নির্মিত বুদ্ধগয়া মন্দির

এবং তাহার পরেও বিশ্বকর্ম্মা ও ময়প্রবর্ত্তিত ইষ্টক ও কাষ্ঠের বাস্তুপ্রাসাদ-নির্ম্মাণের প্রথাপদ্ধতি আর্য্যজাতি বর্জ্জন করেন নাই।

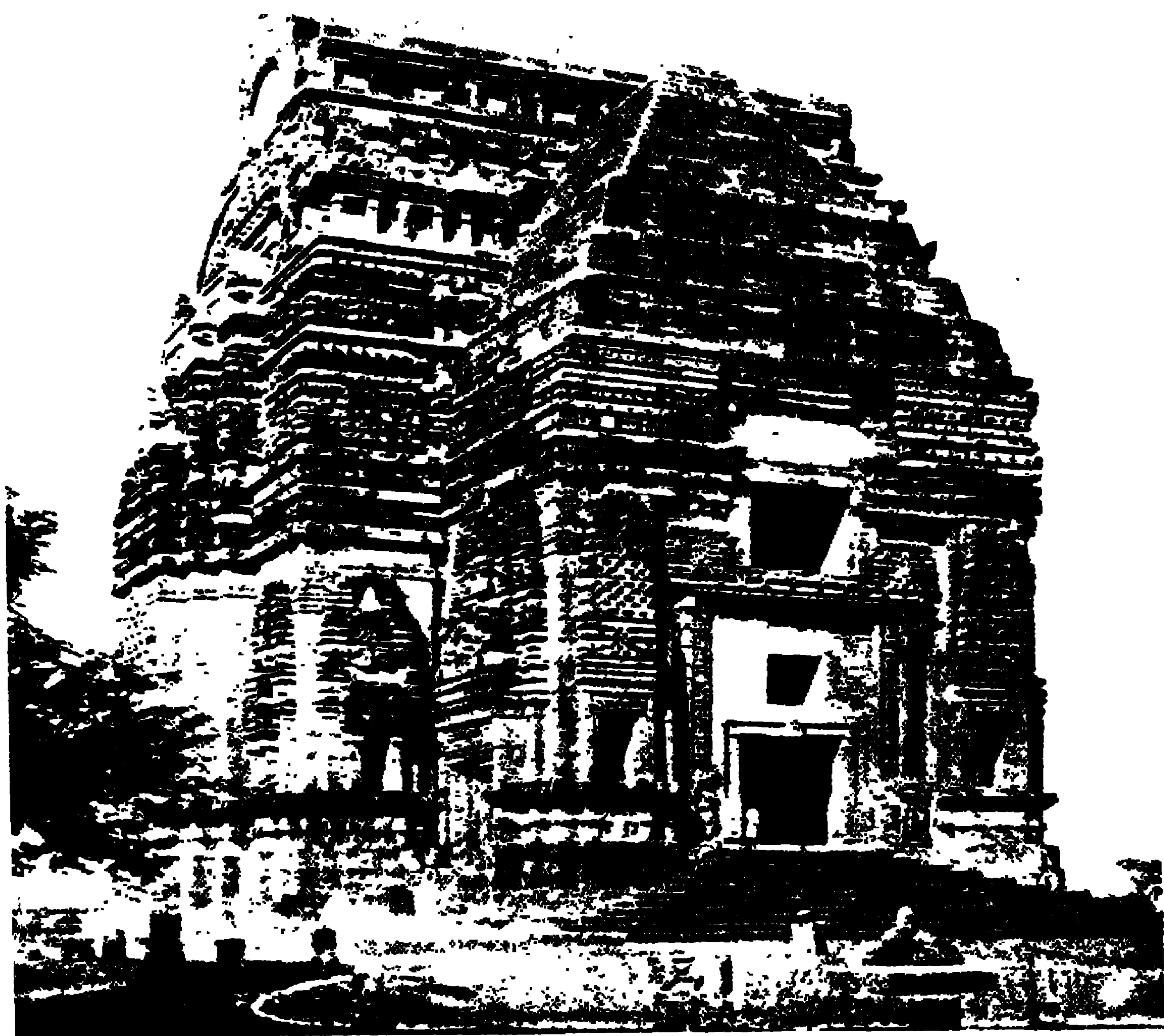
পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মোহেন্-জো-দড়ো এবং হড়প্পায় অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকের বাসগৃহ প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থকার প্রণীত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত *India and New Order* গ্রন্থে সিন্ধুকৃষ্টির এবং প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিস্তৃত বিবরণ আছে। অনেকে বলেন যে, খৃঃ পূঃ হিন্দু মন্দিরের আকৃতি অজ্ঞাত, যেহেতু মন্দিরগুলি বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু খৃঃ পূঃ সুদামা গুহার, লোমশ ঋষি গুহার এবং জুনার গুহার চৈত্য (মন্দির)-গুলি কি স্থাপত্যসম্পর্কে প্রাথমিক ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের অনুকৃতি নয়? 'চুলবগ্‌গ'-নির্দ্দেশিত ভরুৎস্তূপে খোদিত 'প্রাসাদ' কি হিন্দু মন্দিরের প্রতিচ্ছবি নয়? প্রাচীন সাহিত্যে 'মন্দির' প্রাসাদ নামে অভিহিত। হিন্দুর মন্দির-স্থাপত্যের সনাতন ভিত্তি উক্ত চৈত্য ও প্রাসাদ প্রভৃতির উপরে নিহিত। অনুমান হয় খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে ভূপাল প্রদেশের অন্তর্গত বেশনগরে গ্রীক-বৈষ্ণব হেলিয়োদোরসের গরুড়স্তম্ভ সমীপে একটি বিষ্ণুমন্দির ছিল। সেই মন্দিরের নিম্ন ভাগ বর্ত্তমান। পরীক্ষান্তে বোঝা যায় উহা চুণ, শুরকি ও ইষ্টকের উপাদানে, উন্নত নির্ম্মিতিকৌশলে, গঠিত হইয়াছিল। বহু প্রাচীন গৃহনির্ম্মাণে খিলানের প্রচলন ছিল না। ইষ্টকের আয়তন হইত বৃহৎ। দুই পার্শ্ব হইতে একটির উপরে আর একটি, অর্থাৎ উপরে উঠিবার সোপানের মত ধাপে ধাপে, ইষ্টকে উদ্গত (corbel) রাখিয়া অবশেষে উদ্গত-ইষ্টক-শীর্ষে উডুম্বর অথবা শালকাষ্ঠের অথবা প্রস্তরের সর্দ্দল (lintel), ছাদের ভার ধারণের জন্য বসান হইত। খিলানের পরিবর্ত্তেই উদ্গত ইষ্টকের উপর সর্দ্দল স্থাপিত হইত। এইরূপ খিলানবিহীন নির্ম্মাণপদ্ধতি নালন্দায় এবং অন্যত্র দেখা যায়। মোহেন্-জো-দড়োতেও উদ্গত ইষ্টকের খিলানবিহীন নির্ম্মাণ-কৌশল এবং দ্বারশীর্ষে কাষ্ঠের সর্দ্দল আবিষ্কৃত হইয়াছে। অতি প্রাচীন যুগে বহু ক্ষেত্রে গৃহনির্ম্মাণকালে দুই পার্শ্ব হইতে ধাপে ধাপে উদ্গত ইষ্টক উঠিয়া একখানি ইষ্টকের তলদেশে মিলিত হইয়া কোণাকৃতি দাঁতালো যুগ্ম করাতের মত, একরকম খিলানের সৃষ্টি করিত। প্রাগৈতিহাসিক মিশরীয় স্থাপত্যে ছাদ-ধারণের কার্য্যে দ্বারশীর্ষে প্রস্তরের সর্দ্দল ব্যবহৃত হইত। বহু প্রাচীন গ্রীক স্থাপত্যেও সর্দ্দল ও কোণাকৃতি

উদগত খিলানের প্রচলন ছিল। ভারতে খিলানের প্রচলন হয় সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ চতুর্থ-তৃতীয় শতকে।

গয়ার দশক্রোশ উত্তরে 'বরাবর' পাহাড়ে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে অশোক-কর্ত্তৃক খোদিত লোমশ ঋষি গুহার দ্বারশীর্ষে অর্দ্ধ-বৃত্তাকার খিলান দেখা যায়। বুদ্ধগয়ার সম্বোধিক্ষেত্রে অশোক যে প্রথম বোধিদ্রুম-শীর্ষ অনুচ্চ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ভরুৎস্তূপে (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) খোদিত তাহার অনুকৃতি হইতে উক্ত প্রকার খিলান দেখা যায় (২৭ চিত্র)। খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে কুষাণ নরপতি হুবিষ্ক অশোকের সেই মন্দিরের স্থলে সু-উচ্চ, হার্ম্মিকা-শীর্ষ শিখরমন্দির নির্ম্মাণ করেন (২৮ চিত্র)। তাহাতেও খিলান ছিল। সপ্তম শতকে সেই মন্দিরের পুনর্নির্ম্মাণ-কালে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী স্থাপত্যশৈলীর প্রচুর পরিবর্ত্তন হয়। পঞ্চদশ শতকে পুনরায় সংস্কারকালে মন্দিরশৈলী বহুধা পরিবর্ত্তিত এবং মন্দিরের আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া বর্ত্তমান পঞ্চরত্ন, নয়তলশিখর শোভিত দেবায়তনে রূপান্তরিত হয় (২৯ চিত্র)। উভয় সংস্কারেই অর্দ্ধবৃত্ত খিলান ব্যবহৃত হইয়াছিল। প্রাচীন মহাচীন, বাবিলন ও রোমে অর্দ্ধবৃত্ত খিলান প্রচলিত ছিল। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের ভিটাগাঁও (কানপুর) মন্দিরে ইষ্টকের অর্দ্ধ-বৃত্তাকার খিলান ব্যবহৃত হইয়াছিল।

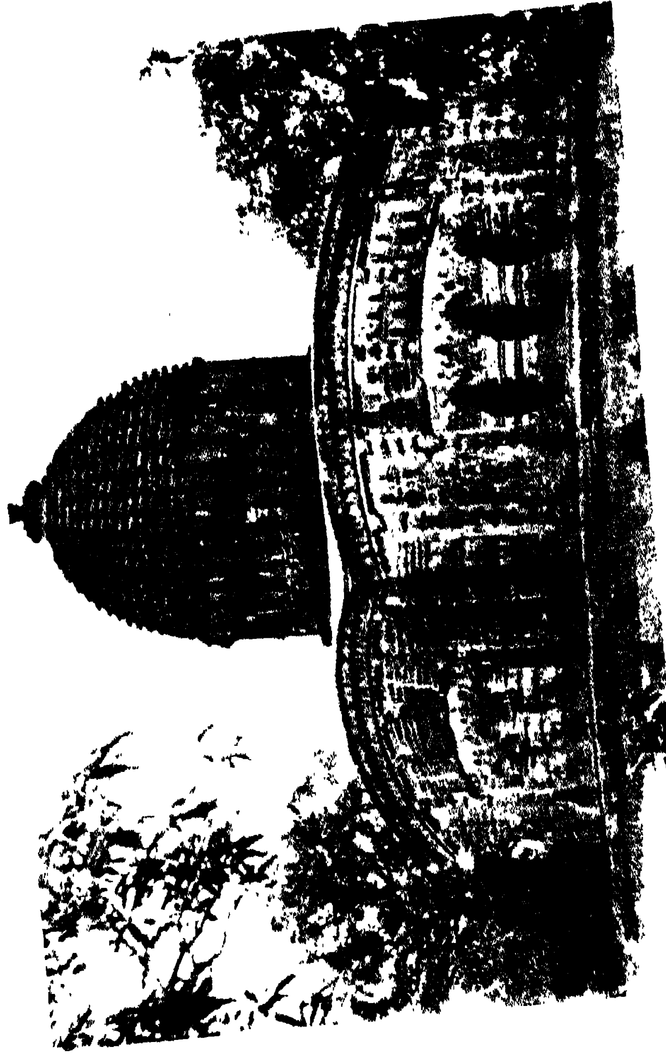
শোলাপুর (বোম্বাই) এবং কৃষ্ণা বিভাগের 'টের' এবং 'ছেরজালা' গ্রামে খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের যে দুইটি চৈত্য ও বিহারের অবশেষ বিদ্যমান আছে তাহারা ইষ্টকে প্রস্তুত। শোলাপুর, রায়পুর এবং মধ্যপ্রদেশের পরবর্ত্তী যুগের জীর্ণ ধ্বংসপ্রায় ব্রাহ্মণ্য মন্দিরগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত। ভুবনেশ্বরে বৈতাল দেউল (৯০০ খৃঃ) এবং গোয়ালিয়রে তেলিকা-মন্দির (১০০০ খৃঃ) ইষ্টকে গঠিত হইয়াছিল। অষ্টম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গের অধিকাংশ দেব-দেউল ইষ্টক-নির্ম্মিত। কান্তনগর, ঈশ্বরীপুর, গুপ্তিপাড়া, তমলুকের বর্গভীমা (পার্ব্বতী), বীরভূমের ও বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির উন্নত বিমাননির্ম্মাণ ব্যপদেশে এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলায় বহুবিধ অট্টালিকা ও মন্দিরের ছাদ ও চূড়াধারণের জন্য ইষ্টকের বৃহৎ বৃহৎ খিলান ব্যবহৃত হইয়াছে (৩০-৩৪ চিত্র)। সেই কালে ইষ্টকের গাঁথনিতে পলিমাটি চূর্ণ, ভাতের মাড় এবং গাছের আঠার মিশ্রণে এক প্রকার মণ্ড ব্যবহৃত হইত। হরিতকী ও বয়ড়ার কাথ,

চিত্রফলক ২৩

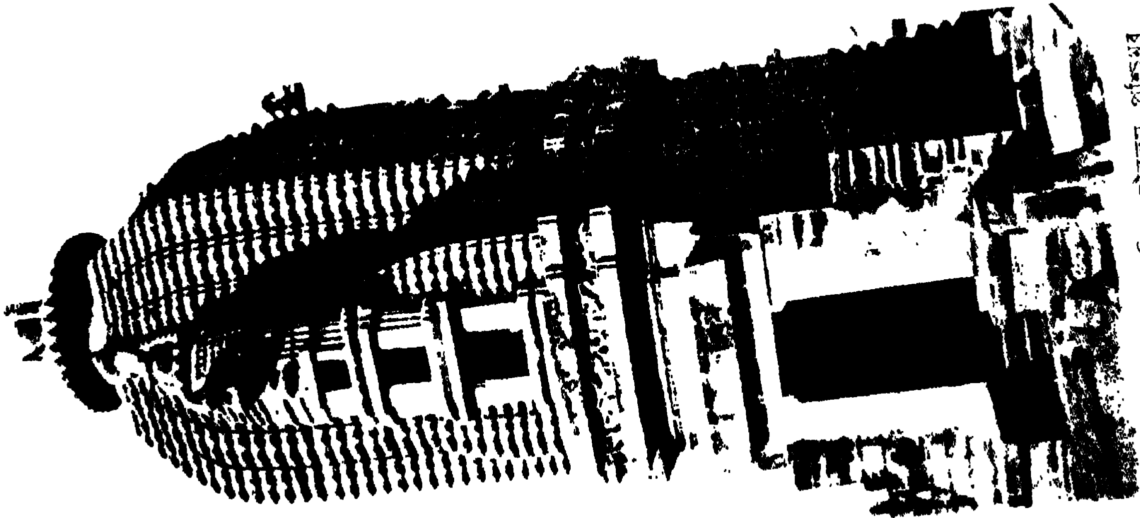


১০ চিত্র—তেলিকা মন্দির, গোয়ালিয়র, মধ্যভারত

চিত্রফলক ২৪

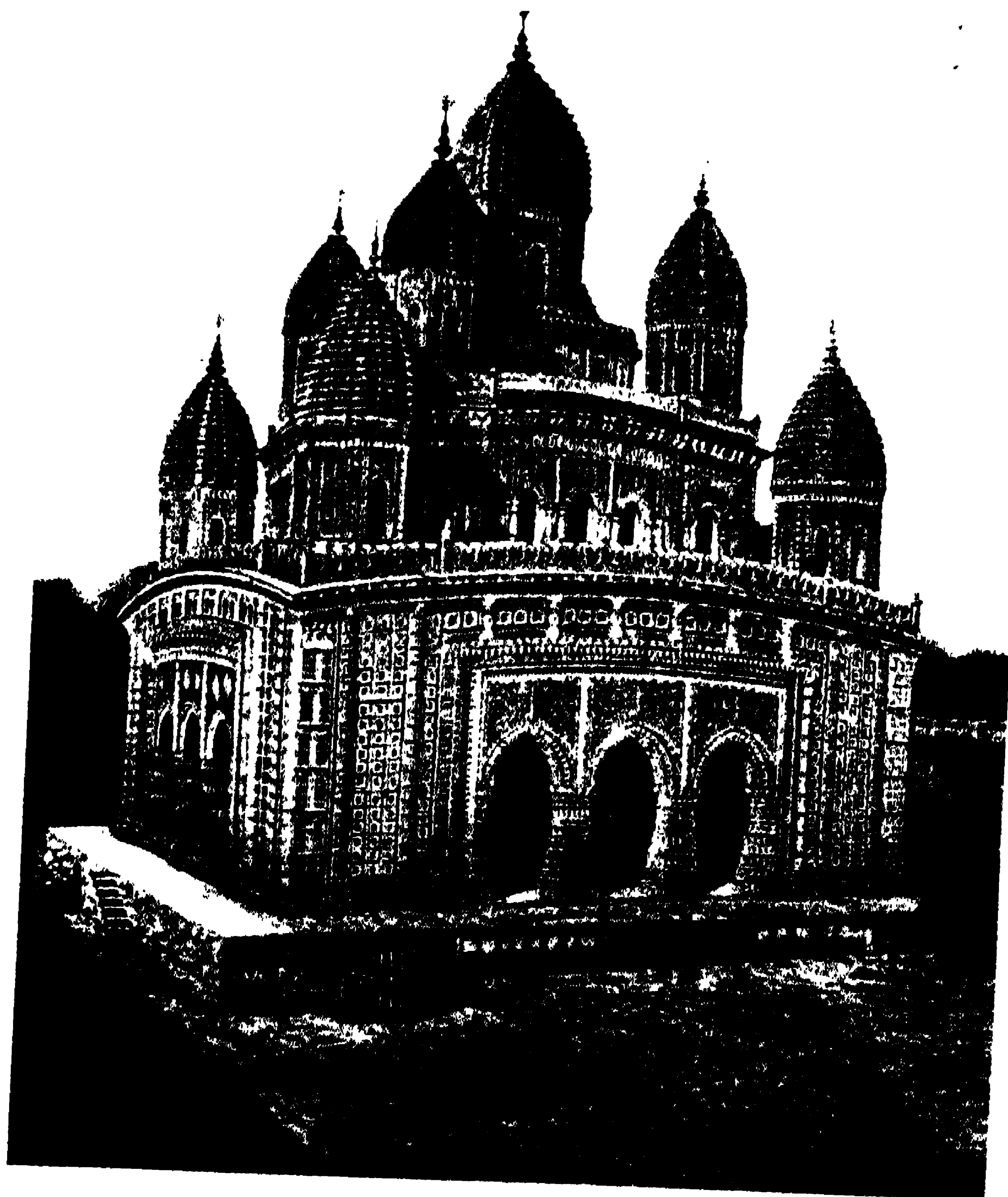


[illegible] চিত্র—মদনমোহন মন্দির, বিষ্ণুপুর, পশ্চিমবঙ্গ



[illegible] চিত্র—বেগুনিয়া মন্দির, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

চিত্রফলক ২৫

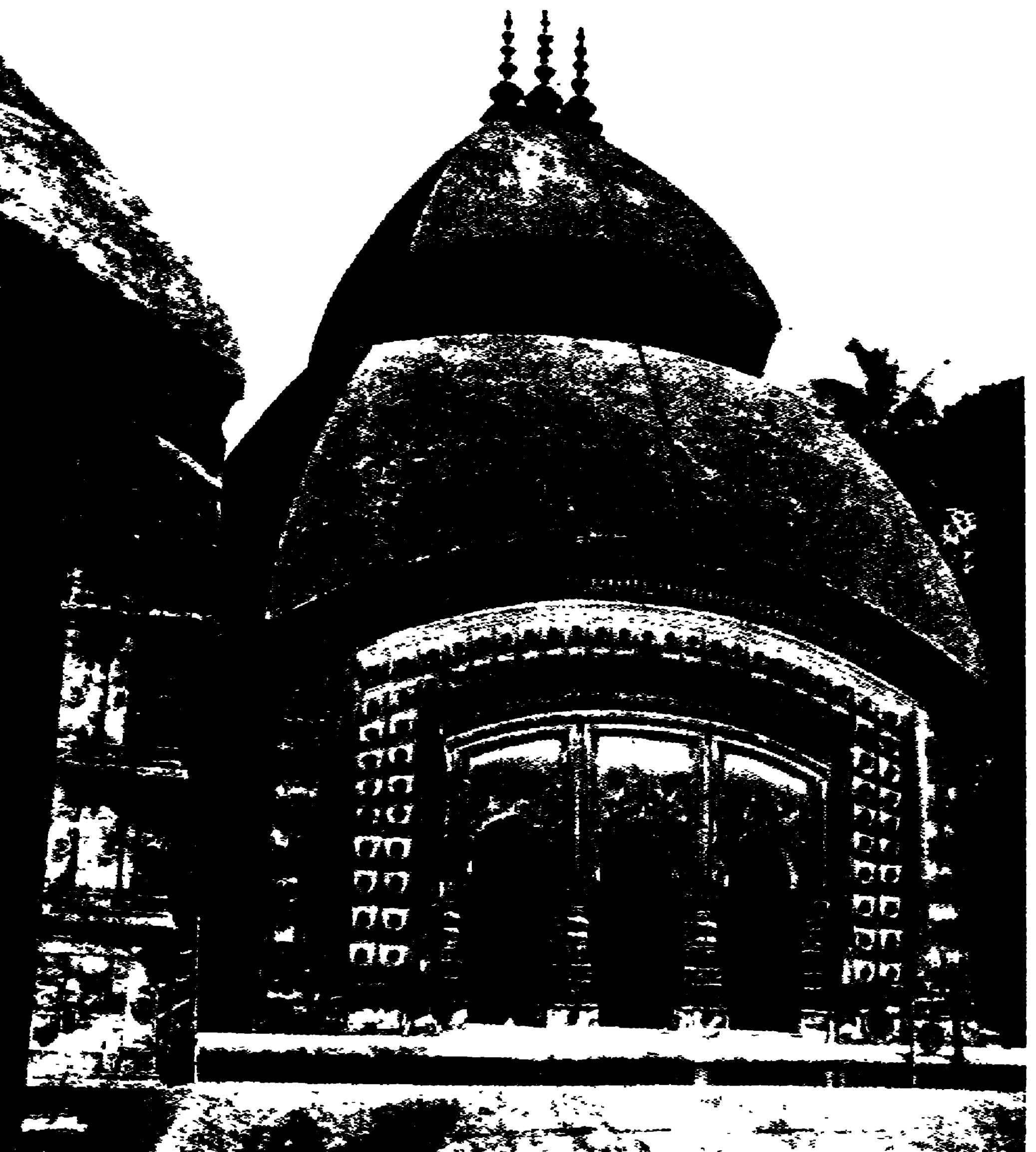


৬৩ চিত্র—কান্ত মন্দির দিনাজপুর, উত্তরবঙ্গ

চিত্রফলক ২৬



৩৫ চিত্র—ব্যাধরমণী, মন্তীপুর



৩৪ চিত্র—বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির, গুপ্তিপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ

বালি এবং 'সুধাচূর্ণের' উপকরণে প্রস্তুত পলস্তারা (বজ্রলেপ) প্রাচীরগাত্রে লেপিত হইত। পলস্তারার নরম অবস্থায় তাহার উপরে কারুশিল্প বিন্যস্ত হইত। শ্যাম রাজ্যে দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও অনুরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল।

দেবায়তনের প্রাথমিক আকার খ্বঃ পূঃ মগধের লৌরীয় নন্দনগড়ের সমাধিস্তূপে খোদিত আছে। অন্যান্য নিদর্শন—প্রিয়দর্শীর তিরোধানের পরে ভরুৎস্তূপের পাষাণ-বেষ্টনীগাত্রে উদ্গত, বিমানবিহীন, বোধিদ্রুমশীর্ষ মন্দির এবং খ্বঃ পূঃ মথুরার শিল্পে ও অমরাবতীর স্তূপে উদ্গত শিখর-মন্দির। বৌদ্ধ চৈত্যের আকারের সহিত তাহাদের সাদৃশ্য নাই। সেই যুগে স্তূপের পূজা সনাতন ব্রাহ্মণের চক্ষে অপধর্ম্মরূপে বিবেচিত হইত। তথাগতের সময়ে এবং তাঁহার নির্ব্বাণলাভের পরে, লৌকিক ধর্ম্মানুযায়ী, বৃক্ষ, বৃক্ষাধিষ্ঠিত দেবতা এবং যক্ষের পূজা হইত; তাহার উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। পরলোকগত ধর্ম্মগুরু মহাস্থবিরের দেহ-ধাতুর উপরে নির্ম্মিত স্তূপের পূজার পরিচয় পালি সাহিত্যে বর্ত্তমান। সাঁচি ও ভরুতের স্তূপদ্বয়ের গাত্রদেশে ক্ষুদ্র সমাধি-স্তূপের অথবা যক্ষমন্দিরের চিত্র খোদিত আছে। উক্ত সমাধিমন্দির অথবা যক্ষস্থান শিখরবিশিষ্ট ছিল না। কলিঙ্গরাজ খারবেল-খোদিত লিপি হইতে খ্বঃ পূঃ শিখর-মন্দিরের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। বিশ্বকর্ম্মা-প্রণীত বাস্তুবিদ্যাতেও তাহার উল্লেখ আছে। বহুতল-শিখরমন্দির-স্থাপত্যের চমৎকার অভিব্যক্তি হইয়াছে বুদ্ধগয়ার বর্ত্তমান মন্দিরে। বুদ্ধগয়া মন্দির, বহু শত বৎসর যাবৎ, শত শত দেবায়তন-নির্ম্মাণে স্থপতিশিল্পীদের উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল।

ভারতীয় ধর্ম্মে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে প্রকৃতির প্রেরণা

স্তূপপ্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে, স্তূপের আবেষ্টনীর মধ্যে, মন্ত্রপাঠের সহিত, যক্ষের ও বনস্পতির উপাসকগণ স্তূপকে প্রদক্ষিণ করিতেন (২৬ চিত্র)। স্তূপকে পুষ্পমাল্য, সুরঞ্জিত পতাকা, রেশমী ছত্র ও আলোকদামে সুসজ্জিত এবং স্তূপগাত্রে সুগন্ধি লেপন, গন্ধবারি সেচন করিতেন। মোহেন্-জো-দড়োর আবিষ্কারকর্ত্তা স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত 'পাষাণের কথা' গ্রন্থে স্তূপপূজার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়।

সৌর প্রকৃতির পূজাসম্পর্কেই হয়ত প্রকারান্তরে স্তূপপূজার প্রচলন। স্তূপের ভিত্তি (আসন) বৃত্তাকার, পৃথিবীর আকারের অনুরূপ। সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভূমণ্ডলের আবর্ত্তনী পথের মত স্তূপকেন্দ্রী প্রদক্ষিণ-পথটি গোলাকার। স্তূপের প্রস্তরবেষ্টনী (বেদিকা) সংলগ্ন, উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমমুখা চারিটি তোরণ। তোরণে দিক্‌পাল ও যক্ষ প্রভৃতির মূর্ত্তি। তোরণের স্তম্ভশীর্ষে পশুরাজ। বেষ্টনীগাত্রে প্রকৃতির চিরপ্রিয় পশুপক্ষী ও লতাপুষ্প খোদিত। খোদিত কমল-কোরক উদীয়মান সূর্য্যদেবের প্রতীক; স্তূপের অর্দ্ধবৃত্ত-আকার অর্দ্ধ-ভূমণ্ডলের প্রতীক। স্তূপের হার্ম্মিকার উপরে স্তরে স্তরে অবস্থিত ছত্র তিনটি যথাক্রমে আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক ও পারত্রিক সাধনাভূমির প্রতীক। সর্ব্বশেষ ছত্রশীর্ষ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হইয়া নভোমণ্ডলে মহাশূন্যে, মোক্ষ-কৈবল্যধাম-ব্রহ্মলোকে, মহানির্ব্বাণে নিলীন।

সৌরমণ্ডলের বৈদিক দেবতা 'মরুৎ, সূর্য্য, মিত্র ও ইন্দ্র বৃত্রহনের' অনুকল্প হইয়াছিল এশিয়া মাইনরের খৃঃ পূঃ দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন সুমেরীয় দেবতা 'মরুত্তস, সুরীয়স' এবং ইরানীয় 'মিথ্র ও বেরেথ্রঘ্ন'। সিন্ধু-উপত্যকার শীলমোহরে, বনমধ্যে পশুপক্ষিসহ দেবদেবীর মাধ্যমে, প্রকৃতিপূজার সন্ধান মিলিয়াছে। বেদে জগৎজননী অদিতি, শ্রী ও ভূদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। তাঁহারা একদা মোহেন্-জো-দড়ো এবং হড়প্পার মাতৃকারূপে মূর্ত্তিমতী ছিলেন (৬ চিত্র)। গৃহে গৃহে কুলুঙ্গীর মধ্যে তাঁহারা বিরাজ করিতেন। তাহার বহু শতাব্দী পরবর্ত্তী ভরুতের প্রস্তরফলকে সেই শ্রীদেবীর উদ্গত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। জননী শ্রীদেবী বিশ্বসন্তানদের স্তন্যদুগ্ধ পান করাইতেছেন। স্নেহময়ীর মুখমণ্ডলে মাতৃত্বের মহিমা মধুরিমা অলৌকিক লাবণ্য প্রতিফলিত করিতেছে। ভারতবর্ষ সিন্ধু-সভ্যতার যুগ হইতে সাঁচি, অমরাবতী, মথুরা, অজন্টা, এলোরা, ভুবনেশ্বর এবং পরবর্ত্তী যুগের বহুকাল পর্য্যন্ত প্রকৃতির সৃষ্টিরহস্যের ধ্যানধারণায় বিভোর ছিল। খৃঃ পূঃ মথুরার ভাবপ্রবণ শিল্পী, বেদিকার স্তম্ভে, তরুলতাপুষ্পের আবেষ্টনে নারীসমাজের গৃহস্থালী চিত্র অভিনব সুষমাসম্পাতে খোদিত করিয়াছিলেন। লতাপত্রপুষ্পাভরণা, মৃগীনয়না, আরণ্যপ্রকৃতির মানসকন্যা, ব্যাধরমণীর অন্তরাত্মাকে ভাবপ্রবণ হয়শালা-ভাস্কর (দ্বাদশ শতক) পাষাণের মাধ্যমে পরিস্ফুট করিয়াছেন (৩৫ চিত্র)।

হড়প্পায় 'নাসাগ্রবদ্ধ-দৃষ্টি' ধ্যানী যোগীর চূণাপাথরের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাঁহার প্রশান্ত আনন ভক্তির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত (৩৬ চিত্র)। স্যর জন মার্শালের মতে 'শিব পশুপতি' উক্ত মূর্ত্তির রূপান্তর। বেদপূর্ব্ব যুগের সিন্ধু-ভূভাগ খননকালে যোগাসনে উপবিষ্ট ধ্যানী দেবতার একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাঁহার দুই পার্শ্বে নতজানু দুই জন ভক্ত ভক্তিবিহ্বল চিত্তে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেছেন। ভক্তদ্বয়ের পশ্চাতে উর্দ্ধফণা নাগযুগলও আরাধনা-নিরত। যোগ, তপ ও তত্ত্বানুসন্ধানের বেদযুগে প্রকৃতির পূজায় ভক্তিতত্ত্বের আভাস থাকিলেও তাহার গভীরতা উপলব্ধ হয় না। রামায়ণ, মহাভারত, জৈন, বৌদ্ধ ও পৌরাণিক যুগের শিব, শক্তি, যক্ষ, নাগ, কৃষ্ণ-বাসুদেব, বুদ্ধ এবং তীর্থঙ্করের উপাসনায় ভক্তিনিষ্ঠা প্রতিভাত হইয়াছিল।

নটরাজ শিবের অনুকৃতি, লোহিত প্রস্তরের একটি ভগ্নমূর্ত্তি হড়প্পায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রস্তরের এবং ধাতুর বহুসংখ্যক যোনি এবং লিঙ্গফলকও সংগৃহীত হইয়াছে। প্রজনন (procreation) শক্তির প্রতীক জ্ঞানে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁহাদের অর্চ্চনা করিতেন। আবিষ্কারগুলি হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীন সিন্ধু-ভূভাগে মৎস্যদেব ও মাতৃকা ব্যতীত শিব ও শক্তি, লিঙ্গ ও যোনি পূজিত হইত।

প্রাচীন ঈজিপ্ট, বাবিলোনিয়া ও ক্রীটে মাতৃপূজার প্রচলন ছিল। ঐতিহাসিক সাহিত্যে তাহার আভাস পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ ৩০০০ বৎসরের প্রাচীন সিংহবাহিনীর মূর্ত্তি ক্রীট দ্বীপে পাওয়া গিয়াছে। বহু প্রাচীন Ma Worship মাতৃপূজার স্মারক। লিঙ্গ ও সর্পপূজা সেই যুগে বহু দেশেই প্রচলিত ছিল। ঋক্‌বেদে উল্লিখিত শিশ্নদেবের অর্থ যে লিঙ্গপূজক তাহা অনেকেই অনুমান করেন। পরবর্ত্তী যুগের স্কন্দ পুরাণ, শিব পুরাণ ও বামন পুরাণ হইতে জানা যায় যে, লিঙ্গপূজার সহিত বৈদিক ধর্ম্মের বিরোধ থাকা সত্ত্বেও মুনিরা শিবকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক ভারতের দেবদেবীর তথা প্রকৃতিপূজার নিদর্শন সাঁচি, ভরুৎ, বুদ্ধগয়া, খণ্ডগিরি, অমরাবতী, মথুরা, পাহাড়পুর, মহাবলীপুর এবং হালবিদের স্থাপত্য-শিল্পে দ্রষ্টব্য। এতদ্ভিন্ন সাঁচি, ভরুৎ প্রভৃতি কয়েক স্থানে লৌকিক ধর্ম্মের উপাস্য সিরিমা, চুল্লকোক, মণিভদ্র প্রভৃতি যক্ষের মূর্ত্তিগুলি পাওয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে উক্ত প্রকার লৌকিক দেবতার পূজা সম্ভবতঃ বিলুপ্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য যুগের যে কয়টি

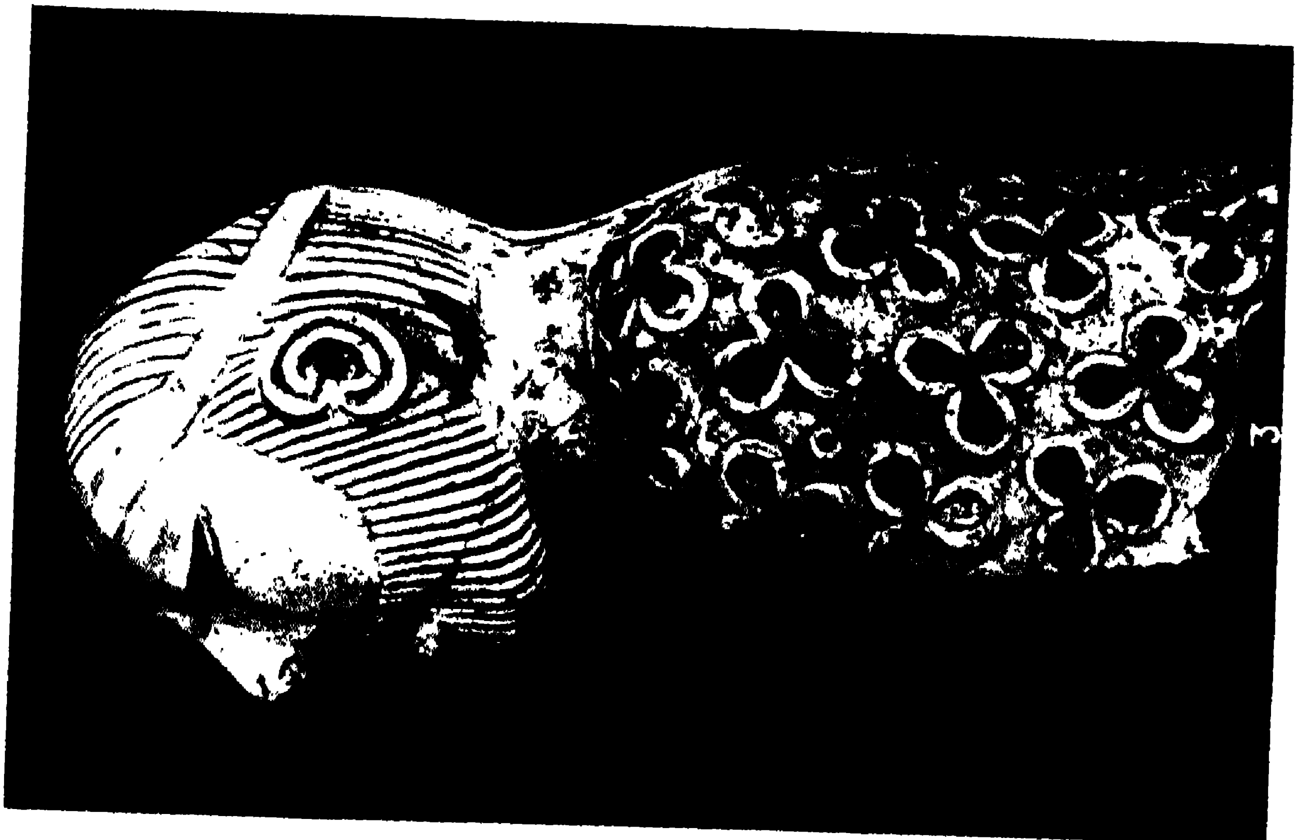
দেবদেবীমূর্ত্তি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কমলা বা লক্ষ্মী সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সাঁচি ও ভরুতের তোরণে, বেদিকায় এবং খণ্ডগিরির অনন্তগুম্ফার দ্বারশীর্ষে এবং অন্যত্র লক্ষ্মীমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়। কমল সরোবরে গজলক্ষ্মী (কমলা) সহাস দণ্ডায়মানা অথবা কমলাসনে স্মিতনয়নে উপবিষ্টা ; তাঁহার দুই পার্শ্বে কুম্ভশুণ্ড করিযুগল (৭ চিত্র)। দশাননের স্বর্ণলঙ্কার মাণিক্য-বৈদুর্য্যমণি-খচিত স্বর্ণপ্রাসাদে মরকতমণিভূষিতা, 'পদ্মিনী পদ্মহস্তা' লক্ষ্মীদেবীর উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান গজযুগলের বর্ণনা রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে লিপিবদ্ধ আছে। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মাচরণেও শ্রী (লক্ষ্মী) দেবীর বিশেষ প্রভাব। সম্প্রতি তমলুক (তাম্রলিপ্তি) প্রদেশে দগ্ধ মৃত্তিকার গজলক্ষ্মী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খৃঃ পূঃ যুগের অন্যবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি সম্ভবতঃ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। খৃঃ পূঃ যুগের শিব এবং লিঙ্গখচিত কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতে প্রয়াগের অদূরে প্রাপ্ত একটি পঞ্চমুখ-শিবলিঙ্গ এবং দক্ষিণ ভারতে গুডিমল্লমে প্রাপ্ত লিঙ্গের অনুকারী পশুপতি মহাদেবও খৃঃ পূঃ যুগের। ঐ সকল মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার তথা অর্চ্চনার জন্য মন্দিরের অবস্থান স্বতঃসিদ্ধ। খৃঃ পূঃ যুগের বৃহৎ পূর্ণাবয়ব মন্দির দেখা যায় না। তবে গর্গ-প্রণীত (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) বাস্তুশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, তৎকালেও নাগর (রেখ) স্থাপত্যের আদর্শানুযায়ী মন্দির গঠিত হইত। রাজ্যাধিপতি শেষনাগ প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্-জ্যোতিষী গর্গকে বাস্তুশাস্ত্র-প্রণয়নে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আর্য্যস্থপতি বিশ্বকর্ম্মার স্থাপত্যরীতির এবং অনার্য্য নাগস্থপতি শেষ-নাগের স্থাপত্যরীতির সমন্বয়ে নাগর-মন্দির-স্থাপত্যের উৎপত্তি ও বহু শত বৎসর ব্যাপিয়া তাহার ক্রমবিকাশ হয়, ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে। গর্গের পূর্ব্ববর্ত্তী শাস্ত্রে ও সাহিত্যে মন্দিরকে 'দেবালয়, দেবায়তন, দেবকুল ও দেবগৃহ' অভিধায় অভিহিত করা হইয়াছিল। অর্থাৎ সেই যুগে বাসগৃহ ও মন্দিরের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। পরবর্ত্তী বাস্তুশাস্ত্রে মন্দির 'প্রাসাদ' নামে পরিচিত। রামায়ণ, মহাভারত ও জাতকের সপ্তভূমি অর্থাৎ সপ্ততল 'চৈত্য প্রাসাদ' দেবায়তনেরই অনুকল্প। আমলক-চিহ্নিত-শিখর-বিশিষ্ট প্রাসাদমন্দির সাধারণতঃ সপ্ততল হইত। খৃঃ পূঃ মথুরা, অমরাবতী ও বেশনগরের স্থাপত্যশিল্পে এবং স্তম্ভশীর্ষে আমলক পরিদৃষ্ট হয়। বেশনগরের বিষ্ণুমন্দির ব্যতীত অন্য একটি খৃঃ পূঃ বিষ্ণুমন্দিরের পরিচয়

চিত্রফলক ২৭



৭ চিত্র—পাহাড়পুর, মকর



চিত্রফলক ২৮



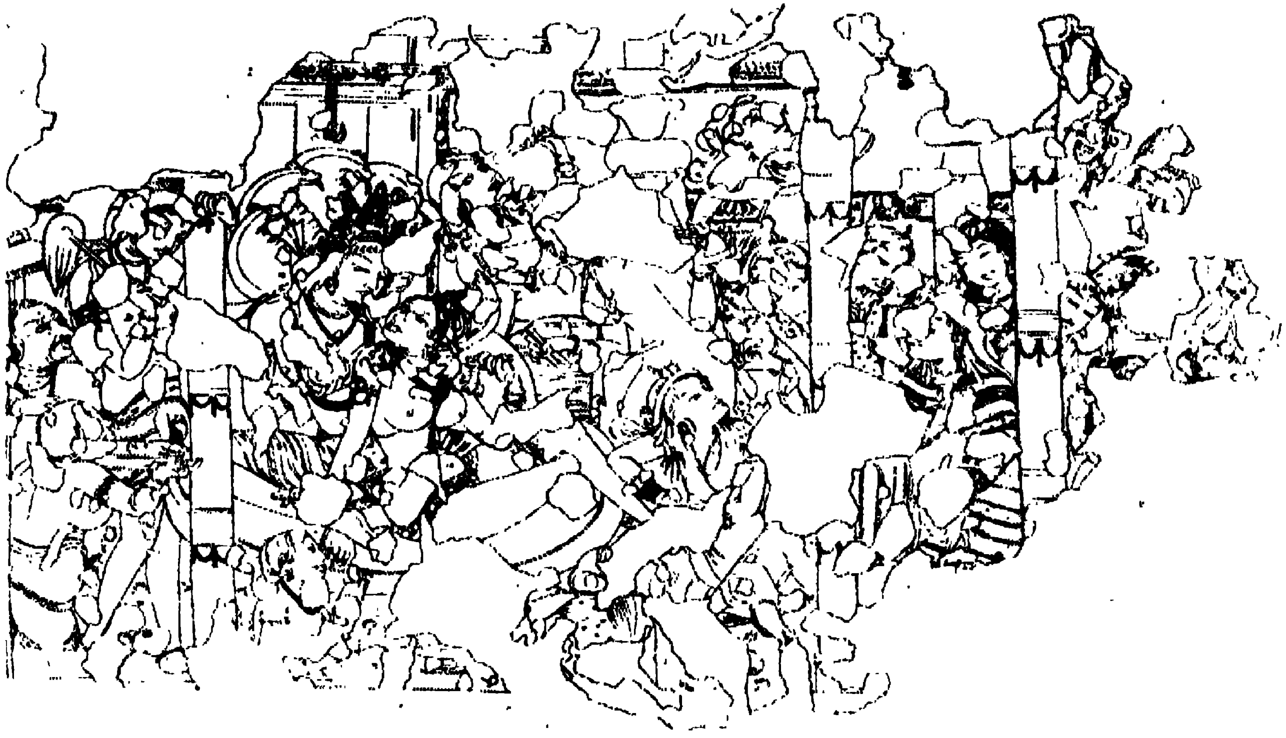
২৮ চিত্র—বিষ্ণুমন্দির, দেওগড়

চিত্রফলক ২৯



৬০ চিত্র, [illegible] অজন্তা

চিত্রফলক ৩০



৪০ চিত্র- প্রাসাদজীবন, অজন্টা

অনুশাসনে উল্লিখিত আছে। খৃঃ পূঃ মাধ্যমিকার (চিতোর) সম্পর্কে নরনারায়ণ সঙ্কর্ষণ ও বাসুদেবের পূজার জন্য নারায়ণবাটের অর্থাৎ নারায়ণ মন্দিরের অবস্থানের সম্ভাবনা সুবিদিত। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে মধ্য ভারতের ভিলসার (বিদিশা) উপকণ্ঠে বেশনগরে গ্রীক-বৈষ্ণব দিওনের পুত্র 'ভাগবত হেলিয়োদোরস্'[১]-প্রতিষ্ঠিত দেবদেব বাসুদেবের গরুড়ধ্বজ এবং তাহার সান্নিধ্যে বিষ্ণুমন্দিরের ভিত্তি দেখা যায়। তবে, সাধারণতঃ, প্রকৃতির অর্চ্চনার জন্য সেই কালে, ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ এবং 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ব্রাহ্মণ ঋষিদের সৌধে ও কুটীরে অগ্নিকুণ্ড থাকিত।

গুপ্ত দেবায়তন ও ভারত সভ্যতার নবজাগরণ
বিধর্ম্মীর কবলে দেবায়তন

উত্তর ভারতে পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত গুপ্ত ও গুপ্ত-পাল শিল্পের সুবর্ণ যুগ। সেই মহাযুগে 'একধর্ম্মরাজ্যপাশে' নিবদ্ধ উত্তর ভারত রাষ্ট্রীয় উন্নতি ও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। তৎপূর্ব্বে তৈর্থিক, পরিব্রাজক, বৌদ্ধ, জৈন, চার্ব্বাক, আজীবিক প্রভৃতি বেদবিরোধী ধর্ম্মমতের আতিশয্যের জন্য এবং রাজা মহারাজা ও শ্রেষ্ঠীর বদান্যতার অভাবে, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান ক্রমশঃ হীনপ্রভ হইয়াছিল। কিন্তু 'পরম ভাগবত পরম ভট্টারক পরমেশ্বর, সোমকুল-তিলক কোশলেন্দ্র' প্রমুখ গুপ্ত সম্রাট্দের আন্তরিক প্রচেষ্টায়, তাঁহাদের অপরিসীম বদান্যতায়, ক্ষীণপ্রভ ব্রাহ্মণ্য আচার ও অনুষ্ঠান, ভক্তি ও নিষ্ঠা, পুনরায় প্রবলভাবে প্রচলিত হয়। বিগ্রহসহ শত শত মন্দির স্থাপিত এবং পূজার প্রসার পূর্ণ মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত হয়। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ তথা উত্তর ও মধ্য ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র অনিন্দ্যসুন্দর দেবায়তনে পরিপূর্ণ হয়। মন্দিরের ইতিহাস ও বাস্তুবিদ্যা প্রণয়ন-

[১] বহু বিদেশী ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন এবং হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবভাষা (সংস্কৃত) ও পালিসাহিত্যে তাঁহাদের অনুরাগ ছিল। গ্রীক-বৈষ্ণব হেলিয়োদোরস্, গ্রীক-বৌদ্ধ নরপতি মিলিন্দ, শক-হিন্দু নরপতি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামন, কুষাণ-হিন্দুরাজ 'পরম মহেশ্বর' বিম কদ্ফিসেস্ এবং হূন-শৈব নরপতি মিহিরকুলের নাম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ।

প্রসঙ্গে 'সকল-কোশলাধিপতি মহাশিব' তিবারদেব (৭২০ খৃঃ) ও যযাতিবংশীয় প্রথম নরপতি যযাতি কেশরী (৮০০ খৃঃ) তথা মহাশিবগুপ্ত এবং বালার্জ্জুনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মৎস্য পুরাণ, বিশ্বকর্ম্মাপ্রকাশ, আগম, অগস্ত্য, ময়মতম্, হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র, অগ্নি পুরাণ, মুহূর্ত্ত-চিন্তামণি, গরুড় পুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, কশ্যপ, মানসার, শিল্পরত্ন, বাস্তুপ্রদীপ, সমরাঙ্গন, চিত্রলক্ষণ প্রভৃতি উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতীয় বাস্তু, স্থাপত্য ও শিল্প শাস্ত্রগুলি গুপ্তযুগে গুপ্তসাম্রাজ্যেই সঙ্কলিত হইয়াছিল।

পাণিনি (খৃঃ পূঃ সপ্তম শতক) বাসুদেব, অর্জ্জুন এবং তাঁহাদের ভক্তবৃন্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিহাসবেত্তার মতে খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে মথুরায় ভাগবতধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণ বাসুদেব সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। ভগবানের আরাধনায় কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, আভীর, অসুর, সুহ্ম প্রভৃতি সকলের সমান অধিকার ছিল। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ভগবদ্‌গীতার বিশ্বপ্রসারী ধর্ম্ম এবং বিশ্বরূপ বুঝাইয়াছিলেন। তিনি সৌরপুরোহিত অঙ্গিরসের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার বাহন গরুড়, তাঁহার আয়ুধ সুদর্শনচক্র, সৌরতন্ত্র ও সূর্য্যপুরাণের সহিত সংশ্লিষ্ট। মেগাস্থিনিস মথুরার (কৃষ্ণপুরা) উল্লেখ করিয়াছেন খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে। মথুরা হইতেই ভগবদ্‌গীতার ধর্ম্ম বিভিন্ন প্রদেশে নীত হয়। গ্রীক-ভাগবত হেলিয়োদোরসের বেশনগর অনুশাসনে (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) উক্ত ধর্ম্মের উল্লেখ বর্ত্তমান। পাণিনিসূত্রে শৈবসম্প্রদায় ও শিবভাগবতের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকের অবসানে মেগাস্থিনিস শৈবসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে পতঞ্জলি লৌহশূলধারী শৈবভাগবত সন্ন্যাসী ব্যতীত শিব, স্কন্দ ও বিশাখের বহুমূল্য ধাতব মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। নানাঘাট (পুণা) গিরিগুহাগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিমালা হইতে জানা যায় যে, খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে ব্রাহ্মণগণের সহিত ভাগবতধর্ম্মাবলম্বীদের সম্প্রীতি সাধন ও বাসুদেবকে ব্রাহ্মণ্যদেবতাদের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। তখন দক্ষিণাপথে ভাগবত ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ ভগবদ্‌গীতাই সর্ব্ববিধ ভারতীয় দর্শনের ঐক্যসাধন করিয়াছে। খৃঃ পূঃ প্রথম শতক হইতে খৃঃ তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত মথুরার শক ও কুষাণ অধিপতিগণের কয়েকজন শৈব ছিলেন। তাঁহারা ভাগবত ধর্ম্মের বিরোধিতা করিতেন। তাহার এক শতাব্দী পরে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভাগবত সংস্কৃতির

পুনরুদ্দীপন ঘটিয়াছিল। ক্রমশঃ ভাগবতপ্রাণ গুপ্তনরপতিদের রাজ্যবিস্তারের অনুক্রমে ভাগবত ধর্ম্ম, মগধ, মধ্য ও পশ্চিম ভারত, রাজস্থান এবং পঞ্চনদ প্রদেশে গৃহীত হয়। ৪০০ খৃঃ হইতে কৃষ্ণ-বাসুদেব বিষ্ণু-নারায়ণরূপে পূজিত হইতেছেন। তদবধি ভাগবত বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্দ্ধমান প্রসার ও প্রতিপত্তি। ধর্ম্মাচরণীয় ব্যবস্থা ব্যতীত ভাগবতগণ সমাজ ও অর্থনীতি-সংস্কারেও তৎপর ছিলেন।

খৃঃ চতুর্থ শতকে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত এবং তাঁহার পুত্র বিক্রমাদিত্য-চন্দ্রগুপ্ত হিন্দু সংস্কৃতির নব-অভ্যুদয়ের অবতারণা করেন। কিংবদন্তী আছে যে, শকারি বিক্রমাদিত্যের প্রসিদ্ধ 'নবরত্নসভা' ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি নামক নয়জন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসাশাস্ত্রবিদ্ প্রভৃতিকে লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু এই জনশ্রুতি প্রমাণসাপেক্ষ। ব্রাহ্মণ্য মহীরুহের বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রধান শাখাগুলি গুপ্ত-সম্রাট্গণের ভক্তি, নিষ্ঠা, বদান্যতা ও সর্ব্ব ধর্ম্মে সমান উদারতা নিরপেক্ষভাবে পরিপুষ্ট করিয়াছিল। সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধন শিব, সূর্য্য ও বুদ্ধকে একই পরমেশ্বরের প্রতিভূজ্ঞানে পূজা করিতেন। তাঁহার সদৃশ সনাতন হিন্দুপন্থী অথচ বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগী গুপ্তরাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং পরিপুষ্টি। গুপ্তযুগে শৈব, ভাগবত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি শান্তিপূর্ণভাবে সুপরিচালিত হইত। হুয়েন সঙ্ প্রমুখ চীনা পর্য্যটকগণ তাহার সত্যতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তৎকালীন ভারতের বৃহত্তর শিক্ষায়তনসমূহে বিবিধ সম্প্রদায়ভুক্ত বিভিন্ন অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ একযোগে শিক্ষাদান ও শিক্ষার্জ্জন করিতেন। বৌদ্ধমন্দিরসমন্বিত নালন্দা মহাবিহারের পার্শ্বে হিন্দুমন্দির বিরাজ করিত। সত্যের উপর শিক্ষামন্দিরের ভিত্তি নিহিত ছিল। বৈদিক ভারতে বর্ণাশ্রমী জনগণ প্রত্যেকে সমান অধিকারের মধ্যে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাইয়া একধর্ম্ম-জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্ত্তে শ্রেণী-সহযোগিতা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থবাদের পরিবর্ত্তে মহামানবতাবাদের বিশাল উদারতা, ভারতের গণতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক ধর্ম্মজীবনকে সুখময় শান্তিময় রাখিত। ঋক্‌বেদ এবং অথর্ব্ববেদ হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও মধ্যযুগের ভারতেও রাষ্ট্রীয় তথা সঙ্ঘবদ্ধ সামাজিক জীবন

ছিল সর্ব্বতোভাবে গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, শিলালেখ ও তাম্রশাসন, প্রাচীন সাহিত্য ও বিদেশ হইতে আগত বিশিষ্ট পর্য্যটকগণের নিরপেক্ষ বিবৃতি তাহা প্রমাণিত করিয়াছে।

বিপুল ঐশ্বর্য্য-সম্পদশালী গুপ্তরাজন্যবর্গের ও শ্রেষ্ঠিগণের অপরিসীম বদান্যতা ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্থাপত্য-শিল্পকে সর্ব্বতোভাবে পরিপুষ্ট ও বিকশিত করিয়াছিল। অপরা ও পরা প্রকৃতি ধর্ম্মপ্রাণ, দর্শনপ্রাণ ও কর্ম্মকুশল জনগণের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা অপিচ বৈজ্ঞানিক, সমাজতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক অনুশীলন নিয়ন্ত্রিত করিত। 'বজ্র, পদ্মক, চন্দ্রকান্ত, বিষ্ণুকান্ত, রুদ্রকান্ত' নামধেয় প্রস্তর-স্তম্ভ-সমন্বিত 'মেরু, মন্দার, কৈলাস, বৈরাট, লাঠ, ভূমিজ, বেশর' প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর, বিভিন্ন শৈলীর, এক হইতে ষোড়শতল 'ব্রহ্মচ্ছন্দ (সমচতুর্ভুজ), বিষ্ণুচ্ছন্দ (সমঅষ্টভুজ) ইন্দ্রচ্ছন্দ (সমষোড়শভুজ) এবং রুদ্রচ্ছন্দ (বৃত্তাকার)' দেবায়তনসমূহ 'সুমঙ্গল, বিজয়, ধ্রুব, সর্ব্বতোভদ্র' প্রভৃতি পর্য্যায়ভুক্ত গৃহপল্লীকে তথা পল্লী, নগর ও জনপদবাসিগণের ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন সুপরিচালিত করিত। বাসভবনসমূহের ভিত্তি (আসন) 'আয়ত, সমচতুর্ভুজ, বৃত্ত, ভদ্র, চক্র, দণ্ড, মৃদঙ্গ, মকর' প্রভৃতি ষোড়শবিধ আকারে গঠিত হইত। 'দীর্ঘবৃত্তাদি রেখাগণিত' নামক প্রাচীন জ্যামিতিশাস্ত্রে তাহার বিবরণ পাওয়া যায়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রণেতার অভিমতে পার্থিব আবাস ও ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট মন্দির প্রভৃতি 'নাগর, সত্য, বৈণিক ও মিশ্র' পর্য্যায়ী চতুর্বিধ বর্ণে রঞ্জিত হইত। আধুনিক গৃহনির্ম্মাণ-বিধানের সহিত প্রাচীন ভারতীয় গৃহনির্ম্মাণ-পদ্ধতির বহুধা সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীন ভারতের স্থপতিরা সচেতন ছিলেন যাহাতে রাজপথের অতি সান্নিধ্যে বাস্তুভবন নির্ম্মিত না হয়, আধুনিক যুগে নিষিদ্ধ Ribbon development অর্থাৎ পথপার্শ্বে ঘনসন্নিবদ্ধ গৃহবিন্যাসের অনুরূপ। স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে স্থপতিরা পয়ঃপ্রণালী ও জলনির্গমনের যথাযথ বিধান ব্যতীত রাজকক্ষে ও শ্রেষ্ঠিভবনে শীতাতপ-সমতা রক্ষা (Air condition) করিবার ব্যবস্থা করিতেন।

উৎকল প্রদেশ দক্ষিণ-পূর্ব্ব হিন্দু ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিচিত। ভুবনেশ্বর শৈবতীর্থ, যাজপুর শাক্ততীর্থ এবং পুরীধাম বৈষ্ণবের ধর্ম্মপীঠ। কোণার্ক

ও দর্পণ যথাক্রমে সৌর (সূর্য্যোপাসক) এবং গাণপত্য (গণপতির উপাসক) ভক্তগণের ধর্ম্মস্থান। গুপ্তভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র ও শচীর মন্দিরের উল্লেখ আছে। তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ আছে—উত্তর ভারতের জনৈক কুলপুত্র (অভিজাত শ্রেণীর ক্ষত্রিয় রাজপ্রতিনিধি) মধ্যদেশীয় বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে বঙ্গদেশে উপনিবিষ্ট করাইবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদের নারায়ণ প্রমুখ দেবতাগণের নিত্যসেবা ও শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবার ব্যবস্থাকল্পে ভূমিদান করিয়াছিলেন। গুপ্তযুগের কয়েকটি হিন্দু মন্দির বিদ্যমান আছে। সাঁচির অদূরে দেবগড়ে (খৃঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতক) শিখরসহ বিষ্ণুমন্দির তাহাদের মধ্যে একটি (৩৮ চিত্র)। সুকুমার সুডৌল মন্দিরটি সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্যে অতুলনীয় বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না। ভারতীয় রাজসরকারের প্রত্নতত্ত্ববিভাগ তাহার সংস্কার করিয়াছেন। মধ্যভারতের ভূমরায় গুপ্তযুগের (খৃঃ পঞ্চম শতাব্দী) একটি সুন্দর মন্দির আছে। তাহার স্থাপত্যের ও কারুশিল্পের কয়েকটি নিদর্শন কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত হইয়াছে। গোয়ালিয়র অঞ্চলীয় উদয়গিরি গুহামন্দির, জব্বলপুর প্রদেশীয় টিগোয়া গ্রামস্থ কঙ্কালী দেবীর বিষ্ণুমন্দির (৪০০ খৃঃ), সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত ভাবুয়ার মুণ্ডেশ্বরী এবং অজয়গড় রাজ্যস্থিত নাচনা কুঠারার প্রসিদ্ধ শিব ও পার্ব্বতী মন্দির (৪০০ খৃঃ) গুপ্তযুগে নির্ম্মিত হইয়াছিল। রেওয়া (প্রাচীন রেবা) রাজ্যে এবং মধ্য, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে গুপ্তমন্দিরের নিদর্শন অথবা জীর্ণাবশেষ পাওয়া যায়। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ (৪১৫ খৃঃ) গুপ্তকালীন শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচায়ক। স্তম্ভশীর্ষে গরুড় মূর্ত্তি অধিষ্ঠিত ছিল, এবং গরুড়ধ্বজ হিসাবেই ইহার প্রতিষ্ঠা, এইরূপ অনুমিত হইয়াছে।

গুপ্তবংশীয় শেষ নরপতিগণের রাজত্বকালে এবং পরবর্ত্তী মধ্যযুগে মন্দিরের আয়তন ও পূজার অনুষ্ঠান হইয়াছিল বিরাট্ ও ব্যাপক। গুপ্তযুগের প্রথম পর্ব্বে তদ্রূপ সম্ভব হয় নাই। গুপ্তযুগের প্রারম্ভে স্বল্পায়তন গর্ভগৃহকে অবলম্বন করিয়া সমচতুষ্কোণ ক্ষুদ্র মন্দির নির্ম্মিত হইত। সমচতুর্ভুজ গর্ভগৃহের চারিধারে থাকিত প্রদক্ষিণ পথ, সম্মুখে মণ্ডপ। অনুচ্চ মন্দিরে শিখর ছিল না। আচ্ছাদন (ছাদ) সমতল হইত। দেবগড়ে অনুচ্চ শিখরবিশিষ্ট বিষ্ণুমন্দির ব্যতীত কেবলমাত্র নাচনা-

কুঠারায় পার্ব্বতী দেবীর দ্বিতল শিখর-মন্দির বিদ্যমান। প্রথম-পর্য্যায়ী গুপ্তমন্দির-সমূহ আকারে ক্ষুদ্র হইলেও দার্ঢ্য ও সৌকুমার্য্যের অপূর্ব্ব মিলনসম্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তাহাদের অতুলনীয় ভাস্কর্য্যসম্ভার প্রকৃতই বিস্ময়প্রদ। ক্রমশঃ বৃহৎ বৃহৎ শিখর মন্দিরগুলির সৃষ্টি। তাহারা হইত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহিষমর্দ্দিনী, গণপতি, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, কুবের, যম, লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবী এবং খর্ব্বট, বিকৃত-বদন, স্ফীতোদর, শিবানুচরগণের মূর্ত্তিসমন্বিত অপিচ হাস্যলাস্যভঙ্গিমাভরা, নৃত্যশীলা, সঙ্গীতমুখরা বিদ্যাধরী ও অপ্সরার ভাস্কর্য্য ও আলিম্পনের অনুকারী অনবদ্য মণ্ডনশিল্প-বিমণ্ডিত। গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে দ্বারপালিকারূপে ত্রিভঙ্গিম-ঠামে দণ্ডায়মানা মকর এবং কূর্ম্মপৃষ্ঠোপরি গঙ্গা ও যমুনা। মধ্যভারতের বহুসংখ্যক দেবায়তন গুপ্তশিল্পের ও গুপ্তসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিরূপে বিবেচিত হইয়াছে।

গুপ্ত-দেবায়তন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির নব-জাগরণের প্রতীক। উহা ক্রমশঃ সমগ্র হিন্দু ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র জাতীয় জীবনগঠনের কেন্দ্ররূপে আদরণীয় হইল। ব্রাহ্মণের গৃহে অগ্নিশালার পরিবর্ত্তে মন্দির ও বিগ্রহের অবস্থিতি ও অধিষ্ঠান অধিকতর প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইল। বৈদিক যাগযজ্ঞের স্থলে দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হইল। পারিবারিক তথা সামাজিক রীতিনীতি ক্রমে ক্রমে ব্যাপকভাবে সমগ্র জাতির আচারানুষ্ঠানে পরিণত হয়। প্রকৃতির বিধান এইরূপ। সেই চিরন্তন বিধানে সভ্যজগতের প্রায় সর্ব্ব জাতির জাতীয় জীবন বিকশিত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রাকৃতিক সেই নিয়মানুসারে হিন্দু ভারতের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে সমগ্র গ্রামবাসীর ও সমগ্র নগরবাসীর প্রাণ-কেন্দ্রী দেবায়তন-রূপে, গ্রাম ও নগরের মধ্যস্থলে, বিগ্রহসহ মন্দিরের অবস্থিতি বাঞ্ছনীয় হইল। রাজা, শ্রেষ্ঠী ও ধর্ম্মপরায়ণ জনসাধারণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক সাধনভজনের জন্য, সমগ্র সমাজের কল্যাণের জন্য, দেবায়তন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইলেন। ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতি ও শ্রেষ্ঠিবর্গের বিপুল বদান্যতা জাতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে যুগান্তর ঘটাইল। তাহার ফলে খৃঃ সপ্তম শতকের পরে, আসমুদ্রহিমাচল হিন্দু ভারতে, অষ্টশত বৎসর ব্যাপিয়া দেবদেউল রচনায় প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয়। দেবভক্তির ও প্রখর কল্পনাশক্তির পূর্ণ পরিচয় প্রদায়ক—বিরাট্, বিশাল, সংখ্যাতীত দেবদেউল,

তাহাদের মৌন-মহিম-ভাস্কর্য্য-সম্ভার, অভ্রংলিহ 'শৃঙ্গ'-সমন্বিত শিখর-বিমান এবং স্বর্ণমণ্ডিত-কলস-কিরীটসহ "কারণ্ডববিকীর্ণানি তড়াগানি সরাংসি" সেবিত, তপোবন-প্রসূত-বিহগ-কাকলী-মুখরিত, ভারত ভূমিকে শোভাময়ী, শান্তিময়ী, পুণ্যময়ী করিল। মহামানবের মর্ম্মমাঝারে চিরন্তন সৌন্দর্য্যের, চিরঞ্জীব শাশ্বত ধর্ম্মের, মহতী ভূমার প্রেরণা উদ্দীপিত করিল।

বাল্মীকির রামায়ণে রাবণের প্রাসাদ বর্ণনায় প্রাচীন ভারতীয় চিত্রশালার উল্লেখ আছে। ভবভূতিও উত্তররামচরিতে চিত্রশালার বর্ণনা করিয়াছেন। 'নারদ শিল্পশাস্ত্র' গ্রন্থে চিত্রভবনের বিবরণ পাওয়া যায়। বহু ক্ষেত্রেই চিত্ররক্ষণের জন্য কারুকার্য্য-খোদিতস্তম্ভ- এবং বিমান-শোভিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সৌধ, ভবন ও হর্ম্ম্য নির্ম্মিত হইত। তাহাদের মাধ্যমে ভাবদীপ্ত চিত্রকলা বহুল পরিমাণে বিকশিত হইয়াছিল। কালিদাস, বাণভট্ট, দণ্ডী প্রভৃতি মহাকবিগণ চিত্রগৃহের বর্ণনায় তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। অজন্টার ১২, ১৬ এবং ১৭ নং গুহার প্রাচীরগাত্রে—প্রাকৃতিক-সৌন্দর্য্য-নির্ঝরোৎ-সারিত উদাত্ত গুপ্তচিত্রের মোহনরূপচ্ছন্দের ধ্যান, ধারণা, পরিকল্পনা ও দ্যোতনার শ্রেষ্ঠতম বিকাশের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে অভিজাত সম্প্রদায়ের 'পদ্মিক, স্বস্তিক' প্রভৃতি পর্য্যায়ভুক্ত দারুময় আবাসসমূহের অভ্যন্তরগাত্র উজ্জ্বল চিত্রে ভূষিত করা হইত বলিয়া কথিত। গুপ্তযুগে অজন্টার গুহাকক্ষের বিবিধ বর্ণোজ্জ্বল চিত্রকলায় হয়ত বৈদিক চিত্রশিল্পের চরম উৎকর্ষ হইয়াছিল। গবেষকগণ এই সম্বন্ধে বিচার করিবেন। অজন্টার চৈত্যমন্দিরে পার্থিব মানবজীবনের দৈনন্দিন ঘটনাবলী অপার্থিব অতিপ্রাকৃত অনুভূতিসম্পাতে মহিমান্বিত করা হইয়াছিল (৩৯ ও ৪০ চিত্র)। অজন্টার সাধকশিল্পীর দার্শনিক ধ্যানপ্রসূত চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি জাপানের সুপ্রসিদ্ধ হোরিয়ুজী বৌদ্ধবিহারের চিত্রকলায় বিশেষভাবে প্রভাব-বিস্তার করিয়াছিল। বহুবিধ জীবজন্তু এবং সাধারণ নরনারীর ভাস্বর চিত্রাবলী তৎকালীন রাজপ্রাসাদের বজ্রলেপ-লিপ্ত কক্ষগাত্রেও অঙ্কিত হইত। রঘুবংশে এইরূপ চিত্রফলকের বর্ণনা বর্ত্তমান।

উদয়পুরে ঘননীল 'পেশোলা'-হ্রদতীরে অবস্থিত শিশোদীয় মহারাণার মর্ম্মরমণ্ডিত অতিকায় প্রাসাদনিম্নস্থ 'সাগরগৃহ' কক্ষের বজ্রলেপ-লিপ্ত অভ্যন্তরভাগ মরালসেবিত

পদ্মবনের অনুকল্প উজ্জ্বল তৈলচিত্রভূষিত। রুদ্র বৈশাখের প্রখর মধ্যাহ্নে সেই কক্ষে অবস্থান অতীব আরামদায়ক। উক্ত 'সাগরগৃহ' হয়ত গুপ্তসম্রাট্ বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদনিম্নস্থ গ্রীষ্মকালীন বিশ্রামকক্ষের আভাস প্রদান করে।

বিশেষ বিশেষ উৎসব উপলক্ষে, স্বর্ণমণ্ডিত রথারূঢ় গুপ্ত-নরপতিগণ আড়ম্বরপূর্ণ শোভাযাত্রাসহ দেবায়তন, সঙ্ঘারাম এবং বিহার পরিক্রম করিতেন। ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ, অর্হৎ, ভিক্ষু, শ্রমণ, শ্রাবক, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি তাঁহাদের অনুগমন করিতেন। পরিক্রমার প্রারম্ভে—রেশমী অঙ্গবাস ও চীনপট্টক-পরিহিত, মণিমুক্তা-স্বর্ণহার-বিভূষিত, রাজহস্তিসমূহের গাত্রে সিন্দুর ও তৈলসহযোগে গরুড়ধ্বজ, পাঞ্চজন্য-শঙ্খ ও স্বস্তিক অঙ্কিত হইত। বিচিত্র পরিচ্ছদ, হেমমেখলা ও চূড়ামণি, মণিকুণ্ডল, কেয়ূর, বলয়, কনক-কঙ্কণ, কঙ্কণী ও চরণচূড় বিভূষিতা হস্তিচালিকা পুরনারীগণের চন্দনচর্চ্চিত গণ্ডে এবং পীনোন্নত বক্ষোদেশে স্বর্ণাভ পত্রলেখা এবং মকরকেতন অঙ্কিত করা হইত। শ্যাম ও ব্রহ্মদেশীয় নরপতিগণ উৎসবযাত্রার পূর্ব্বে নিজ নিজ রাজকুঞ্জরকে সচন্দন পুষ্পমাল্যে তথা বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া ভক্তিভরে করযোড়ে অর্চ্চনা করিতেন। ব্রহ্মদেশীয় প্রাচীন চিত্রে ইহা দৃষ্ট হয়।

প্রাচীনকালে রাজা, শ্রেষ্ঠী, ক্ষত্রিয় রাজপুরুষ ও সাধারণ গৃহস্থের প্রাসাদে ও ভবনে চিত্রশালা থাকিত। বিবিধবর্ণোজ্জ্বল লতা-পুষ্প-পক্ষি-পরিবৃত, দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-নাগ-নাগিনী-সমন্বিত, বহুবিধ চিত্রসহ শত শত শিল্পাগার সমগ্র একটি নগরকে সুশোভিত করিয়াছিল, বাণভট্ট তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। স্থাপত্য-শিল্প-সমৃদ্ধ গুপ্তপ্রাসাদের, সৌধের এবং সুশোভন গ্রামের বহু গৃহস্থভবনের ও কুটীরের বহির্ভাগ এবং অভ্যন্তরভাগ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী এবং পৌরাণিক দেবদেবীর লীলাকাহিনী, গার্হস্থ্য ও সামাজিক জীবনযাত্রার বিশেষ বিশেষ ঘটনা এবং পূজা, পার্ব্বণ ও যুদ্ধাভিযান অবলম্বনে চিত্রিত হইত। সেইরূপ চিত্রাঙ্কনের পারম্পরিক অভিব্যক্তির নিদর্শন উদয়পুর, কৈলবারা, যোধপুর, অম্বর, যশল্মীর প্রভৃতি মধ্যযুগের রাজস্থানী নগরের বিবিধ মহল্লায়, বিশেষতঃ বীকানীর রাজ্যের রতনগড়, চুরু প্রভৃতি নগরের শ্রেষ্ঠিভবন-গাত্রে পরিদৃষ্ট হয় (৪১ ও ৪২ চিত্র)।

চিত্রফলক ৩১



৪১ চিত্র— প্রাচীর চিত্র, কেলবারা

চিত্রফলক ৩২



৪২ চিত্র— প্রাচীর চিত্র, রতনগড়

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকের গুপ্তস্থাপত্য সপ্তম শতকে সুঠাম চালুক্যস্থাপত্যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ধারওয়ারের সমীপবর্ত্তী আইহোল অঞ্চলীয় দ্বিতল লাড়খাঁ মন্দির (৪৫০ খৃঃ) সুঠাম সুডৌল চালুক্যস্থাপত্যের প্রথম উদাহরণ। পট্টদকলের মনোরম জৈন মন্দির পাপনাথ (৬৮০ খৃঃ) লাড়খাঁর মত দ্বিতল তথা গুপ্তস্থাপত্য-প্রভাবিত। নাচনা কুটারার পার্ব্বতী মন্দিরের (৪০০ খৃঃ) ত্রিধা-বিভক্ত শিখরের অনুকৃতি অষ্টম শতকের পরশুরামেশ্বর (ভুবনেশ্বর) মন্দির। গুপ্তের গরুড়স্তম্ভ ষোড়শ শতকের জৈন স্থাপত্যকে প্রভাবিত করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে গরুড়স্তম্ভ খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকের অশোকস্তম্ভের এবং বেশনগরের খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের বিষ্ণুস্তম্ভের সহিত মধ্যযুগের হিন্দু- ও জৈন-স্তম্ভ-শৈলীর ঐক্যসাধন করে।

ভরুৎ স্তূপের 'প্রতোলি' তোরণে বলদীপ্তা পাষাণময়ী যক্ষী চম্পক শাখাকে অবলম্বন করিয়া সহাস হেলায়মানা ছিল। তথা হইতে অপসারিত সেই যক্ষী মূর্ত্তি এক্ষণে কলিকাতার যাদুঘরে প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত যক্ষী অতঃপর পাটলীপুত্রের 'দিদারগঞ্জ-যক্ষী' (৪৩ চিত্র) এবং গুপ্তমন্দিরের প্রধান দ্বারপ্রান্তে দণ্ডায়মানা সুভঙ্গী সুতন্বী গঙ্গা ও যমুনায় রূপান্তরিতা হয়। দেবগড়ের বিষ্ণুমন্দির-সংলগ্ন প্রস্তরময় বেষ্টনীর পরিকল্পনা সাঁচি, ভরুৎ ও বুদ্ধগয়ার বেষ্টনী হইতে অনুসৃত। মথুরা, বারাণসী, পাটলীপুত্র, এলোরা, শিবপুরা, (এলিফাণ্টা, বোম্বাই), বাদামি, পাহাড়-পুর ও ভুবনেশ্বর, পরম ভাগবত গুপ্তসম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে, পৌরাণিক দেবদেবী-প্রতিমার ও বুদ্ধমূর্ত্তির অভূতপূর্ব্ব উৎকর্ষ সাধন করিয়াছিল। গুপ্তরাজন্যবর্গের ভগবদ্ভক্তি, নিষ্ঠা এবং অপ্রমেয় বদান্যতাই মথুরা ও সারনাথের ভাবপ্রবণ শিল্পীদের ভুবনমোহন বুদ্ধপ্রতিমা সৃজনে উৎসাহিত ও শক্তিমন্ত করিয়াছিল (৪৪ চিত্র)।

গুপ্তস্থাপত্যের পরিকল্পনা ও মূর্ত্তিগঠন-পদ্ধতি উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া, সপ্তম হইতে পঞ্চদশ শতকের মধ্যে, এক অভিনব মন্দিরমূর্ত্তে রূপান্তরিত হয়। ভুবনেশ্বর, কোণার্ক, কন্দর্য্য মহাদেও, উদয়েশ্বর, মহাবলীপুর, পট্টদকল, বিজয়নগর ও সৌরাষ্ট্র প্রদেশীয় দেবায়তনসমূহ এবং মধ্যপ্রদেশীয় জব্বলপুরের অদূরে ভেড়াঘাটে দণ্ডায়মান বলদীপ্তা যোগিনীমূর্ত্তিসহ চৌষট্টী যোগিনীর অপূর্ব্ব মন্দির (দশম শতক) প্রভৃতি তাহার নিদর্শন (৪৫-৪৮ চিত্র)।

গুপ্তযুগেই ভারতীয় স্থাপত্য বৃহত্তর ভারতে অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, কম্বোজ, চম্পা, সুমাত্রা (সুবর্ণদ্বীপ), যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে নীত হয়। ভারতীয় ও তত্তৎস্থানীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের সুসমঞ্জস সমন্বয়ে সেই সকল রাজ্যে মনোহর সুকুমার শিল্পসহ নয়নাভিরাম মন্দিরস্থাপত্য উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছিল।

ইহা হইতে বিবেচিত হয় যে, অষ্টশত বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারত ও বৃহত্তর ভারত ব্যাপিয়া হিন্দুধর্ম্মের বিবিধ শাখার বিচিত্র দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ও চেতনাপ্রসূত—প্রাদেশিক প্রাকৃতিক পরিস্থিতির অনুকূল—বহুবিধ মন্দির-রচনার বিশিষ্ট বিশিষ্ট পদ্ধতির পারম্পরিক অভিব্যক্তি প্রকটিত হইয়াছিল। গুপ্তস্থাপত্য ও গুপ্তসভ্যতা তাহাদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে পহ্লব নরপতিগণের পহ্লব, চোল নরপতিগণের চোল এবং পাণ্ড্য রাজগণের পাণ্ড্যস্থাপত্য রীতি, কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রে চালুক্যস্থাপত্য, বিজয়নগরে বিজয়নগর-স্থাপত্য, মাদুরায় নায়কশৈলী, মহীশূরে হয়শালা-স্থাপত্য, বুন্দেলখণ্ডে চন্দেলস্থাপত্য, গুর্জ্জর ও পশ্চিম রাজস্থানে জৈনস্থাপত্য রীতি, উত্তর ভারত ও কলিঙ্গ প্রদেশে উৎকল-স্থাপত্য রীতি, মধ্য-প্রদেশে মহাকোশল, বঙ্গদেশে পাল ও সেনস্থাপত্য কলা, আসামে আহোমস্থাপত্য ও মধ্যভারতে চেদিস্থাপত্য-শৈলী ক্রমশঃ বিশিষ্টভাবে ও বিশিষ্টরূপে বিকশিত হইল (৪৯-৫১ চিত্র)। হিমালয়ে নেপাল, কাংড়া ও কাশ্মীর উপত্যকায় যে ত্রিবিধ স্থাপত্যশৈলীর অভিনব মন্দিরসমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তাহারাও গুপ্তস্থাপত্যদ্বারা প্রভাবিত (৫২ ও ৫৩ চিত্র)। কাশ্মীরে শঙ্করাচার্য্য (৮০০ খৃঃ) এবং অবন্তীস্বামী (৯০০ খৃঃ)-দেবায়তন দুইটি গুপ্তস্থাপত্যের কাশ্মীর প্রকৃতির অনুকূল অভিব্যক্তি। অবন্তীস্বামীর প্রস্তরময় মন্দিরগাত্রে খোদিত অপরূপ মিথুনফলক গুপ্তভাস্কর্য্যের মহিমা ঘোষিত করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে আসমুদ্রহিমাচলবিস্তারী হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসংস্কৃতি ও হিন্দুর রাষ্ট্রীয় সংহতি একত্রীভূত হইয়াছিল গুপ্ত-শিল্পকলা-পরিপুষ্ট হিন্দুস্থাপত্যে। Percy Brown-প্রণীত *Indian Architecture (Buddhist and Hindu)* নামক সুবৃহৎ সচিত্র গ্রন্থে সমগ্র ভারতের সর্ব্ববিধ স্থাপত্য সুবিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে।

দ্বাদশ শতকে তুর্কীরা ভারত জয় করেন। পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুর বহুমুখী প্রতিভা ও সভ্যতার গতি ভীষণভাবে প্রতিহত হয়। সেই কালে

চিত্রফলক ৩৩



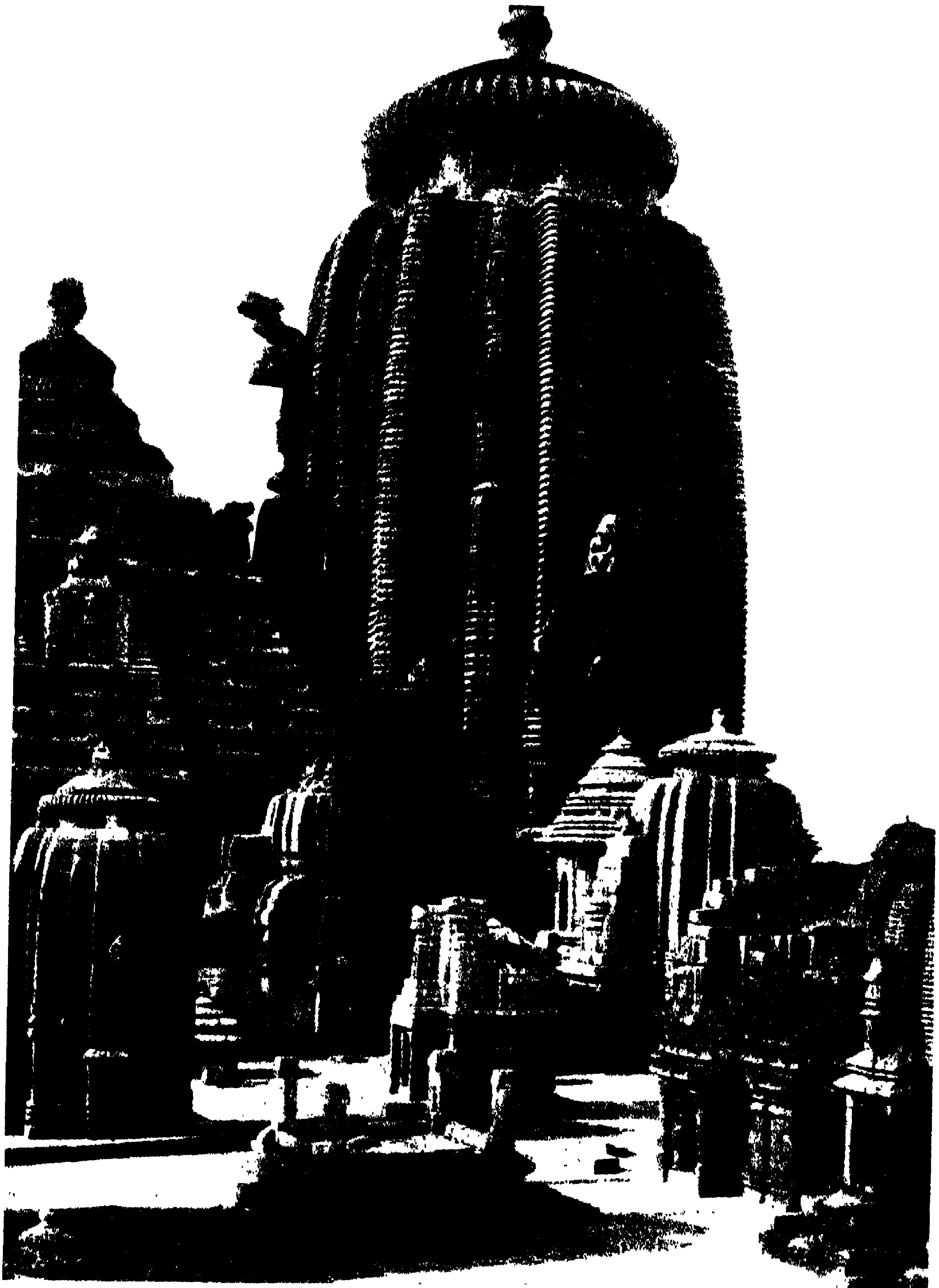
৯৩ চিত্র— যক্ষী, দিদারগঞ্জ

চিত্রফলক ৩৪



৯৪ চিত্র—বুদ্ধ, সারনাথ

চিত্রফলক ৩৫



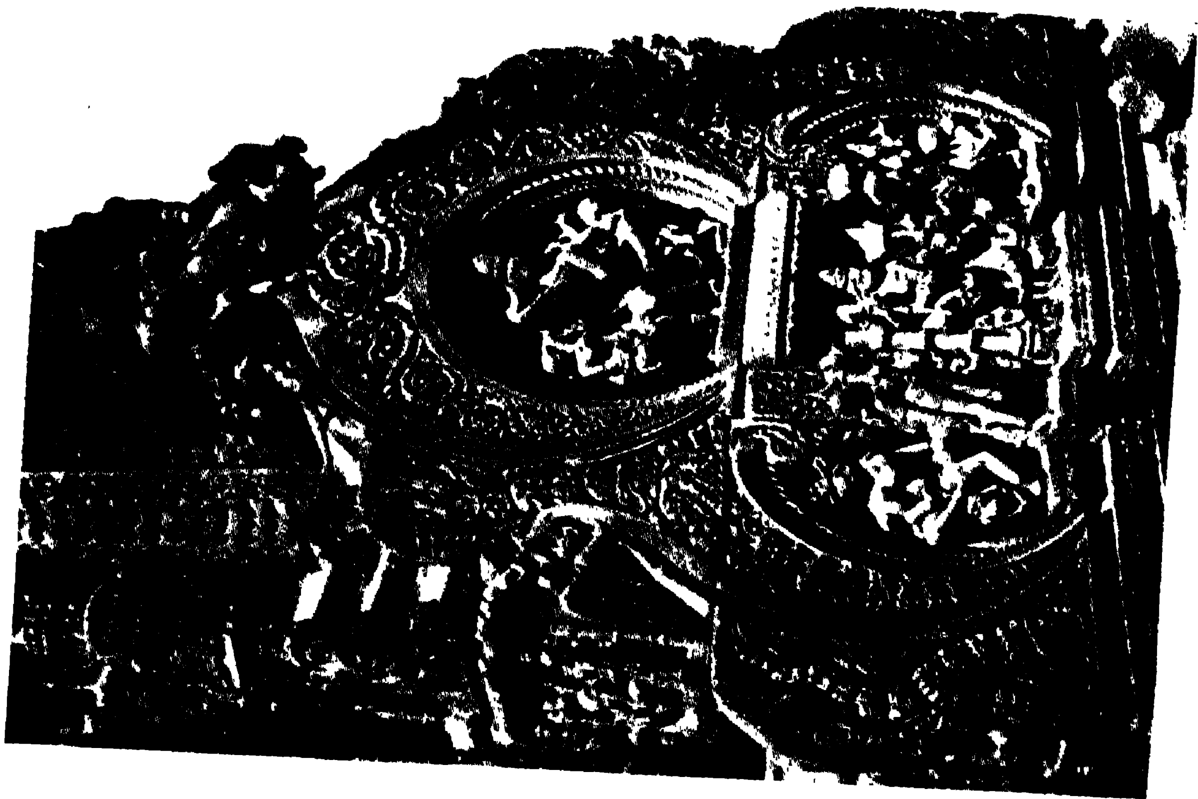
৪৫ চিত্র—লিঙ্গরাজমন্দির, ভুবনেশ্বর

চিত্রফলক ৩৬

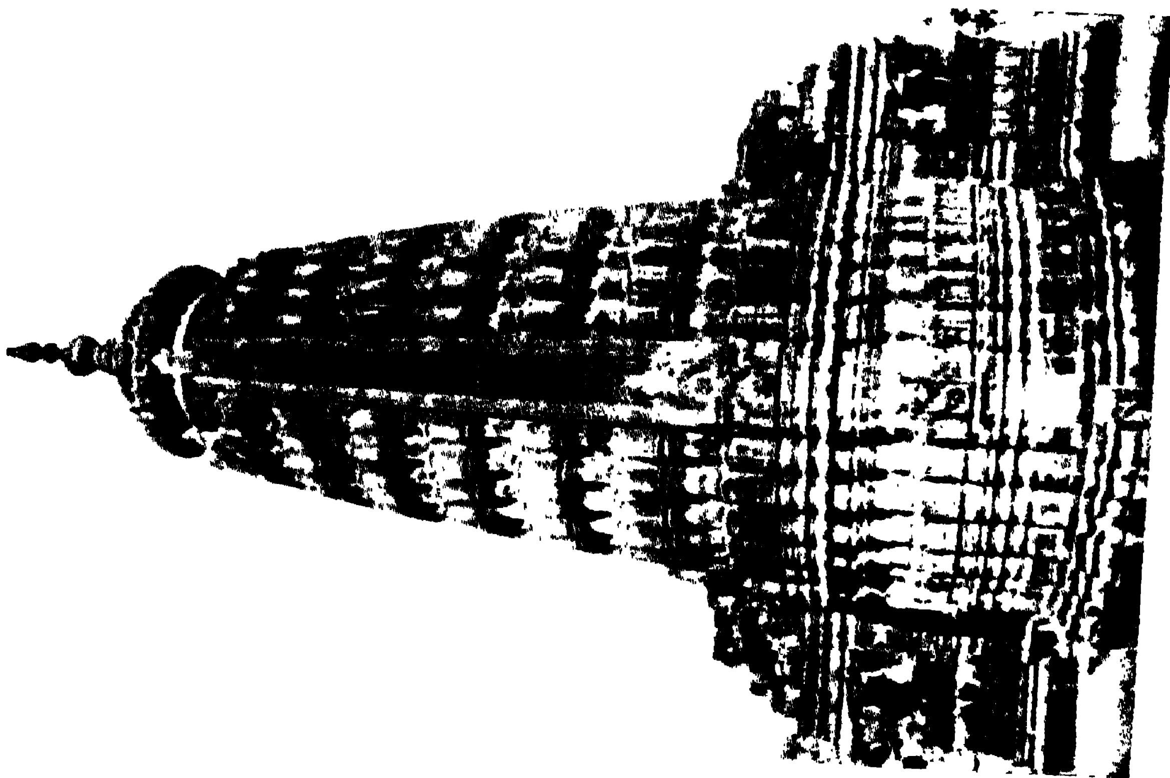


৮৬ চিত্র — কন্দর্যা মন্দির, খাজুরাহো

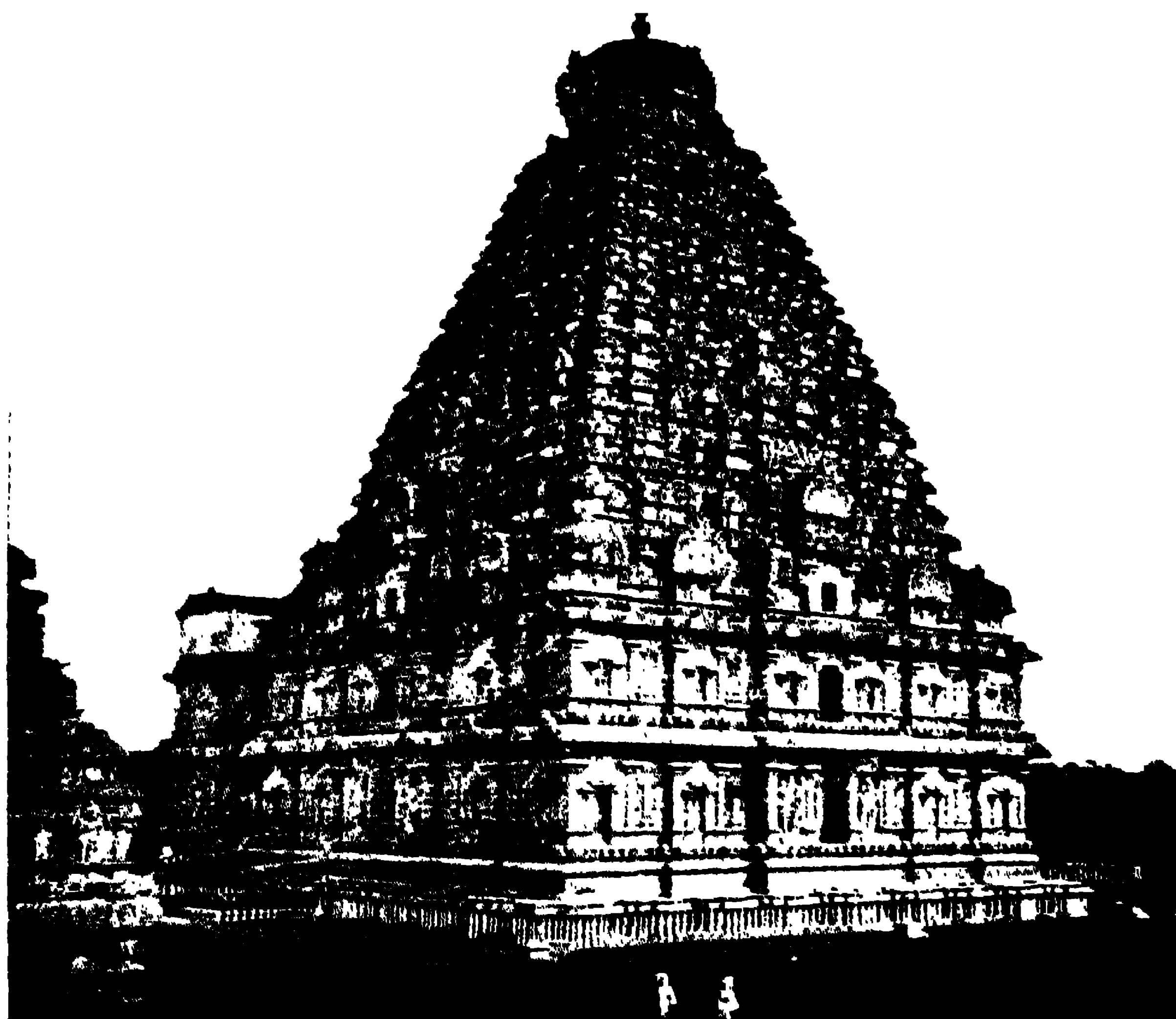
চিত্রফলক ৩৭



৪৮ চিত্র—কারুকার্য (উদয়েশ্বর)

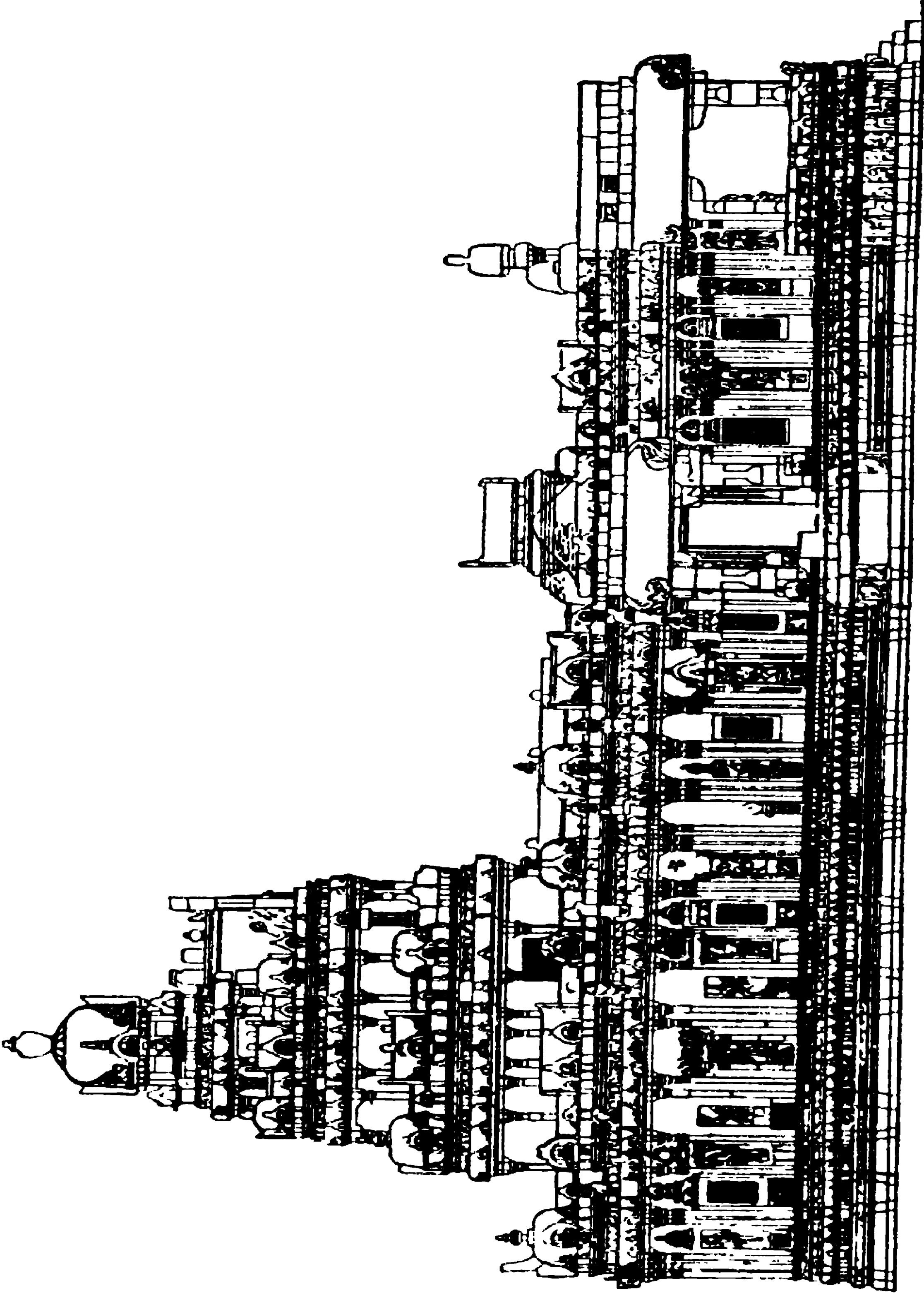


চিত্রফলক ৩৮



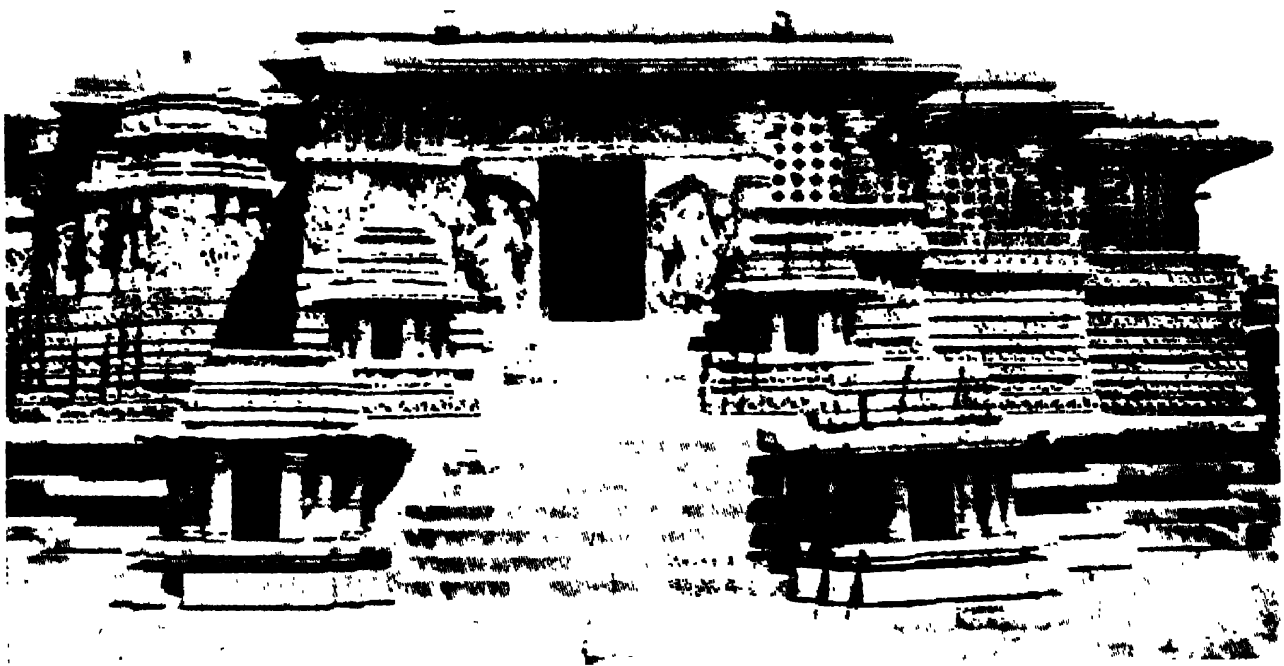
৪৯ চিত্র—বৃহদীশ্বর মন্দির, তাঞ্জোর

চিত্রফলক ৩৯



৪০ চিত্র—বিরূপাক্ষ মন্দির, পট্টদকল

চিত্রফলক ৪০



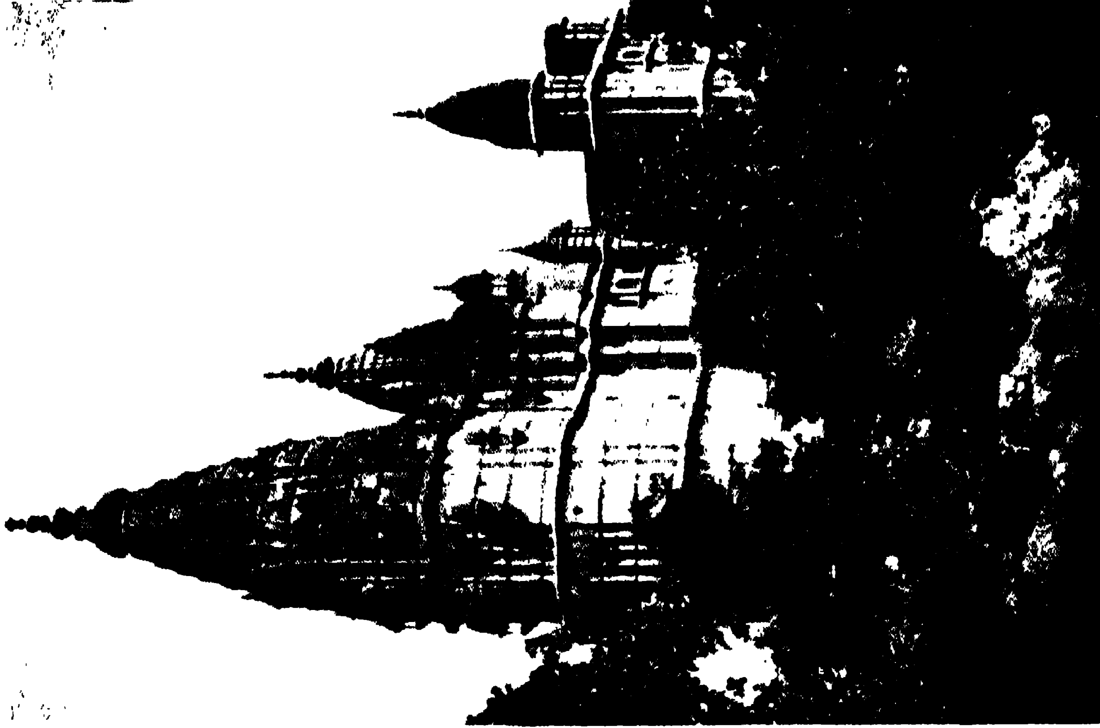
৫. চিত্র— হয়সালেশ্বর মন্দির, হলেবিদ

চিত্রফলক ৪১

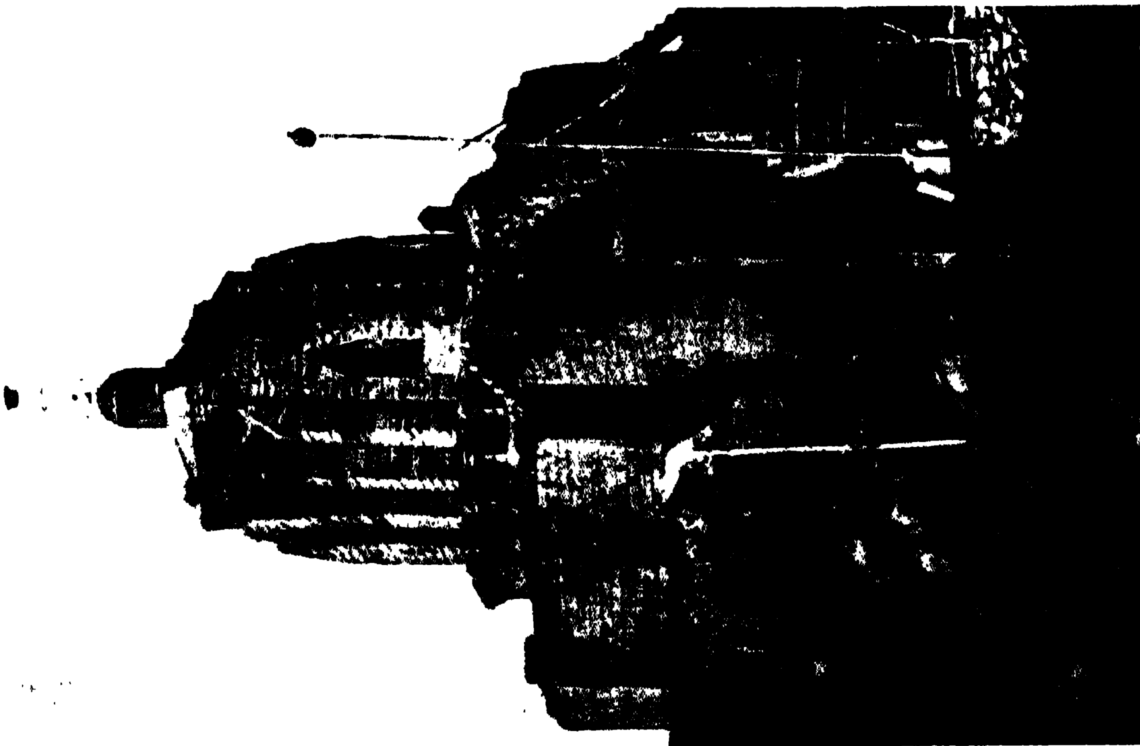


৫২ চিত্র—রাধাকৃষ্ণ ও ভবানী মন্দির, নেপাল

চিত্রফলক ৪২



৫৪ চিত্র—চতুর্ভুজ মন্দির, ওর্চ্ছা



৫৩ চিত্র—শঙ্করাচার্য্য মন্দির, শ্রীনগর

সেই কারণে অধিকসংখ্যক মন্দিরনির্ম্মাণ সম্ভব হয় নাই। অধিকন্তু মুসলমানের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর দেবায়তন বিনষ্ট হইল। কিন্তু যে সকল দেবায়তন দুর্গম মরুকান্তারে, সুদূর প্রান্তরে, অদ্যাপি অক্ষত দেহে পরিদৃশ্যমান—দেশী, বিদেশী শিল্পসমালোচকের নিরপেক্ষ বিচারে তাহারা ভারত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানরূপেই বিবেচিত হইয়াছে। আপৎকালে তাহাদের আশ্রয় লইয়া হিন্দুর ধর্ম্ম ও সমাজ, শাস্ত্র ও মনীষা, অহিন্দুর অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইত। দক্ষিণ ভারতের কোনও মন্দির আক্রান্ত হইলে মন্দিরপ্রাঙ্গণে নাগরিক ও জানপদগণ একত্রীভূত হইয়া বিগ্রহ ও ধর্ম্মকে শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করিতেন। মধ্য ভারতে ঝাঁসির অদূরবর্ত্তী ওর্চ্ছা রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন, চারিশত বৎসরের প্রাচীন, সু-উচ্চ 'চতুর্ভুজ' মন্দির দুর্গনির্ম্মাণের অভূতপূর্ব্ব পদ্ধতি অনুসারে পরিগঠিত (৫৪ চিত্র)। তাহার বৃহদায়তন নাটমন্দিরের (গুপ্তমন্ত্রণাকক্ষের) স্থূল প্রাচীর-গুলি প্রস্তর-নির্ম্মিত, মূর্ত্তি-বিবর্জ্জিত। প্রাচীরের মধ্যে, বহুতল মন্দিরের প্রতি তলে ও শিখরে উঠিবার জন্য তিনপ্রস্থ গুপ্তদ্বারসহ সোপানশ্রেণী বিদ্যমান। মন্দিরের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া সৈন্যগণ আক্রমণকারীদের উপর অস্ত্রনিক্ষেপ করিতেন। সম্ভবতঃ মন্ত্রণাকক্ষের তলদেশে সুড়ঙ্গপথ ছিল। সেই পথে হয়ত মন্দির হইতে, লোক-চক্ষুর অগোচরে, বুন্দেলখণ্ডের পর্ব্বতারণ্যে নিরাপদে গমনাগমন হইত। মগধাধিপতি বিম্বিসারের বিশাল রাজধানী গিরিব্রজের অর্থাৎ রাজগৃহের প্রাসাদে, চিতোর দুর্গের প্রাসাদে এবং আগ্রার প্রাসাদতলেও উক্তপ্রকার সুড়ঙ্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। আলাউদ্দীনের কবল হইতে ধর্ম্মরক্ষা করিতে বহুশত রাজপুতরমণীসহ মেবারমহিষী পদ্মিনী প্রাসাদতলে সুড়ঙ্গমধ্যস্থ অনলকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ভবানীদেবীর নিরালা মন্দিরে এবং পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের দুর্গম অরণ্যের প্রচ্ছন্ন দেবায়তনে ছত্রপতি শিবাজীর রণ-মন্ত্রণা পরিচালিত হইত। কর্ণেল মেডোজ টেলর তদীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস 'তারা' গ্রন্থে মারাঠী রণ-মন্ত্রণা কিরূপে পরিচালিত হইত, তাহা সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দিরের ১৬০' উচ্চ গোপুরমের শীর্ষদেশ হইতে সেনাপতিগণ শত্রুসৈন্যের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

গুপ্ত-দ্রাবিড় মন্দির-স্থাপত্য

খৃঃ পূঃ 'চৈত্যপ্রাসাদ' ও 'প্রাসাদ-মন্দির' দক্ষিণ ভারতে 'বিমান' নামে আখ্যাত হইত। বহুতল বিমান-মন্দিরের আকৃতি হইত রথের মত। মহাবলীপুরমের পঞ্চসংখ্যক রথ-মন্দির এবং কোণার্ক ও মুধেরার প্রসিদ্ধ সূর্য্যমন্দিরদ্বয়, প্রধানতঃ দ্রাবিড়ী রথাকৃতি বিমান-মন্দিরের আদর্শে গঠিত (৫৫ ও ৫৬ চিত্র)। উভয় মন্দিরের উপরিভাগ ধ্বংস হইয়াছে—অবশিষ্ট আছে তাহাদের নিম্নাংশ এবং মুখমণ্ডপ অর্থাৎ ভদ্রদেউল। সপ্তম শতকে পহ্লবরাজ রাজসিংহ মাদ্রাজ প্রদেশে সমুদ্রতীরে, মহাবলীপুরে, প্রস্তরের সর্ব্বপ্রথম রথ-মন্দির, উত্তর-ভারতীয় নাগর (রেখ) অর্থাৎ গুপ্তস্থাপত্যের আদর্শে নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন (৫৭ চিত্র)। কিন্তু সেই রথ-মন্দির স্থানীয় অর্থাৎ মদ্রদেশীয় বিমান-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির অনুযায়ী নির্ম্মিত হয়। তদ্দারা, অর্থাৎ গুপ্ত-নাগর-মন্দিরের পাষাণ-স্থাপত্য-রীতির এবং দ্রাবিড়ের দারুময় সৌধ-নির্ম্মাণ-পদ্ধতির সমন্বয়ে, নাগর-দ্রাবিড় তথা গুপ্ত-পহ্লব স্থাপত্য-শৈলীর উদ্ভব হইয়াছিল। সেইরূপ গুপ্ত-দ্রাবিড় মন্দির-স্থাপত্যের নিদর্শন দাক্ষিণাত্যে বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যমান আছে। অজন্টা, এলোরা, এলিফান্টা, পাণ্ডুলেনা ও কাহ্নেরীর চৈত্য, মন্দির ও বিহার এবং বিজয়নগরের বিঠলস্বামী মন্দির গুপ্ত-দ্রাবিড়-স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ (৫৮-৬১ চিত্র)। ৬৪২ খৃঃ পহ্লবরাজ নরসিংহবর্ম্মন চালুক্যরাজ পুলকেশীকে পরাজিত করিয়া তাঁহার স্থপতি ও ভাস্করগণকে বাদামি, অজন্টা এবং এলোরা হইতে মহাবলীপুরে লইয়া যান। অতঃপর চালুক্যপতি বিক্রমাদিত্য কাঞ্চীর যুদ্ধে পহ্লবরাজকে পরাভূত করিয়া উক্ত শিল্পিগণের শিষ্যপ্রশিষ্যসমূহকে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরাজ্যে লইয়া যান। তাঁহারাই পট্টদকলের বিরূপাক্ষ (৭৪০ খৃঃ) এবং বিরূপাক্ষ মন্দিরের আদর্শে এলোরার অতুলনীয় কৈলাস (অষ্টম শতক) মন্দিরের স্রষ্টা। অজন্টা ও এলোরা ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-স্থাপত্যে গুপ্তশিল্পের প্রভাব ছিল প্রভূত পরিমাণে। সিংহল দ্বীপে পোলোন্নারুয়া (দ্বাদশ শতক) মন্দিরেও গুপ্ত-দ্রাবিড়-স্থাপত্য প্রতিফলিত হইয়াছে (৬২ চিত্র)।

চিত্রফলক ৪৩

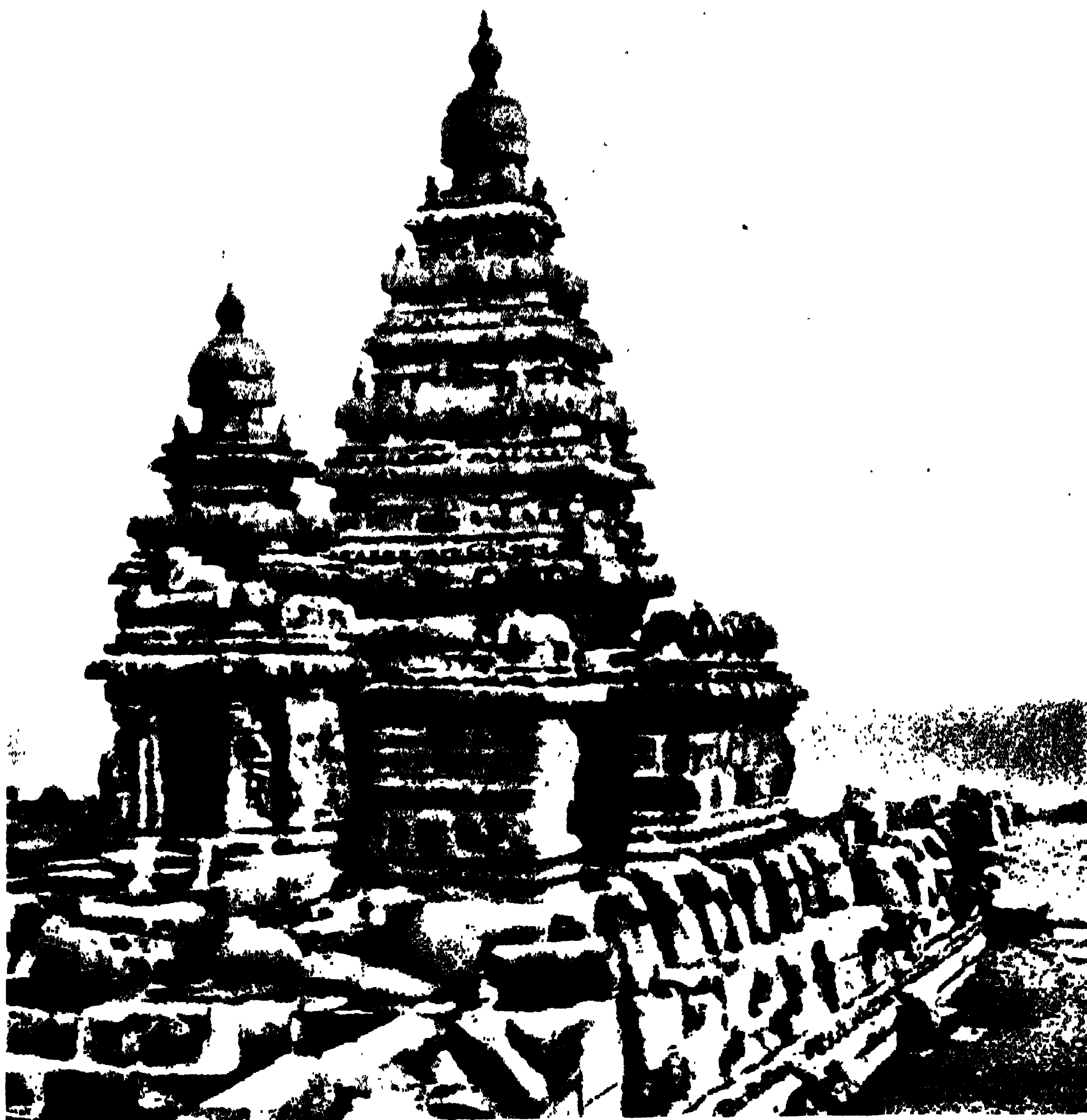


৫৫ চিত্র— সূর্যমন্দির, কোণার্ক



৫৬ চিত্র—সূর্যমন্দির, মুধেরা

চিত্রফলক ৪৪



৫৭ চিত্র— রথমন্দির, মহাবলীপুর

চিত্রফলক ৪৫

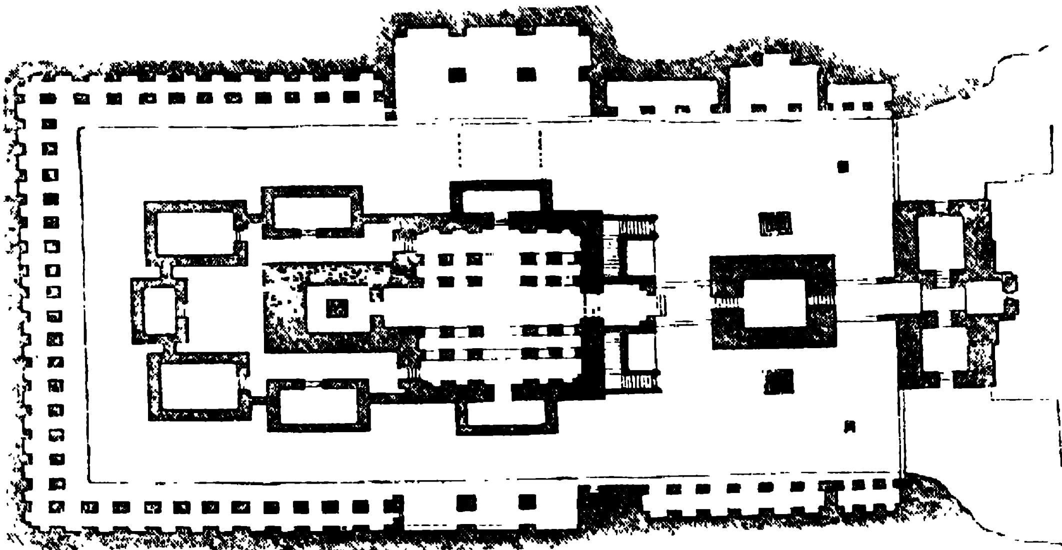


৫৮ চিত্র—১৯নং গুহাচৈত্য, অজণ্টা

চিত্রফলক ৪৬

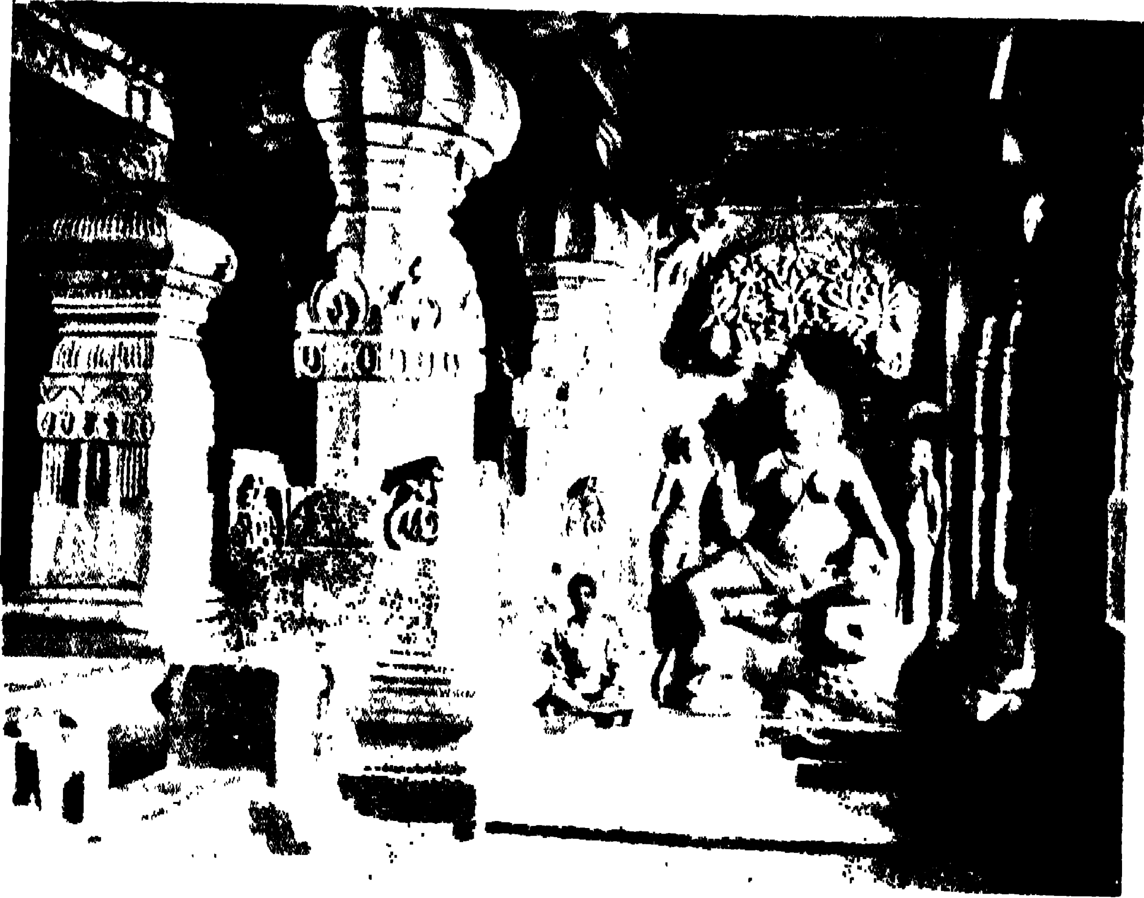


৩২৩ চিত্র—কৈলাস মন্দির, এলোরা



৪ চিত্র—কৈলাস মন্দির, বিন্যাসচিত্র, এলোরা

চিত্রফলক ৪৭



৬০ চিত্র—ইন্দ্রসভা জৈনগুহা, এলোরা



৬১ চিত্র—বিট্ঠলস্বামী মন্দিরের অঙ্গন, বিজয়নগর

চিত্রফলক ৪৮



৬২ চিত্র—পোলোন্নারুয়া মন্দির, সিংহল

গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগের হিন্দুস্থানে প্রতি সমাজপতি ও প্রতি মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতার পক্ষে মন্দির হইয়াছিল সকল সৎকর্ম্মের উৎস। মধ্যযুগে মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গ্রাম ও নগরীর বিন্যাস। গ্রাম ও নগরের মধ্যমণি দেবায়তনের পবিত্র সিংহাসনে মাল্যভূষিত, চন্দনচর্চ্চিত পৌরদেবতা বিরাজ করিতেন। গ্রাম ও নগরের আবেষ্টনী পথ ও রাজপথ মন্দিরপ্রাঙ্গণে যথাক্রমে পরিক্রমা সরণি ও মঙ্গল বীথিতে পরিণত হয়। গ্রামীয় ও নগরীয় পৌরসভাগৃহের আদর্শেই জগমোহন মণ্ডপ সৃষ্ট। পরম্পরাগত নগর-নির্ম্মাণ-বিধানানুসারে পুরীধামের পুরুষোত্তম, সোমনাথ, শত্রুঞ্জয় পালিটানা, শ্রীরঙ্গম এবং সুন্দরেশ্বর-মীনাক্ষী প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ মন্দিরসমূহের সুপ্রশস্ত সীমানা অর্থাৎ সুবৃহৎ অন্তর্ভাগ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সমচতুর্ভুজ অথবা সমান্তরাল, সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত। বহুতল তোরণসহ সু-উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত প্রতি অন্তর্ভাগে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, প্রহরী, পরিজন, উদ্যানপালক, মালাকার, কুম্ভকার, তৈলক প্রভৃতির তথা মন্দিরের মহাস্থপতি, মহাতক্ষক, কারুবিদ্ ও শিল্পী প্রভৃতির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পল্লী ব্যতীত তাঁহাদের আপন আপন আবাসগৃহ, সাধারণ শস্যশালা, পণ্যশালা, ভাণ্ডারবাটিকা ও পণ্যবীথিকা প্রতিষ্ঠিত। ফলবৃক্ষ ও পুষ্প-কুঞ্জ-শোভিত প্রশস্ত দেবোদ্যানে ফলিত জ্যোতিষ ও শিল্পশাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী বিবিধ দেবদেবী এবং তাঁহাদের বাহন, আদিত্য, দিক্‌পাল ও দ্বারপালগণের অবস্থানের নিমিত্ত প্রাকার-তোরণ-বেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবগৃহ ইতস্ততঃ বিন্যস্ত। ত্রিচিনপল্লীর পার্শ্বস্থিত শ্রীরঙ্গম্ মন্দির-নগরী এবম্বিধ দেবনগর বিন্যাসের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ (৬৩ চিত্র)। যজ্ঞশালা-কেন্দ্রী বৈদিক মহাগ্রামের আদর্শে (১৩ চিত্র) দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরকেন্দ্রী নগর ও পল্লীগ্রাম পরিগঠিত হইত। বৈদিক গ্রামের তোরণ ও বেষ্টনী মন্দির-নগরী শ্রীরঙ্গমের আকাশচুম্বী গোপুরম ও সু-উচ্চ প্রাকারে পরিণত হইয়াছিল।

দেবায়তন-সংলগ্ন সহস্রস্তম্ভ সভামণ্ডপ—মুনিঋষি-অধ্যুষিত সহস্রপাদপপূর্ণ আশ্রম-কাননের অনুরূপ। পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার উত্তরভাগে শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যাকীর্ণ 'কালাহান্দি' রাজ্যের রাজধানী 'ভবানী পাটনা'য় অবস্থিত মহারাজ প্রতাপকেশরী দেও বাহাদুরের বিরাট্ প্রাসাদসংলগ্ন কুলদেবী মাণিকেশ্বরী মন্দিরের বিশাল মণ্ডপ স্থানীয় অরণ্যানীর প্রেরণায় পরিকল্পিত। প্রসারিত মণ্ডপের ইষ্টকের স্তম্ভাবলী

দাণ্ডীতে অথবা পদব্রজে আসিতেন। দ্বিতল, ত্রিতল ধর্ম্মশালায় এবং সারিবদ্ধ পর্ণকুটীরে তাঁহারা অবস্থান করিতেন। মন্দিরের বিবিধ 'আপণে' (বিপণী) স্বদেশ ও বিদেশজাত শিল্প ও পণ্যদ্রব্য বিক্রীত হইত (৬৪-৬৮ চিত্র): তিব্বতী চামর, তক্ষশিলার শিলাজতু, কাশ্মীরী কুঙ্কুম, মলয় ও বিন্ধ্যগিরির বনৌষধি, মহীশূরী ও ত্রিবাঙ্কুরী চন্দনকাষ্ঠ ও গজদন্ত-খোদিত সুকুমার কারুকলা, ভারত সমুদ্রের মুক্তা, সিংহলের প্রবাল, অঙ্গরাগের উপাদান পুষ্পরেণু; স্নানান্তে ধূপধূম্রে কেশকলাপ ও চন্দনে অঙ্গ সুরভিত করিবার উপাদান ধূপ ও অগুরু; অনুলেপন ও তিলকমণ্ডনের জন্য নেপালজাত কালীয়ক (মৃগনাভি); রমণীর ওষ্ঠপুটে লেপনের জন্য মধু. কুঙ্কুম এবং মোমমিশ্রিত প্রলেপ; রমণীর কপোল শোভিত করার নিমিত্ত মনঃশিলাচূর্ণসহ দ্রব হরিতাল-মিশ্রিত বিবিধ টিপ; লবঙ্গফুলের ও কেতকীর নির্য্যাস, অলক্তক ও ইঙ্গুল; সৈন্যাধ্যক্ষের ব্যবহর্ত্তব্য লৌহবর্ম্ম, শিরস্ত্রাণ ও চর্ম্মপাদুকা; নালীক (বন্দুক); তুরঙ্গ এবং রণকুঞ্জরের ব্যবহার্য্য বর্ম্ম ও আভরণ প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যসামগ্রী ভারতের নানা প্রদেশের শিল্প তথা পণ্য প্রদর্শনীতে সুসজ্জিত থাকিত। কোথাও সজ্জিত হইত স্বর্ণখচিত চীনাংশুক, পশুলোমের কম্বল, বীকানীরী উষ্ট্রলোমের শীতবস্ত্র; কোথাও বৃক্ষত্বকের বল্কল, ক্ষৌমবস্ত্র, কার্পাস ও পট্টবস্ত্র, অমরাবতীর খদ্দর, দোপাট্টা (উড়ানি); কোথাও বারাণসীর চেলি, শ্রীনগরের শাল, পূর্ব্ববঙ্গের সূক্ষ্মতম মলমল (মসলিন), মাদুরা, মাহীষ্মতী ও কৌশাম্বীর রেশমী শাড়ি, ঘাঘরা, অঙ্গরক্ষণী ও কঞ্চুলিকা (কাঁচুলি) প্রভৃতি; বিক্রমশিলার শিল্পশালায় উৎপন্ন মণি-পান্না-হীরক-খচিত স্বর্ণালঙ্কার; ব্রাহ্মণললনার প্রাণপ্রিয় ফুলের, শোলার ও তালপত্রের গহনা; রাজোয়ারা কুমারীর বিবাহসজ্জা—কুসুম্বী (শাড়ি), লেহঙ্গা (ঘাঘরা) ও চোলী (কাঁচুলি); কোথাও বা কাশীধামের পিত্তল ও কাংস্য-নির্ম্মিত গৃহস্থালী তৈজস, জয়পুরী শ্বেতপ্রস্তরের ভোজনপাত্র, নালন্দার ধাতুশিল্প, বঙ্গদেশীয় মৃৎশিল্প এবং অষ্টধাতুর ও কষ্টিপাথরের ভাস্কর্য্য, ব্রোঞ্জ-ধাতুর 'নিবেদন স্তূপ'; কোথাও বা পাটন (নেপাল) ও যশল্মীরের ধাতুময় ভাস্কর্য্য ও হরিদ্রাভ প্রস্তরের সুচিক্কণ মূর্ত্তি, রাজস্থানী অথবা কাংড়া অঞ্চলীয় চিত্রশিল্পীর সুনিপুণ-তুলিকা-রঞ্জিত বিবিধ বর্ণোজ্জ্বল বিচিত্র চিত্রাবলী; কোথাও বা মখমলের আসন, সাঁচ্চা জরীর অথবা স্বর্ণাভ সূচীশিল্পখচিত রেশমী শয্যা-

দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা

চিত্রফলক ৪৯



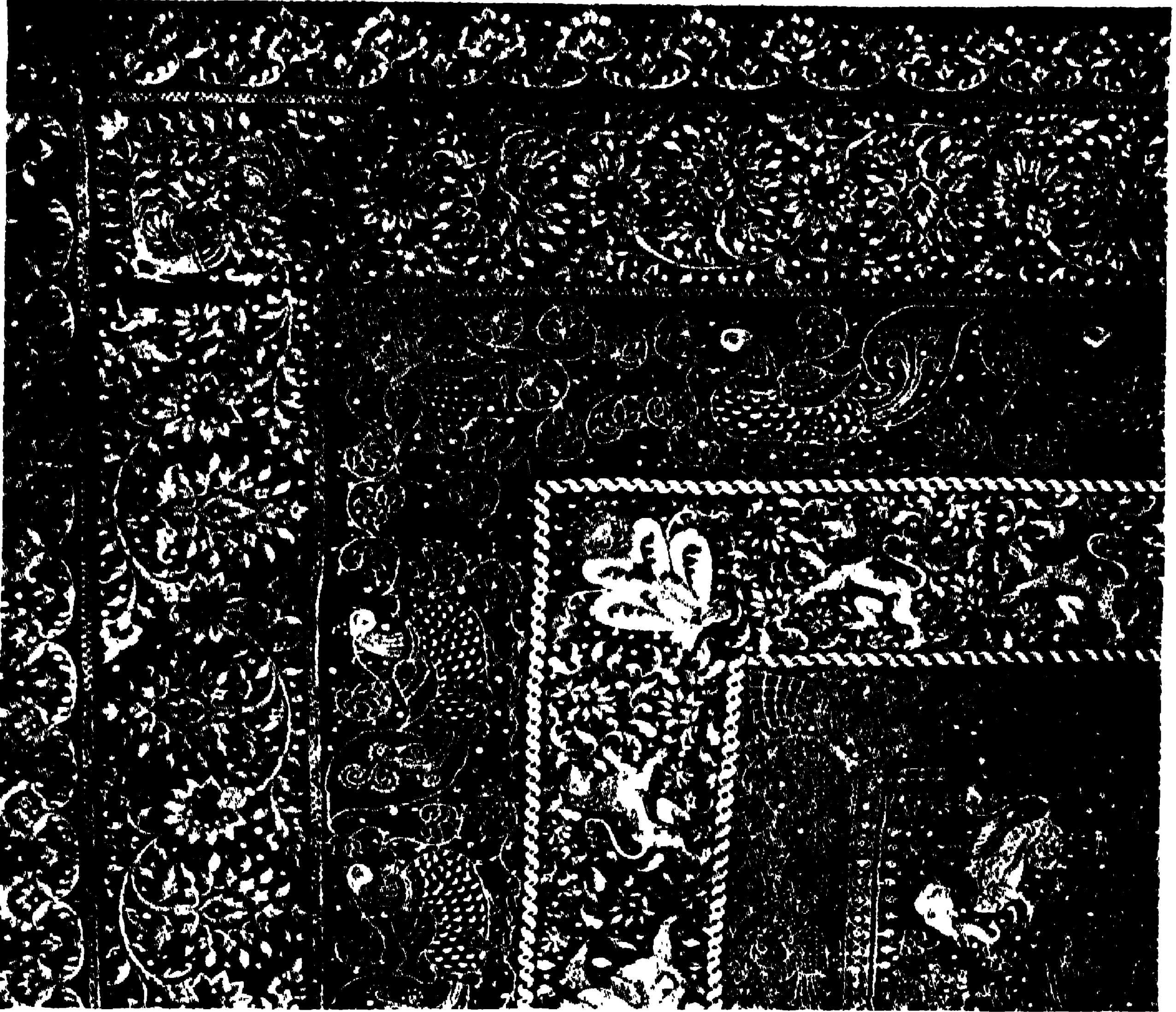
৬১ চিত্র—ত্রিচিনপল্লীর দেশ

চিত্রফলক ৫০



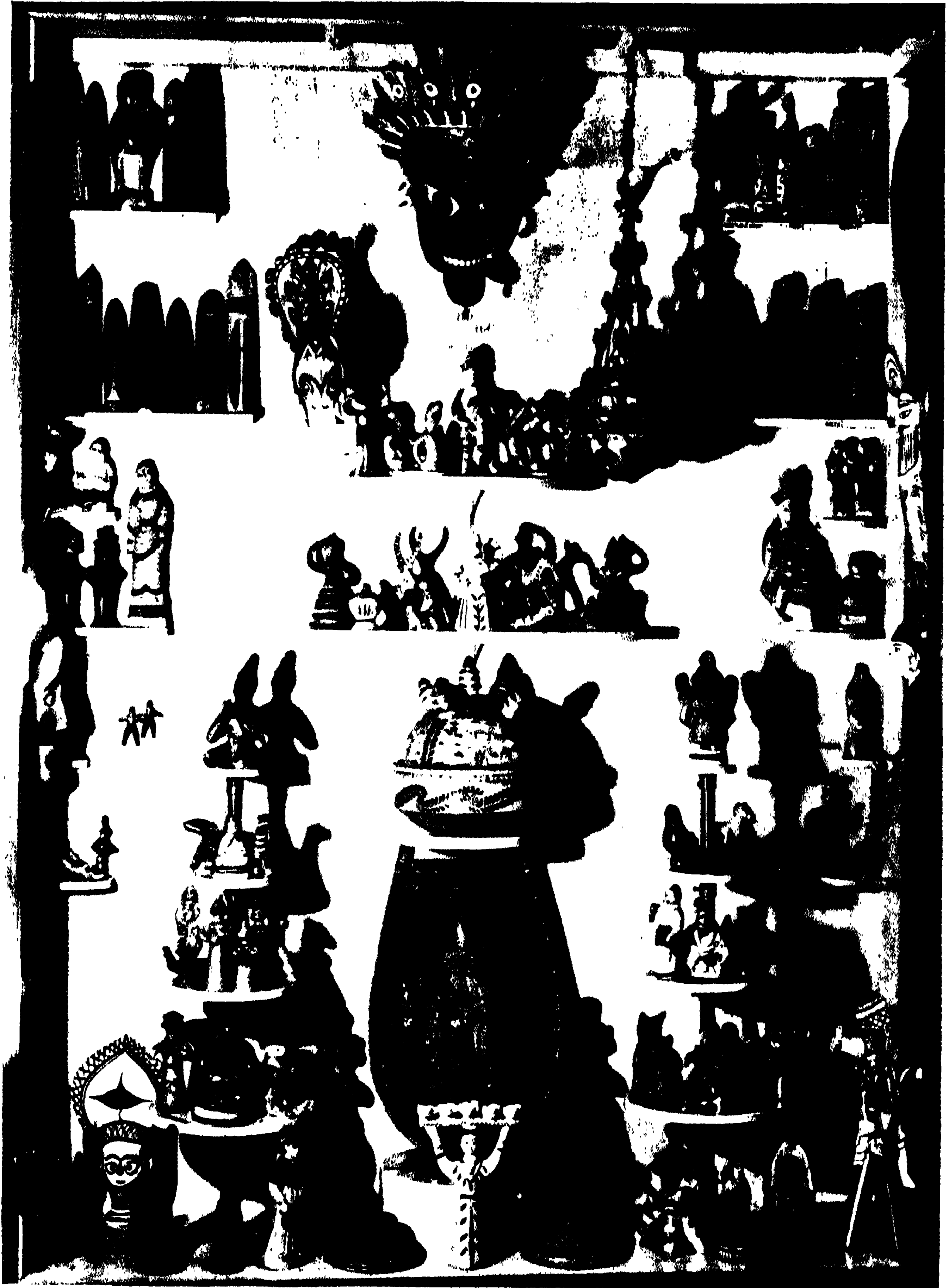
৬৪ চিত্র—তক্ষণশিল্প, মহীশূর

চিত্রফলক ৫১



৬৫ চিত্র — সূচীশিল্প, কাশ্মীর

চিত্রফলক ৫২



৬৬ চিত্র—সুকুমার শিল্প, পশ্চিমবঙ্গ

চিত্রফলক ৫৩



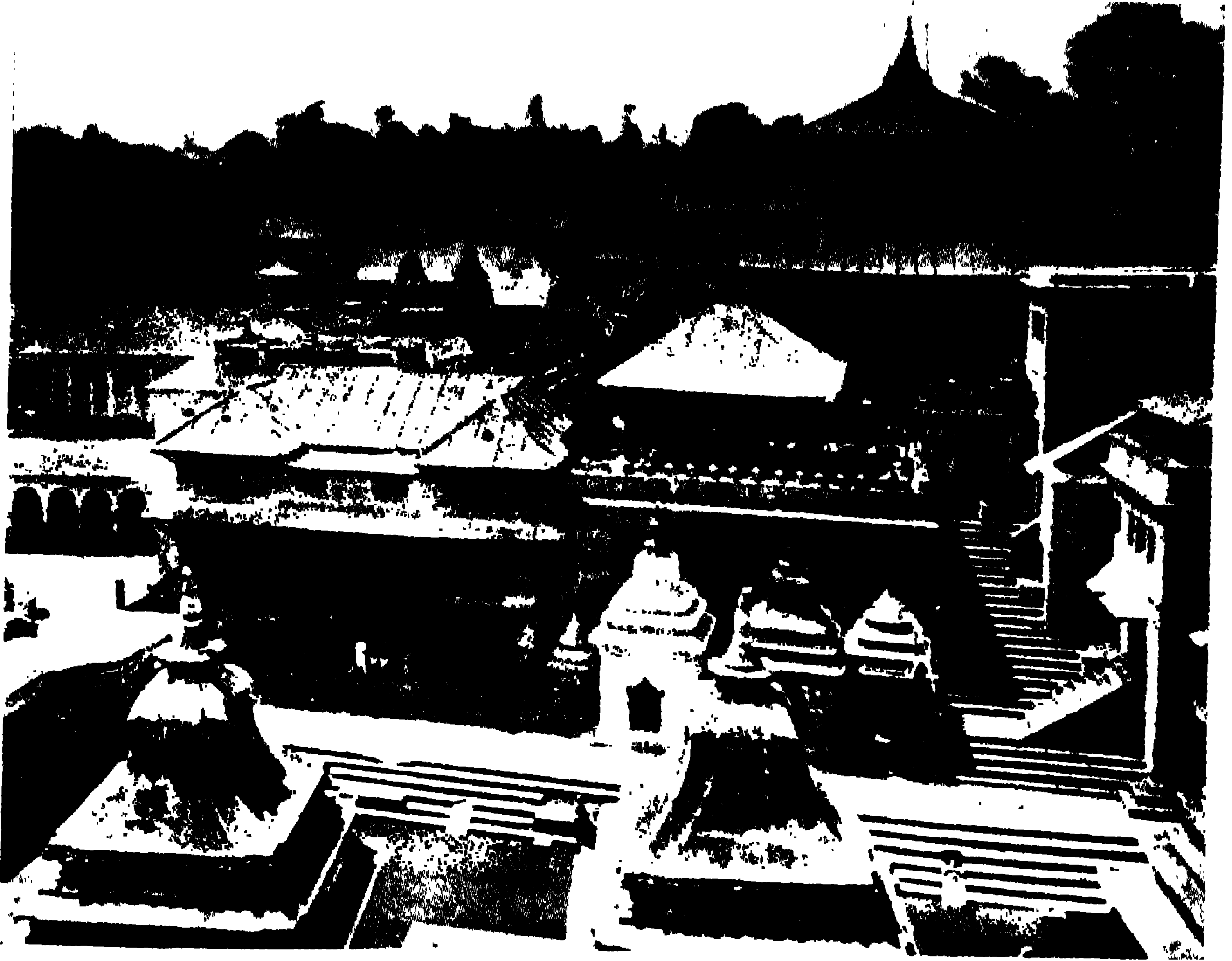
৬৭ চিত্র—দারুময় শিল্প, ত্রিপুরা

চিত্রফলক ৫৪



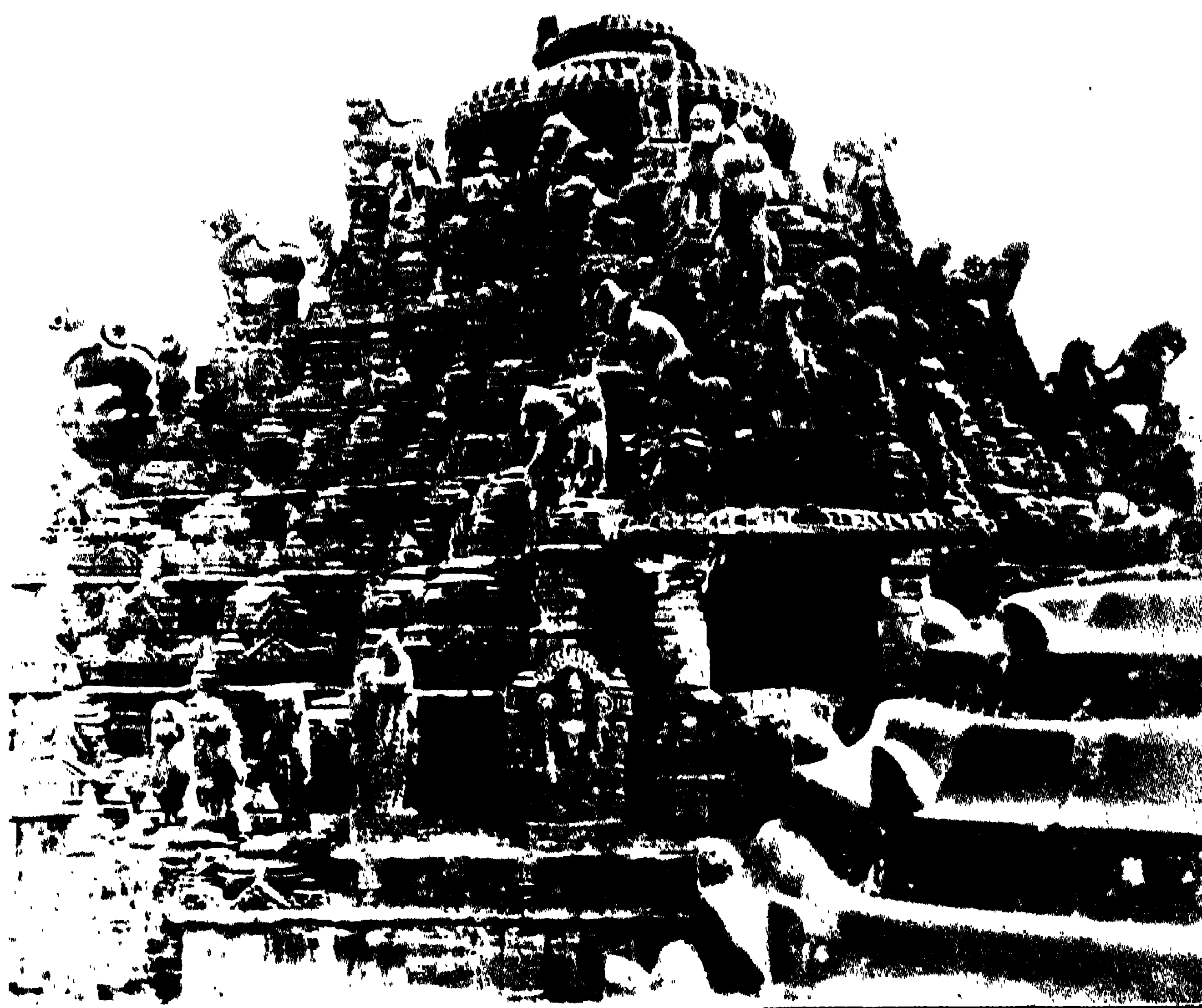
৬৮ চিত্র—সরস্বতী, পশ্চিমবঙ্গ

চিত্রফলক ৫৫



৬০ চিত্র—পশুপতিনাথ মন্দির, নেপাল

চিত্রফলক ৫৬



৭০ চিত্র—শান্তিনাথ মন্দির, যশল্মীর

বস্ত্র ও অঙ্গাভরণ ; কৌবেরচ্ছন্দ (মুক্তার কণ্ঠমালা), কিরীট, কুণ্ডল, কেয়ুর, কঙ্কণ, কঙ্কণী, কৌস্তুভরত্ন, যূথিকাবন্ধ, সপ্তলহর হার, কড়িহার, চন্দ্রহার, সূর্য্যহার, নূপুর, চরণচূড় ও তরঙ্গক প্রভৃতি অলঙ্কার ; কনক, তাম্র ও পিত্তলের দর্পণ,[৮] হস্তিদন্তের সুখাসন (শীতল পাটি)। প্রাচীন ও মধ্যভারতীয় শিল্পজাত এবম্বিধ শত শত রূপদ্রব্য, দেবায়তনের ক্রোড়ে, নরপতি ও যাত্রী জনগণের পৃষ্ঠপোষকতায়, তাহাদের প্রবর্দ্ধমান পুষ্টি অর্জ্জন করিত। শিল্প ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের এতাদৃশ সহজ পদ্ধতি ব্রিটিশ শাসিত ভারতে, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। বারাণসীর বিশ্বনাথ মন্দিরাশ্রিত সংস্কৃতশিক্ষায়তন ও কচুরীগলির বিবিধ পসরাসম্ভারী বিচিত্র বিপণীশ্রেণী, গয়াক্ষেত্রে বিষ্ণুপাদমন্দিরসংলগ্ন সুকুমার শিল্পশালা, নেপালের পশুপতিক্ষেত্র, উজ্জয়িনীর মহাকালক্ষেত্র, যশল্মীরে শান্তিনাথমন্দির, মেবারে নাথদ্বার, শ্রবণবেলগোলায় জৈন সাহিত্যভাণ্ডার, পুরীধামের গোবর্দ্ধন শিক্ষায়তন, বিষ্ণুপুরের মদনমোহন এবং দিনাজপুরের কান্তমন্দির বিবিধ যুগের বিচিত্র সংস্কৃতি-প্রসূত—বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিস্থিতিসঞ্জাত—নাগরিক জীবনের বৈশিষ্ট্য প্রকটিত করে এবং ভারতবাসীর শিল্পানুরাগ ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান কিরূপ গভীর ছিল, অপিচ পাশ্চাত্য-প্রভাবিত বর্ত্তমান ভারতীয় জীবনধারা কোন্ পথে প্রবাহিত হইতেছে তাহার পরিচয় প্রদান করে (৬৯ ও ৭০ চিত্র)।

দক্ষিণ ভারতে মুসলমানের আধিপত্য প্রবল ছিল না। সেই হেতু দাক্ষিণাত্যের হিন্দু রাজগণ বহুকাল পর্য্যন্ত জাতীয় কৃষ্টি ও শিল্পের মর্য্যাদা অনাহত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই হেতু দ্রাবিড় দেশে দেবায়তনের প্রসারিত পক্ষপুটে আচ্ছাদিত গ্রাম ও নগরের পৌরজীবন, নীড়মধ্যস্থ শুকশাবকের মত নিরাপদে শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ তীর্থসমূহ পর্য্যটনকালে, দ্রাবিড়-দক্ষিণের ভাষা, আহার ও আচারগত পার্থক্যজনিত বহুবিধ অসুবিধা ভোগসত্ত্বেও, মন্দিরকেন্দ্রী

---

[৮] মোহেন্-জো-দড়ো খননকালে তাম্রদর্পণ, স্বর্ণরৌপ্যের কেয়ূর, কঙ্কণ, কুণ্ডল, সপ্তলহর হার, কাচের বক্ষোভূষণ, প্রস্তরখচিত (জড়োয়া) অলঙ্কার ও স্ফটিকের কণ্ঠমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে (৭১ চিত্র)।

নগরের ধর্ম্মময় নাগরিক-জীবনের স্বচ্ছন্দ-সরল-সাবলীল গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া দর্শক অভিভূত, অনুপ্রাণিত হইবেন। দেবায়তনের বিশাল মণ্ডপে দণ্ডায়মান থাকিবার কালে পুঞ্জীভূত স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের প্রবল আকর্ষণে তিনি আত্মবিস্মৃত হইবেন। গৌরবময় পূর্ব্বপুরুষের অনাবিল জীবন-প্রবাহের উজ্জ্বল সচল আলেখ্য তাঁহার মানসমুকুরে অহরহঃ প্রতিবিম্বিত হইবে।

দেবায়তনকে অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ভারতে মহাবিত্থালয়ের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার। ইন্দোরের অদূরবর্ত্তী ধারা নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ সরস্বতী মন্দিরের অন্তর্গত সংস্কৃত বিত্থালয় একদা শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল (৭১ চিত্র)। দূরদেশ হইতে সেখানে ছাত্রগণ আসিতেন শাস্ত্র ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য। তাঁহাদের শিক্ষার সুবিধার নিমিত্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহপ্রাচীরে অষ্টাধ্যায়ী পাণিনির সারভাগ উৎকীর্ণ ছিল। দূরদেশ হইতে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতমণ্ডলী মন্দিরের পণ্ডিতসভাতে, সাহিত্য ও ধর্ম্মসম্মেলনে, শাস্ত্রবিচারের জন্য অথবা সমাগত পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিতে আসিতেন। প্রজ্ঞা, বেদমতী, বিশাখা, সুলভা, উভয়ভারতী, লক্ষ্মীঙ্করা প্রভৃতি বিদুষী মহিলাগণ তর্কবিচারে যোগদান করিতেন। মৈত্রেয়ী ও গার্গী দার্শনিক বিচারসভায় সভানেত্রীর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মবাদিনী" বৈদিক কন্যা বিশ্ববারা কেবলমাত্র অগ্নির ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেন নাই, স্বয়ং ঋত্বিক্‌রূপে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন।

এইরূপ মহাসম্মেলনের অধিবেশন প্রায়শঃ এক হইতে তিন সপ্তাহকাল অনুষ্ঠিত হইত, একাদিক্রমে। এহেন বিচারসভায় পাণিনি, কাত্যায়ন, বররুচি ও কালিদাস শ্রেষ্ঠ সম্মান অর্জ্জন করেন। এহেন সভায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য বিজয়মাল্যে ভূষিত হইয়াছিলেন। নির্ব্বিকার-নির্ব্বিশেষ-অদ্বৈতবাদী, মায়াবাদী, বেদান্ত-ভাষ্য-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ শঙ্কর তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অপরাজেয় বাগ্মিতাপূর্ণ যুক্তিতর্ক ও অনুভূতির মাধ্যমে, মাধ্যমিক বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যবাদের প্রতিপ্রভাব হইতে, উপনিষদের ব্রহ্মবাদকে রক্ষা এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে গৌরব গরিমার উচ্চ সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এহেন সভায় মহারাণা প্রতাপসিংহের প্রসিদ্ধ চারণ রাঠোরকুলতিলক পৃথ্বীরাজ সমগ্র রাজস্থানের চারণ-কবি সম্মেলনে জয়মাল্যে

অভিনন্দিত হয়েন। প্রাচান যুগে রাজসভা অপেক্ষা দেবায়তন-প্রাঙ্গণ অথবা তৎসংলগ্ন শিক্ষায়তনের বৃহৎ সভামণ্ডপ গভীরতর শাস্ত্রালোচনা এবং কাব্য-প্রতিযোগিতার জন্য অধিকতর উপযোগী ছিল। প্রাচীন ভারতে তক্ষশিলা, বারাণসী, অমরাবতী, উজ্জয়িনী, তাঞ্জোর, পত্তন, মথুরা, নালন্দা, পাহাড়পুর ও ধারানগরীর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত, স্থাপত্য-চিত্র-আলিম্পন-মণ্ডনশোভিত, বিশালকায় বিচারমণ্ডপ-সমূহের আয়তন ও আকৃতি কিরূপ হইত তাহা মধ্যযুগীয় বিজয়নগরে বিঠলস্বামী মন্দিরের মনোহর মণ্ডপ অথবা মাদুরার সুন্দরেশ্বর মন্দিরসংলগ্ন স্বর্ণকমল সরোবর-পার্শ্বস্থ চিত্রমণ্ডপ-দর্শনে অনুমিত করা যায়। প্রতিষ্ঠানের বহুতল বিদ্যায়তনসমূহের অনুকৃতি মহাবলীপুরের রথাকৃতি দেবায়তনে দ্রষ্টব্য। দেড়শত-হস্ত উচ্চ সুবর্ণকিরীট-শোভিত নালন্দা মহাবিহারের বিচিত্র স্তম্ভপূর্ণ মহামণ্ডপের বিস্ময়প্রদ কারুকার্য্য এবং উজ্জ্বল রামধনুবর্ণের তৈলচিত্ররঞ্জিত অভ্যন্তরভাগের বর্ণনাপ্রসঙ্গে খৃঃ সপ্তম শতকে হুয়েন সঙ্ লিখিয়াছেন—"... pillars ornamented with dragons, beams resplendent with all the colours of the rainbow, rafters richly carved, columns ornamented with jade painted red and richly chiselled ... " খৃঃ পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন্ নালন্দায় একটি ছয়তল মন্দিরমধ্যে বৃহৎ একটি তাম্রমূর্ত্তি (মহাকাল ?) লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

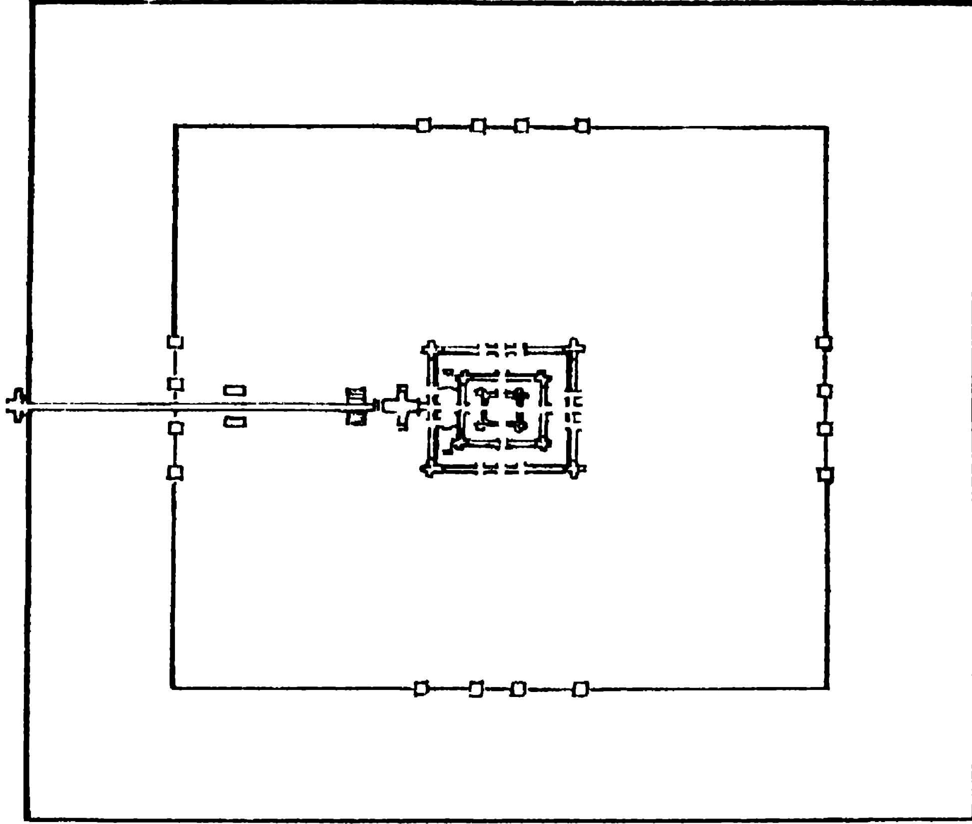
নিয়তির কুটিল বিধানে বেদ-উপনিষদ্ যুগের গুরুকুল ও ঋষিকুলের সমতুল আশ্রম-শিক্ষায়তনের গৌরবরবি অস্তমিত হইলে, বিদ্যাদেবী গ্রামীয় ও নগরীয় পণ্ডিতের চতুষ্পাঠীতে ও টোলে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে খ্রীষ্ট-জন্মের প্রথম সহস্রবৎসরব্যাপী যে সুসমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ পল্লী ও নগরীয় সভ্যতা ও সংহতি বিরাজমান, প্রবর্দ্ধমান ছিল, তাহার শ্রেষ্ঠ শক্তিকেন্দ্র হইয়াছিল ওই অনন্ত-অম্বর-চুম্বী পাষাণমন্দিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। মধ্যযুগীয় হিন্দুস্থানে ও বৃহত্তর ভারতে ওই দেবায়তনই সৃজিয়াছিল জ্ঞান-প্রজ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার শান্তিনিকেতন। দেবায়তন রাজা-প্রজা, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সর্ব্বজনসাধারণকে সম্মোহিত এবং আকৃষ্ট করিয়াছিল। দেবদেউল নিরক্ষর জনগণের অনাবিল ধর্ম্মজীবনের আধ্যাত্মিক সুখশান্তির, অপরিসীম আনন্দের, গোমুখীনির্গত ভাগীরথীধারার অমৃতময় সঙ্গীত-

প্রবাহস্বরূপ হইয়াছিল। অন্তর ও আত্মার শক্তি ও তৃপ্তিসম্পাদনে দেবস্থানের অবদান অপরিমেয়। সন্ধ্যার আগমনে কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া, শিল্পী যন্ত্রপাতি ছাড়িয়া, মধুর রামলীলা শ্রবণ করিতে দেবায়তন-প্রাঙ্গণে সমবেত হইতেন। হরিকথা-, ভগবদ্গীতা- ও পুরাণ-পাঠ দেবায়তনের নিত্যনৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছিল।

সুদূর কম্বোজ রাজ্যের 'আঙ্কর ভাট' (খৃঃ দ্বাদশ শতক) বিষ্ণুসূর্য্যমন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিমালা ঘোষণা করিতেছে যে, দৈনন্দিন রামায়ণ- ও মহাভারত-পাঠের ব্যবস্থা কম্বোজেও প্রচলিত ছিল। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, দার্শনিক পণ্ডিত এবং কিন্নরকণ্ঠ কথকঠাকুর, সবল কল্পনা ও প্রাঞ্জল বর্ণনাশক্তি-সম্পাতে, ইতিহাস ও পুরাণের কাহিনী সাধারণের মানসপটে চলন্ত ছায়াচিত্রের প্রাণবন্ত আকারে ফুটাইয়া তুলিতেন; এইরূপে, একাধারে সাহিত্য ও ধর্ম্মোপদেশের অমৃতধারা তাঁহাদের পান করাইতেন। ভাস্কর মন্দিরের ভিত্তি ও স্তম্ভগাত্রে রামায়ণ ও পুরাণের কাহিনী, সুগভীর ধ্যান এবং অপূর্ব্ব বিন্যাসশক্তির সমন্বয়ে উৎকীর্ণ করিয়া কথকঠাকুরের শাস্ত্রপাঠের, মূর্ত্ত টীকা জনসমক্ষে উদ্ঘাটিত করিতেন, সুদীর্ঘ কালের জন্য (৭২-৭৪ চিত্র)। অহরহঃ দৃশ্যমান ভাস্কর্য্যের অনুপ্রেরণায় দর্শকের চিত্ত স্বীয় অজ্ঞাতসারে শ্রেষ্ঠ শিল্পকলায় শিক্ষালাভ করিত। দৃঢ় ও সবল, সুকুমার ও অলঙ্কারময়, সুরুচিসঙ্গত সুষ্ঠু শিল্পের সম্মোহন তদীয় কল্পনাশক্তিকে উর্ব্বর এবং অন্তর্দৃষ্টিকে প্রখর করিত। শিল্পের পরিবেশে অবস্থানজনিত ক্ষেমর শিল্পীর মূর্ত্তিগঠন ও চিত্রাঙ্কনস্পৃহা, যোগসাধন-শক্তি উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইত।

কম্বোজের দেড়শত-হস্ত উচ্চ শিখরশৈলী-শোভিত বিষ্ণুসূর্য্যমন্দির আঙ্কর ভাটের প্রথম স্তরের (তলের) চতুর্দ্দিকে রামায়ণ-কাহিনী এবং মহাভারতীয় ও পৌরাণিক যুগের সামাজিক জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী প্রস্তরফলকে উদ্গত। দ্বিতীয় স্তরে জ্ঞানের ভাণ্ডার—পুঁথিপত্র ও শিলালেখসহ বিশাল গ্রন্থাগারসমূহ। প্রশস্ত সোপান সাহায্যে তৃতীয় স্তরের সমতল চত্বরে আরোহণ করিলে সচ্চিদানন্দ সূর্য্যনারায়ণের শাশ্বত দেবায়তন দৃশ্যমান হয়। দেবতাদর্শনাভিলাষী সাধকের চিত্ত, কর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তর হইতে তৃতীয় স্তরে উচ্চতম ভক্তিমার্গে

চিত্রফলক ৫৭

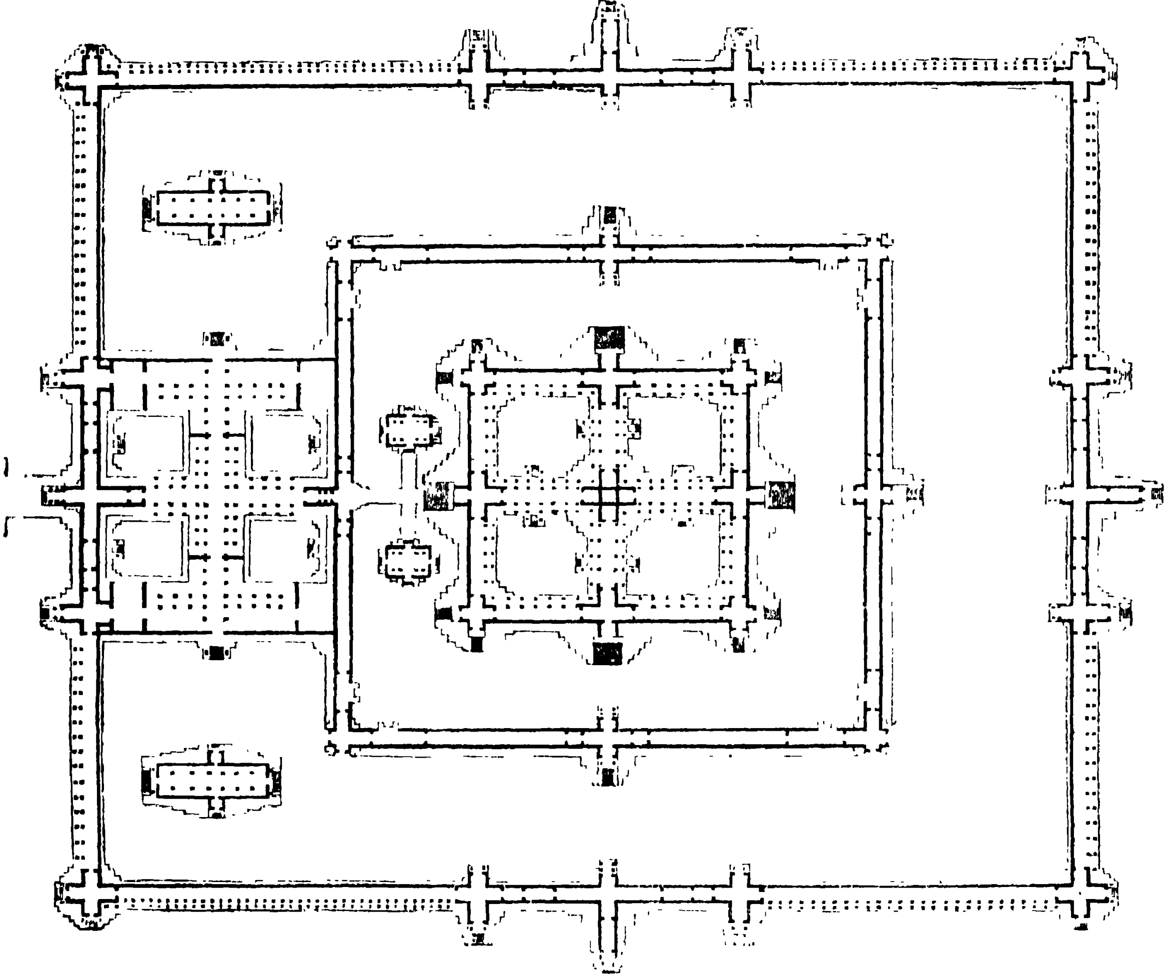


৭২ চিত্র আঙ্কোরভাট সীমানাবিন্যাস



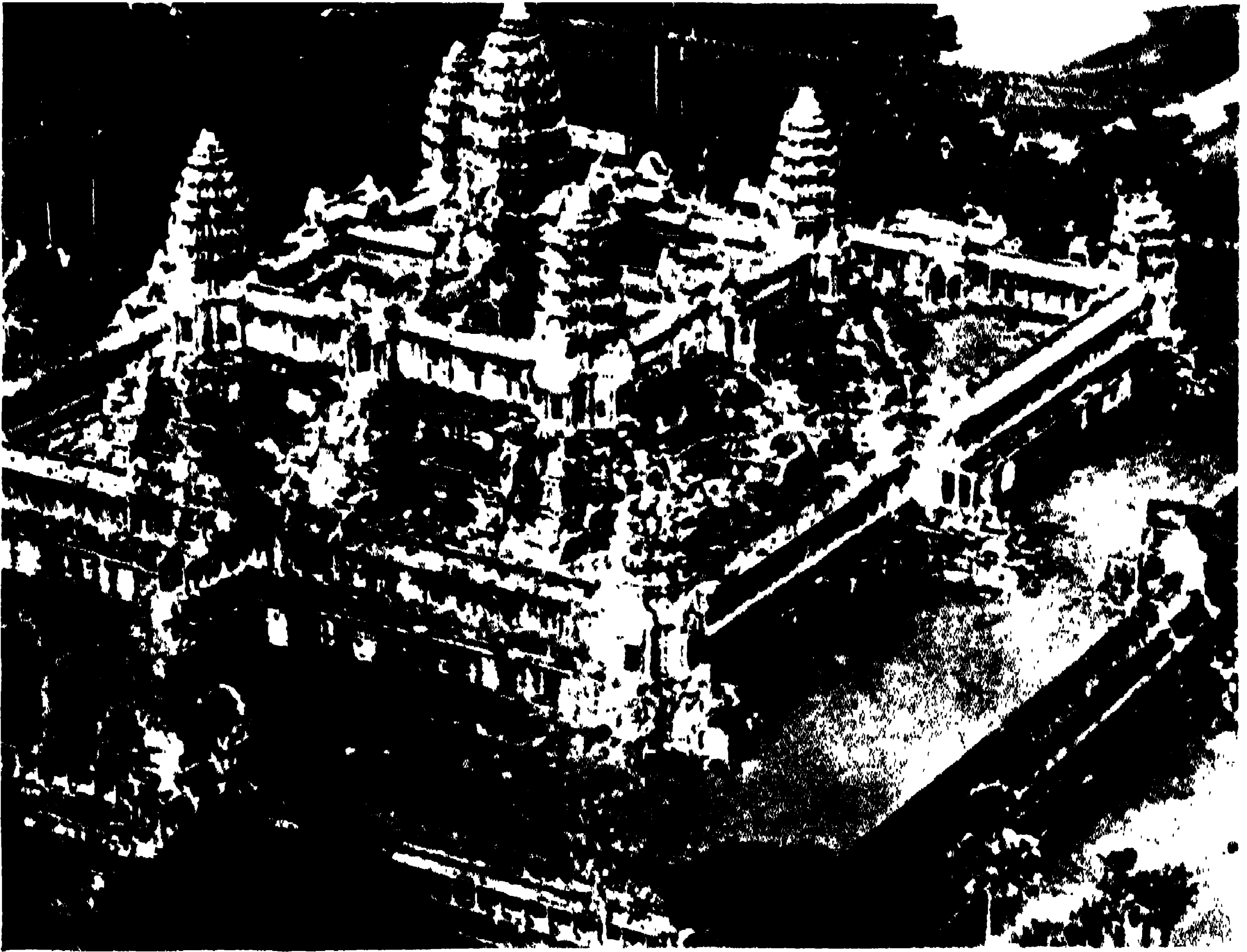
৭৩ চিত্র—সরস্বতী, বাঁকুড়া

চিত্রফলক ৫৮



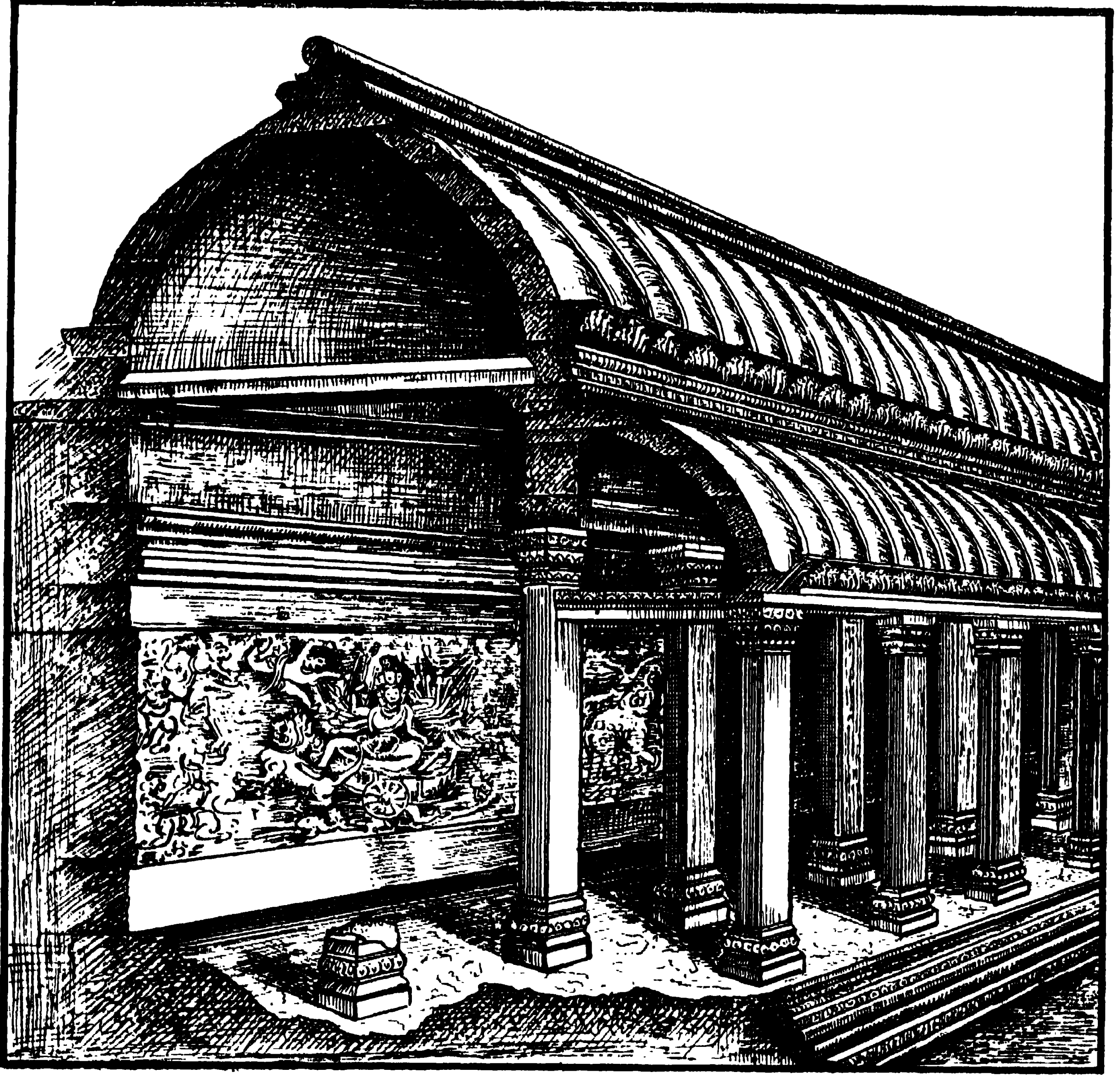
৭২ক চিত্র—আঙ্করভাট মন্দিরবিন্যাস

চিত্রফলক ৫৯



৭২খ চিত্র—বিষ্ণুপদা মন্দির, আঙ্করভাট, কম্বোজ

চিত্রফলক ৬০



৭৩ চিত্র— প্রথমচত্বর বেষ্টনীর ছেদিতাংশ, আঙ্করভাট

চিত্রফলক ৬১



৭৩ক চিত্র—সমুদ্রমন্থন, আঙ্করভাট

চিত্রফলক ৬২



৭৪ চিত্র—বিষ্ণুনটরাজ, পশ্চিমবঙ্গ

উন্নীত হইয়া, অনন্ত ভগবৎপ্রেমে সমাধিস্থ হয়। তাঁহার অতীন্দ্রিয় শিল্পানুভূতি তদীয় অন্তরাত্মাকে আনন্দধামে মোক্ষালোকে বিলীন করিয়া দেয়—যথায় সত্য শিব সুন্দর সতত বিরাজমান, প্রতিনিয়ত বিকাশমান।

সৌরমণ্ডলস্রষ্টা সূর্য্যনারায়ণ, সৃজনশীল নটরাজ ও দেবায়তনের রহস্য

সৌরজগৎস্রষ্টা, সর্ব্বসৃষ্টিপালনকর্ত্তা, সূর্য্যনারায়ণের উদাত্ত ভঙ্গিমা সাধক হিন্দু শিল্পীর মানসমুকুরে সতত প্রতিবিম্বিত। নারায়ণের ঈষৎ-প্রস্ফুটিত-পদ্মকোরক-সমতুল সুবর্ণমুকুটে হীরক (ক্ষিতি), মরকত (অপ্), পদ্মরাগ (তেজ), নীলকান্ত (মরুৎ) ও মতি (ব্যোম)-খচিত পঞ্চরত্ন—অন্তহীন নভোমণ্ডলে দ্যুতিমান্ নক্ষত্র-রাজির প্রতীক। মহান্ যে ঐশী শক্তি সৃজিয়াছিল সৌরপ্রকৃতির পরম সত্তা, সূর্য্যনারায়ণের হেমমুকুটে তাহার ভাস্বর জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়াছে। ত্রিভুবন-নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা শিবমহেশ্বর—বিষ্ণুসূর্য্যের তথা সূর্য্যনারায়ণের রূপান্তরমাত্র। ধ্যানগম্ভীর মহেশ্বরের বিরাট্ ত্রিমূর্ত্তি বোম্বাই উপকূলে, 'এলিফাণ্টা' উপদ্বীপে, গভীর, রহস্যময়, 'শিবপুরা' গুহামন্দিরের বিস্ময় মাঝারে বিরাজমান (৭৫ চিত্র)। ত্রিমূর্ত্তির মহিমা নীলাম্বু জলধি সগর্ব্বে ঘোষণা করিতেছে অম্বর ভেদিয়া সহস্রবর্ষ ব্যাপিয়া।

অতি প্রত্যূষে অস্ফুট আলোকে আধ-উদ্ভাসিত মাদুরা মহানগরীর বক্ষোপরি সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষী মন্দিরের অতুলনীয় শোভা বর্ণনার অতীত (৭৬-৭৭ চিত্র)। সু-উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত বিপুল মন্দিরের প্রস্তরময় 'গোপুরম্' অর্থাৎ শতহস্ত উচ্চ প্রবেশতোরণ, শত শত মূর্ত্তিপূর্ণ। তৎপরে বহুবিধ দেবায়তন-সমন্বিত বিশাল প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের ব্যাপক বিস্তৃতি দর্শকের দৃষ্টিকে প্রসারিত, চিত্তকে উদ্বেলিত করে। অদূরে সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপের স্তম্ভাবলীর অরণ্যানী। আলোক-আঁধারের তরঙ্গপ্লাবিত মহান্ স্থাপত্যের মৌন ঘোষণা মহামানবের মর্ম্মমাঝারে পরাপ্রকৃতির গভীর রহস্যের গোপনবার্ত্তা প্রতিধ্বনিত করে। সেই আধ-আঁধার আধ-আলোকের অন্তরালে—পরিপূর্ণ আনন্দের দ্যোতক, অপস্মার পুরুষোপরি নৃত্যশীল নটরাজ। জন্ম ও মৃত্যুর,

সুখ ও দুঃখের, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির, মিলন ও বিচ্ছেদের, সৃষ্টি ও সংহারের তালে তালে তাঁহার সৃষ্টিলয়ের মোহন নৃত্যের নিবিড় স্পন্দন, তাঁহার ভৈরবসঙ্গীত-রাগনিঃসৃত উদাত্ত তানতরঙ্গ—সৌরজগতে ও মানবচিত্তে ছন্দিত, মন্দ্রিত হইতেছে (৭৮ চিত্র)।

অনাদি অনন্ত কাল হইতে সৌরসৃষ্টি-বিচ্ছুরিত যে অখণ্ড জ্যোতির্ময়, অপ্রমেয় তেজোময়, তড়িৎ-তরঙ্গলহরী বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া অহরহঃ হিল্লোলিত হইতেছে—গ্রহ-উপগ্রহ-জ্যোতিষ্কপুঞ্জের অবিরাম আবর্তনপ্রসূত যে ওঁকার নাদ অনন্ত আকাশে সবিতৃমণ্ডলে ক্রান্তিপথে প্রতিনিয়ত অনুরণিত হইতেছে—যে চৈতন্যশক্তি মহামানবের মানসমুকুরে অসীম আনন্দময় অপরিসীম মঙ্গলময় ভূমার পরিকল্পনা প্রতিফলিত করিতেছে, তাহাদের পরিপূর্ণ বিকাশ, সৎ-চিৎ-আনন্দের শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তি, সতত প্রতিভাত ওই স্পন্দনশীল নটরাজের সৃষ্টিলয়ের সৌরনৃত্যে।[১]

গ্রীক্ দার্শনিক পিথোগোরস্ ধ্যানযোগে প্রণিধান করিতেন—আবর্তনকারী গ্রহ-উপগ্রহ-নক্ষত্রগণ ব্যোমসংঘর্ষে একপ্রকার একতান সঙ্গীত উৎপাদিত করে যাহা (ওঁকার নাদ) অনাদি, অনন্ত।

পূজার উপকরণ এবং বিবিধ শিল্পপূর্ণ বিচিত্র বিপণীশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, বিক্রীয়মান পুষ্পরাশির ও কস্তুরির স্নিগ্ধ সৌরভে অভিভূত দর্শক, বিগ্রহ দর্শনমানসে গর্ভগৃহাভিমুখে অগ্রসরকালে, অনবদ্য-শিল্পসুষমা-মণ্ডিত, সারিবদ্ধ-প্রস্তরস্তম্ভ-শোভিত অলিন্দসমূহ অতিক্রমান্তে, বিপুল পিত্তলময় দীপবৃক্ষে সন্নিবদ্ধ এবং সারি সারি দণ্ডায়মানা ধাতব দীপলক্ষ্মীর যুগ্মহস্তে সুরক্ষিত শত শত ঘৃতপ্রদীপের বিমল আলোকে আলোকিত অপিচ প্রজ্বলিত কর্পূর ও ধূপশলাকা হইতে উত্থিত সুগন্ধ ধূম্রপুঞ্জে আবৃত, বিশাল জগমোহনে অবতীর্ণ হয়েন। এই মণ্ডপের স্তম্ভে স্তম্ভে বিস্ময়প্রদ সুন্দরভাবে খোদিত অগণিত উদ্গত দেবদেবীর প্রমাণাকার প্রতিমা। কোনও স্তম্ভে সংহারশক্তির প্রতীক শবোপরি নৃত্যরতা চামুণ্ডা; কোথাও বা তদ্রূপ সংহার-

---

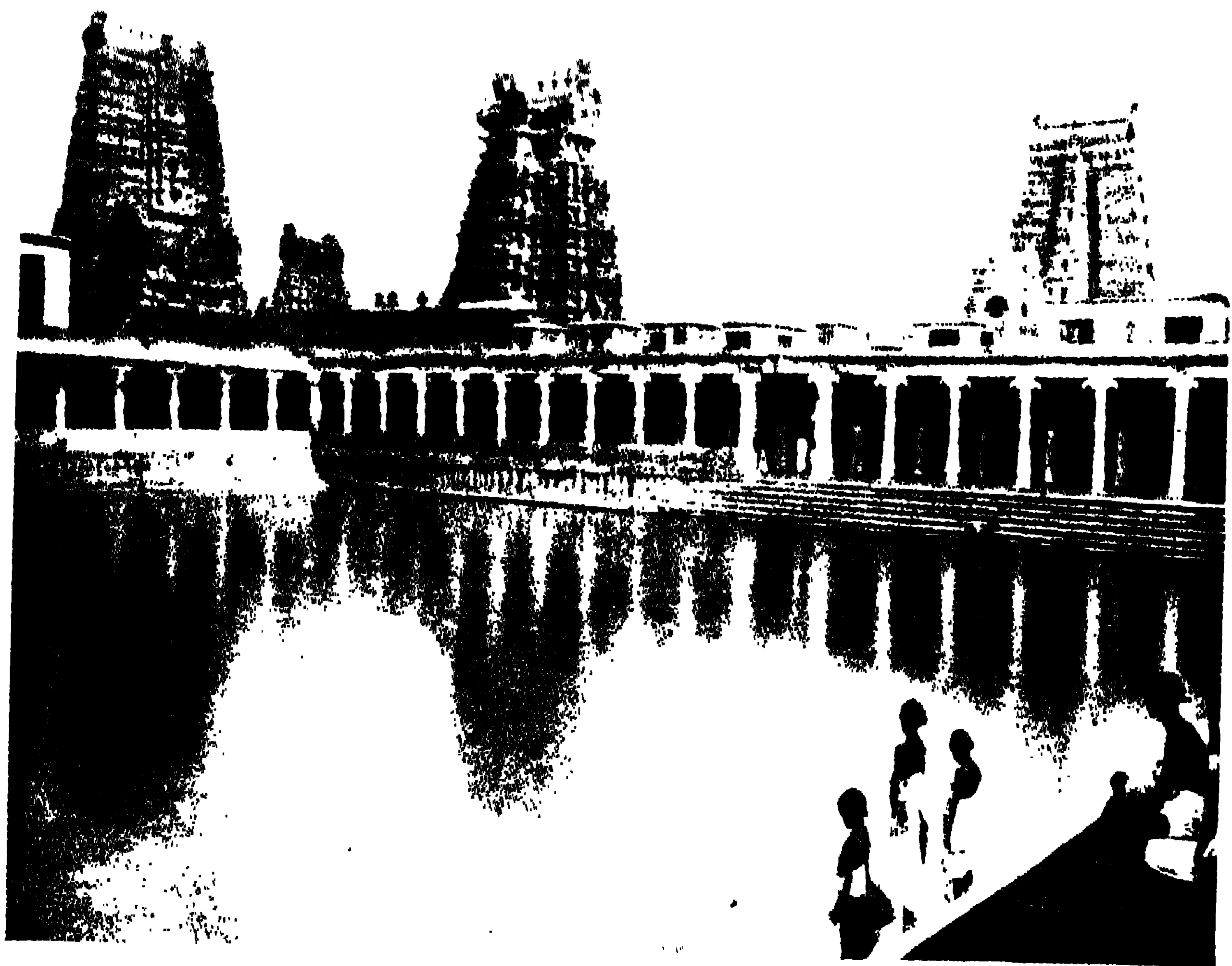
[১] সুপ্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ চিদম্বরম্ মন্দিরের গোপুরম্-গাত্রে নৃত্যশীল নটরাজের ১০৮ প্রকার বিভাব অর্থাৎ মুদ্রা খোদিত আছে।

চিত্রফলক ৬৩



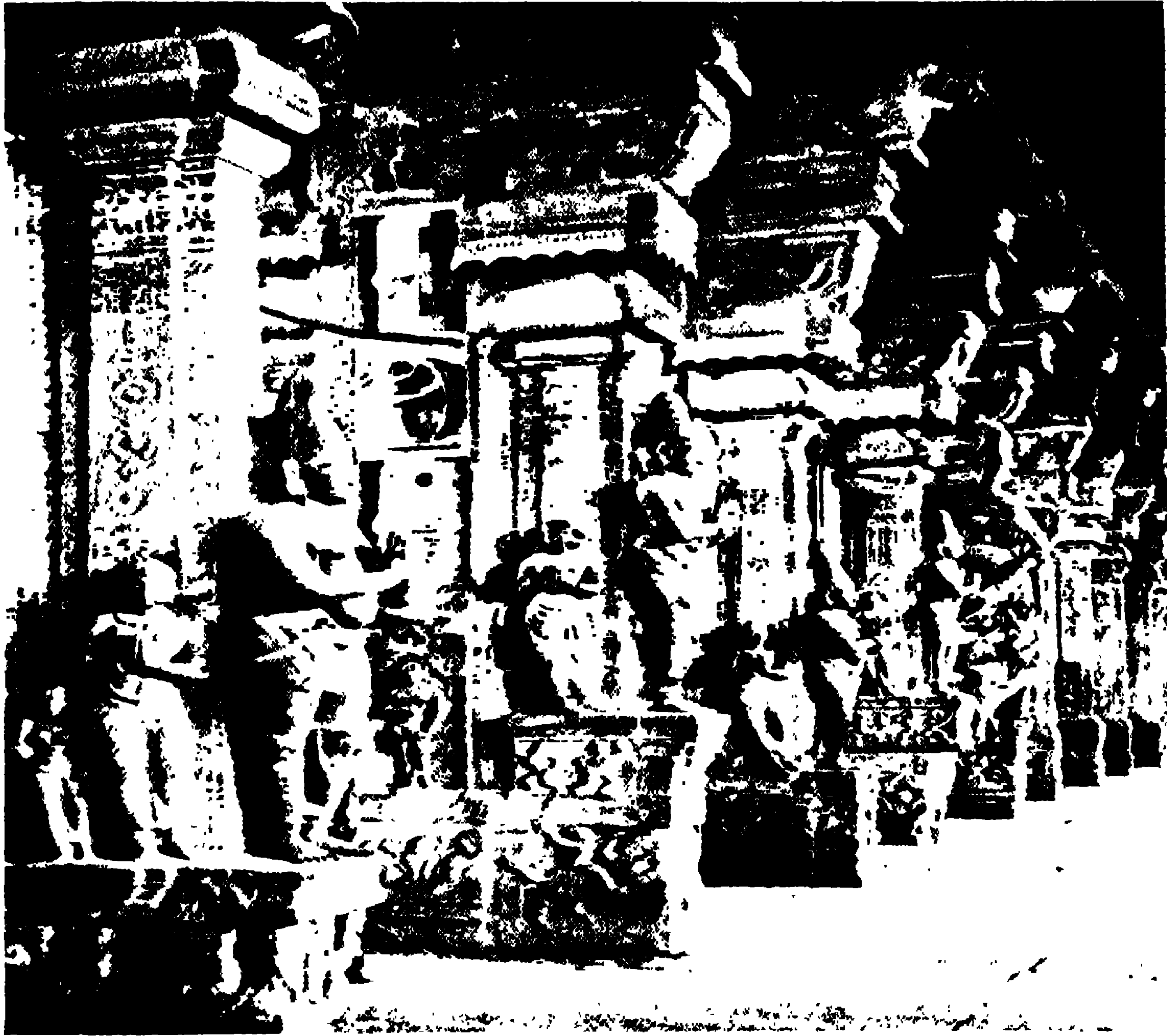
৭৫ চিত্র—ত্রিমূর্তি, এলিফান্টা

চিত্রফলক ৬৪



৭৬ চিত্র - সুন্দরেশ্বর ও মীনাক্ষী মন্দির, মাদুরা

চিত্রফলক ৬৫



৭৮ চিত্র—সুন্দরেশ্বর মন্দিরের অলিন্দ, মাতুরা

চিত্রফলক ৬৬



৭৮ চিত্র—নটরাজ, তাণ্ডবনৃত্য, তাঞ্জোর

নৃত্যে মগ্ন মহাকাল; চতুর্ব্বেদরূপি-চতুরশ্ব-সংযোজিত পাষাণরথারূঢ় ত্রিপুর-বিজয়রত পিণাকী; উমা ও স্কন্দসহ বৃষপৃষ্ঠে মহাদেব; ভারতীয় ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব সুন্দর নিদর্শন শিবমহেশ্বরের 'কল্যাণ সুন্দর' মূর্ত্তি—উমার সহিত পরিণয়ের দৃশ্য। বরবেশী চতুর্ভুজ তরুণ শিব; স্বর্গীয় সুষমাভরা অমল অধরে তাঁহার ফুটন্ত অফুরন্ত প্রশান্ত হাসি—লজ্জাবনতমুখী, প্রোদ্ভিন্নযৌবনা, নববধূবেশিনী, নিরুপমকেশিনী, ব্রহ্মকমলধারিণী, সালঙ্কৃতা নগরাজকন্যা সানন্দ সঙ্কোচে মেদিনীর ক্রোড়ে মিলাইতে চাহেন। ত্রিনেত্র চন্দ্রশেখর তাঁহার করস্পর্শ করিয়াছেন। স্পর্শজনিত বিপুল পুলকে 'সঞ্চারিণী পল্লবলতেব' কমনীয়া-নমনীয়া তনুলতা তাঁহার অনুপম ললিত লাবণ্যে দেদীপ্যমানা। প্রদাতারূপী চতুর্ভুজ সূর্য্যনারায়ণ শিবকরে পার্ব্বতীকে সম্প্রদানকরতঃ ত্রিভঙ্গিমঠামে বরবধূর করপুটে স্বর্ণভৃঙ্গার হইতে শান্তিবারি প্রদান করিতেছেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞাগ্নি সমক্ষে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। কল্যাণ সুন্দরের পরিণয়দৃশ্য দর্শনান্তর যাত্রীর চিত্তশুদ্ধি হইলে সুন্দরেশ্বর দর্শনমানসে তিনি গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন।

স্বতন্ত্র গোপুরম্ ও প্রাকারবেষ্টিত মীনাক্ষী মন্দির সুন্দরেশ্বর মন্দিরের অদূরে নৈর্ঋত (পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্ত্তী) কোণে অবস্থিত। দেবীর মূল মন্দিরের পুরোভাগে বিচিত্র লতাপুষ্প, পশুপক্ষী এবং আকর্ণবিস্তৃত-পত্রপল্লব-মণ্ডিত-গজসিংহ-পরিবেষ্টিত পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী, মহাবীর ও অঙ্গদ, পতঞ্জলি ও ব্যাঘ্রপাৎ ঋষির বৃহদায়তন মূর্ত্তিসম্বলিত 'পদ্মকান্ত' স্তম্ভপূর্ণ বিস্তীর্ণ মণ্ডপ। এখানেও অগণিত যাত্রীর সমাগম। মীননয়না মীনাক্ষীর সুঠাম সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব ও অতুলনীয় ভাবপূর্ণ।

সুন্দরেশ্বর মন্দিরের সান্নিধ্যে অগ্নি (পূর্ব্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্ত্তী) কোণে 'স্বর্ণকমল' সরোবর শোভমান। প্রস্তরময় সোপান এবং প্রস্তরময় চতুঃসংখ্যক মণ্ডপ পরিবেষ্টিত সুবিশাল জলাশয়ে স্বর্ণশৃঙ্গধারী গোপুরম্ প্রতিবিম্বিত। সরোবর প্রদক্ষিণকালে দৃষ্ট হয়—প্রস্তরের প্রশস্ত বেদীচত্বরে উপবিষ্ট, দীর্ঘশিখ, মুণ্ডিতকেশ, তেজোদীপ্ত, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণমণ্ডলী যজুর্ব্বেদ হইতে স্বাধ্যায় পাঠরত। স্বাধ্যায়-আবৃত্তিজাত সুরতরঙ্গের অশ্রান্ত ঝঙ্কার গম্ভীর স্বননে প্রভাত সমীরণ পরিপ্লুত করিয়া, বায়ুমণ্ডল বিকম্পিত করিয়া, ব্রহ্মলোকে বিলীন হয়। অন্যত্র-উপবিষ্ট

সামবেদী ব্রাহ্মণগণ ঐক্যতানে সামগান করিতেছেন। শঙ্খ-কাহাল-মৃদঙ্গ-খরতাল-সঞ্জাত বাদ্যধ্বনির তালে তালে, জলদগম্ভীর তামিল ভাষায়, পদ্মমণ্ডপের উপর আসন-বদ্ধে উপবিষ্ট সৌম্যমূর্ত্তি সুকণ্ঠ গায়ক শিবের বন্দনা করিতেছেন।

দিবসের দ্বিতীয় প্রহরে, দিনমণির সুবর্ণকিরণসম্পাতে, জগমোহনের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যকলা স্পষ্টতর এবং মন্দিরের মধুরিমা ও সুষমা পরিপূর্ণভাবে প্রতীয়মান হয়। সন্ধ্যার আগমনে শঙ্খ, ভেরী, ঘণ্টা ও পনব-পটহ-ডমরু-ধ্বনিত সেই পাষাণমণ্ডপে অনুষ্ঠিত বেদগান, তামিল ভজন এবং আরতিদর্শনার্থী শত শত নরনারীর অনুচ্চ কোলাহলের স্রোতঃসঙ্গমে যে মোহময় পরিবেশের সমাবেশ হয় তাহার বিশদ বর্ণনা ভাষার অতীত।

শিক্ষায়তন ও ধর্ম্মজীবন

ভারতের জ্ঞান ও কর্ম্ম, ভক্তি ও নর্ম্ম, মৈত্রী, আনন্দ, রূপ, রস, অনুভূতি ও অন্তরাত্মা, ভারতের শাশ্বত ধর্ম্ম দেবদেউলের পাদপীঠে একদা অমরত্ব লাভ করিয়াছিল। বর্ণাশ্রমী ব্রাহ্মণ্যজীবনে আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক, বস্তুতান্ত্রিক সর্ব্ব বিষয়েই জীবসমাজের কল্যাণকর মহান্ আদর্শ জাগ্রত ছিল। আদর্শের পরম হোতা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য, শ্বেতকেতু, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ও বাল্মীকি প্রভৃতি মহাত্যাগী মহাপুরুষগণ বেদে, উপনিষদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণে, সাহিত্যে ও কাব্যে, ধর্ম্মদর্শনশাস্ত্রে, সঙ্গীতে ও চিত্রে, ভাস্কর্য্যে ও স্থাপত্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নৈমিষারণ্য একদা দশ সহস্র শিষ্যের অধিনায়ক কুলপতি শৌনক প্রমুখ অধ্যাপক ঋষিগণের এবং শিক্ষার্থিবৃন্দের পঠন-পাঠনে মুখরিত থাকিত। নৈমিষারণ্যের সুরধুনী-তীরে, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত, প্রায়োপবেশনে উপবিষ্ট, পাণ্ডববংশাবতংস পরীক্ষিৎ—মহামুনি বেদব্যাস-বিরচিত এবং তদীয় পুত্র পরমহংস চূড়ামণি শুকদেব গোস্বামীর শ্রীমুখ-নিঃসৃত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিতেন। ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, শিষ্য, প্রশিষ্য, উপশিষ্য প্রভৃতি সহস্র সহস্র জটাজূটধারী, তেজঃপুঞ্জকলেবর, মহাজ্ঞানী বিদ্যার্থিগণ তথায় সমবেত হইতেন। অতঃপর মহর্ষি রোমহর্ষণ সূতের পুত্র শ্রীল-উগ্রশ্রবা-সূত মুনি নৈমিষারণ্যে শৌনক প্রমুখ ষষ্টিসহস্র ঋষিসমাবৃত যজ্ঞসভায় শ্রীশুককথিত

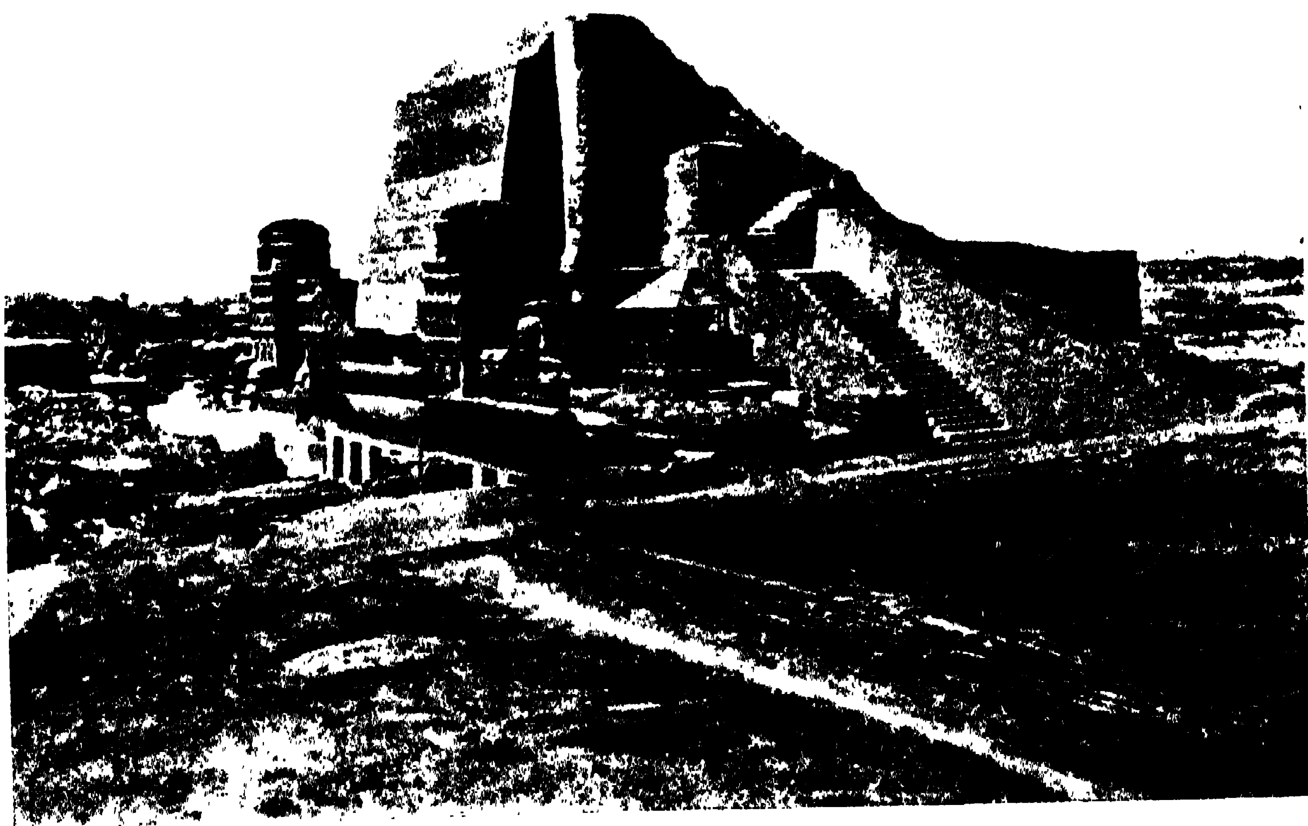
শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণন করেন। মহাভারতীয় যুগে নৈমিষারণ্য (আযুধ-রোহিলখণ্ড রেল ষ্টেশন নিমখার সান্নিধ্যে এবং লখ্‌নৌয়ের বায়ুকোণে ২৩ ক্রোশ দূরে গোমতীর বাম তটে অবস্থিত) ধর্ম্ম-, শাস্ত্র- ও সাহিত্য-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে, ক্রমে ক্রমে, বারাণসী, কাশ্মীর, তক্ষশিলা, পুরুষপুর, পত্তন, উজ্জয়িনী, অমরাবতী, বিদিশা, নালন্দা, ওদন্তপুরা, বিক্রমশীলা, মিথিলা, নবদ্বীপ, কাঞ্চী ও তাঞ্জোর বিশিষ্ট বিশিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রের অধিকারিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। খৃঃ পূঃ অষ্টম শতকে মগধাধিপতি বিম্বিসারপুত্র রাজবৈদ্য জীবক, খৃঃ পূঃ সপ্তম শতকে পাণিনি, তাঁহার পরে গ্রীক-বৈষ্ণব হেলিয়োদোরস্ তক্ষশিলা মহাবিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র ছিলেন।

বিশাল সিংহদ্বারসহ রক্তবর্ণ ইষ্টকে নির্ম্মিত সু-উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত ত্রয়োদশ-শত-হস্ত দীর্ঘ এবং ষষ্ঠশত-হস্ত প্রস্থপরিমিত অন্তর্ভাগমধ্যে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা মহাবিদ্যালয়ে দশ সহস্র ছাত্র অবস্থান করিতেন। কাশ্মীর, পুরুষপুর (পেশোয়ার), বোখারা, তিব্বত, জাপান, চীন, কোরিয়া, সুমাত্রা এবং যবদ্বীপ প্রভৃতি প্রদেশ ও রাজ্য হইতে সমাগত শিক্ষার্থিগণ তত্র অধ্যয়ন করিতেন। বেতন, আহার ও বাসস্থান-ব্যপদেশে তাঁহাদের অর্থব্যয় করিতে হইত না। হুয়েন সঙ্ (খৃঃ সপ্তম শতক) উক্ত বিদ্যামন্দিরে মহাজ্ঞানী বাঙ্গালী অধ্যক্ষ শীলভদ্রের ছাত্ররূপে যোগদর্শন শিক্ষা করেন (৭৯-৮০ চিত্র)। নালন্দায় বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, বৈশেষিক, বৌদ্ধদর্শন, ন্যায়, তন্ত্র, রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতিষ, গণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, বীজগণিত ও শিল্পশাস্ত্র প্রভৃতি পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্ত্রের পর্য্যায়ভুক্ত রসায়ন। রসায়নে প্রকৃতি ও পৃথিবীর আরাধনায় বেদ ও তন্ত্র যুক্তধারায় প্রবহমাণ। অথর্ব্ববেদে সৃষ্টিরহস্য, পৃথিবীর স্তব, যাবতীয় চিকিৎসাবিধান ও শত্রু-নাশন মন্ত্র বিবৃত হইয়াছে। তরুলতা, পত্রপুষ্প, স্থলজ ও জলজ শিকড় ও গুল্ম হইতে প্রাচীন ভারতের অধিকাংশ ঔষধ ও প্রলেপ প্রস্তুত হইত। উদ্ভিজ্জ, ধাতব ও প্রাণিজ পদার্থের দ্রব্যগুণ, তাহাদের রাসায়নিক দ্রবণ ও মিশ্রণ এবং শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিনিরাময়ে তাহাদের শক্তির পরিমাণ এবং ব্যবহারিক মাত্রা উদ্ভাবিত হইয়াছিল। মহর্ষি নাগার্জ্জুন পারদ ও মকরধ্বজ প্রভৃতি রাসায়নিক ঔষধ আবিষ্কৃত

করেন। তৎপূর্ব্বে প্রকারান্তরে নাগজাতি পারদ ('শিববীর্য্য') ব্যবহার করিতেন। নালন্দার ধ্বংসাবশেষমধ্যে নাগার্জ্জুন-প্রতিষ্ঠিত আয়ুর্ব্বেদীয় রসায়নশালায় ব্যবহৃত তুন্দুর (উনন), ভস্ত্রা (হাপর) ও ধাতু গলাইবার উপযোগী ভাণ্ড (মুচি, crucible) আবিষ্কৃত হইয়াছে। নাগার্জ্জুন লৌহ ও তাম্রকে সুবর্ণে রূপান্তরিত (alchemy) করিতেন। মহাযানীয় মতবাদ-প্রচারের উদ্দেশ্যে নালন্দায় তিনি মহাকালমূর্ত্তি স্থাপিত করেন, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত। ধর্ম্মশাস্ত্র-, দর্শন-, বিজ্ঞান-, স্থাপত্য-, শিল্প- ও সাহিত্য-সংক্রান্ত বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপির সুবৃহৎ ভাণ্ডার রক্ষাকল্পে নালন্দায় নয়তল রথাকৃতি 'রত্নোদধি' গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খৃঃ পঞ্চম শতকে ফা-হিয়েন্ পাটলিপুত্র নগরে সুবৃহৎ একটি গ্রন্থাগার পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন।

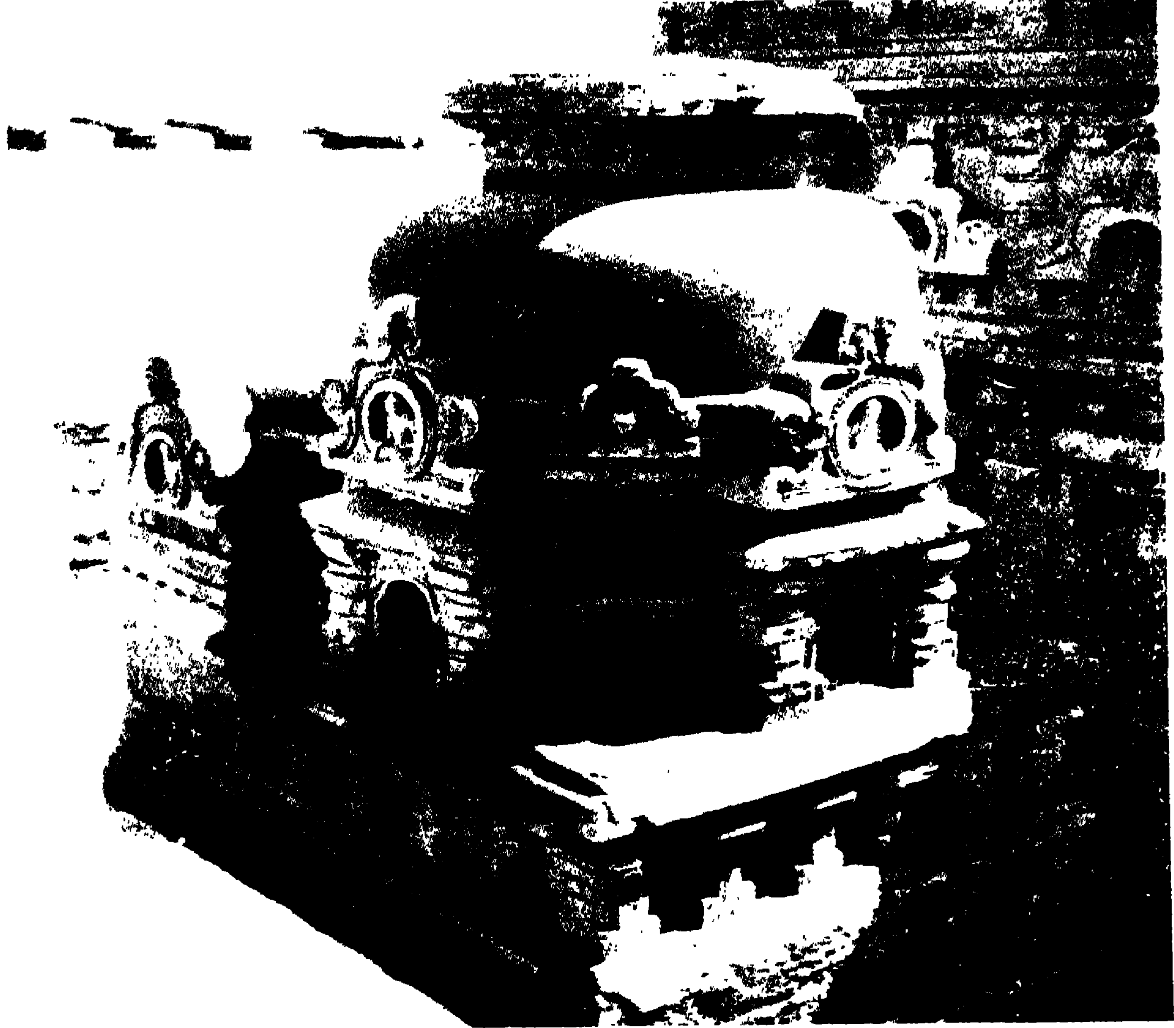
প্রসিদ্ধ পাল-সম্রাট্ ধর্ম্মপালদেব বঙ্গীয় বিক্রমশিলা শিক্ষাকেন্দ্রের (বিহার) প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে যে, তথায় ১১৪ জন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে ৩০০০ ছাত্র প্রধানতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। বঙ্গবাসী মহাচার্য্য অতীশ (দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান) উক্ত শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত করিতেন। বৌদ্ধদর্শনে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত দীপঙ্কর সুমাত্রায় গিয়াছিলেন। অতঃপর তিব্বতাধিপতির আমন্ত্রণক্রমে তিনি তিব্বতে গমন করিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধদর্শনের অমূল্য গ্রন্থাবলী সম্পাদিত করেন (৮১ চিত্র)। অদ্যাবধি তথায় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি বোধিসত্ত্বের অনুরূপ পূজা পাইতেছে। রঘুনাথ শিরোমণি নবদ্বীপধামে ন্যায়দর্শনের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ স্থাপিত করেন। উহা সমগ্র ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপধামে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যজীবনে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'কার বলেন যে, দার্শনিক বিচার-সংগ্রামে ভারতের নানাপ্রদেশীয় পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিয়া কাশ্মীরী ব্রাহ্মণনন্দন 'সরস্বতীর বরপুত্র' শ্রীকেশব ভারতী নবদ্বীপক্ষেত্রে ব্রাহ্মণকুমার শ্রীনিমাই-চৈতন্যের কাছে পরাভূত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপ নব্যন্যায় ও স্মৃতিশিক্ষাসম্পর্কেও শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল। তাহার বহু বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের লুইসিদ্ধা-প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিক 'সহজিয়া' প্রথায় দেবদেবীর প্রতিমা পূজার আনুষ্ঠানিক বিধান ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছিল। মহাযান-প্রবর্ত্তিত শূন্যবাদী বৌদ্ধধর্ম্মাচরণে নির্ব্বাণলাভ বহুজন্মব্যাপী বহু আয়াস,

চিত্রফলক ৬৭



৭৯ চিত্র—প্রধান-স্তূপ মন্দির, নালন্দা

চিত্রফলক ৬৮



৮০ চিত্র—'নিবেদন-স্তূপ', নালন্দা

চিত্রফলক ৬৯



৮১ চিত্র. দীপঙ্করের তিব্বত অভিযান

চিত্রফলক ৭০





৮২ চিত্র—প্রসাধনান্তে যক্ষী, পম্পেই (রোম)

জপতপ ও কঠোর তপস্যাসাধ্য। কিন্তু মহাসুখবাদের সহজযান (সহজিয়া) ধর্ম্ম-সাধনায় নির্ব্বাণপ্রাপ্তি সহজসাধ্য ও সরল—"অহরহ সহজ করন্ত"। মিথিলায় (পূর্ব্ব-বিহার) ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। সর্ব্বত্রই শিক্ষার্থিগণের লক্ষ্য ছিল—শিব-সত্য-সুন্দরের পরম পূজারী ঋষিমহর্ষি-কণ্ঠ-নিঃসৃত যে উপনিষদ্ মন্ত্র ভারতীয় ধর্ম্ম ও কর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল, তাহার মাঙ্গলিক অবদান কোনও প্রকারে অবহেলা না করা।

যখন শিখর-বিমান-ভদ্রদেউল-পরিশোভিত, অনবদ্য-শিল্প-সুষমা-বিমণ্ডিত, অগণিত মন্দির, মঠ, সঙ্ঘারামের স্থাপত্যের শোভা, পুণ্যের প্রভা পরিম্লান হয় নাই—আশ্রম-কাননের বেদগান, বৌদ্ধ থেরীগাথা, স্রগ্ধরা স্তোত্র এবং ভক্তি-প্রেম-পরিপ্লুত দ্রাবিড়ীর শিবসঙ্গীত-মুখরিত, শঙ্খ-ঘণ্টা-ডমরু-ধ্বনিত মঙ্গলারতির মোহমধুরিমা-বিজড়িত ওই অজণ্টা ও এলোরা, সুন্দরেশ্বর ও বিরূপাক্ষ, নালন্দা ও পাহাড়পুর, মহাবলীপুরম্ ও শ্রীরঙ্গম্, কাঞ্চিভরম্ ও চিদম্বরম্, দিলবারা ও রণপুরা, লিঙ্গরাজ ও কোণার্ক, উদয়েশ্বর ও কন্দর্য্য, সোমনাথ ও মুধেরা, বিজয়নগর ও বিষ্ণুপুর, গুপ্তিপাড়া ও কান্তনগর মানবের অন্তরাত্মাকে শ্রীভগবানের শান্তিনিকেতনে আকর্ষণ করিত—পাষাণের কমলমন্দিরে শ্রীমধুসূদনকে তখন চিরন্তন-চিরনবীন, চিরপ্রিয়-চিরবরেণ্য, পরম অতিথিরূপে প্রেমালিঙ্গনে বাঁধিয়াছিল ভক্তহৃদয়ের ঐকান্তিক নিষ্ঠা, প্রেমপ্লুত অন্তরের শাশ্বত কামনা।

শ্রীমধুসূদনের স্নান ও অঙ্গরাগ, ভোজন ও শয়ন, প্রমোদ ও নিত্যলীলার যথারীতি ব্যবস্থা হইয়াছিল। সায়াহ্নে বরাঙ্গনা দেবদাসীর আরতিনৃত্যে নৃত্যমণ্ডপ মুখরিত হইত। নীরব নিশীথে স্নেহশীলা দেবদাসী মধুময় সঙ্গীতের প্রেমময় আবাহনে দেবতার নিদ্রাকর্ষণ করিতেন। প্রভাতপূর্ব্ব ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে রামশিঙ্গা ও রুদ্রবীণার মঙ্গলাচরণে দেবতার কমলনয়ন উন্মীলিত হইত। গৃহসংসার বর্জ্জনান্তর মেবারমহিষী দেবদাসী মীরাবাঈ একদা দ্বারকামন্দিরের স্বর্ণসিংহাসনে বিরাজমান গিরধর-রণছোড়জীর প্রেমালিঙ্গনে স্বীয় কায়মনপ্রাণ উৎসর্জ্জিত করিয়াছিলেন।

অতীতের মধুর স্মৃতি, মধুর কাহিনী, সুদূর অতীতের ব্যাকুল বাঁশরী—দীন লেখকের মানস-সায়র উদ্বেলিত করিল। মাদুরার পাষাণমন্দিরে, শরতের বিমল

প্রভাতে, জগমোহনের পুরোভাগে, দেবায়তনের শান্তিসমুদ্রে অহমিকার মাদকতা বিসর্জ্জন করিয়া তিনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন......দামামার বাদ্যসঙ্কেতে গর্ভ-মন্দিরের রুদ্ধদ্বার উন্মোচিত হইল......সুন্দরেশ্বরের স্বর্ণসিংহাসন পরিবেষ্টিত করিয়া তখনো পর্য্যন্ত বিগত সায়াহ্নের কর্পূরারতি-সঞ্জাত স্নিগ্ধ সুবাস তন্দ্রিত রহিয়াছে।

মন্দিরসংলগ্ন প্রধান গোপুরমের পুরোভাগে রাজপথের মধ্যস্থলে সু-উচ্চ চত্বর দৃষ্ট হয়। চত্বরের কারুকার্য্যমণ্ডিত আচ্ছাদন ধারণ করিয়া দ্বারী, প্রতিহারী ও পশুপক্ষী উৎকীর্ণ কয়টি প্রস্তরস্তম্ভ। যাত্রিগণ সেই চত্বরে বসিয়া বিশ্রাম করেন। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী সেখানে কুমারের উপনয়ন সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। নির্ব্বাপিত হোমানলের অঙ্গার দৃশ্যমান। অলস অপরাহ্ণে সাপুড়িয়া তুবড়ী (বাঁশি) বাজাইয়া গোখুরার নৃত্য দেখাইল। সামাজিক উৎসবের অনুষ্ঠান ব্যতীত পৌরজনসভার অধিবেশন প্রায়শঃ সেই চত্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

এইরূপে দেবায়তনকে পরিবেষ্টন করিয়া ভারতের পল্লীনগর প্রতিষ্ঠিত হইত। তজ্জন্য ভারতবাসীর ধর্ম্মজীবন সুদৃঢ় হইয়াছিল। দেবায়তনের সৌন্দর্য্যময় পরিবেশে অবস্থানজনিত তাঁহাদের দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত থাকিত। তাঁহারা উপলব্ধি করিতেন যে, ইহলোকের পার্থিব ঐশ্বর্য্য নির্ব্বিচারে ভোগ করাই দুর্লভ মানবজীবনের মুখ্য কামনা নহে। ইহজন্মে ধর্ম্মশাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে সৎকর্ম্ম করিলে মৃত্যুর পরে দিব্যলোকে ঋভুরূপে তাঁহারা সুখশান্তিময় অনন্ত জীবন উপভোগ করিবেন। সেই কারণে জড় ঐশ্বর্য্যচিন্তায় অনেকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে, অতীত ভারত ব্যবহারিক বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক অনুশীলনে বিভোর থাকিত। বিজ্ঞান, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনীতি ভারতবর্ষে বিশেষভাবেই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। পুস্তকের শেষভাগে তৎপ্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে।

উইলিয়ম্ জেমস্, স্যর অলিভার লজ, আচার্য্য এলোসাকফ, মরিস মেটারলিঙ্ক প্রভৃতি বিজ্ঞানবিদ্ ও দার্শনিকগণ বহুকাল ধরিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও গবেষণার শেষে অধ্যাত্মতত্ত্বকে পরলোক-বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গীতে অধ্যাত্মতত্ত্ব অনুশীলন করিবার জন্যই ১৮৮৫ সালে লণ্ডনে Society for

Psychic Research প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সোসাইটির অভিমতে অধ্যাত্মতত্ত্ব সত্যের উপর অধিষ্ঠিত। আধুনিক জড়বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান অধ্যাত্মানুশীলনে সহায়তা করিতে অক্ষম; সহায়তা করে অতীন্দ্রিয় মনোবিজ্ঞান, অনুভূতি, অনুমান ও আপ্তবাক্য। বৃহদারণ্যক, কঠোপনিষদ, যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও বরাহপুরাণে আপ্তবাক্য পাওয়া যায়। সংযতচিত্ত ঋষিগণ ধ্যানশক্তির উৎকর্ষ-সাধনপূর্ব্বক সূক্ষ্মতম জ্ঞানদৃষ্টি প্রস্ফুটিত করিয়া যাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই আপ্তবাক্য। তাঁহাদের আপ্তবাক্য জড়বিজ্ঞানের সহিত অধ্যাত্ম-দর্শন-বিজ্ঞানের সমন্বয়সাধন করিয়াছে।

ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পের মাঙ্গলিক অবদানঃ বহির্ভারতে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার

সমাজের মঙ্গলকামী 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ব্রাহ্মণগুরুগণের পরিচালনায় শিষ্য-প্রশিষ্য-মণ্ডলী সাহিত্য, কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, সঙ্গীত, চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যকে পরিণতির উচ্চ শিখরে উত্তোলিত করিয়াছিলেন। কলিঙ্গ জয় শেষে, নরহত্যাপাপে অনুতপ্ত মহাসম্রাট্ অশোক ধর্ম্মগুরু উপগুপ্ত-প্রদত্ত ধর্ম্মদীক্ষার প্রভাবে 'অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ' মঙ্গলমন্ত্রের ব্যাপক প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ধর্ম্মের আকর্ষণে কাশ্মীরের অধিপতি চিত্রশিল্পী গুণবর্ম্মন কাশ্মীরের সিংহাসন বর্জ্জন করিয়া সিংহল, যবদ্বীপ ও মহাচীনে অভিযান, তত্তৎস্থানীয় রাজরাণীগণকে সদ্‌ধর্ম্মে শিক্ষাদান, ব্যাপক-ভাবে সদ্‌ধর্ম্ম-প্রচার, নানকিং-এ প্রথম ভিক্ষুণী মঠ ও কাণ্টনে শিল্পিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে বাকট্রিয়া হইতে কুষাণ নরপতিগণ বৌদ্ধধর্ম্মের সম্প্রসারণকল্পে পণ্ডিত, দার্শনিক ও শ্রমণ প্রভৃতি চীন ও মধ্য এশিয়াতে প্রেরণ করিতেন। ৫৩৯ খৃষ্টাব্দে লিয়াং-বংশীয় প্রথম চীন-নরপতি শিয়াও (Hsiao) মহাযানী ধর্ম্মগ্রন্থগুলি চীনে আনয়ন করিতে কয়েকজন চীনা পণ্ডিতকে মগধে প্রেরণ করেন। মগধরাজ গ্রন্থগুলির চীনা অনুবাদসহ অনুবাদকার পরমার্থকে চীনে পাঠাইয়াছিলেন। ৭৪৭ খৃষ্টাব্দে তিব্বতাধিপতির আমন্ত্রণে পরম দার্শনিক পদ্মসম্ভব নালন্দা হইতে তিব্বতে গমন করেন। তিনিই লামা মতবাদের প্রবর্ত্তক। লোব্রাক (Lhobrak)

ভূভাগে নালন্দার আদর্শে একটি চৈত্য-বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঙ্ রাজত্ব-কালে (খৃঃ সপ্তম হইতে দশম শতক) চীন হইতে পণ্ডিতগণ ভারতে আসিতেন। সংস্কৃতিক্ষেত্রে উভয় রাজ্যে প্রভূত আদানপ্রদান সমাহিত হইত। সেই সহস্র বৎসরের মধ্যে সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালিভাষায় লিখিত বহুসংখ্যক ধর্ম্মগ্রন্থ চীনাভাষায় অনূদিত হয়। ভারতের বহুসহস্র ব্যবসায়ী, শ্রমণ ও পণ্ডিত চীনে বসবাস করিতেন। ভারতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত সুকুমার চারুশিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত, জ্যোতিষ, গণিত এবং আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি ব্যবহারিক বিজ্ঞান মহাচীনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাঙ্ যুগে ভারতীয় ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, কণ্ঠ- এবং যন্ত্র-সঙ্গীত ও নৃত্যকলা তদ্দেশীয় পরম্পরাগত শিল্পের সহযোগে এক মনোরম চীনা-ভারতীয় শিল্পরীতির সৃজন করে। তাহার নিদর্শন বর্ত্তমান চীনের বহু স্থানে বিদ্যমান।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে পারস্য-সম্রাট্ দরায়ুস্ গান্ধার ও সিন্ধুদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিলে পশ্চিম এশিয়ার সহিত এ দেশীয় শিল্প ও সংস্কৃতিগত সংযোগ স্থাপিত হইয়া ক্রমে ক্রমে ইন্দো-পারসিক শিল্প ও 'খরোষ্ঠী' লিপিমালা উদ্ভূত হয়। পারস্য এবং পশ্চিম এশিয়ার সহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের ব্যবসাবাণিজ্য-সংক্রান্ত আদান-প্রদান বর্দ্ধিত হয়। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে অ্যালেগজ্যাণ্ডরের ভারত অভিযানের ফলে গ্রীক সভ্যতার সহিত ভারতীয় সভ্যতার যোগসূত্র স্থাপিত হয়। উভয় সভ্যতা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ভারতীয় চারুশিল্প, স্থাপত্য এবং জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে গ্রীক প্রভাব প্রসারিত হয়। প্রসিদ্ধ 'গান্ধার' শিল্প সেই মহামিলনের অপূর্ব্ব অবদান।

খৃঃ পূঃ রোমের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য পরিচালিত হইত। রোমান স্বর্ণমুদ্রা, ব্রোঞ্জ, কাচ ও দগ্ধ মৃত্তিকার পালিশ-করা শিল্পসামগ্রী ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যে, আবিষ্কৃত হইয়াছে। বন্দরনগরী পণ্ডিচেরী এবং ব্রোচ (ভৃগুকচ্ছ) ভারত ও রোমের বাণিজ্য ব্যাপারে বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। জলপথে লোহিত সাগর ও মিশরের, অথবা পারস্য উপসাগর ও ক্যালডিয়ার মধ্য দিয়া এবং স্থলপথে তক্ষশিলা, আফগানিস্তানের অন্তর্গত বেগ্রাম ও ভূমধ্যসাগরোপকূল অতিক্রম করিয়া রোমে যাওয়া যাইত। ভারতজাত সৌখীন বস্ত্র, মসলিন, মশলা প্রভৃতি অস্থায়ী সামগ্রী


পশ্চিম ও মধ্যএশিয়া
আর্য্য মহাজাতি
য়ুরোপ
শক
তুর্কীস্থান
কাজাক
সিরিয়া
ইরাক
সুসা
পারস্য
পার্শেপোলিস
আরব
ইরাণ
কাবুল
আফগানিস্থান
বেলুচিস্থান
ভারতবর্ষ
মোহেনজোদড়ো
শ্রীনগর
(বহ্লীক)
টিয়েন শান পর্ব্বত
আলতাই পর্ব্বত
মোঙ্গোলিয়া
চীনা তুর্কীস্থান
খোটান
কুনলুন পর্ব্বত
তিব্বত
লাসা
চীন

রোমের খননে পাওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু ইতালীয় পম্পেই নগরীগর্ভে মথুরাজাত কুষাণ শিল্পের অনুরূপ হস্তিদন্তখোদিত যে সুবেশা, সালঙ্কৃতা, প্রসাধনরতা যক্ষীমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার গঠনবৈচিত্র্য ও ভাবভঙ্গী ভারতীয় শিল্পপ্রতিভাপ্রসূত (৮২ চিত্র)।

খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে অশোকপুত্র কুনাল, বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ সমভি-ব্যাহারে মধ্য এশিয়ার অন্তর্বর্ত্তী খোটানে গমন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক এইচ. ডব্লু. বেলী প্রাচীন খোটানী ভাষায় লিখিত রামায়ণ সম্বন্ধে Bulletin of the School of Oriental Studies, Vol.X এবং Journal of the American Oriental Society, Vol. 59 সংখ্যায় মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ডক্টর চারুচন্দ্র দাসগুপ্ত উক্ত বিষয়ে অনুশীলন করিতেছেন। নরপতি বিজয়সম্ভবের রাজত্বকালে কাশ্মীরী মহাপণ্ডিত বৈরোচনের উদ্যোগে খোটানে বৌদ্ধধর্ম্ম বদ্ধমূল হয়, বহুসংখ্যক চৈত্য-বিহার নির্ম্মিত হয়। নরপতি বিজয়বীর্য্যের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন্-বর্ণিত বিশাল 'গোশৃঙ্গ' বিহারে মহাস্থবির বুদ্ধসেনের পরিচালনায় ৩০০ শ্রমণ ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন করিতেন। পঞ্চনদ প্রদেশ ও কাশ্মীর হইতে স্থপতি, ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী, পণ্ডিত, পুরোহিত ও অর্হৎগণ দলে দলে খোটানে গমন করিয়াছিলেন। 'ইন্দ্র, কপোত, বোধিধর্ম্ম' প্রভৃতি ভারতীয় শিল্পিগণের এবং স্থানীয় খোটানী, এশিয়-গ্রীক ও ইরানী শিল্পিসমূহের সমন্বয়ে শক্তিশালী একটি বিশিষ্ট সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শত শত মন্দির, চৈত্য, বিহার, হর্ম্ম্য প্রভৃতি নির্ম্মিত হয়। চীনের পশ্চিমপ্রান্তীয় টুণ হোয়াঙ্ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ 'সহস্রবুদ্ধ গুহা' মন্দিরসমূহ খোদিত এবং সুচিত্রিত হয়। চিত্রগুলি চীনা-ভারতীয় শিল্পপ্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদানস্বরূপ (৮৩ চিত্র)। নরপতি, শ্রেষ্ঠী এবং সাধারণ ব্যক্তিবর্গের কেহ কেহ স্থানীয় অধিবাসিগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন।

শ্রমণ, মহাশ্রমণ ও মহাস্থবিরগণ মধ্য এশিয়া, খোটান, আফগানিস্তান, সিরিয়া, মিশর, রোমসাম্রাজ্য এবং চীনা তুর্কীস্থানে, সাত শত বৎসর ধরিয়া, শত শত চৈত্য-মন্দির, মঠ ও চৈত্য-বিহারের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এতদ্বিষয়ে ফা-হিয়েন্,

ঈৎসিঙ্‌, হুয়েন সঙ্‌, স্যর অরেল ষ্টীন, অধ্যাপক পেল্লিয়ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণের মূল্যবান্‌ বিবৃতি বহুধা উপভোগ্য। ভারত হইতে মধ্য এশিয়া যাইবার পণ্যবাহী শকট ও ব্যবসায়ী যাত্রিপথের উভয়পার্শ্বস্থ পান্থশালাসমূহের সান্নিধ্যে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ্য দেবায়তন এবং চৈত্য-বিহার বিরাজমান ছিল। তাহাদের অভ্যন্তরভাগ চিত্রিত ছিল। তথায় খৃষ্ট জন্মের প্রথম শতক হইতে অষ্টম শতকের বহু চিত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কতকগুলি চিত্র বিশুদ্ধ ভারতীয়; কতকগুলি চীনাপদ্ধতি অনুসারে পরিকল্পিত এবং অঙ্কিত। বহু চিত্রই ভারতীয়, তিব্বতী, চীনা, পারসীক এবং গ্রীক সংস্কৃতির সংমিশ্রণ। উত্তর তিয়েন্‌ শাঙ পর্ব্বতের সানুদেশে তুরফাণে গান্ধার শৈলীর শ্রেষ্ঠ বুদ্ধপ্রতিমা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কুণলুণ শৈলমালার ক্রোড়ে, মীরন প্রদেশে, প্রাচীন চিত্রের বৃহৎ ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইয়াছে। মধ্য-এশিয় চৈত্য-বিহার-স্থাপত্যের এবং গুহা-মন্দির-চিত্রের বহুবিধ নিদর্শন নয়াদিল্লীর Central Asiatic Antiquarian Museum-মধ্যে অর্থাৎ মধ্য-এশিয় প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায় প্রদর্শিত হইয়াছে। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ ডক্টর এন. পি. চক্রবর্ত্তী তদীয় *Central Asia* গ্রন্থে মধ্য এশিয়ার শিল্পসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন।

খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় হিন্দুধর্ম্মী বণিক্‌-সম্প্রদায় মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে অভিযান এবং উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সেই সকল স্থানে গমন করেন। গুপ্তযুগে মধ্য-এশিয় সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সভ্যতার মিশ্রণে অভূতপূর্ব্ব আন্তর্জ্জাতিক উদারতা উদ্ভূত হইয়াছিল। মধ্য এশিয়ার বহু স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি, হিন্দু দেবদেবীর বিগ্রহ, স্তূপ ও মঠের অবশেষ ব্যতীত বহুসংখ্যক সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি গ্রন্থের তথা আয়ুর্ব্বেদীয় রচনাবলীর পাণ্ডুলিপি-সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।[১০]

---

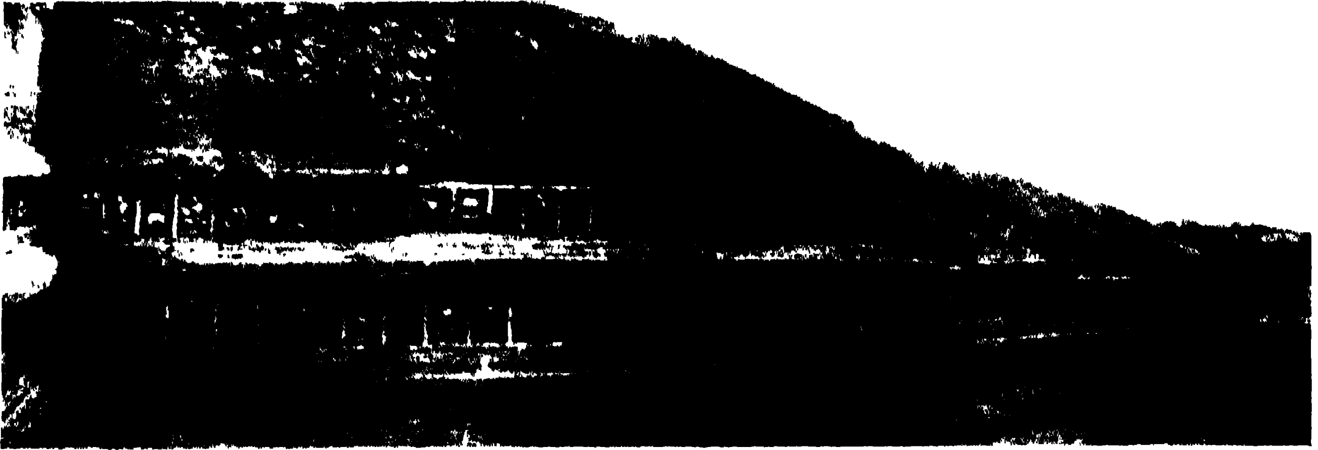
[১০] ভারতের দার্শনিক, পণ্ডিত, আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রবিদ্‌ ও স্থপতিগণ একদা বাগ্‌দাদের বাদশাহ সভায় সম্মানের আসন পাইয়াছিলেন। হারুণ-অল-রসীদ (৭৮৬-৮০৮ খৃঃ) ভারতীয় জ্যোতিবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ, দর্শন, গণিত, সাহিত্য এবং শিল্পসম্বন্ধীয় বহু গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনূদিত করাইয়াছিলেন। খৃঃ একাদশ শতকে গজনীর সুলতান মামুদ প্রমুখ বাদশাহগণ এদেশীয় শিল্পিগণকে মোস্লেম এশিয়ার

চিত্রফলক ৭১

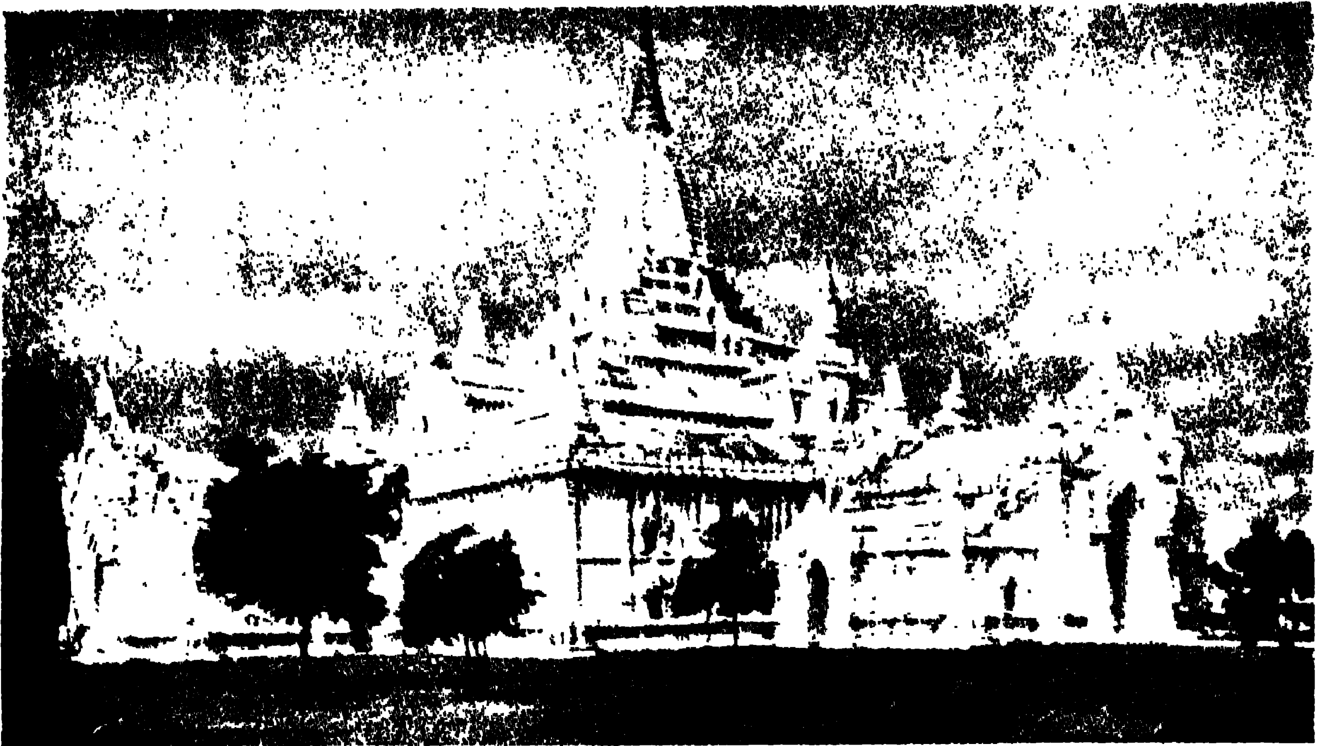


৮৩ চিত্র—সহস্রবুদ্ধগুহা চিত্র, পশ্চিম চীন

চিত্রফলক ৭২



৮৪ চিত্র—সোমপুর বিহার-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পাহাড়পুর



৮৫ চিত্র—আনন্দ মন্দির, পাগান, উত্তরব্রহ্ম

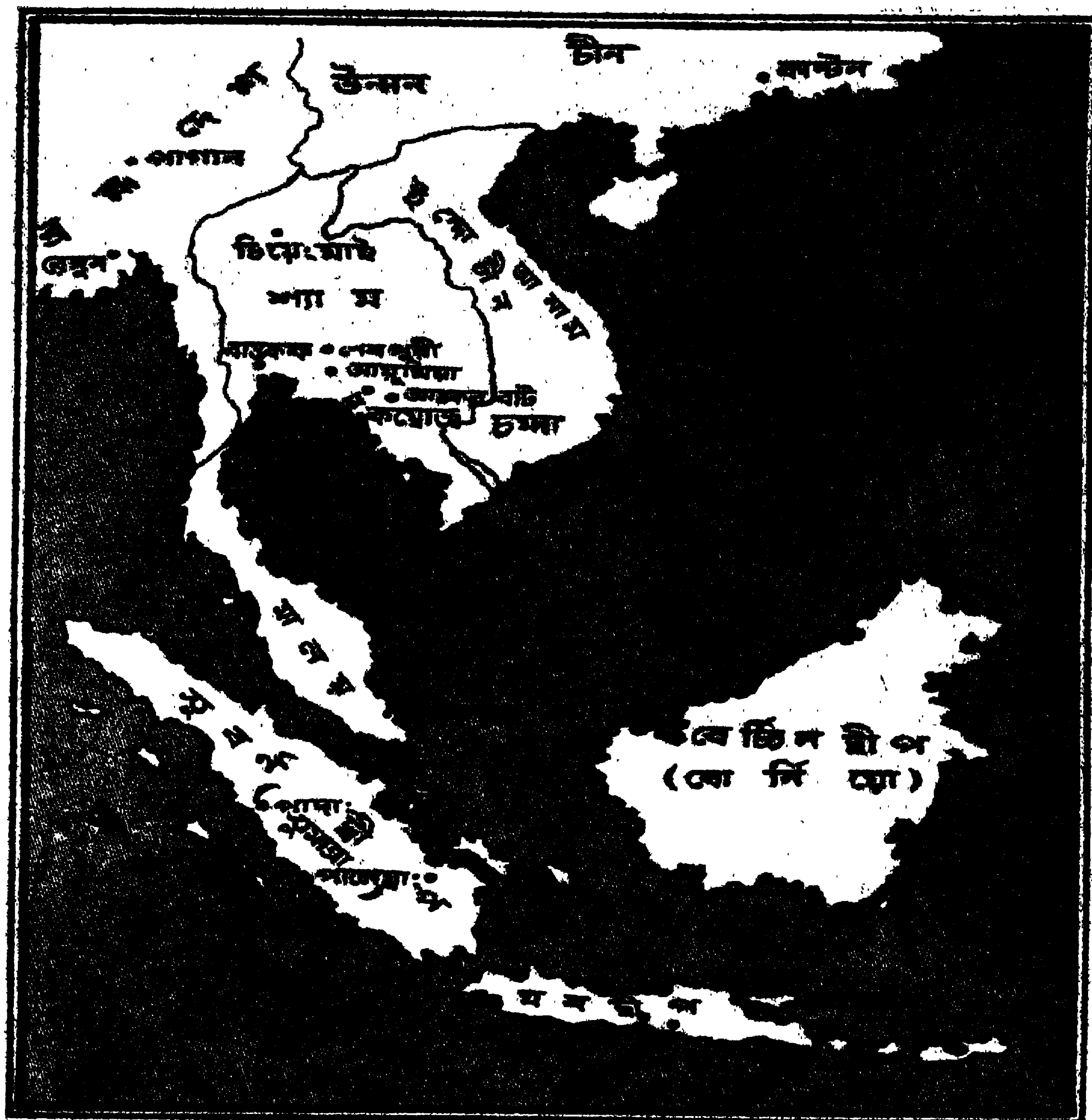
মধ্য-এশিয় কুচী নরপতিগণ হরদেব, হরিপুষ্প প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ তদ্দেশীয় অধিবাসিগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রখ্যাত কুমারজীবের কাশ্মীরী জনক কুমারদেব কুচী রাজকুমারী জীবাকে বিবাহ করেন। দর্শনবিদ্ কুমারজীবের অগাধ পাণ্ডিত্যশ্রবণে মুগ্ধ তদানীন্তন চীন-সম্রাট্ কুমারজীবকে (৪০১ খৃঃ) তিব্বত হইতে চীনে লইয়া যান। তথায় কুমারজীব চীনা-বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্র প্রণয়নে আত্মনিয়োগ করেন। উক্ত বিষয়ে তাঁহার অমর অবদান—'সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক'। চীনা পর্য্যটক ফা-হিয়েন্ কুমারজীবের শিষ্য। ভারতীয় ধর্ম্মবিজয় কাহিনীর অধিনায়করূপে ঋষিকল্প ধর্ম্মরক্ষ, কাশ্যপ-মাতঙ্গ, অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, বসুবন্ধু, সঙ্ঘসেন, গুণবৃদ্ধি, পরমার্থ প্রভৃতি মহাশ্রমণগণ সদ্ধর্ম্ম প্রচারকল্পে চীন দেশে অভিযান করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে, খৃঃ প্রথম-দ্বিতীয় শতকে, মধ্য এশিয় পার্ব্বত্যপথে ভারত সভ্যতার ধারা মহাচীনে প্রথম প্রবাহিত হয়; ভারতের সহিত চীনের প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তাহার ফলে চীনা সভ্যতার প্রবর্দ্ধমান বিকাশ। খৃঃ চতুর্থ হইতে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম চীন হইতে কোরিয়া ও জাপানে নীত হইয়াছিল।

খৃঃ ষষ্ঠ শতকে ভারতে ব্রাহ্মণ্য-গুপ্ত সভ্যতার মহানদে কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত হয়। প্রেমের সেই মহাপ্লাবনে গুপ্ত তথা গুপ্তোত্তর পাল স্থাপত্য, পাল ভাস্কর্য্য, চিত্র এবং ধাতবমূর্ত্তিশিল্প উৎকর্ষ লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে খৃঃ চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ হইতে শিল্প ও সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক পাল এবং সেন নরপতিগণের রাজত্বের অবসান পর্য্যন্ত গুপ্ত-পাল-সেন শিল্পের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। খৃঃ সপ্তম শতকে মাদ্রাজ সমুদ্রোপকূলে মহাবলীপুরে পহ্লবরাজগণ যে সপ্তসংখ্যক রথমন্দির নির্ম্মিত করেন, তন্মধ্যে একটি (দ্রৌপদী-মন্দির) গৌড়ীয় (বঙ্গীয়) কুটীর-স্থাপত্য-শৈলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বঙ্গ রাজধানী

বিভিন্ন স্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। শিল্পিগণ তত্তৎস্থানীয় স্থাপত্যের বিকাশসাধনে সহায়তা করেন। পরবর্ত্তী কালে তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ উত্তর ভারতে আনীত হইয়া ভারতীয় শিল্পিসঙ্ঘের সহযোগে হিন্দু-মুঘল স্থাপত্যের তথা তাজমহলের সৃষ্টি করেন।

গৌড় তৎকালীন মাগধী শিল্পের শ্রেষ্ঠ ভাণ্ডাররূপেই বিবেচিত হইত। পাল এবং সেনযুগীয় গৌড়-বঙ্গেই পূর্ব্ব-ভারতীয় শিল্পকলার অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি। খৃঃ নবম শতকে উত্তর-বঙ্গীয় বরেন্দ্রভূমির (রাজসাহী) প্রসিদ্ধ ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপাল অপূর্ব্ব সুন্দর শিল্পরীতির সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ব এশিয়ায় প্রচলিত করেন। উভয়ের শিল্পপ্রতিভা নালন্দাকে সমৃদ্ধ এবং বৃহত্তর ভারতীয় শিল্পিসঙ্ঘসমূহকে অনুপ্রাণিত, প্রভাবিত ও শক্তিসমন্বিত করিয়াছিল। খৃঃ দ্বাদশ শতকে গৌড়াধিপতি লক্ষণসেন গৌড়ীয় স্থাপত্যে তদীয় নয়নাভিরাম রাজধানী লক্ষণাবতী নির্ম্মিত করেন। লক্ষণাবতী বর্ত্তমান মালদহের সমীপে অবস্থিত ছিল। মধ্যযুগের বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশীয়, ব্রহ্ম-চীন-সীমান্ত পার্ব্বত্য প্রদেশীয় এবং শাণ ও কাচিন অধিত্যকা অঞ্চলীয় মন্দির-স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্ম্মের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। নেপালী এবং তিব্বতী শিল্পেও বঙ্গীয় অবদান অনুভূত হয়। আসামে প্রাচীন আহোম রাজ্যের জীর্ণ মন্দিরসমূহে ও সৌধাবলীর ভগ্নাবশেষে বঙ্গীয় স্থাপত্যের প্রভুত্ব প্রকটিত। বরেন্দ্রী পাহাড়পুরের স্থাপত্য, পাল-সেন-ভাস্কর্য্য ও মূর্ত্তিশিল্প তৎকালীন উত্তর ও দক্ষিণ ভারত, তিব্বত ও বৃহত্তর ভারতকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল (৮৪ চিত্র)। পাহাড়পুরী স্থাপত্যকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া উত্তর ব্রহ্ম, মালয় এবং যবদ্বীপের সুঠাম সুন্দর কয়েকটি দেবায়তন পরিকল্পিত। পাগানের (অরিমর্দ্দনপুর) 'আনন্দমন্দির' ও যবদ্বীপের 'বরবুদুর' মন্দির তাহাদের নির্ম্মাণের পূর্ব্বে গঠিত পাহাড়পুর বিহার মন্দিরদ্বারা অনুপ্রাণিত (৮৫ চিত্র)।

উত্তর-বঙ্গীয় মন্দির-স্থাপত্য বুদ্ধগয়া মন্দিরের উন্নত শিখরশৈলীর অনুসরণ করিয়াছিল। লক্ষণসেনের রাজধানী লক্ষণাবতীর কমনীয় স্থাপত্য গৌড়ের পরবর্ত্তী মুসলমান রাজধানী পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষে—আদিনা মসজিদ এবং রাজভবনসমূহের গাত্রদেশে—পরিলক্ষিত হয় (৮৬ চিত্র)। উহাদের নির্ম্মাণে সেন-সম্রাটের প্রাসাদ ও মন্দির হইতে কারুকার্য্য-খোদিত প্রস্তরস্তম্ভ এবং শিল্পফলকগুলি বিচ্যুত করিয়া উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল। বল্লালসেনের প্রাসাদ ('বল্লাল বাটি') হইতে বিচ্যুত প্রস্তরস্তম্ভ ও খোদিত ফলক প্রভৃতি পরীক্ষান্তে প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—লক্ষণাবতীর ত্রিতল 'বল্লাল বাটি' তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ


চীন
উনান
চিয়েংমাই
শ্যাম
কম্বোজ
চম্পা
বোর্নিও দ্বীপ
(বোর্নিও)

রাজপ্রাসাদসমূহের সমকক্ষ ছিল। পশ্চিমবঙ্গীয় ছোট-পাণ্ডুয়ায় (হুগলি) শাহসুফী মসজিদ এবং ত্রিবেণী তীর্থে জাফর খাঁর মসজিদ নির্ম্মাণেও স্থানীয় দেবালয়সমূহের বিশেষ বিশেষ অংশ বিচ্যুত করিয়া উপাদান সংগৃহীত হইয়াছিল।

খৃঃ পূঃ ভারতবর্ষের বঙ্গ, অন্ধ্র এবং অন্যান্য প্রদেশীয় হিন্দু বণিকগণ শ্যাম, ইন্দোচীন (হিন্দুচীন), যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি উপদ্বীপে এবং দ্বীপে বাণিজ্যব্যপদেশে গমন, উপনিবেশ-স্থাপন এবং তত্তৎস্থানীয় সংস্কৃতিক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার বীজ বপনকরতঃ বৃহত্তর ভারতীয় রাজ্যপ্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়াছিলেন। বৃহত্তর ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতিপ্রসঙ্গে অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত অমূল্য গ্রন্থ 'দ্বীপময় ভারত' পঠিতব্য। গুপ্তশাসনের প্রথম পর্ব্বে উক্ত দেশসমূহে যে সকল হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তন্মধ্যে ইন্দোচীনে কম্বোজ ও চম্পা এবং দ্বীপময় অঞ্চলে শ্রীবিজয় রাজ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খৃঃ প্রথম শতকে ভারতীয় ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিন্য ফুণানে (ইন্দোচীন) প্রথম হিন্দুরাজ্য 'কম্বুজ' স্থাপিত করেন। খৃঃ পঞ্চম শতকে দ্বিতীয় কৌণ্ডিন্য ফুণানের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারে ব্রতী হইয়া ব্যাপকভাবে শিবপূজার প্রচলন করেন। খৃঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে কম্বোজ (কম্বুজ) স্বতন্ত্র হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হয়। খৃঃ দ্বাদশ শতকে কম্বোজাধিপতি 'পরম বিষ্ণুলোক' দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মণ আঙ্করথমের সান্নিধ্যে ভুবনপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুসূর্য্যমন্দির (আঙ্কর ভাট) নির্ম্মাণের সূচনা করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি তথায় সমারোহের সহিত পূজাপার্ব্বণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীন কম্বোজ (ক্মের) রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বর্ত্তমান কাম্বোডিয়া ও শ্যামের কিয়দংশ। চম্পারাজ্য বিস্তৃত ছিল বর্ত্তমান আনামের দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত। সুমাত্রার পালেম্বাং প্রদেশ একদা শ্রীবিজয় রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল। অতঃপর যবদ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপের কিয়দংশ শ্রীবিজয় রাজ্যের অধিকারভুক্ত হয়। ভারতবর্ষের সহিত উক্ত রাজ্যসমূহের যোগসূত্র যতদিন দৃঢ় ছিল ততদিন তাহাদের স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য এবং অন্যবিধ শিল্পে ভারতীয় শিল্পরীতি বহুধা অনুসৃত হইয়াছিল। অবশেষে যোগসূত্র শিথিল হইলে তাহাদের শিল্পের গতি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হয়। কাহারও কাহারও মতে তখন তাহাদের শিল্পে অবনতির সূত্রপাত হয়। বৃহত্তর ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্পের গবেষণার্থ তথা ভারতবর্ষের সহিত উহার অনাবিষ্কৃত যোগসূত্রগুলি

আবিষ্কার করার নিমিত্ত অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ, রবীন্দ্রনাথের আনুকূল্যে, বিশ্ববিশ্রুত Greater India Society-র প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্বিষয়ে উক্ত Society সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর কালিদাস নাগ, ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, ডক্টর নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও ডক্টর বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বৃহত্তর ভারতপ্রসঙ্গে কয়েকটি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উপাচার্য্য ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী উক্ত প্রসঙ্গে বহু তথ্যপূর্ণ, গবেষণামূলক পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করিয়াছেন। কয়েক বৎসর মহাচীনে অবস্থানকালে তিনি চীনা ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং চীনা-ভারত সংস্কৃতির বহু তথ্য সাধারণের জ্ঞানগোচর করেন।

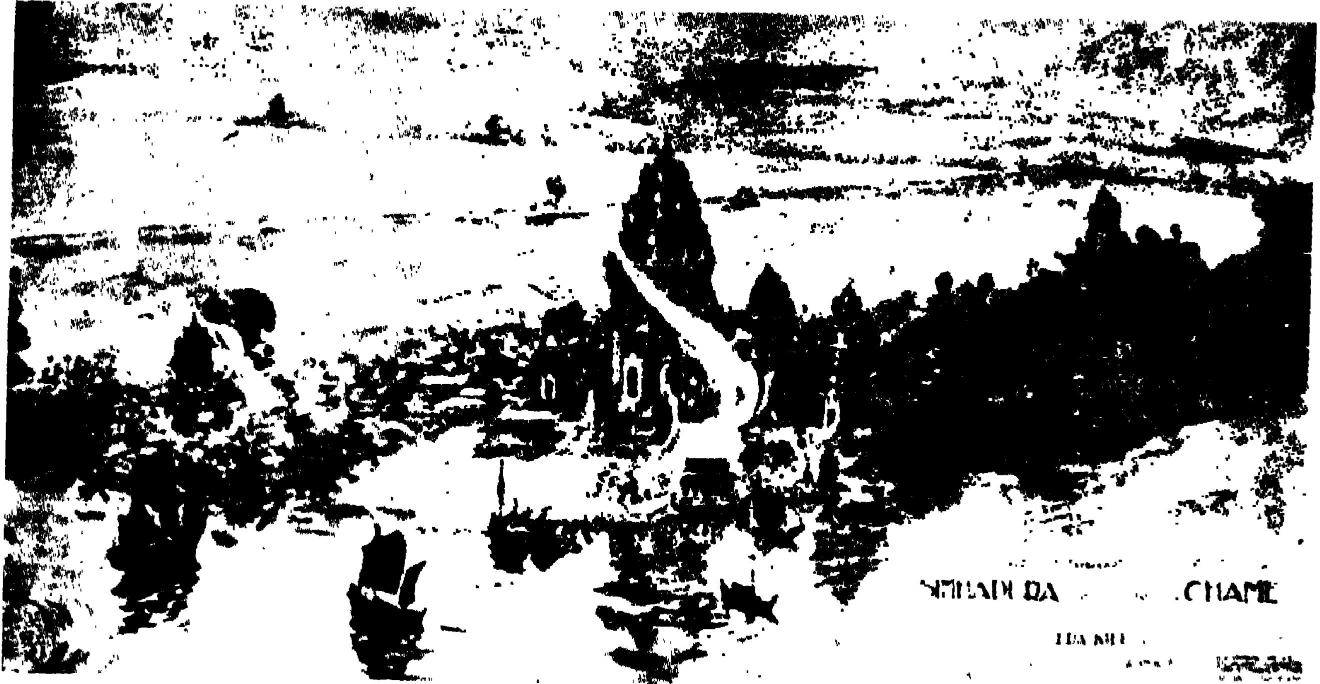
খৃঃ দ্বিতীয় শতক হইতে পঞ্চদশ শতক পর্য্যন্ত চম্পায় চ্যাম জাতি এবং তৎপরে আনাম, মণ-ক্মের ও থাই জাতি রাজধানী সিংহপুর, ইন্দ্রপুর এবং বিজয় হইতে রাজ্য পরিচালনা করিতেন (৮৭ চিত্র)। চম্পায় হিন্দুসংস্কৃতি প্রসারের পূর্ব্বে তৎস্থানীয় অধিবাসিগণ ভূত, প্রেত এবং মৃত পিতৃপুরুষগণের অর্চ্চনা করিতেন। হিন্দুর ধর্ম্মবিজয়ের চিহ্নস্বরূপ তথাকার নানা স্থানে শিব, নটরাজ, পার্ব্বতী, দশভুজা-দুর্গা, গণপতি, কার্ত্তিকেয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, চন্দ্র, কীর্ত্তিমুখ, গজসিংহ, মকর প্রভৃতি এবং ত্রিশূলধারী শিব-বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন শ্যামের দুই রাজধানী দ্বারাবতী ও যশোধরপুর (নবম শতক) উত্তরকালে আয়ুথিয়া (অযোধ্যা) ও আঙ্করথম (নগরধাম, দ্বাদশশতক) নামে পুনর্নির্ম্মিত হয়। চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যভাগে 'সূর্য্যবংশ রামাধিপতি' অযোধ্যার প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্তস্থাপত্য এবং গুপ্তশিল্প শ্যামীয় শিল্পকে প্রভাবিত করে। ভারতীয় বর্ণমালা ও অক্ষরবিন্যাস থাইভাষার উপযোগী করিয়া গঠিত হয়। রামাধিবোধ, পরম ত্রৈলোক্যনাথ, জয়বর্ম্মণ, ক্রাফুথ (পুত্র) রাম, প্রজাধিপক প্রভৃতি অভিধায় শ্যামীয় নরপতিগণ অভিহিত হইতেন। হিন্দুস্থান হইতে সংস্কৃতভাষী বণিক্, সন্ন্যাসী, ধর্ম্মপ্রচারক এবং ঔপনিবেশিকগণ বৃহত্তর ভারতের ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, মালয়, সুমাত্রা, যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপে অভিযান করিয়া তত্তৎস্থানীয় অধিবাসিসমূহকে ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, স্থাপত্য, উন্নত কৃষি ও নৌবিদ্যা, শাসনতন্ত্র ও সমাজরীতি এবং অর্থনীতি শিখাইয়াছিলেন। চম্পায় বহুসংখ্যক

চিত্রফলক ৭৩

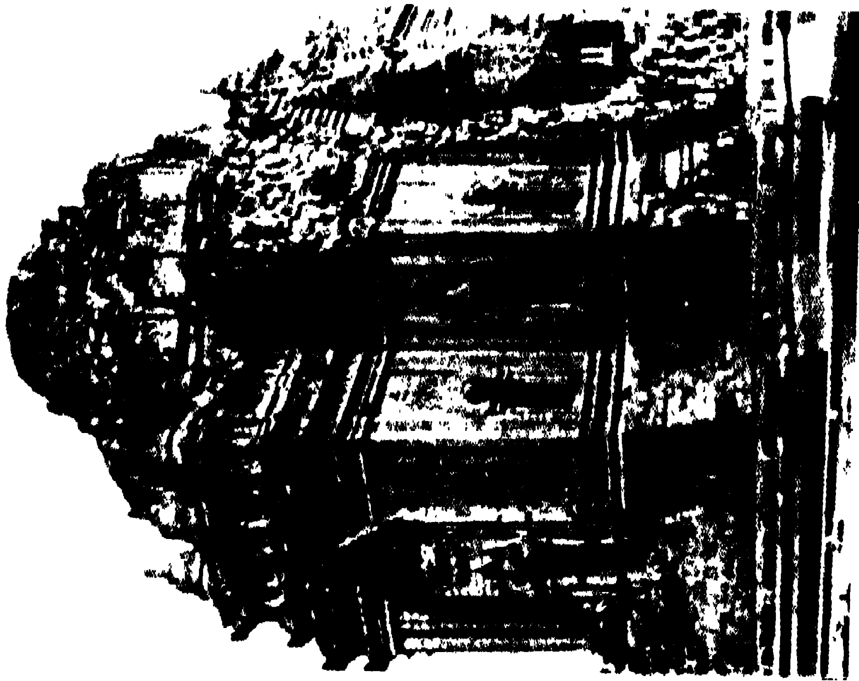


৮৬ চিত্র--আদিনা মসজিদ, গৌড়

চিত্রফলক ৭৪

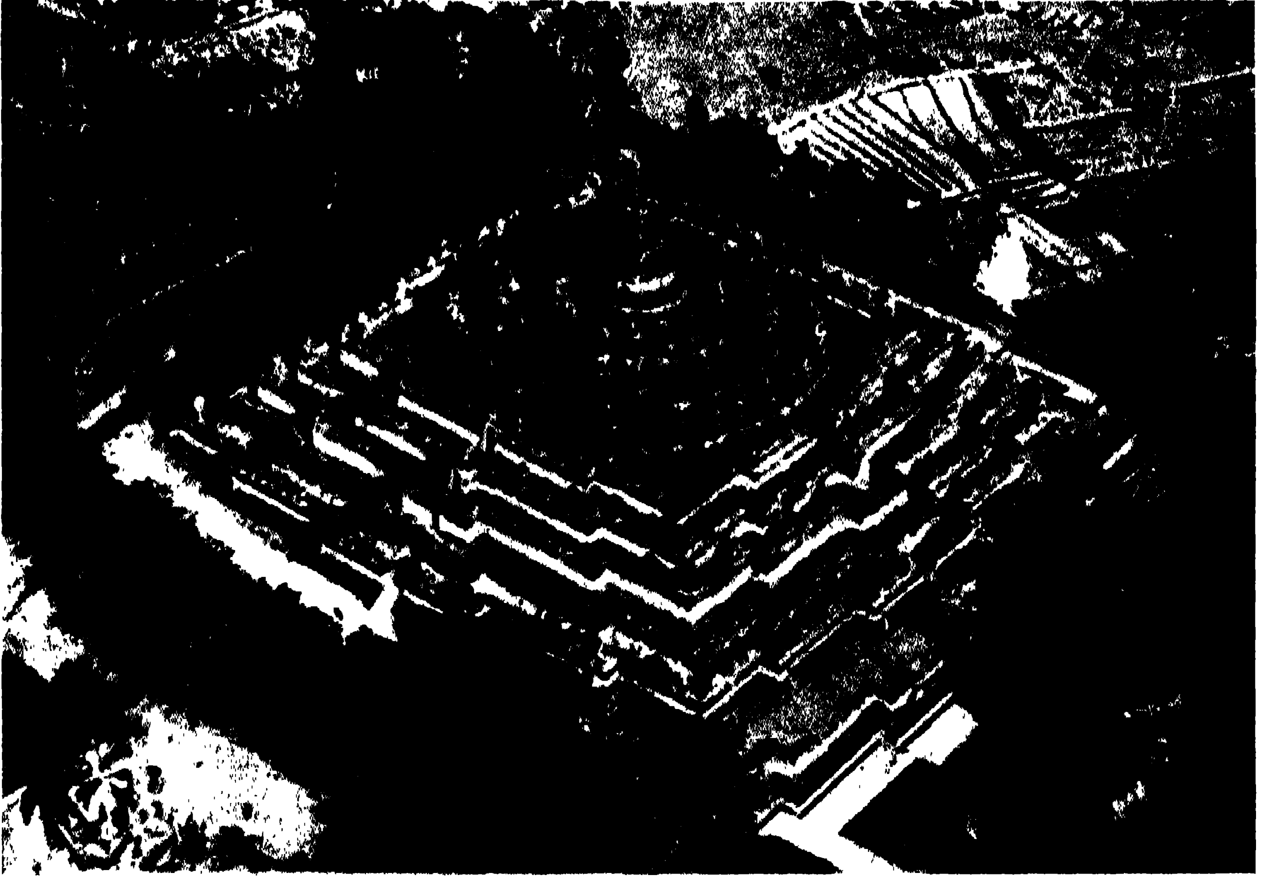


৮৭ চিত্র— সিংহপুর, চম্পা

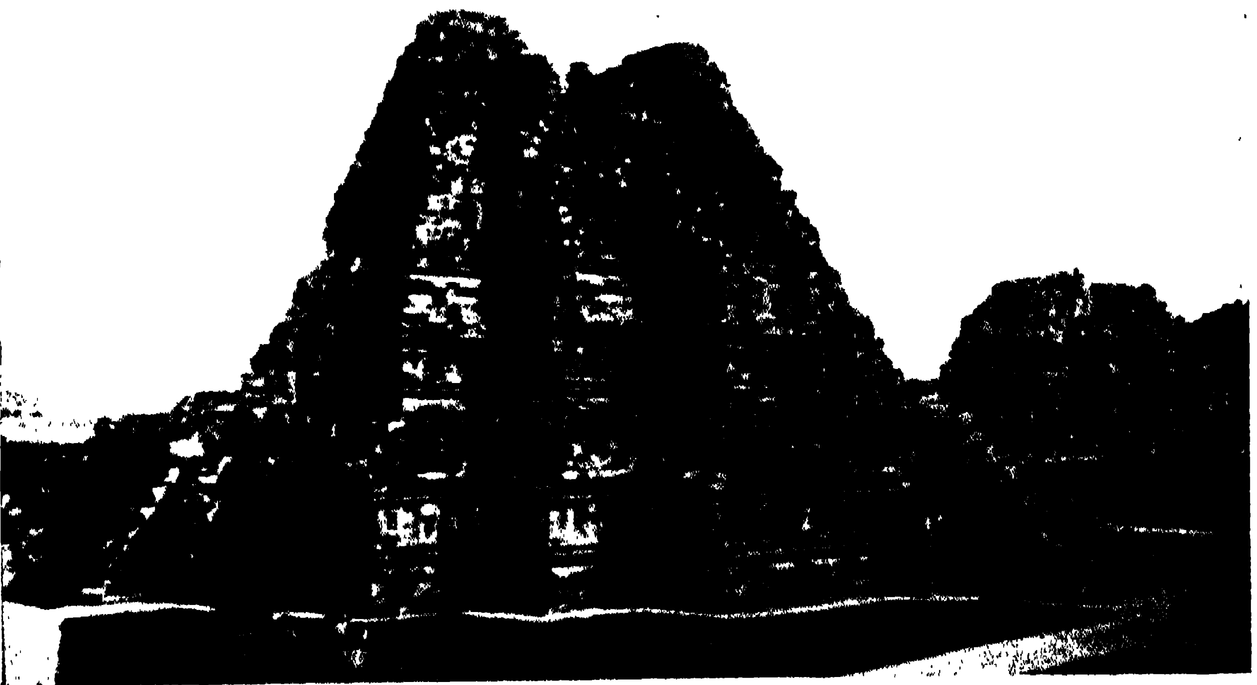


৮৮ চিত্র—চাণ্ডিকনন্দন, যবদ্বীপ

চিত্রফলক ৭৫



৮৯ চিত্র—বরবুদুর মন্দির, যবদ্বীপ

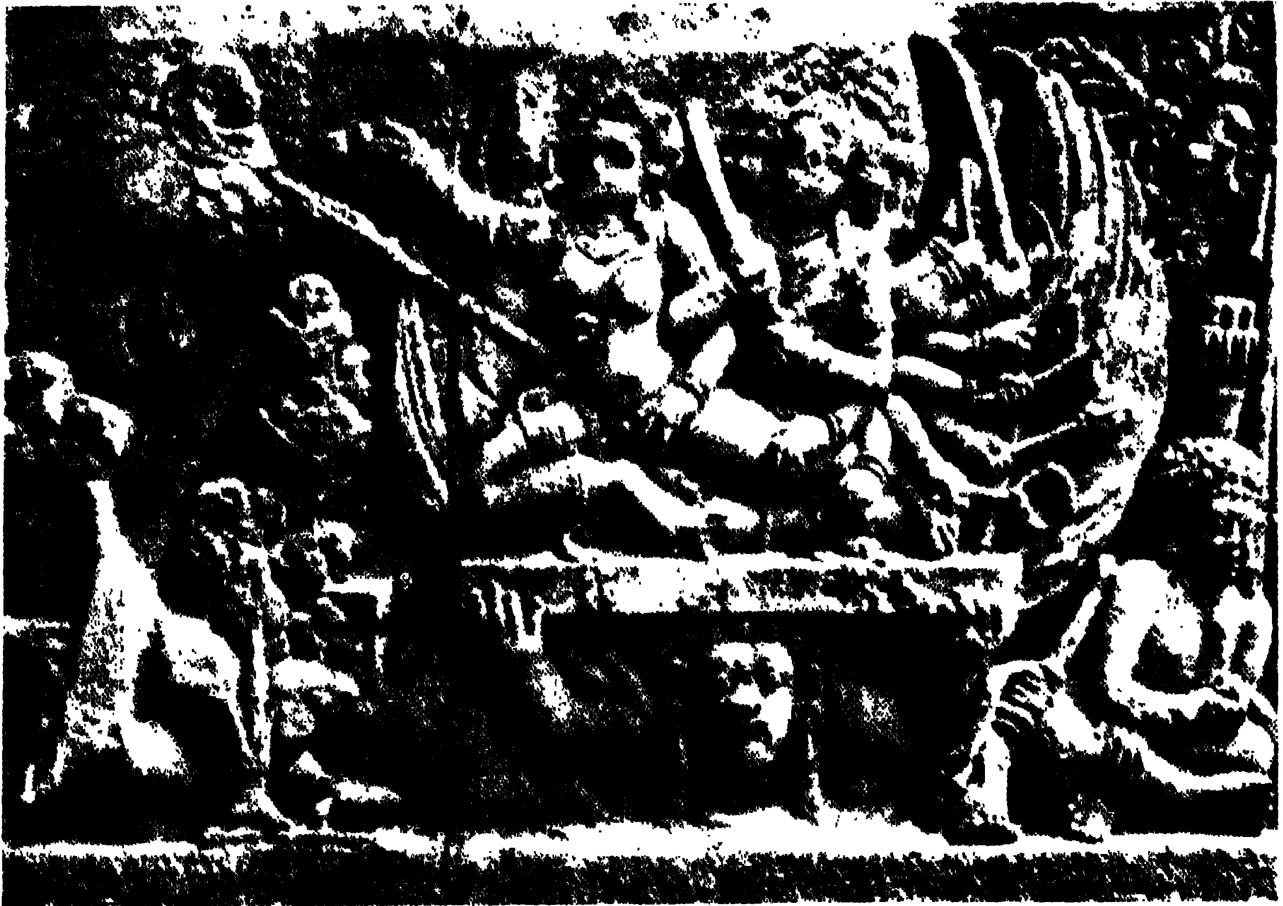


৯০ চিত্র · চাণ্ডিলোরো জোঙ্গ্রাং মন্দির, যবদ্বীপ

চিত্রফলক ৭৬



৯১ চিত্র—রামায়ণ চিত্র, বালিবধ, চাণ্ডিলোরো



৯১ক চিত্র—রাবণ জটায়ুর যুদ্ধ, চাণ্ডিলোরো

সংস্কৃত-পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শৈব, বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধ জনগণকে চম্পাবাসীরা সমভাবে সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার-প্রণীত গবেষণা-মূলক 'চম্পা'-গ্রন্থে চম্পারাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অন্য দুইটি মূল্যবান্ গ্রন্থ 'সুবর্ণ দ্বীপ' এবং 'কম্বুজ দেশ' সুমাত্রা ও শ্যামের অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করে। চম্পাপ্রসঙ্গে Dr. Goloubew, J. T. Claeys এবং Louis Finot-প্রণীত প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি অতীব মূল্যবান্।

যবদ্বীপ 'দ্বীপময় ভারতের' অন্তর্ভুক্ত। তথায় হিন্দুসভ্যতা প্রবর্ত্তিত হয় খৃঃ প্রথম শতকে। তদবধি দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া রামায়ণ ও মহাভারত তৎস্থানীয় অধিবাসিগণের ধর্ম্ম ও সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। বঙ্গ, উৎকল, কলিঙ্গ, অন্ধ্র, মদ্র ও সৌরাষ্ট্র হইতে যুগে যুগে হিন্দুগণ যবদ্বীপে অভিযান করিয়া বসবাস করিয়াছেন। প্রাচীনকাল হইতেই বিষ্ণু যবদ্বীপে পূজিত হইতেছেন। চারি হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত তথায় শৈবধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। অতঃপর হরিহর এবং শিবগুরু অগস্ত্যের পূজা প্রচলিত হয়। খৃঃ অষ্টম শতকে 'সুবর্ণ দ্বীপের' (সুমাত্রা) শ্রীবিজয় রাজ্যস্থ শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধনরপতি যবদ্বীপ অধিকার করিয়া তৎস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। অধিকারের একশত বৎসর মধ্যে 'দ্বীপময় ভারতে' বিশাল সপ্ততল বরবুদুর ব্যতীত চাণ্ডীকলসন প্রমুখ অতীব সুন্দর কয়েকটি বৌদ্ধ দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত হয় (৮৮-৮৯ চিত্র)। নবম শতকে শৈলেন্দ্র রাজ্যের অবসান হইলে দেশীয় পূর্ব্বতন রাজশক্তি যবদ্বীপের পূর্ব্বাঞ্চল হইতে প্রাম্বাণমে (ব্রহ্মবনং ?) আসিয়া তথা হইতে রাজ্যশাসন করিতেন। সেই সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই প্রাম্বাণমে সর্ব্বক্ষেত্রে সমান অধিকার পাইতেন। তখন চাণ্ডিলোরো জোঙ্‌গ্রাঙ্‌ প্রমুখ সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যে বরবুদুরের সমকক্ষ অনিন্দ্যসুন্দর হিন্দু মন্দিরসমূহ গঠিত হইয়াছিল (৯০-৯১ক চিত্র)। শিব- এবং বিষ্ণু-মন্দিরগাত্রে রামায়ণ, পুরাণ ও ভাগবতের শ্রেষ্ঠ কাহিনীসমূহ খোদিত হইয়াছিল। বরবুদুর স্থাপত্যের সুষমা তথা ভাস্কর্য্যের মাধুর্য্য পাহাড়পুরের গুপ্ত-পাল ও দক্ষিণভারতীয় চোল মন্দির হইতে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ডক্টর আনন্দকুমার কুমারস্বামী তদীয় *Indian and Indonesian Art*-গ্রন্থে বৃহত্তর ভারতীয় শিল্প- ও সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে বিশদভাবে চিত্রসহ আলোচনা করিয়াছেন।

K. With, A. Foucher, J. Ph. Vogel, C. R. Schoemaker, E. B. Havel এবং Greater India Society-প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকাগুলি বৃহত্তর ভারতপ্রসঙ্গে বহু তথ্য নির্ণীত করিয়াছে। উক্ত গ্রন্থগুলির সার চয়ন করিয়া অধ্যাপক অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী *Art of Java*-শীর্ষক একখানি সচিত্র তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাহাতে যবদ্বীপের ইতিহাস, শিল্প ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

১২৯৪ খৃষ্টাব্দে কীর্তিরাজ জয়বর্দ্ধন তৎকালীন রাজধানী মজপহিৎ-এর রাজ-সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রধানমন্ত্রী বীরকেশরী 'গজমদ' (১৩৪৩ খৃঃ) বলিদ্বীপ, নিউগিনি, সিলিবিস, বোর্ণিয়ো, পশ্চিম মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জ, মালয় এবং সুমাত্রা জয় করেন। শ্যাম, চম্পা ও আনাম মজপহিৎরাজের মিত্রশক্তিরূপে পরিগণিত হয়। সেই বংশের শেষ নরপতি বিজয় (১৪৭৮ খৃঃ) মুসলমান কর্তৃক পরাজিত হইয়া বলিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তদবধি যবদ্বীপ সুলতানশাসিত ভূভাগরূপে পরিচিত। কিন্তু অদ্যাপি যবদ্বীপের মুসলমান অধিবাসিগণ হিন্দু-আচার, বিচার ও বিশ্বাসের অনুসরণ করিতেছেন।

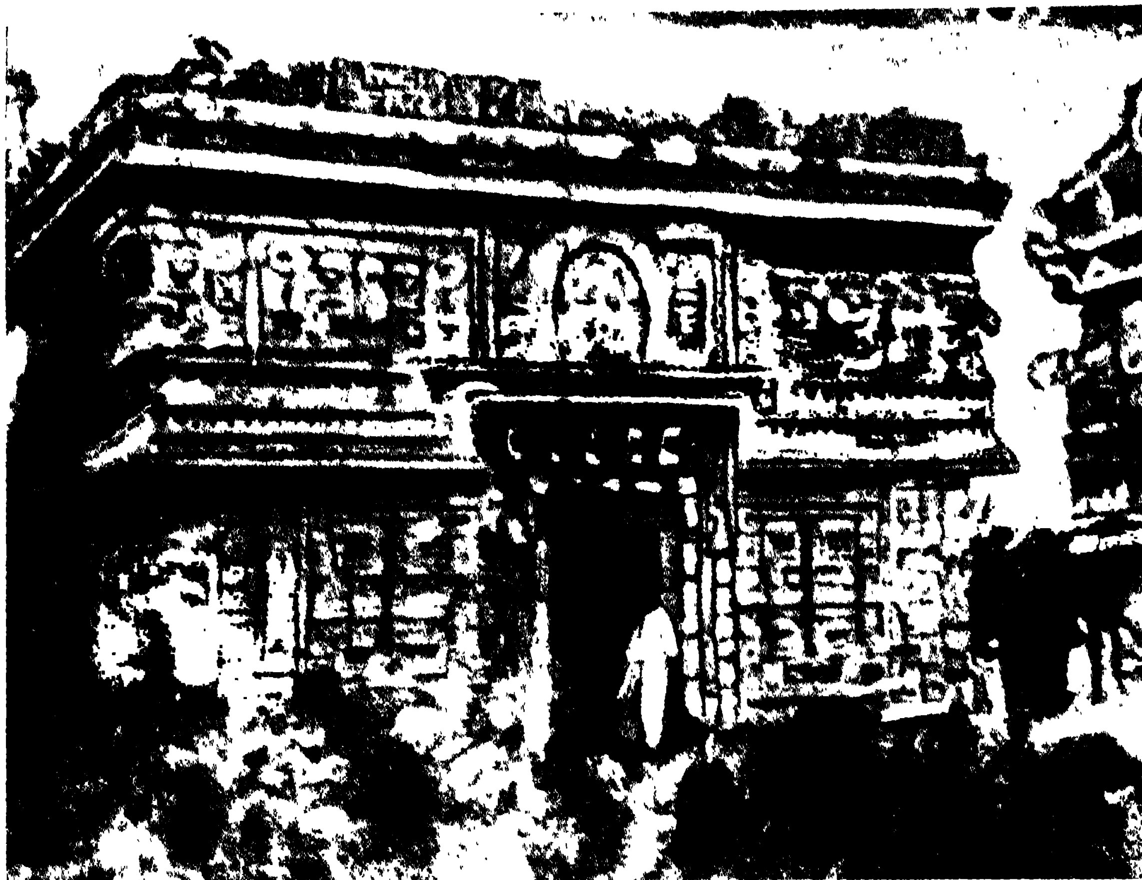
কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, হিন্দুবণিক্‌গণ একদা প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রমান্তে মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকাতেও উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। Prof. Raman, Mena, Hewith, Dr. Kischer, Prof. Ekholem, Shinden, Pococke, Luise Spence প্রভৃতি পণ্ডিত, মানবতত্ত্ববিদ্‌, পর্য্যটক এবং প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ প্রণীত গ্রন্থসকল সেই সেই দেশের প্রাচীন শিল্প ও সংস্কৃতির উপরে প্রাচ্যখণ্ডের তথা ভারতীয় প্রভাবের ইঙ্গিত প্রদান করে। অজণ্টা, পাহাড়পুর, আঙ্কর এবং বরবুদুর স্থাপত্যের সহিত, পৌরাণিক হিন্দু- ও বৌদ্ধ-দেবদেবীর লীলায়িত ভঙ্গিমার এবং সজ্জাভরণের সহিত Yucatan, Palenque, Mexico, Peru, Chichen Itza, Piedras Negras প্রভৃতি স্থানীয় মন্দির ও মঠস্থাপত্যের এবং মূর্তিশিল্পের অঙ্গবিশেষের অল্পবিস্তর সাদৃশ্য অনুভূত হয়। অধ্যাপক চমনলাল বলেন, আর্য্য-ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ ও শিল্পকলা ব্যতীত সমাজতান্ত্রিক ও লৌকিক বিবিধ প্রকার আচার-অনুষ্ঠান মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে একদা প্রভাবান্বিত

চিত্রফলক ৭৭



৯২ চিত্র—গণপতি, মধ্য আমেরিকা

চিত্রফলক ৭৮



৯৩ চিত্র—মঠ, মধ্য আমেরিকা

কঁ াশিয়াছিল। কয়েক বৎসর মেক্সিকো প্রদেশে গবেষণাকার্য্যে অবস্থিতির ফলে তিনি এই বিষয়ে *Hindu America* এবং *Who discovered America*-শীর্ষক একখানি সচিত্র পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। তথাকার প্রস্তরফলকে খোদিত শিব, গণপতি সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতির কয়েকটি মূর্ত্তি তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন (৯২ চিত্র)। সম্প্রতি বারাণসীর হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাদানকালে তিনি বলিয়াছেন যে, 'রেড ইণ্ডিয়ান' ভাষায় এপর্য্যন্ত তিনি ১,৫০০ সংস্কৃত শব্দ আবিষ্কৃত করিয়াছেন।

প্রাচীন আমেরিকার কোন কোন মন্দির ও মঠের স্থাপত্য-পরিকল্পনায় গুপ্ত-দ্রাবিড় স্থাপত্য প্রেরণা প্রদান করিয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয় (৯৩ চিত্র)। বর্ত্তমান লেখক নিউ ইয়র্কের Natural History Museum-এ রক্ষিত 'মায়াশিল্প'-বিভাগ হইতে সাঁচি ও ভরুৎ-এ খোদিত, শক্তিমন্ত ও গতিশীল, হস্তীর অনুরূপ 'মায়া'-হস্তী নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তথায় তিনি হিন্দুবিগ্রহের মুকুটের অনুরূপ মূর্ত্তির (বিগ্রহ ?) শিরোভূষণ ব্যতীত ভারতীয় পদ্ধতিতে বিরচিত ও খোদিত শঙ্খ, পদ্ম, মকর, নাগ প্রভৃতি এবং বিন্ধ্যপ্রদেশের গালিচার অনুকৃতি বয়নশিল্পও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বিগত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর যাবৎ মার্কিন পণ্ডিত ও প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন স্থাপত্য- ও সভ্যতা-প্রসঙ্গে গবেষণা করিতেছেন বৈজ্ঞানিকভাবে। কিন্তু তাঁহাদের বিবৃতিতে তথাকার প্রাচীন শিল্প ও সভ্যতায় ভারতীয় প্রভাবের উল্লেখ পাওয়া যায় না।

১৯৩০ সালে ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় 'মায়া'-সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত করিবার উদ্দেশ্যে মধ্য আমেরিকাতে যে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার অধিনায়ক J. Alden Mason খননের সাহায্যে, খৃঃ ষষ্ঠ শতকের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের কতিপয় নিদর্শন সংগ্রহ এবং প্রকাশিত করিয়াছিলেন। চিত্রশিল্পী H. M. Herget মায়া-জাতির সামাজিক চরিত্রের প্রসঙ্গে কয়েকটি ত্রিবর্ণ চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। উভয়বিধ নিদর্শনের কয়েকটিতে গুপ্তস্থাপত্য ও চিত্রকলার প্রভাব অনুভূত হয়। Mason তাহার উল্লেখ করেন নাই।

গুপ্ত-পাল বণিক্-সম্প্রদায় ভারতবর্ষ হইতে রুশীয় সাম্রাজ্যেও ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালিত করিতেন। রুশ ব্যবসায়িগণ কাস্পিয়ান উপত্যকা-সংলগ্ন এবং পশ্চিম

হিমালয় ভূভাগীয় বাণিজ্যপথে ভারতে পণ্যদ্রব্য লইয়া আসিতেন। রুশীয় লোক-সঙ্গীত, পল্লীগাথা এবং উপকথা—ভারতবর্ষ বিপুল ঐশ্বর্য্যময়, অতুল ধনভাণ্ডারপূর্ণ স্থান (Land of Wonderful Treasures...India the rich) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। পণ্ডিত Lev Uspensky তৎপ্রসঙ্গে ইংরাজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, রুশ পণ্ডিতমহলে বহুকাল যাবৎ ভারতীয় সাহিত্য, সভ্যতা ও শিল্প আদরণীয় হইতেছে। উনবিংশ শতকে ইতিহাসবেত্তা Karamzin রুশীয় ভাষায় 'শকুন্তলা' অনূদিত করিয়া রুশসাহিত্য সমৃদ্ধ করেন। রামায়ণ, মহাভারত, রঘুবংশ এবং পঞ্চতন্ত্র ব্যতীত আধুনিক রবীন্দ্রসাহিত্য রুশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। অজণ্টা, তাজমহল ও মাদুরা রুশীয় শিল্পী ও শিক্ষিত জনগণের বিস্ময়াকর্ষণ করিয়াছে। ভারতীয় স্থাপত্যশৈলীর সহিত মস্কো মহানগরীর বিশ্ববিশ্রুত St. Basil গির্জ্জা-ভবনের স্থাপত্যের সাদৃশ্য অনুভূত হয়।

বঙ্গীয় সংস্কৃতি ও তাহার বৈশিষ্ট্য

প্রথম বঙ্গীয় সংস্কৃতির ক্ষীণ আলোক অনুভূত হইয়াছিল বহু প্রাচীন 'ব্রাত্য'-সভ্যতায় যাহাতে বেদের প্রভাব ছিল না। ভাষাতত্ত্ব এবং মানবজাতির মূল বিভাগ ও পরস্পরসম্বন্ধ-বিষয়ক ইতিবৃত্ত ইঙ্গিত করে—সূত্রপূর্ব্ব যুগের বঙ্গভূমি বেদবিরোধী ব্রাত্য-অধ্যুষিত ছিল এবং অনার্য্য, দ্রাবিড় ও কিরাত (মোঙ্গল) বঙ্গদেশে বাস করিত। সিলভ্যাঁ লেভি প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাগৈতিহাসিক পূর্ব্বভারতীয় অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র এবং সুহ্মের ব্রাত্যসভ্যতার সহিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অস্ট্রিক (নিষাদ) সভ্যতার জাতিগত সংযোগ ছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত অথর্ব্ববেদে সমর্থিত। অধ্যাপক কালিদাস নাগ-প্রণীত *India and the Pacific World*-গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গের আদিম অধিবাসী—অস্ট্রিকজাতীয় মুণ্ডা, কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি। তাহাদের উপাস্য 'বোঙ্গা' হইতে বঙ্গনামের উৎপত্তি। আর্য্য-পূর্ব্ব সিন্ধুসভ্যতা এবং আর্য্য-পূর্ব্ব বঙ্গের ব্রাত্যসভ্যতা প্রায় সমসাময়িক, ইহা বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হয় না। উভয় সভ্যতার সহিত অস্ট্রিক সংস্কৃতি বিজড়িত। ক্রমশঃ সমগ্র পূর্ব্ব ভারতে আর্য্যাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত

হইলে, বঙ্গে অসুর (অস্ট্রিক-ব্রাত্য) সভ্যতার উপর আর্য্যাধিপত্য বদ্ধমূল হয় (৯৪ চিত্র)। এই প্রসঙ্গে বঙ্গীয় মনসাপূজার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মনসাপূজায় আর্য্য, অস্ট্রিক এবং দ্রাবিড় সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটিয়াছে। আর্য্য শিবকন্যার সহিত দ্রাবিড় সর্পদেবী ও অস্ট্রিক সিজবৃক্ষের সমন্বয়ে মনসার উদ্ভব (১৯ চিত্র)। বঙ্গদেশে আর্য্য-অনার্য্যের সংহতি যে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছিল, ইহা তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

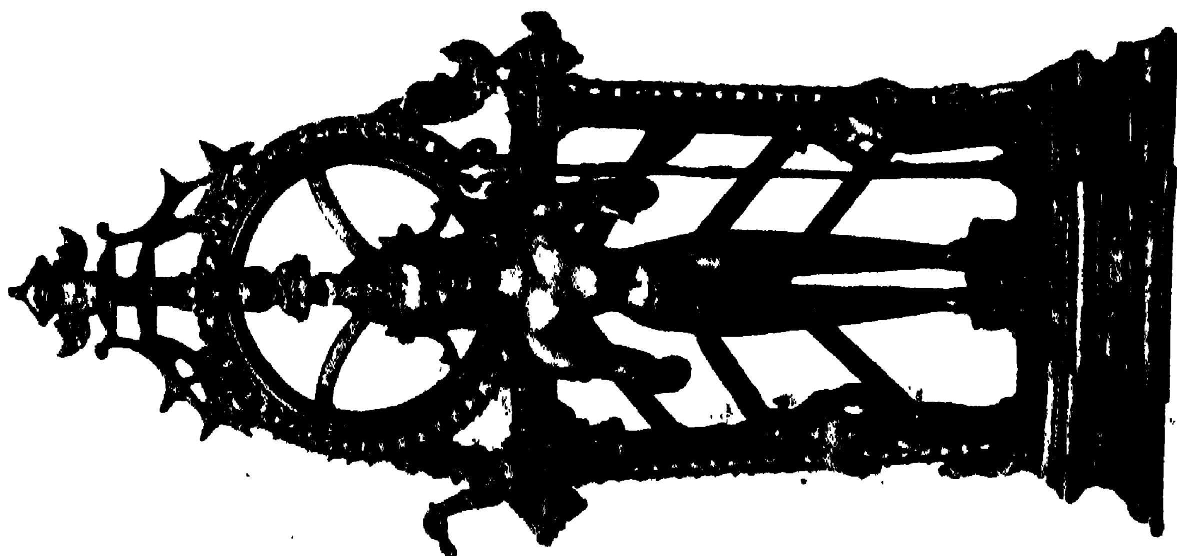
প্রাগৈতিহাসিক বঙ্গভূমির উল্লেখ ঋক্‌বেদের অনুগামী ঐতরেয় আরণ্যক, বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র, পতঞ্জলি, রামায়ণ, মহাভারত, মনুসংহিতা, সংযুক্তনিকায় ও শক্তিসঙ্গম প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। অজ্ঞাতবাসকালে পঞ্চপাণ্ডব বঙ্গদেশে অবস্থান করেন। বঙ্গের পুণ্ড্রবর্দ্ধন (মহাস্থানগড়, পাণ্ডুয়া)-বাসিগণ কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনের পক্ষে পাণ্ডবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। প্লিনি ও টলেমি গঙ্গাতীরবর্ত্তী সমতটভুক্তি বঙ্গকে 'গঙ্গরিডি' নামে অভিহিত করেন। জৈন- এবং বৌদ্ধ-সাহিত্যানুসারে করতোয়া নদীতীরে অবস্থিত বঙ্গরাজধানী পুণ্ড্রবর্দ্ধনের সহিত মৌর্য্যরাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ছিল। জৈন কল্পসূত্রে (খৃঃ পূঃ অষ্টম শতক) লিখিত আছে যে, তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিরুদ্ধে রাঢ় তাম্রলিপ্তি নগরে চতুর্যাম ধর্ম্মবাদ প্রচারিত করিয়াছিলেন। মহাস্থানে প্রাপ্ত একটি শিলালেখে উৎকীর্ণ আছে যে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন মৌর্য্যসাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। বুদ্ধের যুগে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) বঙ্গবাসী বণিক্‌গণ তাম্রলিপ্তি মহানগরীর বিপুল বন্দর হইতে বিরাট্ মাস্তুল ও বিশাল পাল-সমন্বিত 'ময়ূরপঙ্খী' অর্ণবপোত ভাসাইয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে সসম্মানে বাণিজ্য পরিচালনা করিতেন। সিংহলী ইতিবৃত্ত 'মহাবংশ'-গ্রন্থে (খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক) এবং সুপ্রাচীন 'আচারাঙ্গ সূত্র' জৈনসাহিত্যে রাঢ়ভূমির উল্লেখ বর্ত্তমান। জৈন তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমানস্বামী 'লাঢ়' (রাঢ়) দেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসও গঙ্গারাঢ় জনপদকে 'গণ্ডরিডি' নামে উল্লেখ করিয়াছিলেন। পাণিনির 'গণপাঠ', কৌটিল্যরচিত 'অর্থশাস্ত্র' ও বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' বঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছে। 'রঘুবংশ' বঙ্গমহিমা-বর্ণনায় উজ্জ্বল। বরাহমিহির-প্রণীত 'বৃহৎসংহিতা'য় বঙ্গপরিচয় বর্ত্তমান। ভারতের কলিঙ্গ,

তৈলঙ্গ, কর্ণাট, গুর্জ্জর (গুজরাট) প্রভৃতি প্রদেশের সহিত, বহির্ভারতের চীন, মালয়, যবদ্বীপ, কুশদ্বীপ, শঙ্খদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ, ময়ূরদ্বীপ (বোর্ণিও), শ্যাম, সিংহল, ব্যাবিলন, পারস্য, মিশর, ইতালী ও গ্রীস প্রভৃতি রাজ্যের সহিত, অবাধ বাণিজ্য-পরিচালনার অন্যতম প্রধান বন্দর-নগরী ছিল—প্রাচীন বঙ্গের সুসমৃদ্ধ রাজধানী সুপ্রসিদ্ধ সপ্তগ্রাম-সংলগ্ন, ত্রিবেণীর অদূরবর্ত্তী, একদা বিশালকায়া অধুনা শুষ্কপ্রায়া সরস্বতী নদীতীরে অবস্থিত। খৃঃ পূঃ প্রথম শতকে সপ্তগ্রাম বন্দর-নগরী হইতে চাউল, চিনি, গালা, মুক্তা, মস্‌লিন, রেশমী বস্ত্র এবং তুলট কাগজ রপ্তানি করা হইত। খৃষ্টজন্মের পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে সিংহলবিজয়ী 'সিংহবাহু' বিজয়সিংহ সপ্তগ্রামের সমীপবর্ত্তী সিংহগড়ে জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপ প্রবাদ আছে। এক্ষণে সিংহগড়ের অবশেষ সিঙ্গুর নামে পরিচিত।

সপ্তশত অনুচরসহ বিজয়সিংহ মাস্তুল-পালযুক্ত যে সুবৃহৎ অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া তাম্রপর্ণী (সিংহল) দ্বীপে গমন করেন তাহার প্রতিকৃতি অজন্টা গুহাচিত্রে পরিদৃশ্যমান (৯৫ চিত্র)। তাম্রপর্ণী-বিজয়ান্তে তিনি স্থানীয় রাজকুমারী কুবেণীকে বিবাহ করিয়া দ্বীপকে সিংহলে রূপান্তরিত তথা তত্রস্থ অধিবাসিগণের শিক্ষা, সমৃদ্ধি, সভ্যতা উন্নীত করেন। 'মহাবংশ' ও 'দ্বীপবংশ'-গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বিজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। খৃঃ পূঃ ২৪৩ অব্দে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের পুত্র মহেন্দ্র (মতান্তরে অশোকের ভ্রাতা) তাম্রলিপ্তি (তমলুক) নগরী-বন্দর হইতে সিংহলে অভিযান করেন। 'দশকুমারচরিত'-গ্রন্থে তাম্রলিপ্তি মহানগরীর নির্দ্দেশ আছে। 'পেরিপ্লস্'কার ও টলেমির মতে (খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) গ্রীক ব্যবসায়িগণ দক্ষিণ চীন সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত কয়েকটি স্থানের বৃত্তান্ত বাঙ্গালী বণিক্ ও নাবিকগণের সাহায্যে জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের বিশিষ্ট শিল্প-সংস্কৃতিকেন্দ্র তাম্রলিপ্তির তরণী ও অর্ণবপোত পরিপূর্ণ বিশাল বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে মহাচীন, জাপান, মালয়, চম্পা, কম্বোজ, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি রাজ্যে বাণিজ্যব্যপদেশে গমন করিবার ব্যবস্থা ছিল।

তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক পরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত তাম্রলিপ্ত-অঞ্চলীয় কয়েক স্থানে বহুসংখ্যক দগ্ধমৃত্তিকার মানব ও পশুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি এবং

চিত্রফলক ৭৯



৯৪ চিত্র—শিবচক্র, পশ্চিমবঙ্গ



৯৫ চিত্র—বিজয়সিংহের সিংহলযাত্রা

চিত্রফলক ৮০



৯৬ চিত্র—গুপ্ত ও শশাঙ্ক মুদ্রা

অন্যবিধ শিল্পনিদর্শন সংগৃহীত করিয়াছেন। নিদর্শনসমূহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সুরক্ষিত আছে। অনুমান হয়, তাহারা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর, মৌর্য্য-সুঙ্গ যুগের, বঙ্গীয় সংস্কৃতির অবদান। কয়েকটির সহিত গ্রীক-রোমক অথবা মিশরীয় মূর্ত্তির সাদৃশ্য অনুভূত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ তাম্রলিপ্ত-খননের ব্যবস্থা করিতেছেন।

ত্রিপুরাঞ্চলে আড়িয়লখাঁ নদীতীরে বহুসংখ্যক মৌর্য্য রৌপ্যমুদ্রা (কার্ষাপণ) সংগৃহীত হইয়াছে। সম্প্রতি পঞ্জাবপ্রদেশে খননকালে হড়প্পার সহিত বঙ্গের সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৌর্য্য ও গুপ্তযুগীয় বঙ্গের দগ্ধমৃত্তিকার সুমসৃণ, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তৈজসসমূহ তন্মধ্যে প্রধান। প্রাচীন বঙ্গরাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (মহাস্থানগড়) হইতে মৌর্য্য ও সুঙ্গযুগের লিপিলেখ, বহুবিধ পুত্তলিকা ও মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানে খননের ফলে হড়প্পার সহিত আর্য্যাস্থানের (ব্রহ্মাবর্ত্ত ?) যোগসূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অর্থশাস্ত্রের অভিমতে বঙ্গদেশের শ্বেতস্নিগ্ধ বাকল (দুকূল) প্রাচীন ভারতে গৌরবের বস্ত্র ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কার্পাসবস্ত্র 'মস্‌লিন' এশিয়া, য়ুরোপ এবং বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রপ্তানি করা হইত; 'পেরিপ্লস'কার তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। প্লিনি বলেন যে, রোমের মহিলাগণ মস্‌লিনের অনুরাগিণী ছিলেন। সপ্তদশ শতকে মস্‌লিন য়ুরোপের সর্ব্বত্র রপ্তানি করা হইত। তাভার্নিয়ের বলেন যে, ইরাণের রাষ্ট্রদূত মহম্মদ আলী-বেগ ভারত হইতে স্বদেশে ফিরিবার কালে, ইরাণের শাহ্‌কে উপহার দিবার জন্য ৬০ হস্ত দীর্ঘ, ২ হস্ত প্রস্থ ও ৮ তোলা ওজনের একখানি মস্‌লিন অতি ক্ষুদ্র একটি নারিকেলের খোলের ভিতর পূরিয়া লইয়া যান। মোগল-সম্রাজ্ঞী নূরজাহান ঢাকাই মস্‌লিনের কদর করিতেন। ভারতের বাহিরে মস্‌লিন রপ্তানি বন্ধ করার জন্য সম্রাট্ শাহ্‌জাহান সরকারি আদেশ জারি করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবও তদ্বিষয়ে সজাগ ছিলেন।

গুপ্তকালীন ভারতবর্ষ সমগ্র এশিয়ার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য- ও সংস্কৃতি-কেন্দ্র ছিল। গুপ্ত-ভারতের 'সুবর্ণযুগ' (Golden Age) প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, গুপ্ত-স্থাপত্য-সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল এবং সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও শশাঙ্কের অতুলনীয়

স্বর্ণমুদ্রাসমূহ সম্ভাবিত হইয়াছিল—গ্রীস, ইতালী, মিশর তথা বৃহত্তর ভারত হইতে অর্জ্জিত, বাণিজ্যলব্ধ সুবর্ণরাশির দ্বারা (১৬ চিত্র)। গুপ্তযুগেই, গুপ্ত রাজন্যবর্গের সহযোগিতায়, অস্ট্রিক-অধ্যুষিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের শিল্প ও সংস্কৃতি বহুধা উন্নীত হয়। গুপ্তযুগে শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশীগণের সংঘর্ষে পশ্চিম এশিয়ার এবং পূর্ব্ব য়ুরোপের সহিত ভারতীয় বাণিজ্য পরিচালনা কষ্টসাধ্য হইলে, বৃহত্তর ভারতের সহিত এদেশীয় ব্যবসাবাণিজ্য প্রবলভাবে পরিচালিত হয়। তাম্রলিপ্তি হইতে ক্ষৌম, দুকূল, কৌষেয় এবং কার্পাসবস্ত্র—'মেঘউদুম্বর, গঙ্গাসাগর, লক্ষ্মীবিলাস' প্রভৃতি পট্টাম্বর শাড়ী—নারিকেল, ইক্ষুর চিনি, লবণ, বিবিধ ধাতু, মূল্যবান্ প্রস্তর এবং দারুময় কারুদ্রব্য, মৃৎশিল্প, গজদন্ত, গণ্ডারের খড়্গ, শঙ্খবলয়, মণি, মুক্তা, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য ও তৈজস প্রভৃতি ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে, পাশ্চাত্ত্য ভূভাগে এবং পূর্ব্ব এশিয়াস্থিত বিভিন্ন রাজ্যে প্রেরিত হইত। পসরা পণ্যপূর্ণ 'বিশহাথী, আঠাইশা, পঁচিশা' পর্য্যায়ভুক্ত 'সিংহমুখী, ব্যাঘ্রমুখী, হস্তিমুখী, শঙ্খচূড়' নামক সওদাগরী অর্ণবপোত ও বিচিত্র তরণীসমূহ 'তারাবিদ্, পবনবেত্তা, সাগরবেত্তা' প্রভৃতি সুদক্ষ নাবিকগণ চালনা করিতেন। চাঁদ সদাগরের সুবৃহৎ 'মধুকর'-অর্ণবপোত বহু শত ক্ষেপণী (দাঁড়)-বিশিষ্ট ছিল, এইরূপ প্রবাদ বর্ত্তমান। মিলিন্দের বিবেচনানুসারে ধনধান্যে, ফলফুলে, শস্যশিল্পে ও ব্যবসাবাণিজ্যে পরিপূর্ণ নদীমাতৃক বঙ্গদেশ তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠ উর্ব্বর, সমৃদ্ধিশালী, বাণিজ্যপ্রধান ভূভাগরূপে দেশে বিদেশে পরিচিত ছিল।

খৃঃ পঞ্চম শতকের প্রারম্ভে ফা-হিয়েন্ তাম্রলিপ্তি মহানগরে দ্বাবিংশসংখ্যক বিহার দেখিয়াছিলেন। অন্যান্য চীনা-পর্য্যটকগণও বঙ্গের নানাস্থানে বহুসংখ্যক বৌদ্ধবিহার ও চৈত্যমন্দির নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি সাঁচির তোরণসদৃশ তোরণচিহ্নিত ক্ষুদ্র একটি মৃৎফলক তমলুকে সংগৃহীত হইয়াছে। তৎকালে বঙ্গদেশ মগধসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভে, গুপ্তসাম্রাজ্যাবসানের প্রাক্কালে, পশ্চিমবঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের প্রয়াস হয়। অতঃপর আনুমানিক ৬০৩ খৃষ্টাব্দে, শশাঙ্কদেব স্বাধীন নরপতিরূপে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভারতের গঞ্জাম হইতে উত্তরে বারাণসী পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ স্বীয়

অধিকারভুক্ত করেন। ঐতিহাসিক যুগে শশাঙ্কই প্রথম বঙ্গসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার মোহরখচিত বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা এবং কয়েকটি তাম্রশাসন নালন্দায় ও অন্যত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদীয় রাজধানী কর্ণসুবর্ণ বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের ছয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।

অষ্টম শতকের মধ্যভাগে উত্তরবঙ্গে, পালরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে, 'মাৎস্যন্যায়'-উচ্ছেদকারী এক অভিনব গণতান্ত্রিক শাসন উদ্ভূত হয়। তাহার প্রতিষ্ঠাতা গোপালদেব সমগ্র বঙ্গের সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক গৌড়-মগধ রাজ্যের অধিনায়ক ও অধিপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন (৯৭ চিত্র)। এতাদৃশ সর্ব্বজনপ্রিয় নরপতি-নির্ব্বাচন ও সর্ব্বজনীন রাষ্ট্রগঠন অতীত ভারতে অজ্ঞাত। ইতিহাসপ্রণেতা কেহ কেহ অনুমান করেন, গোপালদেবই গৌড় মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা এবং তদীয় রাজত্বকাল (৭৬৫-৬৯) হইতেই গৌড়ের ইতিহাসের আরম্ভ। খালিমপুর তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ আছে তদীয় পুত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপালদেবের প্রভুত্ব সিন্ধু, কান্দাহার, পঞ্জাব ও কাংড়ার নরপতিগণ স্বীকার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল (৭৭০-৮১৫) পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহার এবং ভাগলপুরের নিকটবর্ত্তী পাথরঘাটায় বিক্রমশিলা মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা। তারানাথের মতে তাঁহার পুত্র দেবপালই সোমপুর বিহার এবং বর্ত্তমান কালে পরিচিত বিহার সরিফ সমীপে ওদন্তপুরী বিহার প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পাহাড়পুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে উক্ত মহাবিহারের সহিত ধর্ম্মপালের নাম সংশ্লিষ্ট আছে। দেবপাল (৮১৫-৫৪ খৃঃ) পালসাম্রাজ্য আসাম ও উড়িষ্যা হইতে কম্বোজ ও তিব্বত পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়াছিলেন। তিনি গুর্জ্জর-প্রতিহারবংশীয় মিহিরভোজ, রাষ্ট্রকূটবংশীয় অমোঘবর্ষ এবং হূণগণকে পরাজিত করেন। মুঙ্গের ও নালন্দার তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ আছে যে, তাঁহার আধিপত্য হিমালয় হইতে সেতুবন্ধ এবং পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মালয়ের অধিপতি শৈলেন্দ্রবংশীয় বালপুত্রদেব পালবংশীয় দেবপালের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়া দূতের মাধ্যমে নালন্দায় একটি চৈত্য-বিহার প্রতিষ্ঠাকল্পে পঞ্চসংখ্যক গ্রামদানের অনুরোধ করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পরম পৃষ্ঠপোষক উদারহৃদয় দেবপাল বালপুত্রদেবের অনুরোধ সসম্মানে

রক্ষা করিয়া বিহার প্রতিষ্ঠার অবশেষে বীরদেব নামধেয় বৌদ্ধশাস্ত্রে সুপণ্ডিত একজন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নালন্দা মহাবিহারের পরিচালকরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ভেরী-তুরী-ঢাক-ঢোল-কাড়া-দাগড়ার রণবাদ্যসহ যুদ্ধযাত্রাকালে সম্রাট দেবপাল পঞ্চাশৎ সহস্র রণকুঞ্জর এবং রথী, পদাতি ও অশ্বারোহী সৈন্যসামন্তগণের বস্ত্র ধৌত করিবার নিমিত্ত পঞ্চদশ সহস্র রজক সঙ্গে লইতেন। তৎকালে কুঞ্চিতকেশ ও মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ ডোম ও বাগদীগণ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারূপে বিবেচিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের বীর্য্যকাহিনী গ্রীকজাতির কর্ণগোচর হইয়াছিল। একাদিক্রমে চারিশত বৎসরকাল যাবৎ উত্তর ভারত শাসন করিতে কেবলমাত্র পালরাষ্ট্রই সক্ষম হইয়াছিল। অতীত ভারতে দাক্ষিণাত্যে চালুক্যরাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোনও রাষ্ট্রের এবম্বিধ সুদীর্ঘকালব্যাপী রাজ্যপালনের দৃষ্টান্ত অজ্ঞাত। বঙ্গবীর 'গদাধর' দাক্ষিণাত্যে বেলারীপ্রদেশে একটি এবং বঙ্গীয় মেদিনীপুরের (তাম্রলিপ্তি) মল্ল-সম্প্রদায় পঞ্জাবসীমান্তে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। চৌহানপতি পৃথ্বীরাজের সহিত মহম্মদ ঘোরীর যুদ্ধকালে পৃথ্বীরাজের সেনাপতিরূপে বঙ্গের 'উদয়রাজ' রণক্ষেত্রে প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন। 'বাংলায় ভ্রমণ'-প্রণেতা শ্রীঅমিয় বসু লিখিয়াছেন, "পাঞ্জাবের উত্তর ও পূর্ব্বস্থিত হিমালয়ের অন্তর্গত কাশ্মীর, পুঞ্চ, সুকেত, মণ্ডী ও জুব্বার পার্ব্বত্যরাজ্যের বর্ত্তমান অধিপতিগণ বাংলার সেন রাজবংশ হইতে উদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মণ্ডী ও সুকেত রাজবংশের কুলপঞ্জিকা হইতে জানা যায় যে, লক্ষ্মণ সেনের বংশধর......রূপসেন পাঞ্জাবে গমন করিয়া রূপর নামক স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করেন এবং ক্রমে ক্রমে মণ্ডী, সুকেত প্রভৃতি রাজ্য এই বংশের অধিকারে আসে।" উক্ত গ্রন্থে বঙ্গীয় ইতিহাস ও শিল্পসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

আন্তর্জাতিক ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনে বঙ্গের অবদান, বৈষ্ণবদর্শনের নববিকাশ, চণ্ডীতন্ত্রের উদ্ভব

ধর্ম্মপাল, দেবপাল ও বিগ্রহপালের রাজত্বকালে গুপ্ত স্থাপত্যশিল্প ও সভ্যতা নবভাবে বিকশিত হইয়া গৌড়রাজ্যে উদার পালসংস্কৃতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল।

সুগভীর ভাগীরথীতীরে পাল রাজধানী গৌড় মহানগরী সুমসৃণ কৃষ্ণ প্রস্তরের সৌধমালা-পরিশোভিত বিস্তৃত রাজপথ বেষ্টিত ছিল। রাজা রামপালদেবের মন্ত্রী ও সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত কাব্য' উল্লেখ করিয়াছে যে, গৌড়ের প্রত্যন্তে রাজা রামপাল-প্রতিষ্ঠিত নব রাজধানী রমাবতী মহানগরী সুপ্রশস্ত রাজপথ, সুবর্ণমণ্ডিত কলসখচিত অতিকায় দেবায়তন, নয়নাভিরাম কিরীট এবং শৃঙ্গশোভিত বহুদূরবিস্তৃত সৌধাবলী, ফলফুলের রমণীয় উপবন এবং বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকাসমন্বিত ছিল। রমাবতী নগরে বহুসংখ্যক ধনাঢ্য বণিক্ ও শ্রেষ্ঠীর বসতি ছিল। রমাবতী জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থানরূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য-আভিজাত্য-গরিমাময় পালযুগের বঙ্গভাষায় সঙ্কলিত সহস্র-বৎসর প্রাচীন, সুবৃহৎ পুঁথি 'চর্য্যাপদ' নেপালে সংগৃহীত হইয়াছে। অতীতকালে বহুবিধ বাংলাগ্রন্থ চীনা ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। গৌড় হিন্দু ও বৌদ্ধের অপূর্ব্ব মিলনতীর্থ। গৌড়ে হিন্দু- ও বৌদ্ধ-সংস্কৃতির সমন্বয়ে পালশিল্প অভূতপূর্ব্বভাবে বিকশিত হইয়াছিল। পালযুগেই বঙ্গীয় তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি। বঙ্গের তন্ত্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধদর্শনের প্রকৃত ঐক্যসাধন করে। যদিও শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে বুদ্ধাবতারের উল্লেখ আছে, বাংলার তন্ত্রই ভাগবতের সহিত বৌদ্ধদর্শনের প্রকৃত মিলন সংঘটিত করিয়াছিল। দ্বাদশ শতকে গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের শ্রেষ্ঠ সভাসদ্ মহাকবি জয়দেব-বিরচিত 'গীতগোবিন্দে' বিষ্ণুর দশবিধ অবতারের নবম অবতাররূপে ভগবান্ বুদ্ধ কীর্ত্তিত। পালসংস্কৃতি প্রাচীন জৈনদর্শনের মূল তথ্যকেও ব্রাহ্মণ্যদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করে। পালযুগে রাজসাহী-সান্নিধ্য পাহাড়পুরে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও বৈষ্ণব অধ্যাত্মধারাসমূহের সঙ্গম হইয়াছিল। অবশেষে হিন্দুধর্ম্মের তান্ত্রিক- (সৌর-শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব) এবং ইসলাম-সংস্কৃতির সহিত বৌদ্ধ- ও জৈন-দর্শনের মিলনজনিত মহামানবতাবাদের মহান্ আদর্শ উদ্দীপিত হয়। পাহাড়পুর স্তূপমন্দিরের অদূরে সত্যপীরের ভিটা আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বাদশ শতকে দাক্ষিণাত্যের শ্রীরামানুজ-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব মতবাদ হিমালয়স্থ শ্রেষ্ঠ শৈবতীর্থ কেদারনাথ ধামের সানুদেশে অবস্থিত বিশিষ্ট বৈষ্ণবতীর্থ ত্রিযুগীনারায়ণ হইতে বদরীনারায়ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং সাধু তুলসীদাসকে তদীয় অমর গ্রন্থ রামায়ণ-প্রণয়নে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। শ্রীরামানুজ দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে বৈষ্ণবসংস্কৃতির অভিনব

বিকাশ সংসাধিত করেন। তিনিই লক্ষ্মীনারায়ণ ও রামসীতারূপী যুগল বিগ্রহপূজার প্রবর্ত্তক। তদীয় বৈষ্ণবদর্শন চালুক্যস্থাপত্যের নববিকাশের পথনির্দ্দেশ করিয়াছিল।

রামানুজের পরে, পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পশ্চিমবঙ্গে বিষ্ণুতত্ত্বের নূতন তথ্য উদ্ঘাটিত করিলেন। সমগ্র ভারতে তাঁহার অত্যুদার ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচারিত হইল। তিনি অর্কক্ষেত্রের পুরীধামকে পুরুষোত্তম বৈষ্ণবতীর্থে রূপায়িত করিয়া, প্রথিতযশাঃ বৈদান্তিকাচার্য্য বাসুদেব সার্ব্বভৌমের এবং মহাস্থবির রামগিরির দার্শনিক মতবাদের পরিবর্ত্তন করিয়া, প্রবল পরাক্রান্ত উৎকল-নরপতি 'দুর্গাবরপুত্র', 'গজপতি', 'মহাশৈব' প্রতাপরুদ্রদেবকে স্বীয় বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন (৯৮ চিত্র)। শ্রীচৈতন্যের যুগে অধ্যাত্মচর্চ্চার সহিত সুষ্ঠু সাহিত্যানুশীলনের মধুর সমন্বয় বঙ্গীয় সংস্কৃতির নব-অভ্যুদয়ের ভিত্তি স্থাপন করে। শ্রীগৌরাঙ্গের প্রভাবে শক্তি-উপাসনাতেও ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হয়। শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন পরিবেশন করিয়া তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে আচণ্ডাল হিন্দু-মুসলমানকে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা করিলেন। কলিযুগধর্ম্মপ্রসঙ্গে বৃহৎ নারদীয় পুরাণের "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"—এই শ্লোকটি হইতে হরিনামের অপার মহিমা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে আর্য্যবৈদিক সভ্যতার সহিত বঙ্গীয় প্রাচীনতর ব্রাত্যসংস্কৃতির মিশ্রণ সূচিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ চতুর্থ-তৃতীয় শতকে উত্তরবঙ্গে আর্য্য উপনিবেশ বর্ত্তমান ছিল, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। তাহার পঞ্চদশ শত বৎসর পরবর্ত্তী বঙ্গে, মগধ-গৌড় সংস্কৃতির পুনর্গঠনে, বৈদিক প্রভাবের প্রাচুর্য্য অনুভূত হয়। তৎকালীন তাম্রশাসনে মধ্য ভারত হইতে আনীত ঋক্‌বেদী, সামবেদী এবং যজুর্ব্বেদী তথা ভরদ্বাজ-, কশ্যপ-, অগস্ত্য- ও বাৎস্য-গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণকে বাস করাইবার জন্য ভূমিদান, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, দৈনন্দিন দেবদেবীপূজা এবং যজ্ঞক্রিয়ার ব্যবস্থা উৎকীর্ণ আছে। পার্ব্বত্য ত্রিপুরার শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যেও মধ্য-ভারতীয় চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণের বাসের জন্য উপনিবেশ-স্থাপনের ব্যবস্থা একটি তাম্রপট্ট প্রমাণিত করে। বঙ্গাধিপতি আদিশূর (৭৩২ খৃঃ) বেদজ্ঞ, নিষ্ঠাপরায়ণ পঞ্চজন ব্রাহ্মণকে কনৌজের অধিপতি যশোবর্ম্মার নিকট হইতে আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে স্থায়িভাবে বাস করাইবার বন্দোবস্ত

চিত্রফলক ৮১

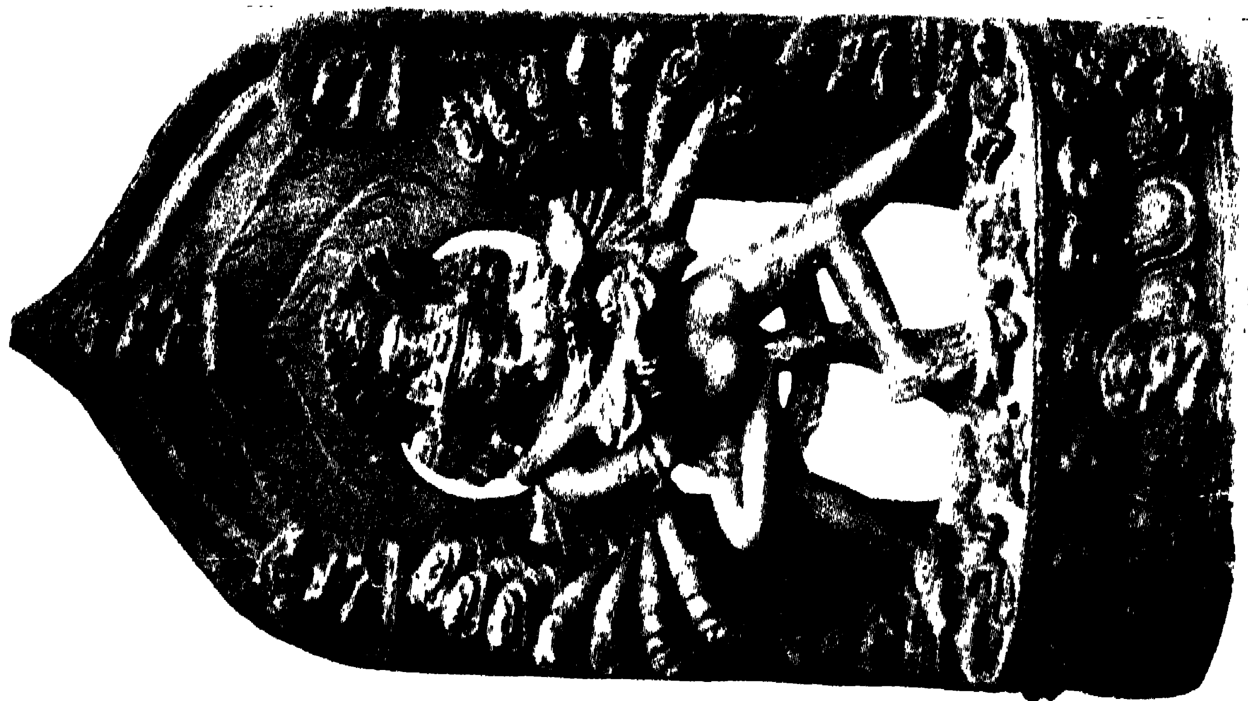


৯৭ চিত্র—গোপালদেবের রাজ্যাভিষেক



৯৮ চিত্র—শ্রীচৈতন্য ও প্রতাপরুদ্র

চিত্রফলক ৮২



ত্র – হেবজ্র, উত্তরবঙ্গ



৯৯ চিত্র— রাধাকৃষ্ণ, পাহাড়পুর

চিত্রফলক ৮৩



১০২ চিত্র—গঙ্গা, উত্তরবঙ্গ

চিত্রফলক ৮৪



০২ চিত্র— শ্রীরামকৃষ্ণদেব

করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সহিত পঞ্চজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। গুপ্ত, পাল, সেন ও শূর নরপতিগণ কেবলমাত্র বেদপ্রচারের অভিপ্রায়েই যে বৈদিক ব্রাহ্মণগণকে মগধে ও গৌড়ে আনীত করেন তাহা নহে। তাঁহারা সনাতন ধর্ম্মকে উপেক্ষা করেন নাই। পুরাণোক্ত দেবদেবীর পূজার্চ্চনার নিমিত্ত তাঁহারা বিধিমত বন্দোবস্তও করিতেন এবং তজ্জন্য তাঁহারা নাগরশৈলীর বহুসংখ্যক দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

খৃঃ অষ্টম শতকের শেষভাগে পূর্ব্বকথিত ধর্ম্মপালদেব পাহাড়পুরে 'সর্ব্বতোভদ্র'-পর্য্যায়ী যে বিরাট্ স্তূপমন্দির নির্ম্মিত করেন তাহা বঙ্গীয় শিল্প ও সংস্কৃতির পরম গৌরবস্বরূপ। সমচতুর্ভুজ, সমচতুষ্কোণ, ক্রমসূক্ষ্ম, সু-উচ্চ দেবায়তন চতুষ্পার্শ্বস্থ চতুঃসংখ্যক গর্ভগৃহবিশিষ্ট এবং উপরিভাগস্থ অষ্টকোণে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখর এবং চূড়াসহ শোভমান ছিল। অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকে ও সুদৃঢ় মৃত্তিকায় গ্রথিত হইয়াছিল দেবায়তনের বিপুল কলেবর। এক্ষণে সেই বিশাল মন্দির মর্ম্মন্তুদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত (৮৪ চিত্র)।

মন্দিরের পাদপীঠগাত্রে কৃষ্ণরাধা প্রমুখ পৌরাণিক দেবদেবী ও দগ্ধ মৃত্তিকার পশুপক্ষি- ও সরীসৃপ-সমন্বিত বহুসংখ্যক শিল্পফলক দৃশ্যমান। সম্ভবতঃ পাহাড়পুরেই কৃষ্ণরাধার যুগলমূর্ত্তি প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মপাল-প্রতিষ্ঠিত সোমপুর মহাবিহার সমগ্র ভারতের সমুদয় বিহারগুলির মধ্যে বৃহত্তম ছিল। অতীব বৃহৎ চতুরস্র ভূখণ্ড আচ্ছাদিত করিয়া বিহারের ভগ্নাবশেষ বিক্ষিপ্ত। সমচতুর্ভুজ বিহারের চতুর্দিকে সু-উচ্চ প্রাচীর ছিল। প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগ-সংলগ্ন সমচতুর্ভুজ বিহার প্রাঙ্গণের চারিদিকে প্রশস্ত বারান্দাবিশিষ্ট সারিবদ্ধ কক্ষশ্রেণী নির্ম্মিত হইয়াছিল। বারান্দার নিম্নে সমচতুষ্কোণ অঙ্গন। অঙ্গনের মধ্যভাগে অতিকায় চৈত্য-দেবায়তন ও কারুকার্য্যমণ্ডিত স্তম্ভশোভিত সভামণ্ডপ। নালন্দার 'মহাবিহার', পুণ্ড্রবর্দ্ধনের 'ভাস্ব' বিহার এবং কর্ণসুবর্ণের 'রক্তমৃত্তি' বিহারের সারিবদ্ধ কক্ষসমূহ-সংলগ্ন চতুরস্র অঙ্গনবেষ্টনী বারান্দা, চৈত্যমন্দির ও সভামণ্ডপ সোমপুর বিহারের অনুরূপভাবেই বিন্যস্ত হইয়াছিল।

সেনযুগীয় বঙ্গে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির নব-অভ্যুদয়কালে গৌড়ীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও মৃৎশিল্প এবং তৎপরে পটচিত্র, কন্থা, তক্ষণ ও আলিম্পনশিল্প উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল।

কলিকাতার ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ম ব্যতীত রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প-সংগ্রহশালায় পাল ও সেনযুগের বহুবিধ শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিসহ সুকুমার শিল্পের রমণীয় নিদর্শনসমূহ সংরক্ষিত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে পাল ও সেনযুগের উৎকৃষ্ট ভাস্কর্য্য ও তক্ষণশিল্প ব্যতীত উড়িষ্যার কারুকলা, বাঙ্গালার মৃৎশিল্প, পট, পুত্তলিকা, কন্থা ও তৈজস প্রভৃতি এবং আধুনিক যুগের সুকুমার শিল্প প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহ-শালায় বঙ্গীয় চারু ও কারুশিল্পের কতিপয় শ্রেষ্ঠ সামগ্রী সুরক্ষিত আছে। স্বর্গীয় বাহাদুর সিং সিংঘীর প্রসিদ্ধ শিল্পশালায় শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি, কারুকলা, বহুবিধ তৈজস ও রাজস্থানী চিত্র ব্যতীত গুপ্তযুগের সুবর্ণমুদ্রা, মধ্যযুগের অস্ত্রশস্ত্র, বহুবিধ পদক ও তাম্রপট্ট প্রভৃতি তদীয় পুত্র শ্রীনরেন্দ্র সিং সিংঘী সুন্দরভাবে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছেন।

কিন্তু য়ুরোপ ও আমেরিকার মিউজিয়মে পিরামিড ও গির্জ্জা প্রভৃতির 'মডেল'সমূহকে কেন্দ্র করিয়া ভাস্কর্য্য, চিত্র, ধাতুময়- ও দারুময়-শিল্প যেরূপ অঙ্গাঙ্গি-ভাবে সুবিন্যস্ত আছে ভারতবর্ষে তাহা দুর্লভ। স্থাপত্যের সহিত অন্যবিধ সুকুমারশিল্প অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। তাহারা স্থাপত্যরূপী মহীরুহের ফলফুলের সমতুল। বাংলার মিউজিয়মে পাহাড়পুর, গৌড়, কান্তনগর, বিষ্ণুপুর, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থানের শিল্পসমৃদ্ধ মন্দিরের, প্রাসাদের এবং বিশিষ্ট বিশিষ্ট কুটীরের অনুকৃতি (মডেল)-সমূহকে কেন্দ্র করিয়া তৎসংশ্লিষ্ট বিবিধ সুকুমারশিল্প অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রদর্শিত হইলে বঙ্গের শিল্প ও সভ্যতার সর্ব্বাঙ্গীণ ও সম্যক পরিচয় একযোগে সহজেই প্রদত্ত হইত। সুকুমারশিল্পের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন সমাবেশ অঙ্গহীন ও অর্থহীন হয় না কি ?

খৃঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগে গৌড়দেশে কৃষ্ণরাধার লীলামূলক বৈষ্ণবদর্শনের উৎপত্তি। মথুরা মহানগরীর কৃষ্ণবাসুদেব-প্রবর্ত্তিত প্রাচীন ভাগবততন্ত্র এবং গুপ্তযুগে মগধে প্রচলিত ভাগবত (বৈষ্ণব)-তন্ত্র গৌড়বঙ্গে উদ্ভূত বৈষ্ণব-মতবাদ হইতে বিভিন্ন ছিল। বেদ ও ব্রাহ্মণের বিষ্ণু ও নারায়ণ, ভাগবত ও পাঞ্চরাত্রের বাসুদেবকৃষ্ণ এবং পুরাণোক্ত গোপারাধ্য গোপালকৃষ্ণের পারম্পরিক আরাধনাপদ্ধতির সমন্বয়ে গুপ্ত-

পাল-সেনযুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব (ভাগবত)-ধর্ম্ম-উদ্ভূত। অবশেষে মীন, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ প্রভৃতি দশাবতার লীলার মহানায়ক বিষ্ণুসূর্য্য (নারায়ণ) বঙ্গদেশে সৌর-প্রকৃতির সৃজন- ও পালন-শক্তির প্রতীকরূপে বৈষ্ণবসমাজে পূজা পাইলেন।

মহাভারতে—কৃষ্ণবাসুদেব-প্রবর্ত্তিত ভাগবতদর্শনে—ব্রজগোপীর উল্লেখ নাই। বিষ্ণুপুরাণে গোপীগণ শান্ত ও পবিত্রভাবেই পরিচিতা। হরিবংশে তাঁহারা বিলাসিনী। অতঃপর ভাগবতপুরাণে গোপীপ্রসঙ্গে আদিরসের সূচনা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে আদিরসের স্ফুরণ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মধ্যযুগীয় বঙ্গীয় বৈষ্ণবতন্ত্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাকবিগণ উক্ত পুরাণের প্রেরণায় তাঁহাদের কৃষ্ণ-গীতিকাব্যসমূহ রচিত করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তদীয় অভিনব বৈষ্ণবতন্ত্রে আদিরস বিবর্জ্জিত তথা প্রেমপ্রধান শুদ্ধভক্তিবাদের প্রবর্ত্তনকরতঃ সভ্যতার ইতিহাসে যুগান্তর ঘটাইলেন।

প্রাথমিক বৈষ্ণবধর্ম্ম বৈদান্তিক ঈশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষ্ণু এবং তাঁহার অবতার কৃষ্ণবাসুদেব বৈদান্তিক পরমেশ্বরের প্রতিভূ। ভাগবত তথা বিষ্ণুপুরাণ অদ্বৈতবাদাত্মক। জগৎ এবং জীবগণ ঈশ্বরের অংশ। ঈশ্বর পরমাত্মা। জীবাত্মা তাঁহার অংশবিশেষ। ঐশ্বরিক মায়া হইতে জীবাত্মা উদ্ভূত। সেই মায়া হইতে মুক্ত হইলে জীবাত্মা ঈশ্বরের সহিত একত্বলাভ করিবে। ইহাই অদ্বৈতবাদের মর্ম্মকথা।

অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ বিবিধভাবের। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য্য এবং বল্লভাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া অদ্বৈতবাদ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ এবং বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ—এই চারি প্রকার ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ঈশ্বর এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের প্রসঙ্গে দুই প্রকার ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচলিত ছিল। প্রথম—ঈশ্বরই জগৎ, তদ্ভিন্ন কোনও জাগতিক পদার্থ নাই; ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। দ্বিতীয়—ঈশ্বর জগৎ বা জগৎ ঈশ্বর নহেন; কিন্তু ঈশ্বরময় জগৎ—সূত্রে 'মণিগণা ইব।' ঈশ্বর জাগতিক সর্ব্বপদার্থে বিদ্যমান আছেন এবং তদতিরিক্ত তিনি। প্রাথমিক কৃষ্ণভাগবত (বৈষ্ণব)-ধর্ম্ম এই দ্বিতীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিত।

বৈষ্ণবধর্ম্ম দার্শনিক যুক্তিবিচারের সহিত অধ্যাত্মানুভূতির সমন্বয় সাধন করিয়াছে। অদ্বৈতবাদ অথবা অবতারবাদের সহিত বৈষ্ণবদর্শনের বিরোধ নাই। জ্যোতির্ম্ময়-বাসুদেব-বিচ্ছুরিত অমিতশক্তি-তড়িৎপ্রবাহী তেজঃপুঞ্জ অনন্ত নভোমণ্ডলকে প্রভান্বিত, কম্পায়িত, স্পন্দায়িত করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির চিরন্তন বিবর্ত্তনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। আধ্যাত্মিক শক্তিকেন্দ্রের (spiritual dynamism) পরিচালক পরমপুরুষ বিষ্ণু-নারায়ণ অপ্রমেয় তড়িৎশক্তি সঞ্চালিত করিয়া সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতি যোজনা করিতেছেন, অপিচ মহামানবের চিত্তাকাশ দিব্যালোকে উদ্ভাসিত করিয়া সচ্চিদানন্দ-বৃত্তি প্রকটিত করিতেছেন।

শ্রীভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা শক্তি 'হ্লাদিনী', তথা শ্রীকৃষ্ণসহ মধুরভাবে নিত্যমিলনরতা 'মোহিনী' যিনি—সেই শ্রীরাধার পরিকল্পনা গৌড়ীয় সংস্কৃতির অমর অবদান। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, গর্গসংহিতা প্রভৃতি এতৎপ্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছে। "পরকীয়াভাবে শ্রীরাধাগোবিন্দের সহিত মিলন এবং সখীর অনুগা হইয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগলসেবা"—এই তত্ত্বজ্ঞান তথা উপাসনাপদ্ধতি বাঙ্গালীর নিজস্ব। শ্রীরাধা শক্তি ও সত্যের মিলনাধার। শ্রীকৃষ্ণের অংশ তিনি। সাংখ্যে 'প্রকৃতি'র সহিত 'পুরুষের' মিলন দর্শনে, অপরোক্ষভাবে নহে, যথা 'স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়'—শ্রুতি। সাংখ্যদর্শনে পুরুষের অংশশক্তিরূপে প্রকৃতি পরিচিতা। রাধিকা—অংশস্বরূপা শক্তি ; প্রকৃতি—অংশশক্তি-বহিরঙ্গা।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে বৈদিক আর্য্যসভ্যতার সহিত অসুর-অস্ট্রিক বঙ্গসভ্যতার মিশ্রণ সূচিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ পূর্ব্ব ভারতে আর্য্যাধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইলে বঙ্গভূমির বিশিষ্ট, উন্নত, সভ্যতার উপর আর্য্যপ্রভাব প্রসারিত হয়। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহু শত বৎসর পূর্ব্বে, মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালে—বঙ্গের পূজাপার্ব্বণে ও ধর্ম্মাচরণে, বঙ্গের সাহিত্যে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্য্যে, চিত্রে ও নৃত্যসঙ্গীতে, বঙ্গবাসিগণের পারিবারিক ও সামাজিক চরিত্রে, ধ্যানধারণা, যোগসাধনা ও পরিকল্পনার ভাবপ্রকাশে—অভিনব বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রতিমায় ও ভাস্কর্য্যে গুপ্তশিল্পের ঈষৎ প্রভাব থাকিলেও তাহারা বাঙ্গালীর নিজস্ব—আত্মস্থ ভাবকেন্দ্রিক—ধ্যানধারণা-

প্রসূত রসোপলব্ধিতে সমৃদ্ধ। ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্পে তাহারা হয়ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পাহাড়পুরের কৃষ্ণরাধার সুডৌল দেহসৌষ্ঠবে নিরুপম নিটোলতা, ভাবপ্রবণ ওষ্ঠপুটে মর্ম্মস্পর্শী মৃদু হাসি—শ্যামল-অঙ্গ বঙ্গজননীর কমনীয় কোমলতার প্রতিবিম্ব (৯৯ চিত্র)। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত ধাতুময় পালভাস্কর্য্য 'সশক্তি হে বজ্র' নটরাজের দোসর (১০০ চিত্র)। মিথুনমূর্ত্তির এতাদৃশ অনাবিল আনন্দপ্রসূত স্বচ্ছন্দ গতিশীলতা, সুললিত ভঙ্গিমা ও লাবণ্যসুষমা—অতুলনীয় এবং অনবদ্য। রাজসাহীতে প্রাপ্ত প্রস্তরের 'গঙ্গা'মূর্ত্তি—শক্তি-তেজে, সৌন্দর্য্য-গাম্ভীর্য্যে দিদারগঞ্জ যক্ষীর সহিত উপমেয় (১০১ ও ৪৩ চিত্র)।

বঙ্গদেশের 'দোচালা, চৌচালা ও আটচালা' কুটীরশৈলীর স্বতঃস্ফূর্ত্ত কোমলতার সহিত উৎকল তথা উত্তর-ভারতীয় নাগর-রেখ স্থাপত্যের সজীব দৃঢ়তার সমন্বয়ে তমলুকে (তাম্রলিপ্তি) বর্গভীমা (পার্ব্বতী), বিষ্ণুপুরে মদনমোহন, দিনাজপুরে কান্তজী এবং গুপ্তিপাড়ায় বৃন্দাবনচন্দ্রের যে-সকল দেবায়তন নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাদের শক্তিমন্ত সুললিত গঠন অনিন্দ্যসুন্দর (৩২-৩৪ চিত্র)। ঐ সকল দেবায়তনের গাত্রদেশে উৎকীর্ণ বলদীপ্ত দেবদেবী ও মানবমানবীসহ সরস-সরলতা-সিঞ্চিত ভাবপ্রবণ পশু-পক্ষি-পুষ্প-লতার কমনীয় মৃৎফলক-গঠনে হয়ত ধীমান্ ও বীতপাল-প্রতিষ্ঠিত পাল-শিল্পীসঙ্ঘের সাধক কর্ম্মিগণ বংশানুক্রমে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুরের বহু স্থানেই বঙ্গীয় ও উৎকল-স্থাপত্যের মিশ্রণে 'বেকি, আমলক, খপুরি ও পীড়' সন্নিবিষ্ট 'চারচালা' দেবালয় পরিদৃষ্ট হয়। কেশিয়াড়ীর সুঠাম সুন্দর সর্ব্বমঙ্গলা-মন্দির (খৃঃ ষোড়শ শতক) তন্মধ্যে একটি। উৎকল-মন্দিরের অনুযায়ী সর্ব্বমঙ্গলার বিন্যাসে গর্ভমন্দিরের পুরোভাগে জগমোহন এবং তৎপরে নাটমণ্ডপ বিরাজমান। কোমলতার সহিত দৃঢ়তার মধুর সমন্বয় হইয়াছে সর্ব্বমঙ্গলার অনাড়ম্বর গঠনশিল্পে।

প্রাক্-বৈদিক, অসুর-অস্ট্রিক শক্তি ও তেজ বঙ্গের বিশিষ্ট শিল্পসাধকগণ বর্জ্জন করেন নাই। অথচ সুশ্যামলা ধন-ধান্য-পুষ্পভরা নদীমাতৃক বাংলার কোমল প্রকৃতির অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন তাঁহারা। শক্তি-তেজশীলা দশভুজা দুর্গা ব্যতীত শক্তি ও গতিশীল দশভুজ নটরাজ সমগ্র

ভারতের মধ্যে কেবলমাত্র বাংলার সমতটেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। মৎস্যপুরাণোক্ত আনন্দমুদ্রায় বিভোর দশভুজ-নৃপ-নটেশের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত পঞ্চ হস্ত খড়গ, শক্তি, দণ্ড, ত্রিশূল ও বরদানভঙ্গিমা এবং বামপার্শ্বস্থিত পঞ্চসংখ্যক হস্ত খেটক, কপাল, নাগ, খটভঙ্গ ও জপমালা ধারণ করিয়াছে। অপূর্ব্ব এই নটরাজের সত্তায় কোমলতা ও কঠোরতা, ক্ষমা ও শক্তি, পালন ও শাসনের মধুর সমন্বয়! বাংলায় লোকেশ্বর এবং প্রজ্ঞাপারমিতা যথাক্রমে সূর্য্য ও সরস্বতীরূপে পূজিত হইয়াছেন। যুগনদ্ধ শ্রীহেরুক এবং দশহস্ত-, ছত্রিশহস্ত- ও শতহস্ত-বিশিষ্ট বোধিসত্ত্বও হিন্দুসাধারণের পূজা পাইয়াছেন। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চাতুর্ব্বর্ণ্য হিন্দুসমাজ হিন্দু এবং বৌদ্ধ দেবদেবীর যুগপৎ আরাধনা করিতেন। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইসলামীয় সংস্কৃতির মহামিলন বঙ্গদেশে যেরূপ পরিপূর্ণভাবে সমাহিত হইয়াছিল অন্যত্র তদ্রূপ হয় নাই। পাহাড়পুরে তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে।

বাংলার গ্রামে গ্রামে, বনে জঙ্গলে, নানাবিধ অপৌরাণিক লৌকিক দেবদেবীর পূজা প্রচলিত আছে। মোহেন্-জো-দড়োর সহিত সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রপাল, কালিয়াদানা, হেঁটাল চণ্ডী, নেকড়াই চণ্ডী, বনদুর্গা প্রভৃতি হিন্দুসমাজের নিম্নস্তরে অনার্য্য প্রথামত পূজিত হয়েন। বাঁকুড়া-অঞ্চলীয় পোখরনায় প্রাপ্ত যক্ষীমূর্ত্তি হয়ত প্রাচীন বঙ্গে অর্চ্চিত হইত (১৬ চিত্র)। কিন্তু বৈদিক, পৌরাণিক, আর্য্য ও অনার্য্য ধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতির অপূর্ব্ব মিশ্রণ হইয়াছিল বঙ্গের আপন আরাধ্য ধর্ম্মঠাকুরের অর্চ্চনায়। আর্য্য ও অনার্য্য কয়টি দেবতার প্রতিনিধি ধর্ম্মঠাকুর। বৈদিক বরুণ ও রথারূঢ় সূর্য্য, অবৈদিক কূর্ম্মাবতার, অশ্বারোহী পাদুকা-পরিহিত ইরানীয় সিপাহী মিহির, ভবিষ্যপুরাণের কল্কি অবতার এবং অনার্য্য কূর্ম্মদেবতার প্রতীক্ পাষাণখণ্ড, অথবা ধাতুময় কূর্ম্মবিগ্রহ, ধর্ম্মঠাকুরের প্রতিভূরূপে পূজিত হইত। কূর্ম্মবিগ্রহের পৃষ্ঠদেশে ধর্ম্মঠাকুরের পাদুকাচিহ্ন। প্রকৃতপক্ষে, উক্ত চিহ্নই আসল ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক্। তৎকালীন স্বাধীন বঙ্গের আসুরিক তেজ ও শক্তিসম্পন্ন, যুদ্ধবিশারদ, ডোম-সম্প্রদায় ধর্ম্মপূজার প্রধান অধিকারিরূপে স্বীকৃত হইয়াছিল। ধর্ম্মঠাকুর স্থানে স্থানে শিব অথবা বিষ্ণুরূপে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদ্বারাও পূজিত হইতেন। ধর্ম্মপূজার উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ এবং ঠাকুরের গাজনপ্রসঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

ডক্টর সুকুমার সেন-প্রণীত গবেষণামূলক 'প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী'-গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। গাজনের প্রধান অঙ্গ 'কালীকাচ' অর্থাৎ কালীবেশে নরমুণ্ডহস্তে পূজারির উদ্দাম রণনৃত্য। ধর্ম্মপূজার অনুষ্ঠানে জাঙ্গুলী (জাগুলী) অর্থাৎ জঙ্গলচারিণী সর্পদেবী মনসার পূজাও অপরিহার্য্য (১৯ চিত্র)। একাদশ শতাব্দীর ও পরবর্ত্তী বঙ্গীয় স্থাপত্যে, স্থানবিশেষে, মনসামূর্ত্তি উৎকীর্ণ হইত।

বঙ্গের চণ্ডীতন্ত্রের শক্তিমন্ত্রেই হিন্দুদর্শনের সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ। পালযুগে ব্রাহ্মণ্য এবং মহাযানী বৌদ্ধসংস্কৃতির সমন্বয়ে উদ্ভূত স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র ও সাহিত্য প্রকৃতপক্ষে উক্ত তন্ত্রের অবদান। বিংশ শতাব্দীর বস্তুতান্ত্রিক, যান্ত্রিক সভ্যতা ভারতের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও মনীষাকে যখন উচ্ছেদ করিবার উপক্রম করিতেছিল, বাংলার পূর্ণবিকশিত চণ্ডীতন্ত্রই তখন ভারতীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। মাত্র তাহাই নহে; অখণ্ডনীয় যুক্তি ও অপরাজেয় শক্তির মাধ্যমে বেদ-উপনিষদসম্ভূত উদার হিন্দুধর্ম্মকে দৃঢ়তর এবং উন্নততর করিয়াছে। যুক্তিমান্, শক্তিমান্ ঈদৃশ মহাশক্তি-তন্ত্রের প্রবর্ত্তক, পরম সাধক—অহরহঃ আধ্যাত্মিক ভাবোন্মত্ত—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বেদবেদান্তের মহান্ আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কোরান ও বাইবেল প্রভৃতির বিশিষ্ট বিশিষ্ট ধর্ম্মবিশ্বাসসমূহকে উপেক্ষা না করিয়া, স্বয়ং বিবিধ ধর্ম্মের অনুশীলন ও কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া, অতীত-বর্ত্তমান সর্ব্বযুগের সর্ব্বদেশের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মদর্শনের সার-ভাগের সমন্বয়ে—বিশ্বমানবের মর্ম্মস্পর্শী, সর্ব্বভূতের কল্যাণকরী, সাকার ও নিরাকার অর্চ্চনা ও উপাসনার সামঞ্জস্য সংঘটনকরী—অপূর্ব্ব আন্তর্জাতিক প্রেমমন্ত্রের অভয়বাণী ঘোষিত করিয়াছেন। সত্য-শাশ্বত-সঙ্গীতমুখরা ভাগীরথীর পুণ্যপীযূষধারা-পরিপ্লাবিত দক্ষিণেশ্বরের আম্রকুঞ্জস্থিত পঞ্চবটীবেদিকা এবং আদ্যাশক্তি মহাকালী-মন্দিরের স্বর্ণচক্রচূড়া তাঁহার পরমঘোষণাকে অহরহঃ প্রতিধ্বনিত করিতেছে (১০২ চিত্র)।

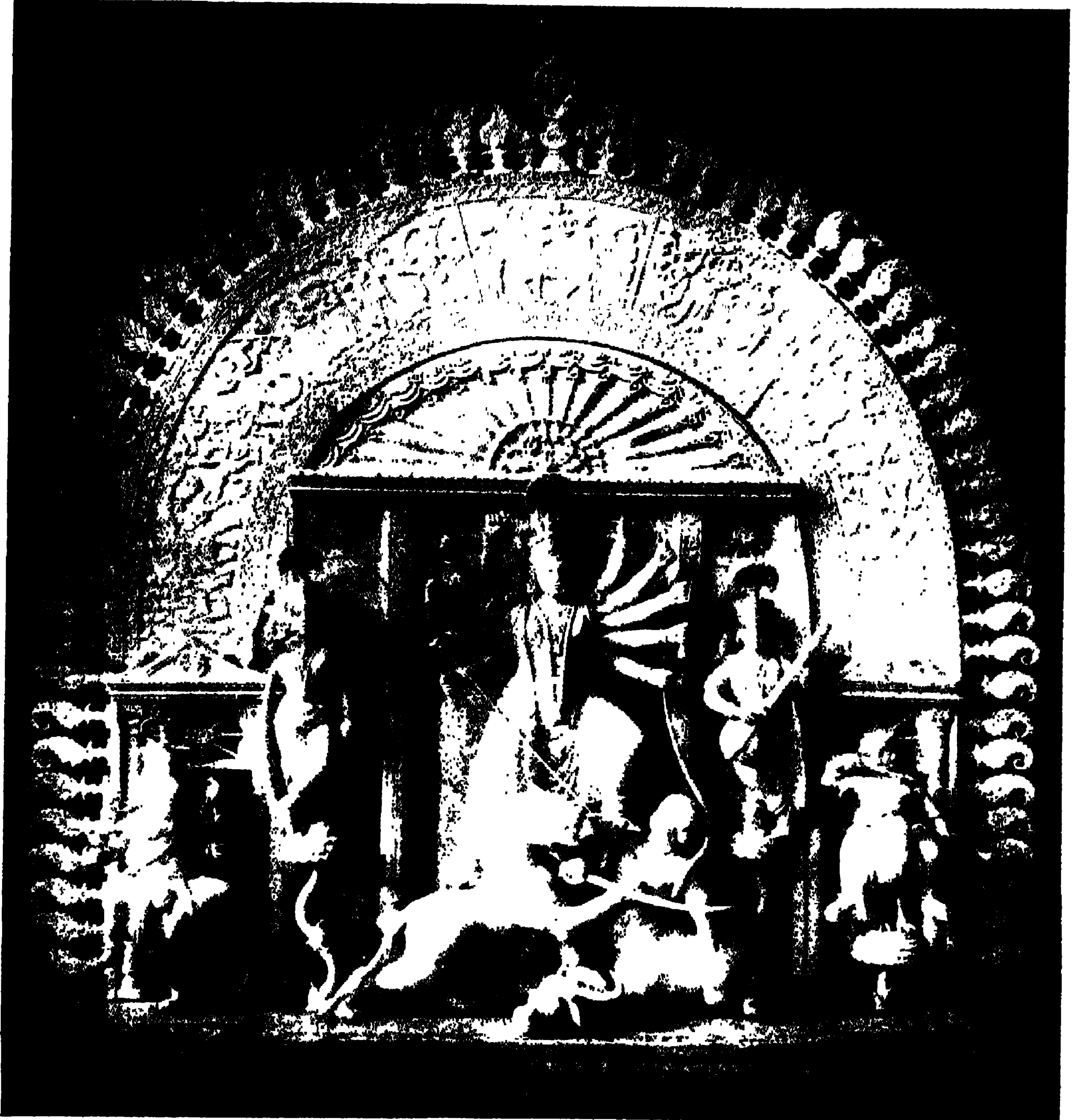
গীতা ও চণ্ডী হিন্দুর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহের অন্তর্গত। উভয়ের মধ্যে এই প্রভেদ যে, গীতার ভক্তবৎসল কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের রথপরিচালনা এবং অর্জ্জুনকে দ্রোণাচার্য্য ও ভীমকে জরাসন্ধবধের পরামর্শ প্রদান করা সত্ত্বেও, প্রত্যক্ষভাবে সংহারকার্য্যে স্বয়ং-নিষ্ক্রিয়; কিন্তু চণ্ডীর শ্রীদুর্গা স্বহস্তে অসুরগণকে সংহার করিয়াছেন। কৃষ্ণ বেদ-উপনিষদোক্ত পরব্রহ্মস্বরূপ নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয়।

কিন্তু চণ্ডী (শ্রীদুর্গা) সেই পরব্রহ্মেরই 'শক্তি'রূপিণী। মহাশক্তিময়ী মহামায়া তিনি। আদ্যাশক্তি 'প্রকৃতি'রূপে তিনি বিশ্বের সৃজন-, পালন- ও সংহার-কর্ত্রী। তাঁহার অনন্ত শক্তি 'পুরুষ'রূপী শিবকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। তিনি কাম, ক্রোধ ও লোভের প্রতীক্ শুম্ভ, মহিষাসুর ও মধুকৈটভের নিধনকর্ত্রী। অসুরকুল যখন দেবকুলকে পরাজিত, লাঞ্ছিত করিয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিল—দেবতাগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের প্রত্যেকের আপন আপন শক্তিকে সমবেত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া অসুরগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করিতে হইবে। অন্যথা তাঁহাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। তখন তাঁহারা নিজ নিজ শক্তির শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ একত্রিত করিয়া অপূর্ব্ব, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, মহাবলশালিনী দুর্গার সৃষ্টি করিলেন। বঙ্গদেশে শ্রীদুর্গা সঙ্ঘবদ্ধ-গণশক্তির প্রতীক্। দশ দিক্ হইতে গণদেবতাগণ নিজ নিজ শক্তি (আয়ুধ) লইয়া দেবীকে কেন্দ্র করিয়া সম্মিলিত হইলেন। তাঁহার নয়নত্রয় সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নির প্রতীক্। বিত্ত, বিদ্যা, বীর্য্য ও বুদ্ধির প্রতীক্ লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণপতি দেবগণের সহিত একত্রিত হইলেন—অজ্ঞতা-দুর্নীতি-অত্যাচারের প্রতীক্ মহিষাসুরকে নিধন করিতে। সিংহ সংযমের এবং ত্রিশূল সামাজিক অনুশাসনের প্রতীক্। সিংহবাহিনী শ্রীদুর্গা মহিষাসুরকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া, ত্রিশূল (অনুশাসন)-দ্বারা তাহার দুর্নীতিপরায়ণ দুর্গত জীবনের অবসানকরতঃ সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠা করিলেন (১০৩ চিত্র)।

সত্যযুগে দেবতাগণের এবং মহর্ষি কাত্যায়নের আরাধনাতুষ্টা দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা দুর্গা মহাষ্টমী তিথিতে, মহিষাসুরকে সংহার করিয়া দেবলোকের দেবসমাজকে দুর্গতি হইতে রক্ষা করেন। ত্রেতায় রঘুপতি রামচন্দ্র মহানবমী দিবসে শ্রীদুর্গার অকালবোধন ও মহাপূজাসমাপনান্তে লঙ্কেশ্বর দশাননকে নিধন করেন। দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধিক্ষণে কৃষ্ণবাসুদেবের নির্দ্দেশানুসারে অর্জ্জুন শ্রীদুর্গার স্তব ও আরাধনা করিয়া কুরুক্ষেত্র মহাসমরে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চণ্ডীতন্ত্রে ব্রহ্মস্বরূপিণী সেই আদ্যাশক্তির স্তবস্তুতি ঘোষিত হইতেছে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

চিত্রফলক ৮৫



২০৩ চিত্র - হস্তিদন্তে খোদিত শ্রীদুর্গা, মধ্যবঙ্গ

চিত্রফলক ৮৬



১০৪ চিত্র—গৌরীশঙ্কর

বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্বজনপালনকারিণী শ্রীদুর্গা স্নেহময়ী জননীরূপেও পূজনীয়া। আদ্যাশক্তি ব্রহ্মময়ীকে জগৎজননীরূপে পূজার্চ্চনা ও আরাধনা চণ্ডীতন্ত্রসাধনার আদি-পীঠভূমি বঙ্গের নিজস্ব।[১১] সেই মহীয়সী মাতৃশক্তিকে পুনরুদ্দীপিত করিতে এবং নিষ্পেষিত, সঙ্ঘশক্তিবিস্মৃত, হিন্দুজনগণকে জাতীয়তার ঐক্যমন্ত্রে পুনর্দীক্ষিত করিতে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম্' মহাসঙ্গীত রচিত করিয়াছেন।

বেদ ও শ্রীমদ্ভগবৎ গীতার সারতত্ত্বগুলি চণ্ডীতন্ত্রে নিহিত। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কঠোর শক্তিসাধনাপ্রসূত শান্তিমন্ত্র—ব্রাহ্মণ্য গীতা, বৌদ্ধ ত্রিপিটক, জৈন ধর্ম্মসূত্র এবং চণ্ডীতন্ত্রের সমন্বয়সম্ভূত। 'শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' আন্তর্জাতিক মহাসঙ্গীত। তাহা মহামানবের মোক্ষমন্দিরে সর্ব্বজীবে করুণাপরায়ণ, সত্যকামী ও শান্তিকামী নরনারীদের সাদরে আবাহন করিতেছে। ভগবান্ রামকৃষ্ণ উপনিষদুক্ত পরমব্রাহ্মণের প্রতিভূ। সমাধির পূর্ব্বে ভাবের আবেশে তিনি পুরুষ ও প্রকৃতির যুগ্ম সত্তা প্রকটিত করিতেন।

ভারত সভ্যতার জনক গৌরীশঙ্করশীর্ষ-হিমালয়

হিমালয়ে বৈদিক ব্রাহ্মণ-বিরচিত ব্রহ্মাণ্ডপ্রসারী দর্শনশাস্ত্র—ভারতীয় মূর্ত্তি-বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের মূলশক্তি যোগাইয়াছিল (১০৪ চিত্র)। দার্শনিক ধ্যান ও ধারণা, দেবদেবীর প্রতিমায় সাঙ্কেতিক স্ফুরণ ও বিবিধ ভঙ্গিমার যোজনা করিয়াছিল। সেই স্ফুরণের পরিণতি—জটামুকুটধারী গৌরীশঙ্করের প্রতীক্ নটরাজের সৃজন ও সংহারমূর্ত্তি। নটরাজের চারিভুজ ডমরুধারণ, অভয়প্রদান, অগ্নিধারণ এবং গজহস্তমুদ্রায় বিন্যস্ত। ডমরু হইতে সৃষ্টি, অভয় হইতে স্থিতি ও অগ্নি হইতে

---

১১ বৃহৎসংহিতাকার শক্তিপূজার উল্লেখ করিয়াছেন। সংহিতারচনার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শক্তি 'মাতৃকা'রূপে মোহেন্-জো-দড়োর গৃহে গৃহে পূজা পাইতেন (৬ চিত্র)। অবশেষে তিনি 'ব্রহ্মাণী, মহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, বরাহী, ইন্দ্রাণী এবং চামুণ্ডী'রূপে বরণীয়া হয়েন। 'মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী' রূপিণী শাখাশক্তিগণ 'আদ্যাশক্তির' নির্দ্দেশমত বিশ্বের পরিচালনা করিতেছেন ;—ইহা তন্ত্র হইতে জানা যায়।

লয়ের সঙ্কেত নির্দ্দেশিত হইতেছে। নমিত গজহস্ত বামপদ দেখাইয়া মুক্তির ইঙ্গিত করিতেছে। নৃত্যভঙ্গিমায় উত্থিত বামপদ অনুগ্রহের (মুক্তি) সঙ্কেত করিতেছে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম তদীয় সৃজন- ও সংহার-নৃত্যের স্পন্দনে বিচ্ছুরিত ও বিকম্পিত হইতেছে।

হিমালয় দেবদেবীর লীলানিকেতন। হিমালয়ের প্রেরণায় ভারতের দেবায়তন পরিকল্পিত। নগরাজের গর্ভগুহা-আবেষ্টন ও আচ্ছাদনকারী গৌরীশঙ্কর ও কৈলাস-শৃঙ্গের আদর্শে বিষ্ণুমন্দিরের ও শিবমন্দিরের গর্ভগুহাকে পরিবেষ্টিত এবং আচ্ছাদিত করিতে যথাক্রমে চতুরস্র-সূচল বিষ্ণুবিমান ও স্তূপিকাশীর্ষ শিবশিখর পরিকল্পিত ও পরিগঠিত। মন্দিরস্থ গর্ভগৃহ—বিশ্বসৃজনকর্ত্তা প্রজাপতি পরমব্রহ্মসৃষ্ট আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবিন্দু হিরণ্যগর্ভের প্রতীক্। মন্দিরের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে হিমালয়াধ্যুষিত পশুপক্ষী, তরুলতা, পত্রপুষ্প, দেবদেবী, যক্ষযক্ষী, মানবমানবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। অধিকন্তু শরীরী-অশরীরী জীবজগতের বাস্তব ও কল্পিত জীবনের ঘটনাবলী তথা পুরাণের কাহিনী খোদিত ও চিত্রিত রহিয়াছে। দেবগৃহের কারুমণ্ডন এবং চিত্রকলা সৃজনশীলা প্রকৃতিদেবীর সৌন্দর্য্যরচনার ভাব, ভাষা ও ছন্দের অনুসরণ করিয়াছে।

দেবায়তন ব্রহ্মাণ্ডস্রষ্টা ব্রহ্মণ্যদেবের প্রতিভূ। বিরাট্‌পুরুষ ব্রহ্মণ্যদেবের 'সমভঙ্গ' মুদ্রার সঙ্কেতমত অবক্র (সমভঙ্গ) দেবায়তনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত তথা স্থাপত্যশৈলী ছন্দায়িত হইয়াছিল। ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে বিরাট্ লিঙ্গরাজের অবক্র মন্দির তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাণবন্ত-ভাস্কর্য্যমণ্ডিত পূর্ণ-প্রস্ফুটিত মন্দির-স্থাপত্যের মাধ্যমে গৌরীশঙ্করের প্রতীক্ উন্নতশির-সমভঙ্গ লিঙ্গরাজ সমভঙ্গ ব্রহ্মণ্যদেবের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন।

নদ-নদী-অরণ্য-সমাকুল 'হিমবান্‌দেব' হিমালয় ভারতীয় শিল্প এবং সভ্যতার নিয়ন্তা। হিমালয়ের ক্রোড়ে স্রোতস্বিনীবিধৌত বনানীবেষ্টিত 'সপ্ত-সিন্ধব' ও 'ব্রহ্মাবর্ত্ত' ভূভাগে শতপথব্রাহ্মণ ও আরণ্যকসহ বেদবেদান্ত বিরচিত হয়। ঋষি-মহর্ষিসেবিত হিমারণ্যের শালমেখলা-আশ্রমকুঞ্জে, গঙ্গা- ও গোমতী-তটে, 'ধর্ম্মারণ্যের সত্যমন্দিরে' এবং নৈমিষারণ্যের 'গুরুকুলে' ও 'ঋষিকুলে' উপনিষদের প্রণয়ন ও ভাষ্যের সঙ্কলন হইয়াছিল। আগম, সূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, জাতক প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থসমূহ

এবং প্রাচীন লোকসাহিত্য অরণ্যসম্ভূত ভারতীয় সভ্যতার মহিমাবর্ণনায় ভাস্বর। ইতিহাস-প্রণয়নের পূর্ব্বকাল হইতে ভারতীয় শিল্প ও সাহিত্য বনস্পতির মহিমা প্রচার করিতেছে। ভারতের অরণ্যে অরণ্যে বনস্পতির উপাসকগণ বনানীর মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনে পরিভ্রমণ করিতেন। অরণ্যসঙ্কুল সিন্ধু-উপত্যকার অধিবাসিগণ তথা আর্য্যপূর্ব্ব নাগজনগণ ভক্তিভরে কৃতাঞ্জলিপুটে বৃক্ষপূজা করিতেন। মোহেন্-জো-দড়োতে একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহাতে একটি বৃক্ষের শাখাদ্বয়ের মধ্যে দণ্ডায়মানা নগ্নদেহা বৃক্ষদেবী খোদিত আছেন। দেবীর সমক্ষে আরাধনানিরত উপাসক এবং মাল্যগলে গন্ধর্ব্বরাজ। সাঁচির মণ্ডনশিল্প সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত করিয়াছে—গহন কাননমাঝারে কিরূপ ভক্তিবিহ্বল চিত্তে পশুরাজ সিংহ—মাতঙ্গ, অশ্ব ও মৃগসহ—বনস্পতির পূজা করিতেছে। ভারত-ইতিহাসের যুগে যুগে আর্য্য ও অনার্য্যগণ অশ্বত্থের পূজা করিয়াছেন। সিন্ধু-সভ্যতানুপ্রাণিত সুমেরীয় জনগণও বৃক্ষপূজা করিতেন। রামায়ণ, মহাভারত, জাতক, পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ ও মৎস্যপুরাণ ব্যতীত কালিদাস, ভারবি, মাঘ ও বাণভট্ট প্রভৃতি মহাকবিগণ-সঙ্কলিত সংস্কৃত সাহিত্য ও নাট্যগ্রন্থ অরণ্যানীর সৃজনী ও সঞ্জীবনী শক্তির মাহাত্ম্যবর্ণনায় ভাস্বর। ঋষিগণ সজীব বৃক্ষপল্লবে চেতনা এবং অনুভূতির সন্ধান পাইয়াছিলেন। পুরাণে বৃক্ষরোপণ-মহোৎসবের ব্যবস্থা এবং ফলবৃক্ষ-ছেদনকারী মহাপাপীকে সমুচিত দণ্ডবিধানের নির্দ্দেশ বর্ত্তমান। অশোকস্তম্ভে মগধ সাম্রাজ্যের সুপ্রশস্ত রাজপথসমূহের উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধ বৃক্ষরোপণের নির্দ্দেশ উৎকীর্ণ আছে। বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজসেবা, চিত্তশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক সম্পদ্-লাভের মহান্ আদর্শ ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে দেদীপ্যমান ছিল।

প্রাচীন ভারতে বৃক্ষরোপণ, নীবার ধান্যবপন, আলবালে জলসেচন এবং গো-পালন অনাড়ম্বর বৈদিকব্রাহ্মণ-সংস্কৃতির বিশিষ্ট অঙ্গরূপে বিবেচিত হইত। ব্রহ্মর্ষির আশ্রমকুঞ্জে, প্রসারিত বৃক্ষতলে, ব্রহ্মচারী বিদ্যার্থিগণ গুরুর সকাশে শিক্ষার্জ্জন করিতেন (১৭ চিত্র)। সেই শিক্ষা সততসৃজনশীলা মৌনবতী প্রকৃতির গোপন রহস্যসঙ্গীতের সহিত বিদ্যার্থিগণের মর্ম্মবীণার নীরব সুরঝঙ্কারের নিরবচ্ছিন্ন সংযোগসাধন করিত। আরণ্যপ্রকৃতির অনন্তসৌন্দর্য্যনিঃসৃত আনন্দনির্ঝরের অফুরন্ত অমৃতপ্রবাহ তরুণ শিক্ষার্থীর সরল চিত্ত ও নির্ম্মল চরিত্র সতত সরস রাখিত।

12—1872B.

তপোবনসঞ্জাত ফলমূল, নীবার ধান্য, পক্ক যব, গব্য ঘৃত, গাভীদুগ্ধ, গয়বীজের পায়স-পিষ্টক কুমারগণের দেহে কান্তি, চিত্তে শান্তি সঞ্চারিত করিত। অনাড়ম্বর আশ্রমকুটীরে ঋষি-মহর্ষিগণ বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, অতিথিপূজন প্রভৃতি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন (১৪ চিত্র)।

একদা ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূভাগ অরণ্যসমাকীর্ণ ছিল। রামায়ণযুগে দণ্ডকারণ্য গঙ্গা হইতে সমুদ্রতট পর্যান্ত বিস্তীর্ণ ছিল। পূর্ব্ব ভারতে তাড়কারণ্য, পশ্চিম ভারতে পঞ্চবটী অরণ্য এবং উত্তর ভারতে খাণ্ডবারণ্য, নৈমিষারণ্য ও ধর্ম্মারণ্যের পরিসর ছিল বহুদূরবিস্তৃত। পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধুভূভাগীয় সুবিস্তীর্ণ আরণ্যনিকেতনে অরণ্যানীর অনাবিল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য মধুময় করিয়াছিল ভাবপ্রবণ সিন্ধুবাসিগণের সাত্ত্বিক সমাজজীবন (৩ চিত্র)। সুকুমারশিল্পের পরিকল্পনা-প্রসঙ্গে বৃক্ষপল্লব, পুষ্পগুচ্ছ ও তরুলতা সাধকশিল্পীদের অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তাহার প্রমাণ মোহেন্-জো-দড়োর শীলমোহর, হড়প্পায় আবিষ্কৃত মহাযোগীর গাত্রবস্ত্র, অধিবাসিগণের শিরোভূষণ, পুষ্পখচিত স্বর্ণালঙ্কার এবং বিবিধ শাখাপল্লবের রমণীয় চিত্রশোভিত, সুরঞ্জিত, দগ্ধমৃত্তিকায় পালিশ-করা তৈজসপত্র ; তাহার প্রমাণ পম্পেই ধ্বংসাবশেষ-গর্ভে আবিষ্কৃত ভারতীয় প্রতিভাপ্রসূত হস্তিদন্তময় যক্ষীর কেশাভরণ (৮২ চিত্র)। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি পর্য্যায়ে অরণ্যের পাদপরাজি ভারত-বাসীর জীবন ও সমাজকে, শিল্প ও সংস্কৃতিকে পরিচালিত করিয়াছে। অশ্বত্থবৃক্ষতলে কৃষ্ণবাসুদেবের জীবনাবসান হয়। লুম্বিনীর রাজোদ্যানে গৌতমবুদ্ধের জন্মগ্রহণকালে গর্ভধারিণী মায়াদেবী একটি শালবৃক্ষে স্বীয় দেহভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। জাতকে বুদ্ধজীবনীর অধ্যায়ে অধ্যায়ে এবং সাঁচি, ভরুৎ, বুদ্ধগয়া, মথুরা, খণ্ডগিরি ও অমরাবতীর পাষাণে পাষাণে বৃক্ষলতা ও পত্রপুষ্পখোদিত উদ্গত চিত্রের মধুর সমাবেশ। বিন্ধ্যগিরির লোহিত প্রস্তরে উদ্গত মৌর্য্যভারতের কল্পবৃক্ষ—যাহা এক্ষণে কলিকাতার যাদুঘরে প্রবেশপথে সংরক্ষিত আছে—মানবের ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ববিধ সাধনাকামনা-পূরণের পরম উৎসরূপেই পরিকল্পিত হইয়াছিল। প্রাকৃতিক সৃজনী-শক্তির অফুরন্ত উৎসরূপী উক্ত কল্পবৃক্ষ প্রাচীনতা ও নবীনতা, পার্থিব ও অপার্থিবের মোহন মিলন প্রতিঘোষিত করিতেছে। বনফুলভূষণ, শ্যামমুরলীধর, পীতবসন বনমালী

বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে বাল্যলীলা করিতেন। আরণ্যপ্রকৃতি বনমালীর লাস্যলীলার প্রেরণা যোগাইতেন। বৃক্ষরোপণ-উৎসবরত বনমালীর তেজোদীপ্ত চিত্রাবলী রাজস্থানে, গুজরাটে এবং বোষ্টনের (Boston) শিল্প-সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত আছে।

'পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ'—এই ধর্ম্মনীতি পালনার্থ প্রাচীন ভারতে ধর্ম্মপরায়ণ নরপতি, শ্রেষ্ঠী এবং গৃহী জনগণ তাঁহাদের জীবননাটকের চতুর্থ পর্য্যায়, মহাসত্যানুসন্ধিৎসু কঠোর তপস্যায় মহারণ্যে অতিবাহিত করিতেন। কুরুপতি ধৃতরাষ্ট্র, রাজমহিষী গান্ধারী এবং পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবীও সেই অনুশাসন উপেক্ষা করেন নাই। এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, রামরাজ্যের আদর্শে চন্দ্রগুপ্তের বিশাল মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠান্তে মহামন্ত্রী চাণক্য হিমালয়ে মহর্ষি নারদের আশ্রমে গমন করিয়া রামমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন; হিমারণ্যে, অবশেষে, রাম নাম জপ করিতে করিতে তিনি দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। সংসারের শোক-তাপ-বাদ-বিসংবাদের কবল হইতে মুক্তিকামী মানবগণ শান্তিপূর্ণ কাননকান্তারে, শিব-সত্য-সুন্দরের আরাধনায়, জীবনের অবশিষ্ট ভাগ যাপন করিতেন। বনবাসী রামসীতা সুখশান্তিপূর্ণ আশ্রমজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন—পুণ্যতোয়া গোদাবরীবিধৌত পঞ্চবটীর 'শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চোপশোভিত' কাননমাঝারে ফলফুলভারাবনত পর্ণকুটীরে। কাননের পশু-পক্ষি-পুষ্প-লতা হইয়াছিল জনকনন্দিনীর ক্রীড়াসহচরী। সেই 'পুষ্পিতৈস্তরুভির্বৃতা পদ্মশোভিতা' পঞ্চবটী করভ-করভীর, ময়ূর-ময়ূরীর প্রিয় ক্রীড়াভূমি ছিল।

কভু 'মেঘৈর্মেদুরাম্বরং' ঘন বরষার দামিনীচকিত অমাবস্যানিশীথে ভৈরব-নর্ত্তনমত্ত, কভু বা ঋতুরাজ-বসন্ত-সুসজ্জিত-শ্যামল-কাননস্থ ঘনপল্লব-পুষ্পগুচ্ছ-শোভিত, 'মৃগমদসৌরভরভসবশ'-মলয়-সমীর-সুরভিত, অপিচ 'মধুকর-নিকর-করম্বিত-কোকিল-কূজিত' হিমালয়-প্রকৃতির বিবিধ বিচিত্র লাস্যলীলার রূপভঙ্গিমাবলোকনে উচ্ছ্বসিত, ভাবপ্রবণ ভারতশিল্পিগণ তাঁহাদের আরাধ্য দেবদেবীর চিত্র, প্রতিমালক্ষণ ও ভাস্কর্য্যের ধ্যানধারণা, পরিকল্পনা করিতেন; হিমালয়ের প্রিয় সন্তান পশুপক্ষি-তরুলতার অন্তর্নিহিত তেজ ও শক্তি এবং তাহাদের আকার ও প্রকারগত সৌষ্ঠব, সুষমা ও আবেগের তারতম্যানুসারে পার্থিব ও অপার্থিব নরনারীর তথা দেবদেবীর

প্রতিমা ও প্রতিকৃতি আকারিত রূপায়িত, ছন্দায়িত, এবং অঙ্কিত করিতেন (১০৫ চিত্র)। এবম্বিধ সাধক স্থপতিশিল্পীর ধ্যানলব্ধ সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের প্রকৃত পরিচয় অনুভবের অভাবে—আদর্শমূলক উদাত্ত স্থাপত্যের, ভাস্কর্য্যের, চিত্রের ও সঙ্গীত নৃত্যের মহতী প্রেরণানির্ণয়ে অক্ষম—বস্তুতন্ত্রপরায়ণ, দেশবাসী ও বিদেশীগণ ব্রহ্মজ্ঞান-প্রতিপাদিকা প্রকৃতিসঙ্গত, দর্শনমূলক হিন্দু-বৌদ্ধশিল্পের অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক ভাষা, ছন্দ ও বাণী প্রণিধান করিতে অসমর্থ হইয়াছেন। পশুর কণ্ঠস্বর ও পক্ষীর কূজন হইতে হিন্দুসঙ্গীতের স্বরগ্রাম উদ্ভূত। প্রকৃতিদেবী হিন্দুসঙ্গীতের প্রেরণা, রচনা ও দ্যোতনার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন।

রামায়ণ-, পুরাণ- ও জাতক-বর্ণিত জীবসমাজে পশুপক্ষী, নরনারীর মত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ঐরাবত হইতে মূষিক তথা হংস হইতে পেচক দেবদেবীর বাহনরূপে আদরণীয় হইয়াছে। পশু ও পক্ষী অপহৃতা সীতার উদ্ধারকল্পে অপরিমিত সহায়তা করিয়াছিল। রাজা শুদ্ধোধনের তনয়রূপে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে বুদ্ধদেব পশু, পক্ষী ও পাদপরূপে জন্মাইয়াছিলেন। বৈশাখী পূর্ণিমারজনীর প্রথম প্রহরে, আসমুদ্রহিমাচল আলোকিত করিয়া গৌতম ধরাধামে অবতীর্ণ হইলে, তাঁহার জন্মোৎসব-পালনকল্পে, লুম্বিনীর কাননসভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন কাননবিহারী বৃষ। সেই পরম অনুষ্ঠানে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন—হিমাদ্রির যক্ষ-যক্ষী, বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী, গন্ধর্ব্ব-গন্ধর্ব্বী, কিন্নর-কিন্নরী, অপ্সর-অপ্সরী, বানর-বানরী এবং সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী, মৃগ, শশক, হংস-হংসী, ময়ূর-ময়ূরী ও নাগ-নাগিনী, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। উরুবিল্ব অরণ্যে মহাবোধিতলে, ধ্যান-মগন-স্তিমিত-লোচন মহাযোগী সিদ্ধিলাভ করিলেন যখন—কাম-ক্রোধ-মোহের অবতার ঐন্দ্রজালিক মারের আসুরিক শক্তিকে পরাভূত করিয়া—পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-লতা শরীরী-অশরীরী বিশ্বচরাচর সত্যাশ্রয়ীর ধর্ম্মবিজয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ রহিল (১০৬ চিত্র)। রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য, উপগ্রহ, শান্ত নক্ষত্র, মরুৎ, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধ ও ঋভুগণ স্বর্গ ও মর্ত্ত্য হইতে সবিস্ময়ে বুদ্ধের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।......সম্বোধিলাভের এক পক্ষকাল অন্তে প্রবল বারিবর্ষণের সময়ে নাগরাজ মুচলিন্দ স্বীয় দেহপাশের সপ্তপাকে বুদ্ধের

চিত্রফলক ৮৭



১০৫ চিত্র—লেখননিরতা, ভুবনেশ্বর

চিত্রফলক ৮৮



১০৬ চিত্র—সম্বোধিলাভ

দিব্য দেহ পরিবেষ্টিত করিয়া তাঁহার মস্তকের উপর সপ্তফণার বিচিত্র ছত্র ধারণ করিলেন।

জটায়ু, সম্পাতি, সুগ্রীব ও পবননন্দন রামচন্দ্রের মিত্ররূপে, নলনীল স্থপতিরূপে এবং জাম্বুবান চিকিৎসকরূপে বরণীয় হইয়াছিলেন। কলকণ্ঠ রাজহংস হইয়াছিল দময়ন্তীর প্রিয় পত্রবাহক। মহীরুহের কোটরবাসী বৃদ্ধ শুকপক্ষী কাদম্বরী-কাব্যের কথক ছিল। কৌশিক (পেচক), সারিক (ময়না) এবং শুক (টিয়া) কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তকে রাজধর্ম্মপালনে উপদেশ দিতেন; হিমালয়বাসী রাজগুরুর নির্দ্দেশানুসারে কাশীপতি স্বীয় পোষ্যপুত্ররূপে তাঁহাদের গ্রহণ করিয়াছিলেন। সীতা, দময়ন্তী, শকুন্তলার খেলার সাথী ছিল পশু-পক্ষি-পুষ্প-লতা। মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্তা শকুন্তলার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল শকুনপক্ষী। স্বামিগৃহে যাইবার প্রাক্কালে শকুন্তলা তপোবনের পশু, পক্ষী, তরু ও পুষ্পকে বক্ষে ধরিয়া রোদন করিয়াছিলেন। ভাবপ্রবণ গুপ্তশিল্পী তাঁহার তৈলচিত্রে দেবদারু ও শালশোভিত হিমালয়ের পাদমূলে মৃগী ও চমরীসহ চিত্রনায়িকা শকুন্তলাকে উজ্জ্বল বর্ণসম্পাতে অমর করিয়াছেন। গভীর অরণ্যে শ্রীহরির সন্ধানে শিশু ধ্রুব ঘুরিয়া বেড়াইতেন; বনদেবী স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহাকে শায়িত করিয়া ঘুম পাড়াইতেন। অলসনেত্র ব্যাঘ্র আসিয়া চৌকি দিত। নীল আকাশে ভাসমান লঘু-শুভ্র মেঘখণ্ডসমূহ অনন্ত তুষারমৌলি হিমালয়শৃঙ্গের ক্রোড়ে, কৈলাসের গুহাকন্দরে মিলাইয়া যাইত, ধ্রুবক্রোড়ে বনদেবী তাহা নিরীক্ষণ করিতেন। সুধানিস্যন্দিনী জাহ্নবী মন্দাকিনী কেদার-হরিদ্বার পরিপ্লাবিত করিয়া আত্মহারা ছুটিতেন মহাসাগরের উদ্দেশে। কতকাল পরে, পুনরায়, ওই লঘু-শুভ্র মেঘখণ্ডাকারে ফিরিয়া আসিয়া, উত্তুঙ্গ হিমধামের তুষারমৌলিতে বিলীন হইতেন। স্ফটিকস্বচ্ছ সুনীল অলকানন্দা—বদরিকার তির্য্যগাকৃতি গিরিসঙ্কটের গভীর আবর্ত্তে আছাড়ি' পিছাড়ি', সফেন সর্পশীর্ষ তরঙ্গ বিস্তারি' ছুটিতেন সমুন্নতশির সহস্রশৃঙ্গের পদ প্রক্ষালন করিয়া। যক্ষ-রাজধানী অলকাপুরীর বক্ষোনির্গতা উন্মাদিনী নির্ঝরিণী—অলকানন্দার শীতল সলিলে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন (১০৭ চিত্র)। রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দার উন্মাদ নর্ত্তনে নটরাজের প্রলয়নৃত্য প্রতিবিম্বিত এবং প্রতিধ্বনিত হইত (১০৮ চিত্র)।

বিষ্ণুপ্রয়াগে—অলকানন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গার প্রখর স্রোতসঙ্গমে, সতত-ঘূর্ণায়মান বিপুল জলোচ্ছ্বাসের সফেন সলিলে, অস্তাচলগামী আরক্ত তপন প্রতিফলিত হইয়া রামধনুর বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ করিত (১০৯ চিত্র)। অলকানন্দার বিজন পুলিনে বিহগকূজন-মুখরিত ব্রহ্মকমল-পারিজাত-সুরভিত বর্ণাঢ্য 'নন্দন'কাননে,—দূরাগত গিরিপ্রস্রবণ যথায় ফেনায়মান, শব্দায়মান, জলপ্রপাতরূপে স্রোতস্বিনীর অশ্রান্ত কল্লোলে মিশিতেছে—শীকরসম্পৃক্ত তরুতলে, পাষাণচত্বরের কোলে, বনফুল-সুসজ্জিত কেশসম্ভার আলুলায়িত করিয়া বনলক্ষ্মী প্রকৃতিরাণী বনফুলের মালা গাঁথিতেন।

'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যে কালিদাসবর্ণিত 'গৌরীশিখর'-পর্ব্বতের পাষাণ বক্ষোৎসারিত উষ্ণপ্রস্রবণ 'গৌরীকুণ্ড' হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ ও কেদারনাথের দূরত্ব কয়ক্রোশ মাত্র। মহেশকে পতিরূপে পাইবার সঙ্কল্প করিয়া গিরিরাজকন্যা 'অপর্ণা' (গৌরী) গৌরীকুণ্ডে স্নানান্তে, গৌরীশিখরে কঠোরতম তপস্যা করিয়াছিলেন। অতঃপর ত্রিযুগীনারায়ণ-তীর্থে বিষ্ণুনারায়ণ স্বয়ং তাঁহাকে শিবমহেশ্বরের শ্রীকরে সম্প্রদান করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা পরিণয়োৎসবে পৌরোহিত্য করেন (১১০-১১৩ চিত্র)। তদবধি হিমালয়ের তুষারমুকুট (চোমালুঙ্গমান) গৌরীশঙ্করশৃঙ্গ নামে অভিহিত।

কেদারধামের কেদারশৃঙ্গ (২২৫০০')—বিরাট্ বিশাল, বহুকোটিবর্ষব্যাপি-সমাধিমগ্ন নির্ব্বিকারকল্প মহাযোগীর মত উদাত্ত গম্ভীর (১১৪ চিত্র)। বৃহৎ বৃহৎ গভীর কন্দরসমূহ শৃঙ্গের ইতস্ততঃ লুক্কায়িত। অম্বরচুম্বী, ভয়াবহ, ধূসর-শিখর-নিঃসৃত সহস্রধার বারিপ্রপাত। ভৈরব কেদারনাথ—'কেদারা-চৌতাল' সঙ্গীত রাগের মত গুরুগম্ভীর। কেদারা (মার্গ) সঙ্গীত 'দেবতাত্মা'-হিমালয়ের অন্তর্গূঢ় উপাসনার গভীর রহস্য উদ্ঘাটিত করিতেছে। সুরতানের তরঙ্গে তরঙ্গে বাদি-বিবাদি-সম্বাদি-অনুবাদি-চক্রের অবিরাম আবর্ত্তনপ্রসূত শত শত রাগরাগিণী সৃষ্ট হইতেছে দিবানিশার প্রহরে প্রহরে। সম, অতীত, অনাঘাত ও বিশমের চতুর্বর্গী আবর্ত্তে আবর্ত্তে অগণিত তাল-লয়-ছন্দের অনন্তপ্রসারী ঊর্ম্মিমালা হিল্লোলিত হইতেছে। ধূর্জ্জটির কম্বুকণ্ঠোৎসারিত 'কেদারা' সঙ্গীততরঙ্গের হিল্লোলে হিল্লোলে কল্লোলিনী 'মন্দাকিনী' ভৈরবীরাগিণীর সুরলহরী মিলাইয়া মহাসঙ্গীতের ঐক্যতান মন্ত্রিত

চিত্রফলক ৮৯

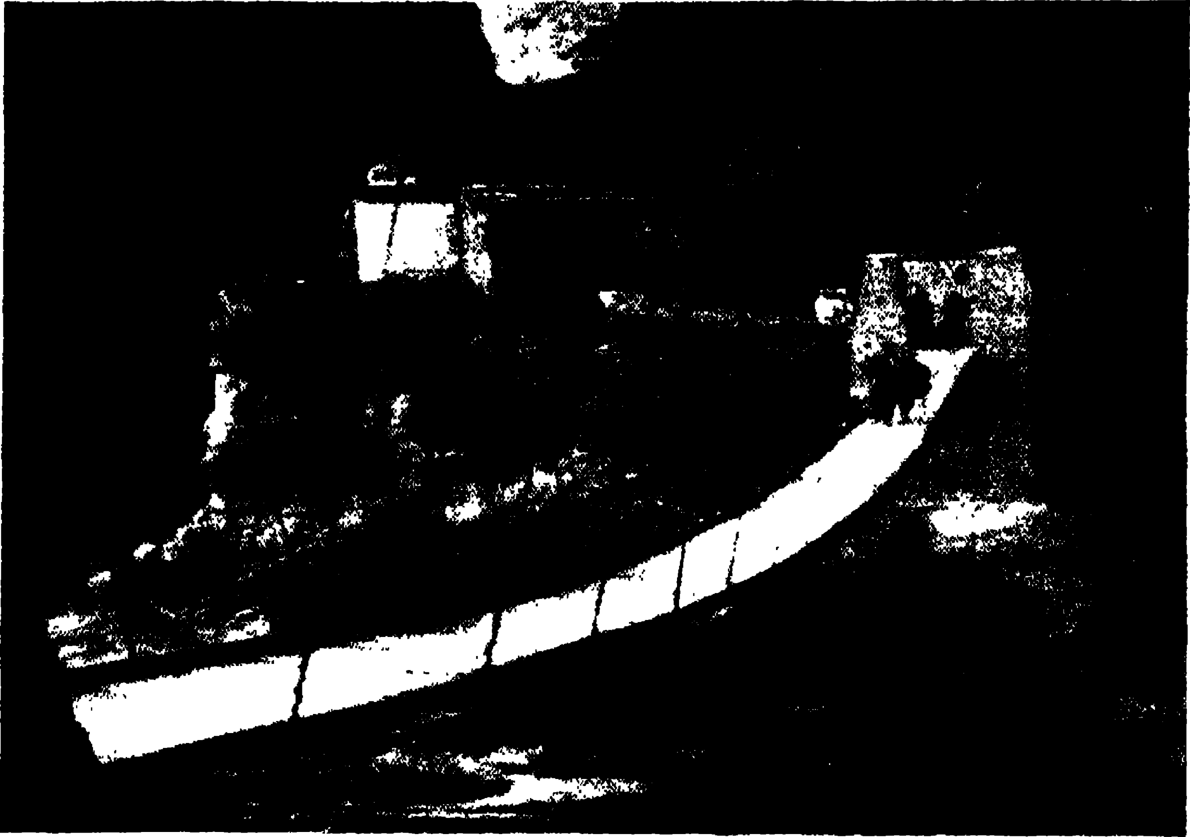


১০৭ চিত্র—অলকাপুরী, হিমালয়



১০৮ চিত্র—রুদ্রপ্রয়াগ, হিমালয়

চিত্রফলক ৯০

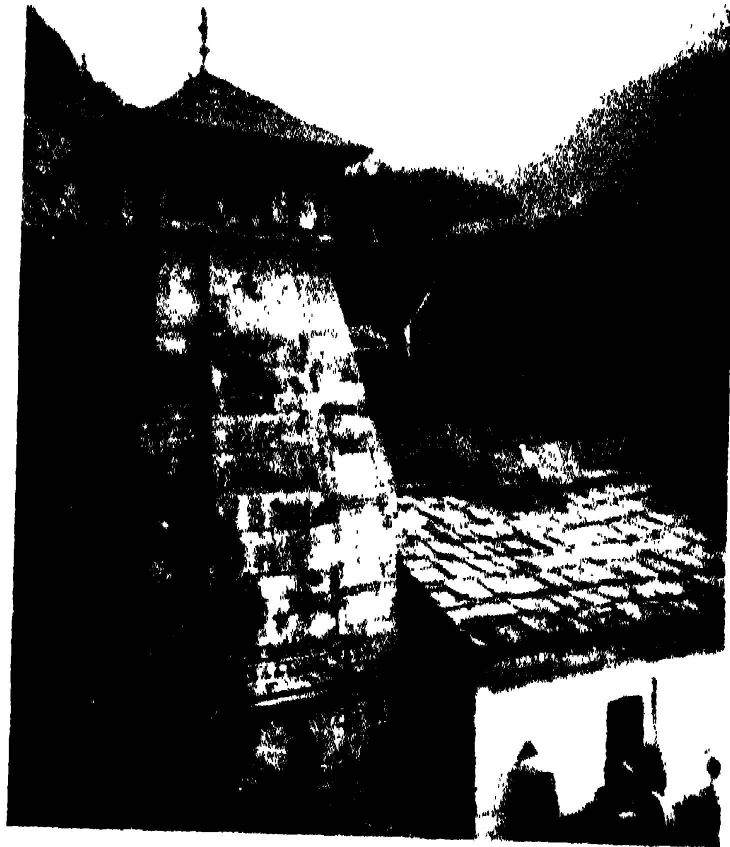


১০৯ চিত্র—বিষ্ণুপ্রয়াগ, হিমালয়



১১০ চিত্র—গৌরীকুণ্ড, হিমালয়

চিত্রফলক ৯১



১১১ চিত্র · ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির, হিমালয়



১১২ চিত্র – হরগৌরী নৃত্য

চিত্রফলক ৯২



১১৩ চিত্র— গৌরী, উত্তরখারক

চিত্রফলক ৯৩



১১৪ চিত্র— কেদারনাথ মন্দির, হিমালয়

চিত্রফলক ৯৪



১১৫ চিত্র—গঙ্গাবতরণ, হিমালয়

করিতেছেন। শৈলস্খলিত তুষারস্তূপ (হিমানীসম্প্রপাত) মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন; স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী অতিক্রম করিয়া কেদারনাথ আভোগ ধরিলেন। পরাপ্রকৃতির অনন্ত সঙ্গীতের অফুরন্ত রাগরাগিণী কেদারমন্দিরের উদার স্থাপত্যে পুঞ্জীভূত, প্রস্তরীভূত, হইতেছে। কেদারার ছন্দঃ, সুরের মূর্চ্ছনা, অনুলোম ও বিলোম মন্দিরের বিমানে কিরীটে অহরহঃ অনুরণিত হইতেছে।

তুষারকিরীট কেদারনাথের স্বচ্ছ শুভ্রবর্ণ সত্ত্বগুণের প্রতীক্। সমাধিমগ্ন কেদারস্বামীর, অস্তাচলগামী দিনমণির কনক কিরণোজ্জ্বল, নীলাভধূসর পাষাণ আয়তন নিরীক্ষণকালে তীর্থযাত্রী ভক্তজনগণের ভক্তিপ্লুত হৃদয় দ্রুতস্পন্দনে, গুরুকম্পনে, আলোড়িত হয়।

মহাযাত্রার পথে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কেদারধামে বিশ্রাম করেন। মন্দিরগাত্রে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। শঙ্করাচার্য্যই বদরী ও কেদারধামের প্রতিষ্ঠাতা। খৃঃ অষ্টম শতকে কেদারতীর্থেই কেদারমন্দিরের সান্নিধ্যে সমাধিকালে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

'দেবতাত্মা'-হিমালয়েই আর্য্যব্রাহ্মণের সঙ্গীত, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান বিরচিত হইয়াছিল। হিমালয়, প্রকৃতপক্ষে, ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্র ও সাহিত্য, শিল্প (স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য) এবং প্রাচীনতম মহামানবীয় সভ্যতার জনক।

তরঙ্গায়িত হিমগিরির ঊর্দ্ধস্তরে, ঘননীল নভোমণ্ডলে, তুষারমণ্ডিত শৃঙ্গযুগল 'ত্রিশূল' ও 'নন্দাদেবী' শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতির প্রতীকরূপে দণ্ডায়মান। উভয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের নিয়ন্তা। পাতালগর্ভ হইতে উত্থিত 'ত্রিশূল' মর্ত্ত্যকে বিদীর্ণ করিয়া, স্বর্গকে বিদ্ধ করিয়া ত্রিভুবন গ্রথিত করিয়াছে।

'নন্দাদেবী'র শীর্ষোপরি উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় হেমনিভ প্রভাতোরণ। সেই জ্যোতিঃপুঞ্জমাঝারে কম্পমান তুহিনের ধূম্রনিভ ঊর্ম্মিমালা ধূর্জ্জটির প্রসারিত জটারূপে প্রতীয়মান হয়। কুহেলিকামুক্ত তরুণ তপন সেই পিঙ্গল জটাজালের চন্দ্রাতপতলে দণ্ডায়মানা 'নন্দাদেবী'র উন্নত শিরে তুষারকণা-হীরার মুকুট আরোপিত করেন।

'নন্দা'-কন্যা গঙ্গাদেবী শিবজটা হইতে ধরাতলে অবতরণপূর্ব্বক উদ্ভিদ্ ও জীবের সৃজন ও পোষণ করিয়া মহাসমুদ্রে মিলিত হইতে ছুটিয়াছেন (১১৫ চিত্র);

প্রকৃতির চিরন্তন বিধানে মেঘ ও তুষারকণারূপে চন্দ্রশেখরের জটাজুটে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

গগনস্পর্শী পর্ব্বতশ্রেণীর শরীরাভ্যন্তরে হিমবারিকণা প্রবিষ্ট হইয়া শিখরগাত্র বিদীর্ণ করিতেছে। চ্যুতশিখর বজ্রনির্ঘোষে নিম্নে পতিত হইতেছে। বিদারিত পাষাণখণ্ড, উপলস্তূপ, তুষারের স্রোতে, অতঃপর উপনদী ও নদীপ্রবাহে, উপত্যকা ও সমতল প্রদেশে বাহিত হইয়া মৃত্তিকার উর্ব্বরা শক্তি বিবর্দ্ধিত করিয়া—পল্লী, নগর, জনপদের মধ্য দিয়া—চূর্ণাকারে সাগরসলিলে নীত হইতেছে; মনুষ্যচক্ষুর অগোচরে সমুদ্রগর্ভে নব নব দ্বীপ উপদ্বীপের সৃষ্টি করিতেছে। এইরূপে, যুগযুগান্তর ধরিয়া, গৌরীশঙ্করের সৃজন, পোষণ ও সংহারলীলা সমাহিত হইতেছে।[১২] উত্তর-পূর্ব্ব বঙ্গের নিরালা ভাগীরথীতীরে ধ্যানোপবিষ্ট বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"নদি, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ?"

উত্তর হইল—"মহাদেবের জটা হইতে।"

ভাগীরথীর উৎসসন্ধানে আচার্য্যবর হিমালয়যাত্রা করিলেন। বহু গ্রাম, গণ্ডগ্রাম, জনপদ, পর্ব্বত, অরণ্য ও স্রোতোধারা অতিক্রমান্তে তিনি হিমগিরির উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলেন। যত উর্দ্ধে উঠিতেছেন বায়ুস্তর ততই ক্ষীণতর হইতেছে। ক্রমে শ্বাসপ্রশ্বাস কষ্টসাধ্য হইল। শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল।

অবশেষে হতচেতনপ্রায় তিনি নন্দাদেবীর পদতলে পতিত হইলেন। সহসা শত শত শঙ্খনাদ তাঁহার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিল।

ইহাই কি ভগীরথের শঙ্খনাদ ?...অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে তিনি প্রণিধান করিলেন :—

"সমগ্র পর্ব্বত ও বনস্থলীতে পূজার আয়োজন হইয়াছে। জলপ্রপাতগুলি যেন সুবৃহৎ কমণ্ডলুমুখ হইতে পতিত হইতেছে; সেই সঙ্গে পারিজাতবৃক্ষসকল স্বতঃ

---

১২ এলিফান্টা (বোম্বাই) দ্বীপের 'শিবপুরী' গুহামন্দিরে বিরাজমান মহালিঙ্গ ত্রিমূর্ত্তি তৎসৎপুরুষ মহাদেবের ত্রিবিধ সত্তার ত্রয়-প্রতীক্। মধ্যমূর্ত্তি 'মহেশ্বর' গৌরীশঙ্কর, তাঁহার দক্ষিণ-পার্শ্বস্থিত সংহারের প্রতীক্ 'রুদ্র'-ভৈরবের এবং বামপার্শ্ব-সংলগ্ন পোষণের প্রতীক্ 'উমা'-শক্তির সমন্বয়ে 'ত্রিমূর্ত্তি'রূপে সৃজন, পোষণ ও সংহারের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন (১৫ চিত্র)।

পুষ্প বর্ষণ করিতেছে ; দূরে দিক্ আলোড়ন করিয়া শঙ্খধ্বনির ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি উঠিতেছে। ইহা শঙ্খধ্বনি কি পতনশীল তুষারপর্ব্বতের বজ্রনিনাদ…ক্ষীণ বায়ু দেবধূপের সৌরভে পরিপূর্ণ।…নন্দাদেবীর শীর্ষোপরি এক অতি ভাস্বর জ্যোতিঃ…সেই জ্যোতিঃপুঞ্জ হইতে নির্গত ধূম্ররাশি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছে। তবে, ইহাই কি মহাদেবের জটা ?"

বদরীনারায়ণ যাত্রিপথের দুই পার্শ্বে, প্রধানতঃ 'গরুড়গঙ্গা' হইতে 'পাতালগঙ্গা' পান্থশালা পর্য্যন্ত, ধূপাগ্র-সূচল-দোদুল্যমান-দীর্ঘপত্রবিশিষ্ট দেবদারুর আকৃতি দেবধূপ-বৃক্ষরাজি সারি সারি দণ্ডায়মান। সমীরণের হিল্লোলপরশে তাহারা জলতরঙ্গ যন্ত্রসঙ্গীতের মত শ্রুতিমধুর বিচিত্র স্বনন সঞ্চারিত করে। দক্ষিণ-পার্শ্ববর্ত্তী গিরিসঙ্কটে প্রবহমাণা অলকানন্দার আনন্দকল্লোলের সহিত আপন আপন কণ্ঠ মিলাইয়া হিল্লোলিত বৃক্ষরাজি পূজামগ্ন বনস্থলীর পূত মহিমা প্রচারিত করে। ছুরিকাসহযোগে উক্ত দেবধূপবৃক্ষের ত্বক্ বিচ্ছিন্ন করিয়া রসাঘ্রাণকালে ধুনার মত অনুগ্র সৌরভে তীর্থযাত্রীর মনপ্রাণ ভরিয়া যায়। দেবধূপবৃক্ষের সুগন্ধি কাষ্ঠে প্রত্যহ শ্রীবদরীনাথের হোমানল প্রজ্বলিত হয়।

কৃষ্ণনীল মানস সরোবরে কমলকোরকাকৃতি চিরতুহিন কৈলাসশিখর প্রতিবিম্বিত (১১৬ চিত্র)। কোরকবক্র কৈলাসশিখরই ভারতীয় দেবায়তনের শিখরবিমান পরিকল্পনার প্রেরণাকেন্দ্র। মানস সরোবরের প্রান্তদেশ হইতে বিবিধ সম্প্রদায়ী সাধুসন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রিগণ দশ ক্রোশ দূরস্থ তুষারমণ্ডিত কৈলাসের শুভ্র সত্ত্বগুণান্বিত দিব্যরূপ দর্শন করেন। তাঁহারা কৈলাসনাথকে নিজ নিজ ইষ্টদেবজ্ঞানে আরাধনা করেন। কৈলাসমাহাত্ম্য প্রতি ভক্তকেই অভিভূত ও অনুপ্রাণিত করে। মন্দির ও স্তূপপরিক্রমার বিধানানুসারে যাত্রিগণ কৈলাস-প্রতিবিম্বিত মানস সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। মানস সরোবরকে বেষ্টন করিয়া অষ্টসংখ্যক 'গুম্ফা' অর্থাৎ চৈত্যবিহার অবস্থিত।

শুক্লা রজনীর চতুর্থ প্রহরে সাগর-সমতুল মানস সরোবরের বিশাল জলরাশি রজতকিরণে ঝলসিত করিয়া নিশানাথ যখন আঁধার যবনিকার অন্তরালে প্রবেশ-মানসে কৈলাসশৃঙ্গে আরোহণ করেন, তাঁহার পার্শ্বে বিরহবিধুরা রোহিণী নক্ষত্রের

বিষণ্ণ আনন উদ্ভাসিত হয়। রোহিণী—'ললিতা' রাগিণীর দীপ্ত প্রতিমা। প্রতি মধুপূর্ণিমায় তাঁহার জীবনসায়রে, যৌবনজোয়ারে, রোহিণীবল্লভ পূর্ণচন্দ্র মিলন-সঙ্গীত যোজনা করেন। মায়াময়ীর প্রাণে শান্তি নাই। চন্দ্রমার প্রাণেই কি শান্তি আছে? অন্তর্গূঢ় আগ্নেয়গিরির ফুটন্ত নিঃস্রবে তাঁহার বক্ষ শতধা বিদীর্ণ। তথাপি, শীতল শর্ব্বরীর নয়নের নিধি সুধাংশু তিনি জ্যোৎস্নাকিরণে ধরিত্রীকে স্নিগ্ধ করেন; সর্ব্বরসের আধার তিনি সুধাসিঞ্চনে ধরিত্রীজাত সকল শস্যের, সকল উদ্ভিদের, সকল ওষধির পুষ্টিসাধন করেন। তাঁহার জোছনাসুরের কড়িমধ্যমে স্বীয় কোমল-ধৈবত মিলাইতে অসমর্থা প্রজাপতিতনয়া লজ্জায়, ক্ষোভে, অম্বরপ্রান্তে আলো-আঁধারের চিতানলে আত্মাহুতিদানে ধাবমানা—কিন্তু নিশানাথের অনুরাগের আকর্ষণে তাঁহারই মুখপানে সকাতরে চাহিয়া আছেন। রোহিণীর সত্তা তদীয় ভর্ত্তা চন্দ্রদেবের রূপাগ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র। কৃষ্ণচন্দ্রের কলা (অংশ)-রূপেই ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার রাধিকা-রোহিণীর বর্ণনা করিয়াছেন।

অমাবস্যা নিশাবসানে, দিবানিশার সন্ধিক্ষণে, কুহেলিকার কৃষ্ণ যবনিকা অপসারিত করিয়া বিমানচারিণী, রক্তকমলধারিণী উষাদেবীর সলাজ প্রকাশ এবং তৎপরে তাঁহার পতিদেব বিবস্বতের সহাস উদয়ের উল্লেখ বেদমন্ত্রে পাওয়া যায়। দিবানিশার সন্ধিক্ষণে সত্যবানের প্রাণপ্রার্থিনী মহাসতী অশ্বপতিতনয়া ধর্ম্মরাজের বন্দনা করিয়াছিলেন—"বিবস্বতস্তনয়স্ত্বং প্রতাপবান্ ততো হি বৈবস্বত উচ্যসে বুধৈঃ।" উগ্রতপাঃ মহাযোগিনী সাবিত্রীর সাধনাসঙ্গীত বৈবস্বত যমরাজের পাষাণহৃদয়কে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সত্যবান পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়াছিলেন। সংযমী সাবিত্রীর অপরাজেয় যোগসাধনের অপূর্ব্ব কাহিনী সভ্যতার ইতিহাসে অক্ষয় রহিবে।

মেঘচুম্বী হিমগিরির তরঙ্গায়িত পাষাণশ্রেণী বৈদিক ঋষির কাল্পনিক প্রকৃতির তথা পুরাণোক্ত দেবদেবীর লীলাভূমি ছিল। হিমালয়শিখরে—অমলধবল প্রাসাদ-সৌধ, পণ্যবীথিকা, রাজপথ ও গগনস্পর্শী তোরণশোভিত নগরাজের রাজধানী 'ওষধি প্রস্থ'। নগরাজকন্যা গৌরী তথায় বাল্যলীলা করিতেন। অতঃপর কৈলাস হইল হরগৌরীর ক্রীড়াশৈল (১১২ চিত্র)। কৈলাসের ক্রোড়ে যক্ষপতি কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী।

চিত্রফলক ৯৫

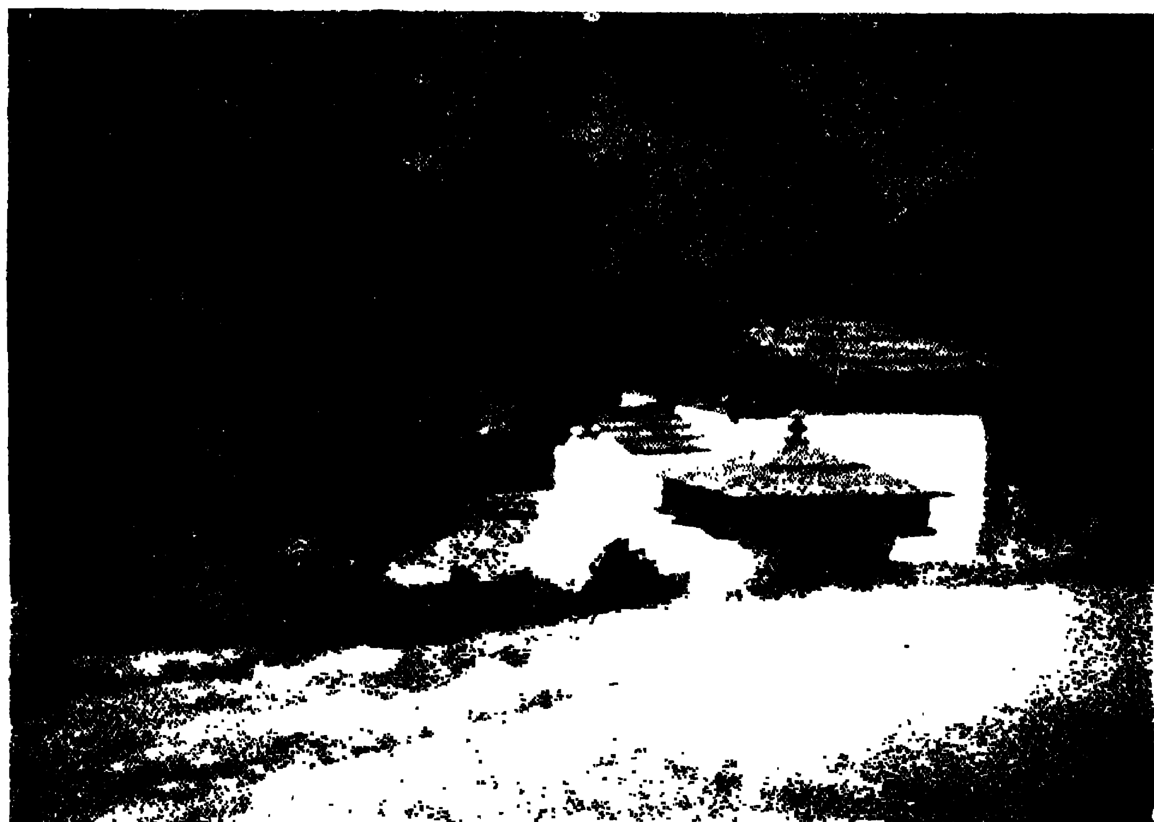


১১৬ চিত্র—শ্রীকৈলাস, হিমালয়

চিত্রফলক ৯৬



১১৭ চিত্র—গোপেশ্বর মন্দির, হিমালয়

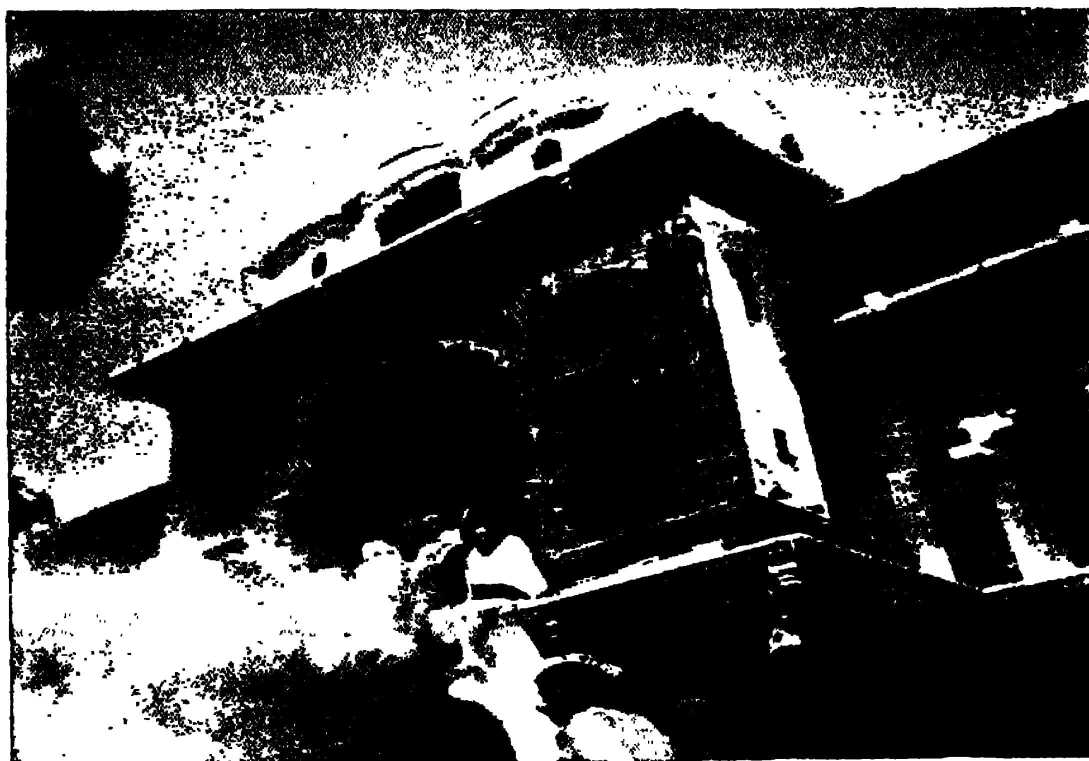


১১৮ চিত্র—যোশীমঠ, হিমালয়

চিত্রফলক ৯৭

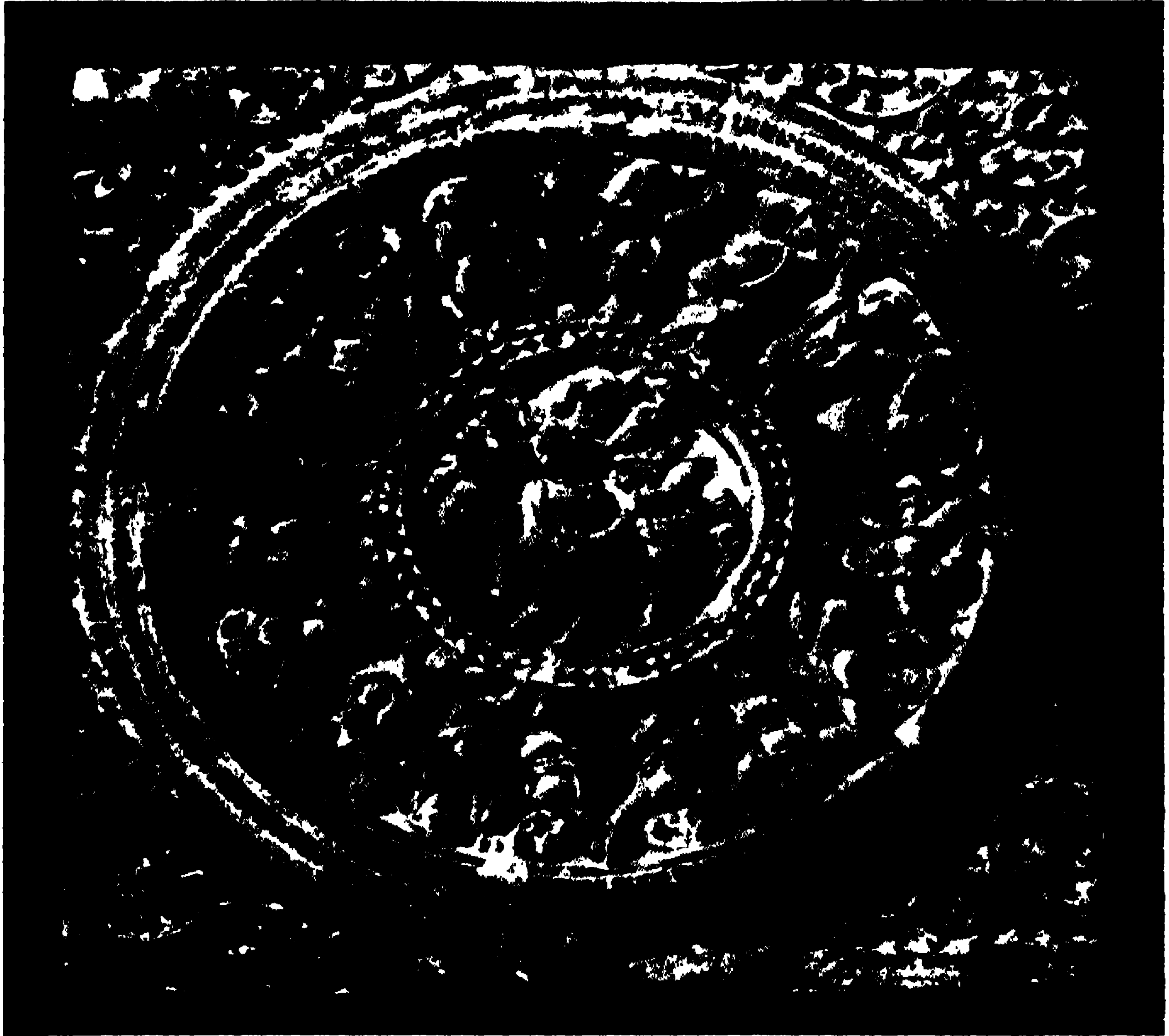


১১৯ চিত্র—বদরীনাথ মন্দির, হিমালয়



১২০ চিত্র—বদরীনাথ মন্দিরের সিংহদ্বার

চিত্রফলক ৯৮



১২১ চিত্র—শ্রীরাসলীলা, পশ্চিমবঙ্গ

ঋষি-মহর্ষি-দেবর্ষিগণ হিমালয়শৈলে যোগসাধনা করিতেন। বৈদিক, ঔপনিষদিক, বৌদ্ধ, শৈব, বৈষ্ণব সাধুসন্ন্যাসিগণ হিমালয়ে মন্দির, মঠ ও চৈত্যবিহার স্থাপিত করিয়া একত্র শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মজীবন যাপন করিতেন। কেদার-বদ্রী যাত্রিপথপার্শ্বে বিরাজমান প্রাগৈতিহাসিক ধর্ম্মপীঠ 'উখীমঠ' ও অগস্ত্য ঋষির তপস্থানে নির্ম্মিত তদীয় মূর্ত্তিসমন্বিত 'অগস্ত্যমুনি মন্দির,' 'কমলেশ্বর মন্দির'—যথায় শ্রীরামচন্দ্র নীলকমলের অর্ঘ্যদানে শিবের পূজা করিয়াছিলেন, পাণ্ডবজননী কুন্তী দেবীর 'গোপেশ্বর' মন্দির (১১৭ চিত্র), শ্রীশঙ্করাচার্য্যের 'যোশীমঠ' (১১৮ চিত্র), নেপালের 'পশুপতিনাথ' (৬৯ চিত্র) ও 'স্বয়ম্ভুনাথ' প্রভৃতি পুণ্য তীর্থ তাঁহাদের পুণ্য স্মৃতি বহন করিতেছে। পরমেশ্বরের প্রতিভূস্থানে সত্যনারায়ণ, চতুর্ম্মুখ শিব ও শিববুদ্ধকে তথায় সর্ব্বসাধারণ অদ্যাবধি পূজা করেন (৯৪ চিত্র)। খৃঃ অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য্য বদরিকাশ্রমে বদরী বিশালজীর শ্রীমূর্ত্তি এবং যোশীমঠ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন (১১৯-২০ চিত্র)। তাহারও সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বদরীতীর্থে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ প্রভৃতি সাধুসন্ন্যাসী, সিদ্ধপুরুষ ও সিদ্ধাচার্য্যগণ সমবেত হইয়া পরম সত্তার আরাধনা করিতেন। অদ্যাপি বদরীনাথ বিবিধ সম্প্রদায়ের তীর্থযাত্রিকর্ত্তৃক পূজিত হয়েন। বদরীনারায়ণ মন্দিরের অদূরে মহামুনি ব্যাসদেবের গুহা দেখা যায়।

প্রতি শ্রাবণ পূর্ণিমাতিথিতে, মাত্র একদিনের জন্য, হিমাদ্রির 'অমরনাথ গুহা'-মাঝারে তুষারকান্তি শিবমহেশ্বর আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহাকে প্রণতি নিবেদন করিবার জন্য বিভিন্ন সমাজের নরনারীগণ কাশ্মীরপ্রান্তীয় পঞ্চদশ সহস্র ফুট উচ্চ সুদুর্গম শৃঙ্গস্থিত অমরনাথতীর্থে সমবেত হয়েন।

শ্রীকৃষ্ণলীলা-রহস্য

শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুধর্ম্মের পুরোধা, হিন্দুসভ্যতার অধিনায়ক। তিনি ভারতের আত্মা। ব্রহ্মসংহিতাপাঠে জানা যায় যে, অনন্ত বৈকুণ্ঠ ও অগণিত ব্রহ্মাণ্ড যে পরতত্ত্বের আশ্রয়ে অবস্থিত এবং অবশেষে যাহাতে লীন হয়, সেই পরতত্ত্বই স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। জ্ঞানিগণ যে তত্ত্বকে নিরাকার নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মজ্ঞানে আরাধনা করেন, উপনিষদুক্ত সেই পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ। যোগিগণ যে

তত্ত্বকে অন্তর্যামী আত্মা বলিয়া স্তব স্তুতি করেন, যোগশাস্ত্রবর্ণিত সেই অন্তর্যামী আত্মা শ্রীকৃষ্ণের অংশবিভূতি মাত্র। ভক্তগণ যে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, রামচন্দ্র প্রভৃতি অবতারের উপাসনা করেন, তাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দনের অংশকলা। ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ং অবতার হইয়াও অবতারী। অবতার যুগ-প্রয়োজন, অবতারী সনাতন। শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় সনাতন সত্যের স্ফুরণ।

আপ্তকাম, আত্মারাম, আত্মক্রীড়, আত্মশীল ও নিত্যমুক্ত হইয়াও শ্রীভগবান্ সতত ভক্তাধীন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু এবং প্রেমবশ। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে', 'যেঽপ্যন্যে দেবতা ভক্তাঃ যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ' প্রভৃতি শ্রীগীতার শ্লোক হইতে জানা যায় যে,—অনন্তরূপ, অনন্তগুণ, অনন্তস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে যিনি যে ভাবে পাইবার ইচ্ছা এবং তদনুরূপ সাধনা করেন, শ্রীভগবান্ তাঁহাকে সেই ভাবেই গ্রহণ করেন। দাস্যভাবে ভক্ত তাঁহাকে প্রভুরূপে, বাৎসল্যভাবে পুত্ররূপে, সখ্যভাবে সখারূপে অথবা মধুরভাবে তাঁহাকে প্রাণকান্তরূপে পাইতে পারেন। শ্রীমতী রাধিকা, ললিতা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি (অংশ) হইয়া, তদীয় বৃন্দাবন-লীলায় তাঁহাকে পরকীয়া ভাবে সেবা করিয়া, তাঁহাকে আনন্দদানের জন্য সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। মহাপ্রেমবতী ব্রজগোপীগণের প্রেমাধীন হইয়া, তাঁহাদের আনন্দ দান করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ লীলাশ্রেষ্ঠ শ্রীরাসলীলার অবতারণা করেন এবং ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্য ও যোগমায়াশক্তি প্রকটিত করেন। সৃজনরহস্য-উৎসারী বাঁশরীর তানে আত্মহারা গোপীগণ প্রেমবিহ্বলচিত্তে পরিপূর্ণ-সুন্দর গোপীবল্লভের আরাধনা করেন। ঝুলন- ও রাস-লীলায় পুরুষ ও প্রকৃতির অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক মিলন সর্ব্বতোভাবে সমাহিত হইয়াছে।

শ্রাবণের ঝুলনপূর্ণিমানিশীথে, মেঘপুঞ্জবেষ্টিত চন্দ্রকিরণোদ্ভাসিত বৃন্দাবনের দিগন্তপ্রসারিত যমুনাপুলিনে, কেলিকদম্বতরুমূলে, শিখিপুচ্ছশির নন্দলালের মোহন মুরলী সুবাসকুসুম-সৌরভভরা কেতকী-যূথিকা-মাধবীকুঞ্জ, বকুলবীথিকা, বসন্তমল্লারে সম্মোহিত করে; মধুরহাসিনী, মধুরভাষিণী, গোপীপরিবেষ্টিতা ললিতলবঙ্গলতা শ্রীরাধার আকুল হিয়া উদ্বেলিত করে। পশু-পক্ষী, পত্র-পুষ্প, শরীরি-অশরীরী বিশ্বচরাচর অপলকনেত্রে মৃগমদতিলক, বনফুলভূষিত, শ্রীকান্ত-শ্রীমতীর ঝুলন নিরীক্ষণ

করে। অদূরস্থ শাল-পিয়াল-পুন্নাগ-তমাল-কৃষ্ণ-অগুরু-হরিচন্দন-উপবন-নিঃসৃত ঝিল্লী-কুলের ঝিঝিট খাম্বাজের সুরলহরী দিগন্তপ্রবাহিত শীতল সমীরে হিল্লোলিত হয়। ছন্দায়িত-গতিচঞ্চল কৃষ্ণরাধার রূপের ছটায়, মিলনসঙ্গীতে, পুষ্পপুঞ্জ অসীম পুলকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত হয়। ঝুলনে বহিঃপ্রকৃতির সহিত মানবের অন্তঃপ্রকৃতির শাশ্বত সম্বন্ধ তথা সৃষ্টিতন্ত্রের মূল তথ্য ব্রহ্মসূত্রের সহিত বৈষ্ণবদর্শনের প্রেম ও ভক্তি, ভাব ও সমাধি, উন্মেষ ও বিকাশ, বিরহ ও মিলনের মধুর সমন্বয় পরিপূর্ণভাবে সংসাধিত হইয়াছে।

শারদীয় পূর্ণিমার রজতকিরণবিধৌত, শান্তশীতল, যমুনাপুলিনে, কুরুবক-চম্পক-কুন্দ-কেশর-কুমুদ-কহ্লার-সুরভিত কুসুমিত উপবনে, শ্রীনন্দনন্দন শতকোটি ব্রজগোপীর সহিত শতকোটি কৃষ্ণরূপে, মণ্ডলাকারে, বিবিধ তালবন্ধে, বিচিত্র গতিচ্ছন্দে, নৃত্যগীতের রাসলীলা করেন। প্রেমময়ের মোহনলীলা নিরীক্ষণতরে শত শত দেবদেবী আকাশযানে অন্তরীক্ষে সমবেত হইয়া রাসমণ্ডলীর উপরে অঞ্জলি অঞ্জলি পুষ্প বরিষণ করেন। সম্মিলিত কিন্নরকণ্ঠের সুললিত হিন্দোলরাগে স্বর্গমর্ত্ত্য মুখরিত হয়। সুরস্নিগ্ধা পরমা প্রকৃতির শাশ্বত সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ ও সৌকুমার্য্যে ভুবন ভরিয়া যায়। ব্রজবালাগণের হিয়ার মাঝারে—যোগমায়া-নিয়ন্ত্রিত বাঁশরী-আবাহনে উদ্বেলিত বক্ষঃ-সায়রে - মিলনের ভাবতরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হয়। রাসনৃত্যের তালে তালে ত্রিভুবন নৃত্যচঞ্চল হয়।

প্রাচীন যুগে এবং আধুনিক কালে বিবিধ আচার্য্যগণ রাসরহস্য উদ্ঘাটনের জন্য নানাভাবে ধ্যান ও গবেষণা করিয়াছেন। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শৃঙ্গাররসাত্মক রাসলীলায় উদ্দাম কামক্রীড়াই উচ্ছলিত এবং গোপীগণের কামলিপ্সা চরিতার্থ করার সহিত শ্রীকৃষ্ণের একটি বিশেষ সঙ্কল্পও সুসিদ্ধ হইয়াছিল। তিনি দর্পহারী। রাসলীলায় ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণের কামদম্ভ নাশ করিয়া কামদর্পী মদনেরও দর্পচূর্ণ করিয়াছিলেন এবং 'কন্দর্পদর্পহা' অভিধায় অশেষ স্তবস্তুতি পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের বিবেচনায় ইন্দ্রিয়সম্ভোগসুলভ কামক্রীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ অপরাজেয়।

অপরপক্ষে বহু সাধকের মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছে—পূর্ণকাম পরব্রহ্ম তিনি, সুতরাং কামনাময় কামলীলা করিবেন কেন? মহাপুরুষের পরদার-সংসর্গই বা

কেন? প্রজাপতি ব্রহ্মার তনয়, পূতচেতা মহামুনি, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বয়ং ভাগবতের রচয়িতা। তদীয় কঠোরতপস্যালব্ধ পুত্র—আদর্শ ব্রহ্মচারী ও সতত-সমাধিমগ্ন—শ্রীশুকদেব পরমহংস ভাগীরথীতীরে হস্তিনার অধিপতি অভিমন্যুর পুত্র মহারাজা পরীক্ষিতের অন্তিম দশায় শ্রীভাগবতের অন্তর্গত শ্রীভগবানের যাবতীয় লীলা এবং কার্য্যকলাপের বর্ণনাসহ শ্রীরাসলীলার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্য বিবৃত করিয়াছিলেন। প্রাকৃত জগতের চিন্তা-চেতনাবিবর্জ্জিত, গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশনরত প্রৌঢ় নরপতির মহাপ্রয়াণের প্রাক্কালে শৃঙ্গাররসাত্মক পরদার-সংসর্গকাহিনী বর্ণিত হইতে পারে না। প্রভুপাদ আচার্য্য শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী, এম.এ., বিদ্যাভূষণের 'গল্পে ভাগবত' এবং 'ভাগবত প্রবেশ' গ্রন্থদ্বয়ে এতদ্বিষয়ে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। তিনি বলেন, ভগবানের নাম, স্বরূপ ও লীলা চিন্ময় তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। যে ভক্ত যেরূপ ভাবে উহার মর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করেন ও যেরূপ যোগ্যতা ধারণ করেন, ভগবানের নাম, স্বরূপ ও লীলা সেইরূপ ভাবেই সেই সাধক-ভক্তের মানসপটে প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন ভাবের সাধকের মানসচক্ষে রাসলীলা বিভিন্ন রূপেই প্রকটিত হইতেছে। প্রাকৃত কামনাময় শৃঙ্গাররসে যাঁহাদের চিত্ত নিমগ্ন শ্রীভগবানের অধ্যাত্ম অতিপ্রাকৃত রাসলীলার নিগূঢ় রহস্যপ্রণিধানে তাঁহারা অক্ষম; তাঁহারা রাসলীলাকে সাধারণ কামক্রীড়ারূপেই বিবেচনা করেন।

কোণার্কের নীলাম্বুতীরে ধ্বংসাবশিষ্ট সূর্য্যমন্দির-রথের বিরাট্ পাষাণচক্রে, ভুবনেশ্বরের রাজা-রাণী মন্দিরের বহির্গাত্রে এবং পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের অঙ্গে অঙ্গে, নরনারীর যে সকল মিথুনমূর্ত্তি খোদিত আছে তাহাদের রহস্যপ্রকটনেও এবংবিধ যুক্তি প্রযোজ্য। উক্ত মিথুনসমূহের তথা রাসলীলা উৎসবের অন্তর্গূঢ় প্রকৃত উদ্দেশ্য—প্রাকৃত কামনার নশ্বর প্রভাব হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করাইয়া অপ্রাকৃত, অবিনশ্বর, ভগবৎপ্রেমে নিয়োজিত করা। আরণ্যক ও বৈরাগ্যশাস্ত্রে নিবৃত্তির উল্লেখ বর্ত্তমান। রাসতন্ত্র পরোক্ষভাবে প্রবৃত্তির কবল হইতে নিবৃত্তিমার্গে মানবচিত্তকে আকৃষ্ট করে।

শাস্ত্রসিদ্ধ মহাযোগিগণ আধ্যাত্মিক আলোকসম্পাতে রাসলীলায় জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনরহস্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। যোগতত্ত্ববিচারে পরাপ্রকৃতির অধ্যাত্ম-জগৎসৃষ্টির অবিনশ্বর বিধানে গোপীরূপ জীবাত্মা কৃষ্ণরূপ পরমাত্মার সহিত মিলিত।

গ্রহতত্ত্ববিচারে মহাজ্যোতিষ্ক গোপেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া নক্ষত্রমণ্ডলরূপিণী গোপীবৃন্দ মণ্ডলাকারে আবর্ত্তন-নৃত্যরতা। রাশিমণ্ডলের মধ্যস্থিত বিশাখানক্ষত্রের অনুরূপ রাসমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তিনী শ্রীরাধা। সৃষ্টিতত্ত্ববিচারে সৃজনকমলের অমৃতশক্তির আধাররূপী বীজকোষ হইতে স্ফুরিত সৃজনকর্ত্তা কৃষ্ণ বৃষভানুর কন্যাসহ সৃজনানন্দের রাসনৃত্যে বিভোর। মানসসায়রে মানসকমলের কোটি দলের স্তবকে স্তবকে কোটি গোপ-বালাগণের দুই-দুই জন এক-এক জন গোপীবল্লভসহ বিবিধ তালে, বিবিধ ছন্দে, নৃত্যগীত করিতেন (১২১ চিত্র)। সাংখ্যের বিচারে রাসলীলায় ব্রহ্মণ্যপুরুষ কৃষ্ণের সহিত অংশশক্তি প্রকৃতির তথা রাধাপ্রমুখ সংখ্যাতীত গোপাঙ্গনাগণের চিরন্তন অধ্যাত্ম সঙ্গম নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে।

বাঁশরীর শক্তিমন্ত্রে শ্রীভগবান্ প্রকৃতির অঙ্গে সৃষ্টিসংরক্ষণী প্রাণবায়ুশক্তি সঞ্চারিত করিলেন। বাঁশরীর প্রণবনাদ (প্রাণশক্তি) চেতনপ্রকৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে, পদ্মে পদ্মে, স্তরে স্তরে, কেন্দ্রে কেন্দ্রে সপ্তবর্ণ-রশ্মিচ্ছটা বিকীরিত ও বিচ্ছুরিত করিয়া—দ্বাদশ স্বরের উদারা, মুদারা, তারার ত্রিবিধ স্তরে 'আঘাত' করিয়া—সর্ব্ব-সৃষ্টির আধাররূপিণী রাধাপ্রকৃতির যৌবনকোরক প্রস্ফুটিত করিল। প্রেমময় পুরুষের আবেগময় স্পর্শে প্রেমময়ী প্রকৃতির উৎপাদিকাশক্তি উৎসারিত হইল। প্রকৃতিদেহে মেরুদণ্ডের পার্শ্বভাগে প্রবহমাণ ঈড়া ও পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্যবর্ত্তী সুষুম্না ধমনীর শূন্য নালীর অভ্যন্তরে কুণ্ডলিনী-পদ্মে শায়িতা চিন্ময়ী রাধার অন্তরবীণার ষোড়শতারে সেই শক্তিমন্ত্র ঝঙ্কারিত হইল। মুক্তির আলোকে রাধা (প্রকৃতি) চঞ্চলা হইলেন। কুণ্ডলিনীমুক্তা, পূর্ণপ্রস্ফুটিতা, রাইকমলিনী বাঁশরীর আবাহনে কৃষ্ণের অন্বেষণে 'সহস্রার' (যোগশাস্ত্রোক্ত সুষুম্না শিরোমধ্যস্থ অধোমুখ সহস্রদল কমলের) কেন্দ্রাভি-মুখে ধাবমানা হইলেন। তাঁহার দেহরক্ষিণী ষোড়শ শত ললনা, ষোড়শ শত নাড়ীর কেন্দ্রীভূতা-শক্তিরূপিণী কুণ্ডলিনী-স্নায়ুজালের (Plexus) মত, বৃন্দাবনচন্দ্রকে আবেষ্টন করিলেন। বেণুবাদনরত কৃষ্ণ বীণাবাদনরতা রাধারাণীসহ জীবজগৎসৃজনের বসন্তরাগ সঞ্চারিত করিয়া পুরুষ ও প্রকৃতির যৌবনতন্ত্রী অনুরণিত করিলেন।

শিবসঙ্গিনীগণ পরিবৃত নটরাজের সৃজননৃত্যের সহিত গোপীগণ-পরিবৃত নটশেখর কৃষ্ণের রাসনৃত্য উপমেয়। উভয় নৃত্যই বিশ্বপ্রকৃতির তথা তেজঃস্ফূর্ত্ত গ্রহমণ্ডলের

আবর্তন নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সৌন্দর্য্য ও সুষমা, ভাব ও উন্মেষ, ত্মন ও কথন, শক্তি ও গতি, সামর্থ্য ও রতি, সম্ভোগ ও নিবৃত্তির মধুর প্রকাশ হইয়াছে—স্বচ্ছসুনীল-সলিলা যমুনাপুলিনে, কুসুমিত সুরভিত কুঞ্জকাননে, অফুরন্ত আনন্দ-উৎসারী অবাঙ্মনসগোচর চিরসুন্দর রাসলীলায়।

কুরুক্ষেত্রে পার্থসারথি বিরাট্ বিশ্বরূপ ('বাসুদেবঃ সর্ব্বম্') প্রকটিত করিয়াছিলেন (১২২ চিত্র)। বৃন্দাবনে ভুবনমোহন রাসলীলার বিরাট্ যোগমায়াচক্র প্রবর্ত্তনেরও তিনিই অদ্বিতীয় মহানায়ক।

পঞ্চসহস্র বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু-ভূভাগের যোগিসমাজে প্রজননশক্তির প্রতীক্ লিঙ্গ-যোনি-মিথুন পূজা প্রচলিত ছিল। প্রথম সভ্যতার আদিমকাল হইতেই নরনারীর যৌনমিলনজনিত প্রজননের রহস্যনির্দ্ধারণে বিশ্বমানব সতত সচেষ্ট। পরব্রহ্মের ব্রহ্মাণ্ডপ্রসারী রাসলীলায় কল্পান্তকল্পকালিন অধ্যাত্ম-অতিপ্রাকৃত-যৌন-মিলনের অপূর্ব্ব রূপায়ণ অভিনবভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

বসন্ত, বরষা এবং শারদপূর্ণিমার চন্দ্রিমানিশীথে বিশ্বপ্রকৃতির যৌবনকমল প্রস্ফুটিত, সরসিত এবং পূর্ণবিকশিত হইলে যুবকযুবতীর মিথুনপ্রবৃত্তি স্বতঃ-উদ্দীপিত, উদ্বেলিত এবং উদ্‌ভ্রান্ত হয়, পৃথিবীর সর্ব্বত্র। সর্ব্বদেশের সর্ব্বমানবজীবনে প্রকৃতির এহেন চিরন্তন বিধান প্রযোজিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজে মদনরতির, হরগৌরীর ও কৃষ্ণরাধার মিথুনলীলার মত পাশ্চাত্ত্য সমাজে Osiris, Persephone, Tammuz, Adonis প্রভৃতি কামবিলাসে প্রমত্ত। ভারতের হোলি-, ঝুলন- এবং রাস-উৎসবের সহিত—পাশ্চাত্ত্যের Bacchnalia, Carnival, Saturnalia উপমেয়। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, তত্ত্বসন্ধানী দার্শনিক ভারত প্রাকৃতিক সৃজনীশক্তির পরম উৎসকে ঝুলন- ও রাস-উৎসবের মাধ্যমে ধর্ম্মের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করিয়াছে। মধ্যযুগীয় রাজস্থানে কৃষ্ণপ্রাণা মীরাদেবীর দৃষ্টান্তে প্রমাণিত হইয়াছে যে, দার্শনিক বৈষ্ণব মহাকবি শ্রীরাধাকে ইন্দ্রিয়সম্ভোগের আধাররূপে পরিকল্পিত করেন নাই। রক্তমাংসের মীরা শ্রীরাধারই রূপান্তর।

পাণ্ডবপতি পরীক্ষিতের জীবনাবসানের প্রাক্কালে পরমদার্শনিক পরমহংস শুকদেব, রাসলীলার মাধ্যমে, তাঁহাকে প্রাকৃত মানবজীবনের, পার্থিব সংসারসমাজের,

চিত্রফলক ৯৯



১২২ চিত্র—পার্থসারথি

চিত্রফলক ১০০



১২৩ চিত্র— অশোকের রাজসভা

চিত্রফলক ১০১



১২৪ চিত্র— শ্রীরামচন্দ্রসমীপে গুহক

চিত্রফলক ১০২



১২৫ চিত্র— যমপট, পশ্চিমবঙ্গ

চিত্রফলক ১০৩



১২৬ চিত্র—গাজাপট, আসাম

চিত্রফলক ১০৪



১২৭ চিত্র—রক্ষা, পশ্চিমবঙ্গ

নশ্বর সম্ভোগস্তরের, অলীক আলেখ্য দেখাইয়া অবশেষে বৈরাগ্যের আধ্যাত্মিক আলোকে নিবৃত্তিস্তরের অনন্ত অমৃতধাম উদ্ভাসিত করিয়াছিলেন যে মোক্ষলোকে সত্য, শান্তি ও অক্ষয় আনন্দ চিরতরে বিকাশমান রহিয়াছে।

জৈবিক সৃষ্টিরহস্যের মূলকেন্দ্র পুরুষ ও প্রকৃতির সত্তা এবং শক্তির সহিত ভারতীয় ধর্ম্মদর্শনসমূহের নিগূঢ় সম্বন্ধ নিম্নলিখিত প্রবচন হইতে প্রতীয়মান হয়:

"সাংখ্যে 'পুরুষ', তন্ত্রে 'মহেশ', বেদে 'হিরণ্যগর্ভ'
শ্রুতির 'ব্রহ্মা', পুরাণের 'প্রভু', উপনিষদের 'সর্ব্ব'।
দেহেতে 'আত্মা', ভোগেতে 'ভোক্তা', আগমেতে শুধু 'সত্য'
ঈশ্বর 'জ্যোতিঃ', 'অক্ষর' 'অজ' কে বুঝিবে তাঁর তথ্য।
জ্ঞাত ও জ্ঞেয়, দ্রষ্টা ও দৃশ্য, গ্রাহক ও গ্রাহ্যভাবে
পুরুষ-প্রকৃতি, দোঁহায় ধর্ম্ম-জগতে দেখিতে পাবে।"

সাংখ্যকারের মতে এই জড়জগৎ বা জড়জগন্ময়ী শক্তি চেতন (আত্মা) হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আত্মা (পুরুষ) নিষ্ক্রিয়। জগতের সহিত তাঁহার কোনও বাস্তব সম্বন্ধ নাই। 'প্রকৃতি'ই জড়জগৎ; জড়জগন্ময়ী মহাশক্তি। প্রকৃতিই সর্ব্বসৃষ্টিকারিণী সর্ব্বসঞ্চারিণী, সর্ব্বসঞ্চালিনী এবং সর্ব্বসংহারিণী। এহেন 'পুরুষ-প্রকৃতি'-তত্ত্ব হইতে তান্ত্রিক ধর্ম্মের উৎপত্তি। তন্ত্র পুরুষ ও প্রকৃতির ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধ সম্পাদন করার জন্য জনপ্রিয় হইয়াছিল। প্রাথমিক বৈষ্ণবদর্শনের অদ্বৈতবাদে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিবর্গ তান্ত্রিক ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রাচীন বৈষ্ণবধর্ম্মে শক্তিতন্ত্রের সারাংশ সংযোজিত করিয়া বৈষ্ণবদর্শনের নববিকাশের মানসেই, ব্রহ্মবৈবর্ত্তকার তদীয় বৈষ্ণব-তন্ত্রের প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিনব সৃষ্টি 'শ্রীরাধা'—যিনি সাংখ্যদর্শনের মূল 'প্রকৃতি' ও চিৎশক্তির সমন্বয়। বেদান্তের 'মায়াবাদ' সাংখ্যে হইয়াছিল 'প্রকৃতিবাদ'। সাংখ্যের 'প্রকৃতি'ই তন্ত্রে 'শক্তি'তে পরিণত হয়। প্রকৃতিবাদ হইতে শক্তিবাদ। অদ্বৈতবাদের সহিত শক্তিবাদের মিলনের ফলেই বঙ্গীয় বৈষ্ণবতন্ত্রের সৃষ্টি।

সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি এবং বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া—শৈব, বৈষ্ণব এবং বৌদ্ধতন্ত্রে যথাক্রমে মহেশ্বর ও আদ্যাশক্তি, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা এবং আদিবুদ্ধ ও

প্রজ্ঞাপারমিতারূপে গৃহীত হইয়াছেন। আদিবুদ্ধের অভিলাষানুসারে তাঁহার সূক্ষ্ম শরীর হইতে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমোঘসিদ্ধি এবং অমিতাভরূপী পঞ্চসংখ্যক ধ্যানী বুদ্ধ—লোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা ও আর্য্যতারিকারূপিণী পঞ্চ-শক্তিসহ আবির্ভূত হইয়াছিলেন; শক্তির আধার সৌর প্রকৃতির তেজ, গতি ও স্থিতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন। অতঃপর, তাঁহাদের অন্তরাত্মা হইতে সামন্তভদ্র, বজ্রপাণি (ইন্দ্র), রত্নপাণি, পদ্মপাণি (অবলোকিতেশ্বর) এবং বিশ্বপাণি নামধেয় পঞ্চজন বোধিসত্ত্বের আবির্ভাব। বৈষ্ণবতন্ত্রে অবলোকিতেশ্বরই বিষ্ণু অর্থাৎ কৃষ্ণরূপে বরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার শৈলোপম জ্ঞানমুকুটের পুরোভাগে অনন্ত দীপ্তি ও অপ্রমেয় শক্তির আধার অমিতাভ অর্থাৎ বিষ্ণু-সূর্য্যের মূর্ত্তি খচিত। মহেশ্বরের 'ঊর্ণা' এবং জৈন তীর্থঙ্করের 'কেবলজ্ঞান' ও 'কেবলদর্শন' অমিতাভের দিব্যজ্ঞান ও দিব্যদর্শনের সহিত উপমেয়। তিব্বতে ধর্ম্মগুরু দলাইলামা বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার হিসাবে পূজনীয়।

রাজ্যপালনের আদর্শ, ভারতীয় সংস্কৃতির উদারতা

চিত্তশুদ্ধি ও ভক্তি, সংযম ও সাধনা, সত্যানুসরণ ও সত্যদর্শন, রসানুভূতি ও ব্রহ্মজ্ঞান, অধ্যাত্মানুশীলন ও অনাড়ম্বর ধর্ম্ম- এবং অহিংস কর্ম্ম-জীবনযাপন প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির লক্ষ্যীভূত হইয়াছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-সংস্কৃতি-পরিপুষ্ট দেবায়তন-সমূহ ভূমানন্দে বিভোর বেদান্তপ্রাণ ভারতীয়গণের কর্ম্মজীবন ধর্ম্মময় ও শান্তিময় রাখিত। তথাপি আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণায়, পারমার্থিক মোক্ষচিন্তায় তাঁহারা মগ্ন থাকা সত্ত্বেও, ধনধান্যে, স্বাস্থ্যসম্পদে, জ্ঞানবিজ্ঞানে, স্থাপত্যশিল্পে, ব্যবসাবাণিজ্যে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যের বিস্ময়াকর্ষণ করিয়াছিল।

গুপ্তসংস্কৃতির 'সুবর্ণযুগে' ভারতভূমি সমগ্র এশিয়ার সংস্কৃতি- ও ব্যবসাবাণিজ্য-সংশ্লিষ্ট শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তৎকালে মহাচীন ও ভারতের মধ্যে ধর্ম্ম-, শিল্প- ও সাহিত্য-বিষয়ে প্রভূত পরিমাণে আদানপ্রদান চলিত।

ইন্দোচীন, মালয় এবং দ্বীপময় ভারতে ব্রাহ্মণ্য-, ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মপ্রসারণের অনুক্রমে বহুসংখ্যক ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত এবং মঠ, মন্দির ও বিহার নির্ম্মিত হয়। তদ্ভিন্ন চীন, রুশিয়া, পূর্ব্ব এশিয়া, খোটান, মধ্য এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার সহিত স্থলপথে ও সমুদ্রপথে ভারতীয় ব্যবসাবাণিজ্য সুপরিচালিত হয়।

বাবিলন, গ্রীস, রোম এবং ইরানের ঐশ্বর্য্যসম্পদ্ একদা ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিত। রোমের ধ্বংস হইলে বাগদাদ, ভিনিস ও জেনোয়া ভারতসম্পর্কীয় ব্যবসাবাণিজ্যের শাখাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তুর্কীজাতি রোমসাম্রাজ্য অধিকার করিয়া ইতালীর সহিত ভারতের বাণিজ্যপথ রুদ্ধ করিয়া দিলে, জেনোয়ার পুরুষসিংহ ক্রিস্টোফর কলম্বসের অতলান্তিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া ঐশ্বর্য্যের অমরাবতী 'ভূস্বর্গ ভারতে' আসিবার নূতন পথ বাহির করিবার প্রয়াসের ফলে হইল—কলম্বস্-কর্তৃক তথাকথিত আমেরিকার আবিষ্কার। বেদবর্ণিত 'সিন্ধু'ই—ইরানে 'হিন্দু', গ্রীসে 'ইন্দুস', অবশেষে পাশ্চাত্ত্য জগতে 'ইণ্ডিয়া' নামে প্রসিদ্ধ হয়। আমেরিকা মহাদেশকে কলম্বস্ 'ইণ্ডিয়া'ই মনে করিয়াছিলেন। তদবধি আমেরিকার আদিম অধিবাসিগণ 'ইণ্ডিয়ান' নামে আখ্যাত।

অধিকাংশ প্রাচীন ভারতীয় নরপতিগণের সুশাসনে প্রজাবর্গ সুখে কালযাপন করিতেন। রাজচক্রবর্ত্তী 'দিগ্বিজয়' করিতেন মূলতঃ ধর্ম্মের প্রসারকল্পে, অর্থ ও প্রতিপত্তির বৃদ্ধি ও প্রসারের জন্য নহে; বিজিত নরপতিগণকে তাঁহাদের রাজ্য-শাসনের অধিকার ফিরাইয়া দিতেন। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে প্রাচীন-ভারতীয় সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়—"নমেস্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপঃ। নানা হিতাগ্নির্ণা বিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতঃ॥" রঘুকুলের নরপতিগণের রাজ্যশাসনের আদর্শ রঘুবংশে বর্ণিত হইয়াছে—"প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ। সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুং আদত্তে হি রসং রবিঃ।" অর্থাৎ "প্রজাগণের সমুন্নতির জন্যই তিনি কর লইতেন, সূর্য্য যেমন সহস্রগুণ বর্ষণের জন্য জল শোষণ করিয়া থাকেন।" "প্রজানাং বিনয়াধানাৎ রক্ষণাদ্ ভরণাদপি। স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।" অর্থাৎ "প্রজাগণের শিক্ষাবিধান, রক্ষণ ও ভরণের ব্যবস্থা করিয়া প্রকৃতপক্ষে তিনিই পিতা ছিলেন, তাঁহাদের

জনকেরা জন্মহেতু মাত্র।" ক্ষত্রিয়ের রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ধর্ম্মনীতির উপরেই।

সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের এবং রাজর্ষি অশোকের রাজত্বকালে—পশ্চিমে আফগানিস্তানের হিরাট হইতে পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহীশূর পর্য্যন্ত প্রসারিত মৌর্য্যসাম্রাজ্য ধর্ম্মনীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য-শাসনব্যবস্থা এবং পৌর শাসনপ্রণালী কিরূপ উন্নত এবং সর্ব্বজনহিতকর ছিল, কিরূপ গণতান্ত্রিক ছিল—তাহা গ্রীক-রাজদূত মেগাস্থিনিসের বিবৃতি, কৌটিল্য (চাণক্য)-সঙ্কলিত 'অর্থশাস্ত্র' এবং অশোকের অনুশাসন হইতে জানা যায়। চাণক্যের নির্দ্দেশ ছিল যে, রাজাকে ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে সুপণ্ডিত হইতে হইবে। নরপতির কর্ত্তব্যপালনপ্রসঙ্গে তাঁহার অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে—"প্রজার সুখেই রাজার সুখ; প্রজার মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল; প্রজাদের পরিতুষ্ট করিয়াই রাজা স্বীয় আত্মাকে তুষ্ট করিবেন।" অশোক তাঁহার শিলালিপির মাধ্যমে রাজার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন তাহা জগতে অতুলনীয়—"আমার প্রজা আমার সন্তান। আমার নিজ পুত্রকন্যাগণ সুখী হউক, ইহা যেমন কামনা করি, তেমনি আমার প্রজারা সুখী হউক, ইহাই আমার প্রাণের কামনা (১২৩ চিত্র)। অশোকের কালে (খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক) গ্রীক্-রাজদূত মেগাস্থিনিস্ ভারতবর্ষে লক্ষ্য করিয়াছিলেন—"এদেশে ক্রীতদাস নাই; তস্কর নাই; মিথ্যাবাদী নাই; পুরুষেরা সাহসী, স্ত্রীলোকেরা পতিপরায়ণা; শৌর্য্যবীর্য্যে ভারতবাসীরা এশিয়ার অন্য অধিবাসীদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। সংযত, পরিশ্রমী, কলাকুশল, শ্রমসন্তুষ্ট শিল্পী এবং কৃষকেরা দেশীয় রাজাদের অধীনে শান্তিপূর্ণভাবে, সুখে বাস করিতেছেন।"

'অ-প্রাণহিংসারুচি' দিগ্বিজয়ী মগধসম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত বিজিত রাজ্যের নরপতিগণকে নিজ নিজ রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন। আসমুদ্রহিমাচল ভারত তাঁহার ধর্ম্মমূলক রাজনীতি এবং তাঁহার মহানুভবতায় আকৃষ্ট হইয়াছিল। এলাহাবাদের গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে যে, তিনি সর্ব্ববিধ প্রজাপালন, নিঃসহায় দরিদ্র ও নিপীড়িত জনগণের রক্ষণাবেক্ষণ, বিজিত নরপতিদের বিষয়সম্পদ্-প্রত্যর্পণ, শিল্পের

পোষণ, ধর্ম্মদণ্ড (গরুড়ধ্বজ)-স্থাপন এবং জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সর্ব্বমানবের সর্ব্ববিধ প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানকে সমভাবে রক্ষা করিতেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজ্যপালনের সার্থকতাসম্বন্ধে ফা-হিয়েন্ লিখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রজাদের অবস্থা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। শাসকগণ প্রজাসাধারণকে উৎপীড়ন করিতেন না। দেশের সর্ব্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করিত; দস্যুতস্করের কোনও উপদ্রব ছিল না। তিনি ভারতবাসিগণের নৈতিক চরিত্রেরও ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মথুরাস্তম্ভে উৎকীর্ণ আছে যে, তিনি (বিক্রমাদিত্য) অশ্বমেধযজ্ঞ সুসম্পন্ন এবং বহুলক্ষ ধেনু ও সুবর্ণমুদ্রা বিতরণ করিয়াছিলেন। জুনাগড় (পুণা) গিরিগাত্রে খোদিত (৪৭৫ খৃঃ) লিপিমালা হইতে জানা যায় যে, মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে প্রতি প্রজা ধর্ম্মানুশাসন পালন করিতেন এবং তদীয় সাম্রাজ্যে কেহ দরিদ্র, দুঃখকাতর অথবা অর্থলিপ্সু ছিল না।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত তাম্রফলকে উৎকীর্ণ আছে যে, খৃঃ পঞ্চম শতকের শেষভাগে ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী রামী, বটগোহালী গ্রামের জৈনবিহারস্থিত অর্হৎগণের নিত্যপূজা নির্ব্বাহের জন্য দেড়-বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্যের (৬০৬-৪৬ খৃঃ) রাষ্ট্রনৈপুণ্য, সাহিত্যিক প্রতিভা এবং দানশীলতা সভ্যতার ইতিহাসে অতুলনীয়। তিনি শৈবধর্ম্মী ছিলেন; কিন্তু সর্ব্ববিধ ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বহুবিধ সর্ব্বজনহিতকর সমবায় প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ছিলেন তিনি। তদীয় উদার, নিরপেক্ষ প্রজাপালন-রীতির ভূয়সী প্রশংসা-করতঃ হুয়েন-সঙ্ খৃঃ সপ্তম শতকের মধ্যভাগে লিখিয়াছেন, "প্রজার নিকট হইতে সামান্যমাত্র কর লইয়া রাজা প্রজার হিতে ব্যয় করেন। প্রজার অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য রাজা দেশময় ঘুরিয়া বেড়ান। হিন্দু ও বৌদ্ধের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। হিন্দুমন্দিরের পার্শ্বে বৌদ্ধমঠ শোভা পায়।" একাদশ শতকে পরমসৌগত বৌদ্ধমহারাজাধিরাজ মদনগোপালদেব চম্পাহিট্টি গ্রামবাসী পণ্ডিত-ভট্টপুত্র বটেশ্বর স্বামীকে, তদীয় পট্টমহিষী চিত্রমতিকাকে বেদব্যাসপ্রোক্ত মহাভারত শ্রবণ করাইবার দক্ষিণাস্বরূপ একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু-, জৈন- ও বৌদ্ধ-নরপতিগণের বিচক্ষণ রাজনীতির বহুসংখ্যক উদাহরণ ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস

উজ্জ্বল করিয়াছে। কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্যের ধর্ম্মময় রাজনীতি হিন্দু-বৌদ্ধ-সমাজ-তন্ত্রের, হিন্দু-বৌদ্ধ-মন্দিরস্থাপত্যের, স্ফূর্ত্ত বিকাশ সংসাধিত করিয়াছিল।

মুসলমান শাসনকালেও প্রাচুর্য্য-পরিপূরিত ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অবনত এবং খাদ্য-, শস্য- ও শিল্প-উৎপাদনের ক্ষমতা হ্রাস হয় নাই। ভারতবাসিগণ আদৌ অভাবপীড়িত ছিলেন না। বিদেশী পর্য্যটক ও ইতিহাসকারগণ তৎকালীন ভারতের প্রভূত সমৃদ্ধির বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একশত বৎসর পূর্ব্বেও মণ্টগোমেরী মার্টিন, এডওয়ার্ড থর্নটন প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভারতের পৌরশৃঙ্খলা, সামাজিক সুখশান্তি, শস্যসম্পদের প্রাচুর্য্য এবং বহুবিধ যন্ত্রজ, ধাতব, দারুময় ও বয়নজাত শ্রমশিল্পের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের তুলনায় ভারতবর্ষ অধিকতর সমৃদ্ধিশালী।

প্রাচীন বর্ণাশ্রমী হিন্দুরাষ্ট্রে তথা হিন্দুসমাজে মৈত্রী, আত্মচেতনা ও সমবেত-ভাবে কর্ম্ম করিবার স্পৃহা ও শক্তি প্রখর এবং সক্রিয় ছিল। তাহার প্রমাণ গুপ্ত ও মধ্যযুগে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি। প্রাচীন সমাজে বর্ণবৈষম্য ও সাম্প্রদায়িক অথবা অর্থনৈতিক অশান্তি একেবারে বিরল না হইলেও কদাচ প্রবল ছিল না। কোনও বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে ব্যাপক অশান্তির উল্লেখ নাই।

ঋষি-মহর্ষির সাধনাভূমি দণ্ডকারণ্যে রামচন্দ্র শবরী চণ্ডালিনীর উচ্ছিষ্ট ফল সমাদরে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। আর্য্যপতি রামচন্দ্র অনার্য্যপতি গুহক চণ্ডালকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন (১২৪ চিত্র)। চণ্ডালিনী ফলবিক্রেত্রীর জননীসুলভ স্নেহালিঙ্গনকে যশোদানন্দন উপেক্ষা করেন নাই। হিন্দুসমাজে রামী রজকিনী রাধার মর্য্যাদায় উন্নীত হইয়াছিলেন। ৬৩ জন প্রসিদ্ধ দ্রাবিড়দেশীয় শৈবসাধকের অন্যতম 'নন্দ' অস্পৃশ্য সমাজভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও, পরমেশ্বরের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তিহেতু, 'নয়নর' (ঋষি) পর্য্যায়ে উত্তোলিত হইয়াছিলেন। ক্ষত্রিয়বর 'চামুণ্ডা রায়', তদীয় কঠোর সাধনার বলে, দিগম্বরী-জৈনাচার্য্যরূপে বরণীয় হইয়াছিলেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ জৈনতীর্থ শ্রবণবেলগোলার (মহীশূর) বিরাট্ প্রস্তরময় মূর্ত্তি গোমতেশ্বরের প্রতিষ্ঠাতা। 'পবনদূত'-রচয়িতা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ধোয়ী, জাতিতে তন্তুবায় হইলেও, সম্রাট্ লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যসমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রচলিত ছিল। আর্য্য, অনার্য্য ও তথাকথিত উচ্চ- ও নীচ-কুলজাত নরনারীর বিবাহের ফলে ঐতরেয়, পরাশর, বেদব্যাস, শুকদেব, সত্যকাম, কণাদ প্রভৃতি মহামুনিগণের জন্ম। তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগুরুর পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। বর্ণসঙ্কর হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভাকে বর্ণাশ্রমসমাজ অবহেলা করে নাই। মহর্ষি অগস্ত্যের ধর্ম্মপত্নী লোপামুদ্রা, ঋষ্যশৃঙ্গের সহধর্ম্মিণী শান্তা এবং জমদগ্নির ভার্য্যা রেণুকা—প্রত্যেকেই ক্ষত্রিয়দুহিতা ছিলেন। ব্রাহ্মণকন্যা দেবযানী ক্ষত্রিয় নরপতি যযাতির ধর্ম্মপত্নী। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরী মেনকার গর্ভে শকুন্তলার উদ্ভব; রাজা দুষ্মন্তের মহিষী এবং ভরতরাজার জননী ছিলেন শকুন্তলা। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, তখন জাতিভেদ অলঙ্ঘনীয় এবং অসবর্ণবিবাহ অসামাজিক ছিল না।

ঐতিহাসিক যুগে মৌর্য্যসম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সহিত গ্রীক-কন্যা হেলেনের বিবাহ, শকরাজ রুদ্রদামনের কন্যার সহিত ব্রাহ্মণ সাতবাহন রাজকুমারের বিবাহ, চেদীরাজ লক্ষ্মীকর্ণের সহিত হূণ-রাজকুমারীর পরিণয় এবং তাঁহার এক দুহিতার সহিত বৌদ্ধরাজ তৃতীয় বিগ্রহপালের ও অন্য দুহিতার সহিত বৈষ্ণবরাজ জাতকর্ম্মার উদ্বাহ প্রমাণিত করে যে, অতীত কালে হিন্দুসমাজ উদার ছিল। খৃঃ প্রথম শতকে কম্বুজ-দেশে প্রথম হিন্দুরাজ্য-স্থাপয়িতা ভারতীয় ব্রাহ্মণসন্তান কৌণ্ডিণ্য তৎস্থানীয় অনার্য্য নাগরাজকুমারী সোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। গুপ্তোত্তর যুগে সংস্কার ও জাতিগত ক্ষত্রিয়সমাজের স্থলে অভিনব এক কর্ম্মগত ক্ষত্রিয়শ্রেণী উদ্ভূত হয়। তাঁহারা রাজপুতপর্য্যায়ী, হিন্দুস্তরে রূপান্তরিত, বহিরাগত শকজাতি। শৌর্য্যবীর্য্যে তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিলেন তাঁহারা হিন্দুসমাজে ক্ষত্রিয়শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহারা হিন্দুর সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধও স্থাপিত করিলেন। রাজপুত ব্যতীত যবন, পারদ, পহ্লব, হৈহয়, তালজঙ্ঘ প্রভৃতি বহির্ভারতীয় জাতিসমূহ এবম্প্রকারে ক্ষত্রিয়পর্য্যায়ের অন্তর্গত হইয়াছিলেন।

রাজপুতগণ বলবীর্য্যে যেরূপ অসাধারণ ছিলেন আত্মকলহে এবং গোষ্ঠীগত আভিজাত্যের রেষারেষিতেও তদ্রূপ আত্মহারা ছিলেন। হিংসা, দ্বেষ ও ব্যক্তিগত স্বার্থপ্রণোদিত উন্মাদনার আবেশে রাঠোর, চৌহান, হরবংশী প্রভৃতি

ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় রাজপুত পরিবারবর্গ প্রতিনিয়ত মুসলমান নরপতির আশ্রয় লইতেন। সমবেতভাবে, একরাজধর্ম্মী, গণতন্ত্রী ভারতীয় রাষ্ট্রগঠনে তাঁহারা প্রয়াস করেন নাই; রাজপুত চরিত্রের এতাদৃশ দৌর্ব্বল্যের উপর মুঘলসাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহাদের কুদৃষ্টান্ত ভারতের অন্যান্য হিন্দুরাজ্যে প্রসারিত হয়। তাহার ফলে বহু শত বৎসর ধরিয়া সমগ্র ভারতব্যাপী বৈষম্য ও অশান্তি। বৈষম্যমূলক অশান্তি এবং অনৈক্যের সুযোগ লইয়া একতাবদ্ধ মুসলমান শাসকগণ বিরাট্ বিজয়নগর সাম্রাজ্যের ধ্বংসসাধন করেন। বিরোধবিচ্ছিন্ন দেশীয় জনগণকে হস্তগত করিয়া বিদেশীগণ ভারতে তাঁহাদের আধিপত্যস্থাপনে সক্ষম হয়েন।

মৌর্য্য, গুপ্ত, পাল, বিজয়নগর প্রভৃতি হিন্দু-বৌদ্ধ যুগের ধর্ম্মরাজ্যসমূহের অবসান হইলে খৃঃ সপ্তদশ শতকে মারাঠাবীর ছত্রপতি শিবাজী ন্যায়ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে নব-হিন্দুরাষ্ট্রগঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী মারাঠা রাজবংশীয়গণের অবিশ্রাম আত্মকলহের ফলে এবং মহারাষ্ট্র শক্তির অযথা অত্যাচারপীড়িত ভারতের অন্যান্য প্রদেশীয় হিন্দুগণের সহযোগিতার অভাবে, অমিতপরাক্রম মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা-সূর্য্য একশত বৎসরের মধ্যে অস্তমিত হইল।

সম্প্রতি পঞ্জাবের জনৈক সম্ভ্রান্ত অধিবাসী, চৌধুরী কাবুল সিং, ভারতীয়, আরবী ও উর্দ্দু ভাষায়-সঙ্কলিত বহুসংখ্যক পাণ্ডুলিপি আবিষ্কৃত করার সংবাদ প্রকাশিত করিয়া জানাইয়াছেন যে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতক হইতে খৃঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত পঞ্চায়ৎশাসিত, শান্তিপূর্ণ, পাঞ্জাবী সমাজে অসবর্ণবিবাহের প্রচলন ছিল। পৌর সমাজপরিচালনে, সুযোগ্য ব্যক্তি হইলে, রজক ও সম্মার্জ্জক প্রভৃতিও পঞ্চায়তের নেতারূপে নির্ব্বাচিত ও নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং পঞ্চনদ প্রদেশে শ্রেণীসঙ্ঘবদ্ধ গণতান্ত্রিক সমাজে পৌরশৃঙ্খলা ও শান্তি অন্ততঃ দুই সহস্র বৎসরকাল অব্যাহত ছিল, উক্ত পাণ্ডুলিপিসমূহের মাধ্যমে ইহা বিবেচিত করা যায়।

ইতিহাসের সর্ব্বযুগে সর্ব্বদেশে সকল জাতির এবং সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা বিষয়ে নানাবিধ বিভেদবৈষম্য বর্ত্তমান ছিল, এখনও আছে। ভারতেও যুগে যুগে বিভেদবৈষম্যজনিত অশান্তি অজ্ঞাত নহে। কেহ কেহ এইরূপ অভিযোগ করিয়াছেন

যে, ভারতবর্ষেই সাম্প্রদায়িক এবং সামাজিক অনৈক্য ও অশান্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল এবং অদ্যাপি বর্ত্তমান এবং তজ্জন্য সমাজগত আচারবিচারের নিয়ন্তা ব্রাহ্মণশ্রেণীর অপরাধ অধিক। তাঁহাদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। পৃথিবীর অন্যান্য জনসমাজের তুলনায় বরঞ্চ প্রাচীন হিন্দুসমাজে এবং হিন্দুরাষ্ট্রে, বর্ণবিভাগ সত্বেও, অশান্তি ছিল অল্প। পঞ্চ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় সমাজে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়প্রদানের প্রচেষ্টা ইতিপূর্ব্বে করা হইয়াছে। ইহাও বহুজনবিদিত যে, মানবসমাজে সাম্য, মৈত্রী ও অভেদের বাণী সর্ব্বাগ্রে ঘোষিত করিয়াছেন 'জ্ঞানময়ী শিখা'- এবং 'জ্ঞানময় উপবীত'-ধারী ঋষি-মহর্ষিগণ। রাজ্যে তথা সমাজে আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বহুক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইতেন। রঘুকুলের রাজগুরু ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ। ব্রহ্মর্ষি মনু অযোধ্যার এবং মহর্ষি মহাগোবিন্দ বিম্বিসারের রাজধানী 'রাজগৃহের' পরিকল্পয়িতা। ব্রাহ্মণ 'বর্ষকার' মগধাধিপতি অজাতশত্রুর অমাত্যরূপে তৎনির্ম্মিত নব-রাজগৃহের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। মহাত্যাগী চাণক্যের তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি বর্ণাশ্রমী ভারতের স্বাধীনতা ও শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছিল গ্রীকের কবল হইতে। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ 'শক্তিস্বামী' কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্যের মন্ত্রিরূপে 'ভূস্বর্গের' বিপুল ঐশ্বর্য্য ও বিশাল সংস্কৃতি বিকশিত করিয়াছিলেন। কম্বোজাধিপতি দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মণের ব্রাহ্মণগুরু দিবাকর পণ্ডিত আঙ্কর ভাটের পরিকল্পনা করেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালসম্রাট্গণ বংশানুক্রমে গর্গদেব, দর্ভপাণি, বোধিদেব, বৈদ্যদেব, কেদার মিশ্র, শ্রীগরব মিশ্র, সোমেশ্বর প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মহামন্ত্রিগণের নির্দ্দেশানুযায়ী রাজ্যশাসনে পরিচালিত হইতেন। বহু শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, বিচারবুদ্ধিতে প্রবীণ ব্রাহ্মণগণই সাধারণতঃ মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইতেন এবং সর্ব্বথা সামাজিক আচারবিচারের নিয়ন্ত্রণ করিতেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে সুনিয়ন্ত্রিত, ব্রাহ্মণের মন্ত্রণাচালিত, গুপ্ত- এবং পাল-রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অন্যায় প্রভাব বিস্তার করিত না। রাষ্ট্র- ও সমাজ-পালনে রাজার প্রধান এবং একমাত্র দায়িত্ব ছিল সুবিচার ও দেশরক্ষা করা। সমাজের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বশিষ্ঠ, চাণক্য এবং গর্গদেবের মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, নির্লোভ ও ত্যাগশীল ব্রাহ্মণের ব্যবস্থাই চরম বলিয়া

স্বীকৃত হইত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-সঙ্কলিত 'বেণের মেয়ে' নামক গবেষণামূলক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসে, সহস্রবর্ষ পূর্ব্বকালীন পশ্চিমবঙ্গীয় সপ্তগ্রামের বর্ণাশ্রমী সমাজের উজ্জ্বল আলেখ্য প্রতিফলিত হইয়াছে।

পরমারবংশসম্ভূত মালবপতি অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের গুরু ও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ 'বাল সরস্বতী' মদন। আচার, বিনয়, বিদ্যা, ত্যাগ, নিষ্ঠা, তপ ও দান 'সত্যনিষ্ঠ, স্বদার-সন্তোষী,' ব্রাহ্মণগণের অবশ্যপালনীয় কুললক্ষণ ছিল। বশিষ্ঠ, চাণক্য, রামানন্দ, রামদাস প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ভারতরাষ্ট্র, ভারতসমাজ ও ভারতীয় জীবনকে সুপথে সুশৃঙ্খলে পরিচালিত করিতেন। মাধবাচার্য্য ও সায়ণাচার্য্য বিজয়নগর ধর্ম্মরাষ্ট্রের বিশাল সংস্কৃতি, বিরাট্ শিল্প, বিস্ময়প্রদ স্থাপত্য, বিপুল ঐশ্বর্য্য, ব্যাপক বাণিজ্য এবং অতুল বৈভবের নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন। অম্বর (জয়পুর) রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্যকর্ত্তৃক পরিকল্পিত, মহারাজা জয়সিংহের নব-রাজধানী, জয়পুর মহানগরীর বিজ্ঞানসম্মত আসনবিন্যাস ও নয়নাভিরাম স্থাপত্য পাশ্চাত্ত্য মহাদেশের আধুনিক নগরনির্ম্মাতা উচ্চশিক্ষিত স্থপতিগণকে বিস্মিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে।

সুশৃঙ্খল রাজ্যপরিচালনার ফলে অতীত ভারতে প্রবল কোনও ধর্ম্মমত ও সংস্কৃতি দুর্ব্বল ধর্ম্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে বিনাশ করে নাই। [প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায়কর্ত্তৃক দুর্ব্বল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে দলিত ও নির্ম্মূল করার দৃষ্টান্ত পাশ্চাত্ত্য ইতিবৃত্তসমূহে বিশেষতঃ আমেরিকার ইতিহাসে প্রচুর পাওয়া যায়।] প্রতীচ্য হইতে আগত বিবিধ সংস্কৃতির সমন্বয়ে ভারতীয় ধর্ম্মে উদার বিচারবুদ্ধি ও সত্যনিষ্ঠা বিকশিত হইয়াছিল। গ্রীক ও মধ্য-এশিয় সভ্যতার সারসংযোগে কুষাণযুগে ভাগবত সংস্কৃতির উদারতা ব্যাপকতর হয়। কণিষ্ক, হুবিষ্ক প্রভৃতি কুষাণ নরপতিগণ ভাগবত এবং বৌদ্ধতন্ত্রের অমৃতধারা আকণ্ঠ পান করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করেন। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরাজগণ সমাগত খৃষ্ট সাধকগণের অবস্থানের নিমিত্ত ভূদান করিতেন। খৃঃ সপ্তম শতকের মধ্যভাগে পারস্যদেশ হইতে পলায়িত অগ্নিপূজক পারসিকগণ গুজরাটে আসিয়া, গুর্জ্জর-রাজের আশ্রয়ে, তৎপ্রদত্ত ভূমিখণ্ডে, নিরাপদে বসবাস এবং ধর্ম্মাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুসলমানের ভারতবিজয়ের বহু পূর্ব্বেই সমাগত

মুসলমান সাধকগণের বাসগৃহ নির্ম্মাণের নিমিত্ত দেশীয় নরপতিগণ এবং মহাবীর উপাসিকা, জৈন-সাধিকা দেবী অনুপমা বহুসংখ্যক ভূমিখণ্ড দান করিয়াছিলেন এবং ৮৪ সংখ্যক মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৪৯৮ খৃঃ ভাস্কো-দা-গামার নেতৃত্বে পর্ত্তুগীজগণ জলপথে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে আসিয়া স্থানীয় হিন্দুরাজ 'সামুদ্রিনের' অনুগ্রহে স্বচ্ছন্দে ভারতে বসবাস ও অতঃপর কালিকটে একটি কুঠি স্থাপন করিয়া বাণিজ্য পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিদেশী অতিথি ও শরণার্থীকে সমাদরে গ্রহণ করিতে 'সর্ব্বভূতেষু আত্মবৎ'-জ্ঞানসম্পন্ন ভারতীয়গণ সোৎসুক থাকিতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের এহেন উদারতাকে পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা-প্রণোদিত অধুনাতন ভারতবাসী বহু ব্যক্তি কাপুরুষসুলভ দৌর্ব্বল্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, সপ্তসিন্ধব ও ব্রহ্মাবর্ত্তে উদ্ভূত চাতুর্ব্বর্ণ্য ব্রাহ্মণ্যসমাজ বহু পরবর্ত্তী কালের হিন্দুসমাজের মত অনুদার ছিল না। বৈদিক ব্রাহ্মণশ্রেণীর কেহ কেহ হলচালন, কৃষিকর্ম্ম ও ব্যবসাবাণিজ্য করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষা, দীক্ষা ও বৃত্তি ছিল অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের মত। জন্মগত, পরিবারগত অথবা অধিকারগত সর্ত্তানুযায়ী ব্রাহ্মণ, কৃষক অথবা ব্যবসায়ীর বংশধর যে বংশপরম্পরাক্রমে একই পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিবেন এইরূপ কোনও বিধান প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত নাই। বৈদিকযুগে শান্তিপূর্ণ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ পুষ্টিকল্পেই বর্ণ- ও শ্রেণী-বিভাগ ব্যবস্থিত হইয়াছিল।' ক্রমশঃ গ্রাম ও নগরীর শ্রেণীগত তথা বৃত্তিগত পারস্পরিক সহযোগিতা প্রবল হইয়া, সমাজের শান্তিশৃঙ্খলা অটুট রাখিয়া, বৃহত্তর সমাজ- ও রাষ্ট্র-জীবনের সৃষ্টি করে। সমাজপতি রাজর্ষি 'রাজন'-প্রমুখ পৌরজনসঙ্ঘের সুচিন্তিত নির্দ্দেশানুসারে শ্রেণীবদ্ধ সমাজজীবন সর্ব্বাঙ্গীণভাবে পরিপুষ্ট হইত। বুদ্ধদেবের পরমভক্ত বৈশ্যশ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডিকা গণতন্ত্রী সমাজের কর্ম্মশক্তিকে সক্রিয় ও প্রখর রাখিতে সতত সহযোগিতা করিতেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার-প্রণীত *Corporate Life in Ancient India* পঠিতব্য। 'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।'—গীতা।

উপনিষদ্ যুগের বহু পরে কুষাণ, শক, হূণ, যবন প্রভৃতির উপপ্লাবনজনিত অহিতকর অসামাজিক বৈষম্যসৃষ্টির ফলে অধোগামী সমাজরক্ষার অভিপ্রায়ে

জাতিভেদ ও বৃত্তিভেদের উৎপত্তি হয়; হিন্দুসমাজে কঠোর বিধিনিষেধ নিয়ন্ত্রিত হয়।[১৩]

ব্রাহ্মণ- ও ক্ষত্রিয়-শ্রেণীর হিন্দুগণ অন্যান্য বর্ণের যাঁহারা সমাজের বিধিনিষেধ অমান্যকরতঃ বিদেশীগণের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিতেছিলেন তাঁহাদের নিকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিলেন। ফলতঃ সনাতন হিন্দুসমাজ ক্রমশঃ সন্দিগ্ধচেতা, দুর্ব্বল ও পরস্পরবিরোধী হইল। যে উদার সমাজ একদা শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশীদের নির্ব্বিচারে সসম্মানে স্বীয় অঙ্গীভূত করিয়াছিল, কালক্রমে তাহাদের অত্যাচারে তাহা

---

১৩ কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন যে, চতুঃসহস্র বৎসর পূর্ব্বে য়ুরোপের পূর্ব্ব-দক্ষিণ এবং এশিয়ার পশ্চিমপ্রান্তের সংযোগস্থলের সমীপবর্ত্তী কাস্পিয়ান হ্রদের উপকূল হইতে আর্য্য মহাজাতি বিবিধ শাখায় বিভক্ত হইয়া পারস্য, মেসোপটেমিয়া, ভারতবর্ষ, ইতালি, গ্রীস, জার্ম্মানী, স্কান্দিনেভিয়া, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশসমূহে ছড়াইয়া পড়েন (পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। ভারতে তাঁহাদের প্রথম অবস্থিতি সপ্তসিন্ধব ভূভাগে (প্রাচীন ভারতের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)। আর্য্য মহাজাতির সমসাময়িক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বর্ব্বর, যাযাবর ও শিকারপ্রিয় অন্য একটি মানবজাতি বিদ্যমান ছিল। সেই জাতির একটি শাখা 'মোঙ্গল'। মোঙ্গল গোষ্ঠীর প্রথম কর্ম্মক্ষেত্র—বৈকাল হ্রদের পশ্চিমপ্রান্তস্থ সাইবিরিয়া। বহুকাল পরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ জেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ আলতাই পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া তারিম নদীর সান্নিধ্যে তাতার গোষ্ঠীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া চীন আক্রমণ করে। ১২১৪ খৃঃ পিকিং তাহাদের অধিকারভুক্ত হইলে তাহারা পশ্চিমমুখে অগ্রসর হইয়া তুর্কীস্তান, আফগানিস্তান, পারস্য এবং রুশিয়ার দক্ষিণভাগ আক্রমণ করে। অতঃপর তাহাদের ভারতাভিযান। মুঘলসম্রাট্ আকবর তাহাদের বংশধর ছিলেন। মধ্য এশিয়া হইতে বিনির্গত অন্য একটি যাযাবর শাখা 'হূণ' য়ুরোপ, চীন, পারস্য এবং ভারতবর্ষে অভিযান করে। মিহিরকুলের (৫২৫ খৃঃ) অধীনে খাইবার গিরিসঙ্কটের মধ্য দিয়া তাহারা ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় অধিবাসিগণের অর্থ, শস্য ও পশু প্রভৃতি লুণ্ঠন করে। কিন্তু মিহিরকুল পরিশেষে পরাজিত হয়েন। হূণের ভারতাভিযানের বহু পূর্ব্বে শকগোষ্ঠী (খৃঃ প্রথম শতক) এই দেশে আগমন করিয়াছিল। ভারতে হূণ-অভিযানের অনতিকাল পরে প্রবলপরাক্রান্ত কুষাণ-নরপতি কণিষ্ক পঞ্চনদ প্রদেশে কুষাণরাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। এইরূপে উপর্য্যুপরি বিদেশীগণ ভারত আক্রমণ করায় বিধ্বস্ত হিন্দুগণ সমাজের ধর্ম্মনীতিরক্ষণে কঠোর বিধিনিষেধের নিয়ন্ত্রণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বিপর্য্যস্ত হইয়া, অপবিত্র সমাজশত্রুজ্ঞানে তাহাদের দীক্ষাদান বন্ধ করিল। গুপ্ত ও মধ্যযুগেও হিন্দুসমাজ বিধিনিষেধের কঠোরতা শিথিল করিতে সক্ষম হয় নাই। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নানা কারণে হিন্দুগণ যখন কুসংস্কারপূর্ণ দুর্নীতির চরম সীমায় উপনীত—শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান রামমোহন রায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য ধর্ম্ম- ও দর্শন-শাস্ত্রসমূহকে জ্ঞানযোগসূত্রে গ্রথিত করিয়া, উপনিষদের নব-সংস্করণস্বরূপ, একেশ্বরবাদী ব্রহ্ম (ব্রাহ্ম) ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিলেন।

ইস্‌লামধর্ম্মের উপর মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর ঘৃণা অথবা বিদ্বেষ ছিল না। শ্রেষ্ঠ ইতিহাস-বিশারদ আচার্য্য যদুনাথ সরকারের বিবেচনায় 'ছত্রপতি' সর্ব্বধর্ম্মের প্রতি সমশ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। উন্নতচরিত্র, উদারহৃদয় ও সংযমী, প্রকৃত ধর্ম্মবীর শিবাজীর স্থান ছিল ঘৃণানিষ্ঠুরতার বাহিরে। নিরীহ হিন্দুধর্ম্মের, সনাতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরমশত্রু ঔরংজেব-প্রণোদিত নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধেই তিনি বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। মুসলমানধর্ম্ম ও মুস্‌লিম সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অকপট গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কখনও কোনও মুসলমান ধর্ম্মস্থান অথবা মসজিদ অপবিত্র অথবা ধ্বংস করিবার প্রয়াস তিনি করেন নাই। একদা রাজপথের উপরে বিক্ষিপ্ত একখানি কোরান তুলিয়া লইয়া তিনি একজন মুসলমানকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন।

য়ুরোপ ও আমেরিকার প্রবল ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলি দুর্ব্বল সম্প্রদায়সমূহকে যুগে যুগে যেরূপ বিনষ্ট করিয়াছিল, সর্ব্বধর্ম্মবিশ্বাসের প্রতি সহানুভূতিপরায়ণ ভারতীয় ধর্ম্মে কখনও তাহা ঘটে নাই; বরঞ্চ বহিরাগত মহৎ মহৎ আদর্শসমূহের সার চয়ন করিয়া তৎসাহায্যে ইহা স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডারস্থ দার্শনিক বৈচিত্র্যসমূহ সবল ও সরস করিয়াছিল। ভারতের সর্ব্বপ্রথম সূফীসাধক, গজনীর অধিবাসী আলিবিন ও উসমান্ অলজুল্লাবী হুজউয়িরী (একাদশ শতক), তৎপরে খাজা মৈনুদ্দীন চিশ্‌তী (দ্বাদশ শতক), নিজামুদ্দিন আউলিয়া (ত্রয়োদশ শতক) এবং শাহ্‌জালাল প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ভারতভূমিতে সাধনা করিয়া, উদার হিন্দুধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া, হিন্দু-মুস্‌লিম সংস্কৃতিবিকাশের পথ ক্রম-প্রসারিত করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে এক পরমেশ্বরেরই সন্তান, এই দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে সাম্যমৈত্রীর অভেদদর্শন তাঁহাদের চিত্তাকাশে ধ্রুবতারার মত স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছিল।

ভাষা, ধর্ম্ম ও আচারগত বিচার করিলে বেদপন্থী আর্য্যগণের সহিত আবেস্তপন্থী আর্য্যজাতির সাদৃশ্য বহুধা উপলক্ষিত হয়। সভ্যতার প্রথম ইতিহাসরচনার পূর্ব্বে আর্য্য-ভারতের সহিত আর্য্য-ইরানের ('এরিয়ান') সংস্কৃতিগত (ভাষা, ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতিমূলক) সংযোগ ছিল। বৈদিক উপাস্য সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ ও মরুৎ দেবতাগণ ইরানীয় ধর্ম্মে যথাক্রমে 'সুরীয়স্, অগ্নোস, বরুনাস ও মরুত্ স'-রূপে পূজনীয়। ভারতীয় ঋষি-মহর্ষি-প্রণোদিত ধর্ম্মদর্শনের সহিত জগদ্গুরু জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মদর্শন একই প্রণালীতে প্রবাহিত। সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বেদান্তের শিব ও শক্তি, বৈষ্ণব-দর্শনের কৃষ্ণ ও রাধা—একেশ্বরবাদী জরথুস্ত্রের 'অহুর মজ্দ' অর্থাৎ 'জীবনদেবতা ও বিশ্বপ্রকৃতি স্রষ্টা'র সহিত উপমেয়। ভেদাতীত, সার্ব্বভৌম পরমেশ্বরই ভারতীয় এবং ইরানীয় অধ্যাত্মদর্শন-সৃষ্টির মূল শক্তি। উপনিষদের জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ এবং কর্ম্ম (সেবা)-মার্গ 'অহুর মজ্দ'-এ 'অশ, ভোহুমনো, ক্ষত্র'-পর্য্যায়ের প্রধান ত্রয়াংশে রূপান্তরিত হইয়াছে। অথর্ববেদোক্ত অথর্ব্বণ সূক্তে পরমদেবতা 'অল্লা'র স্বরূপবর্ণনে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, ব্রাহ্মণ, সূর্য্য, চন্দ্র, ঋষি, আকবর এবং মহম্মদ প্রভৃতি শব্দ একত্র গ্রথিত আছে: "অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্ঠং পরমং পূর্ণং ব্রাহ্মণমল্লাং অল্লোবস্থর মহমদরকং বরস্য অল্লো অল্লাং..." "ইল্লাকবর ইল্লাকবর ইল্লল্লেতি ইল্লাল্লাঃ ইল্লা ইল্লল্লা অনাদিস্বরূপা অথর্বণী শাখাং হ্রূঁ হ্রীং...কুরু কুরু ফট্...।"

তুর্ক-আফগান আমলে দাদু, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সাধকগণ হিন্দু- ও মুসলমান-সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনে প্রয়াস করিয়া আংশিকভাবে সফলকাম হইয়াছিলেন। মুঘলযুগে শাহানশাহ্ আকবর তাহা পরিপুষ্ট করেন। ফতেপুর সিক্রিতে তৎপ্রতিষ্ঠিত 'ইবাদৎখানা' নামক ধর্ম্মসভামণ্ডপে তিনি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুস্লিম আচার্য্যগণ এবং হিন্দু, জৈন, পার্সি, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের সহিত ব্রহ্মাণ্ডপ্রসারী প্রকৃত সদ্ধর্ম্মের মূলতত্ত্বপ্রসঙ্গে আলোচনা করিতেন। শেষ জীবনে আকবর সূর্য্য ও অগ্নির উপাসনা করিতেন, হিন্দুপূজারীর ন্যায় ফোঁটাতিলক-ধারণ, ধ্যানাসন ও নিরামিষ আহার করিতেন। গো-বধ নিষিদ্ধ করার জন্য তিনি মুসলমান-সম্প্রদায়ের অপ্রিয় হইয়াছিলেন। অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী শাস্ত্রী-প্রণীত *Dīn-i-Ilāhi* হইতে মহামতি আকবরের, বিভিন্ন ধর্ম্মমতের সমন্বয়ের প্রচেষ্টার

সঙ্কলিত, 'ঈশ্বরে-বিশ্বাস'মূলক "দীন-ই-ইলাহী" মতবাদের এবং শাহানশাহের অমায়িক উদারতাসম্বন্ধে বহু তথ্য পাওয়া যায়। শাস্ত্রী মহাশয় বহুকাল যাবৎ আরব, ইরান ও মিশরে অবস্থান করিয়া গবেষণাকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং ভগবদ্গীতা আরবী ভাষায় অনূদিত করিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধন করিতে নানক একেশ্বরবাদী শিখসমাজের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

উপনিষদের একেশ্বরবাদ এবং ইস্লামের একেশ্বরবাদ মূলতঃ একই অখণ্ডনীয় মহাসত্য হইতে উদ্ভূত। ইহাই অনুধাবন করিয়া ভারতবাসী মুসলমান-সম্প্রদায় হিন্দুধর্ম্মের মূল নীতির প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। মুসলমানের বিবিধ উৎসব ও অনুষ্ঠানের মধ্যে সন্তানের জন্মোৎসব হইতে তাহার মৃত্যুর পরবর্ত্তী ধর্ম্মাচরণসমূহ হিন্দুজাতির অনুরূপ অনুষ্ঠানের সহিত বহুধা মিশ্রিত আছে। ভারতীয় বাদশাহ্গণ দেওয়ালি-, হোলি-, নববর্ষ-উৎসব (নওরোজ) প্রভৃতি পালন করিতেন। হিন্দুর উপাসনাবিধির বহুলাংশ মুসলমানী উপাসনা ও পর্ব্বে উপলক্ষিত হয়। জপমালা (তসবী), নিঃশ্বাসনিয়ন্ত্রণ ও যৌগিক প্রক্রিয়া, ধ্যানাসন, আমিষাহার, উপবাস প্রভৃতি পীর-মুর্শিদ ও মুসলমান সাধক-সম্প্রদায়ের বহু ব্যক্তি পালন করিয়া থাকেন। গৌড়াধিপতি জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহের বেগমসাহেবা আসমানতারা হিন্দুবিধবার মত কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন। সূফী মতবাদ বেদান্ত-দর্শনদ্বারা প্রভাবিত। হিন্দুগুরু বহুসংখ্যক মুসলমান শিষ্যগণকে দীক্ষা দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, মুসলমান সাধকের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন বহু হিন্দু। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈষ্ণবতন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন শত শত মুসলমান এবং কবীর প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন বহু হিন্দুর দীক্ষাগুরুরূপে।

মুসলমান অভিজাতবর্গ হিন্দুধরণের পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। "ভারতীয় মুসলমানের উপর হিন্দুপ্রভাব"-প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রেজাউল করীম বহুবিধ যুক্তিপূর্ণ একটি অমূল্য প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "ভারতবর্ষ যদি ইউরোপীয় শক্তির দ্বারা অধিকৃত না হইত, দেশের বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি পূর্ণ সমন্বয় সাধিত হইয়া যাইত।...ভারতের (বর্ত্তমান) মুসলমানের কয়জন আরব, ইরান, তুর্কী, তাতার হইতে আসিয়াছেন? নির্দ্দিষ্ট

কতিপয় পরিবার, কিছুসংখ্যক সৈন্যসামন্তদের বংশধর, আর কতক কতক শাসক-শ্রেণীর আত্মীয়স্বজনের অধস্তন পুরুষ ব্যতীত ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের অধিকাংশই এদেশেরই সন্তান। অতীতকালে তাঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেও হিন্দু ভাবধারা ও হিন্দু সংস্কৃতি তাঁহারা একেবারেই বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। আজ ভারতীয় মুসলমানদের জীবনযাত্রার মধ্যে হিন্দুপ্রভাবের বহু নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে আরব, ইরান প্রভৃতি দেশের প্রভাবের অল্প চিহ্নই অবশিষ্ট আছে। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, মহম্মদ তোগলক প্রমুখ জাঁদরেল শাসকগণ, যাঁহারা কোন অতীতে মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এদেশের কোথাও তাঁহাদের চিহ্নমাত্র নাই, মুস্‌লিম বিজেতাগণ সম্পূর্ণভাবে ভারতের জনগণের সঙ্গে একাঙ্গ হইয়া মিশিয়া গিয়াছেন।....মুসলমান যে সমাজব্যবস্থা রচনা করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থা হইতে বেশী পৃথক নহে।...তাঁহারা আর্‌বী ও ফার্‌সী ভাষা এদেশে চালাইতে পারেন নাই। তাঁহারা এদেশের ভাষাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন" (আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬০, ১৪৩ পৃঃ)।

বস্তুতঃ, সংস্কৃত- ও হিন্দী-ভাষার সহিত ফার্‌সী- ও আর্‌বী-শব্দের সমন্বয়ে উর্দু ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ। প্রথম মুসলমান-শাসিত যুগের ভারতে মুসলমান শাসকগণ তুর্কিভাষায় কথা কহিতেন; কিন্তু শাসনকার্য্য পরিচালিত হইত ফার্‌সীভাষার মাধ্যমে। পরবর্ত্তী কালে তুর্কি- অথবা ফার্‌সী-ভাষা ভারতে অচল হইল। বর্ত্তমান উর্দু ভাষার পঞ্চান্ন হাজার শব্দের মধ্যে বিয়াল্লিশ হাজার ভারতীয় ভাষাসমূহ হইতে গৃহীত।

মধ্যযুগের ভারতস্থাপত্য, চিত্র- ও সঙ্গীত-কলা হিন্দু- ও মুস্‌লিম-সংস্কৃতির সমন্বয় হইতে উদ্ভূত। জেরুজালেম, তুর্ক এবং ইরানী মুস্‌লিম স্থাপত্য হিন্দু-মুস্‌লিম ভারতীয় স্থাপত্য হইতে বহুধা পৃথক্‌। তাজমহল হিন্দু-মুস্‌লিম সংস্কৃতির চরমোৎকর্ষ। তাহার অনুরূপ অনিন্দ্যসুন্দর সমাধিসৌধ বহির্ভারতীয় মুস্‌লিম জগতের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। পঞ্চরত্ন হিন্দুমন্দিরের আদর্শে তাজমহলের আসন ও স্থাপত্যশৈলী বিন্যস্ত হইয়াছে এবং অজন্টার পদ্মকোরকাকৃতি স্তূপশিখরের অনুপ্রেরণায় তাজমহলের গম্বুজ

পরিকল্পিত।* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লণ্ডন রয়েল সোসাইটি অফ্ আর্টের অনুষ্ঠিত একটি বিশিষ্ট আলোচনাসভায় সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, তাজমহল প্রধানতঃ হিন্দু-স্থাপত্যের এবং অংশতঃ মুস্‌লিম স্থাপত্যের আদর্শে রচিত, তাহার গঠনে ইতালীয় অথবা অন্যবিধ স্থাপত্যের কোনও অবদান নাই।

মধ্যযুগের শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গে দামোদর, সরস্বতী প্রভৃতি নদনদীর সমতটবর্ত্তী সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া, ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, মহানদ প্রভৃতি—সু-উচ্চ দেবালয়, মঠ, বিহার ও মসজিদ-পরিপূর্ণ—জনপদসমূহে স্থানীয় সামন্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে উদার সভ্যতা উদ্ভূত হইয়াছিল তাহাতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা প্রবল ছিল না। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক দেবদেবীর উপাসক, শৈব-উপাসক, সূর্য্য-উপাসক এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায় মুসলমান গোষ্ঠীসহ একত্রে সুখে-শান্তিতে বসবাস ও ধর্ম্মাচরণ করিতেন। ঐশ্বর্য্যের অধিকার ব্যপদেশে কিছুকাল যাবৎ অস্থায়ী বিরোধিতার অবসানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সৌভ্রাত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। লালকুনওয়ারনাথ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত হিন্দু (১৭৬৩ খৃঃ) পাণ্ডুয়ার একটি মসজিদগৃহের সংস্কার করেন। পাণ্ডুয়ার শাহ্‌সূফীর আস্তানায় হিন্দু-মুসলমান একত্র মানত করেন; উপাসনা করেন। পৌষ ও চৈত্র মাসে তথায় পীরের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বহু হিন্দু ও মুসলমান মেলায় যোগদান করেন। ভক্তিভরে হিন্দুগণ সত্যপীরের 'দরগায়' ধর্‌না দেন। ভক্তিভরে মুসলমানগণ লক্ষ্মীর পাঁচালি গান করেন এবং সত্যনারায়ণের শিন্নি গ্রহণ করেন। হিন্দুগণও পীরের শিন্নি ভক্ষণ করেন। শত বৎসর পূর্ব্বে বাংলার মেলায় মেলায় 'গাজীর পট' (প্রাচীন বাংলার যমপটের মুসলমানী সংস্করণ) দেখাইয়া মৃত্যুর পরে মৃতব্যক্তিবর্গ যমরাজের বিচারে তাহাদের ইহজন্মে সাধিত সুকৃতি ও দুষ্কৃতির কর্ম্মফলজনিত কিরূপ পুরস্কার অথবা দণ্ড পাইবে দর্শকদের তাহা বুঝান হইত (১২৫-২৬ চিত্র)। হিন্দু ও মুসলমান তথায় নীতিমূলক হিতোপদেশ গ্রহণ করিতেন। মাত্র পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও দুর্গাপূজার উৎসবে মুসলমান আবালবৃদ্ধবনিতা আনন্দসহকারে পূজাবাটিতে পান-ভোজন করিতেন ও পৌরাণিক লীলামূলক যাত্রা-থিয়েটার উপভোগ করিতেন। হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের এবং মুসলমানের সহিত হিন্দুর সংঘাত ভারতীয় রাষ্ট্র-ইতিহাসের কয়েকটি বিশেষ বিশেষ পর্য্যায় মাত্র। পরবর্ত্তী সমন্বয়ের ইতিহাসই ভারতের

প্রকৃত জাতীয় ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। একজন কুমারিল ভট্ট, একজন ঔরংজীব এবং কয়জন ধর্ম্মান্ধ মোল্লা স্বতঃস্ফূর্ত্ত সমন্বয়ের গতিরোধ করিতে পারেন নাই।

ভেদাতীত পরম সত্যের প্রচারকল্পে মধ্যযুগে কবীর, ভক্ত দাদু, রজ্জব প্রভৃতি মুসলমান সাধকগণ আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতকে সেই সত্যে দীক্ষিত হইয়াছিলেন মহীশূরের অধীশ্বর টিপু সুলতান। কোন কোন ইতিহাসবেত্তার অভিমতে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য তদীয় কার্য্যকলাপে প্রকটিত হইয়াছিল। ধর্ম্মসংক্রান্ত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-কলহ প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্ত্যে চিরকাল বর্ত্তমান ছিল, অদ্যাপি আছে। টিপুও হয়ত তাহার প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই। কিন্তু সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। ইংরাজ-সৈন্য শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিলে, সার উইলিয়ম কার্কপাত্রিক টিপুর লিখিত দুই সহস্রাধিক দলিল ও চিঠিপত্রের অনুলিপি সংগৃহীত করিয়া অতঃপর ইংরাজি ভাষায় অনূদিত করাইয়াছিলেন। কলিকাতা National Libraryতে সেইগুলি সংরক্ষিত আছে। অনুবাদ হইতে টিপুর মহৎ চরিত্রের, বিশেষতঃ সামাজিক কর্ত্তব্যপরায়ণতার, বিবিধ তথ্য পাওয়া যায়। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠের অনুশাসনে তাঁহার নিঃস্বার্থ দানের উল্লেখ বর্ত্তমান। তিনি হিন্দুমন্দিরে পূজার উপচার নিবেদন করিতেন। তিনি হাকিমী (য়ুনানি-আয়ুর্ব্বেদ) চিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন; জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সাধারণ প্রজাগণের গৃহে গৃহে গমন করিয়া রোগিগণের চিকিৎসা করিতেন; রাজভাণ্ডার হইতে ঔষধপথ্য প্রেরণ করাইতেন। হিন্দুর বিবাহ-আসরে উপস্থিত থাকিতেন; উপঢৌকন পাঠাইতেন। শ্রীরঙ্গপত্তন যুদ্ধের কালে রাজধানী-সংলগ্ন কাবেরী নদীর তীরে, হিন্দু-পুরোহিতবর্গের নির্দ্দেশে, তিনি যজ্ঞ সম্পন্ন করাইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও শাস্ত্রবিদ্‌গণকে গাভী ও স্বীয় রাজ্যে প্রস্তুত ব্যাঘ্রচিহ্নিত সুবর্ণমুদ্রা স্বহস্তে বিতরণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অনুশীলন

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন অজ্ঞাত ছিল না। মুসলমান-অধিকৃত ভারতেই, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে, প্রাচীন দেশীয় বিজ্ঞান

(পদার্থ- ও রসায়ন-বিজ্ঞান) এবং জ্যোতির্বিদ্যার প্রবর্দ্ধমান উন্নতি ভীষণভাবে প্রতিহত হয়। মোহেন্-জো-দড়ো প্রাথমিক খনি ও ধাতুবিদ্যার এবং প্রাথমিক আয়ুর্ব্বেদের ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছে। তথায় কাচের উদ্ভব হয়। খনন হইতে বিবেচিত হইয়াছে যে, স্থানীয় অধিবাসিগণ কাচ ব্যবহার করিতেন। ষষ্ঠ সহস্র বৎসরের প্রাচীন ভারতীয় নগর ও বাস্তুনির্ম্মাণপ্রসঙ্গ ইতিপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। গৃহ্যসূত্র, রামায়ণ, মহাভারত, জাতক এবং অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত দেশীয় নগরীসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে।

নালন্দায় বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ও গবেষণা কি ভাবে পরিচালিত হইত তাহার আভাস প্রদত্ত হইয়াছে। নবম শতকে জৈনাচার্য্য কুমুদেন্দু-সঙ্কলিত তালপত্রের পুঁথিতে দেশীয় পদার্থবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণিতত্ত্ব, জ্যোতিষ, পশুচিকিৎসা, আয়ুর্ব্বেদ এবং জীববিদ্যার উৎকর্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষাতত্ত্ব এবং সঙ্গীতশাস্ত্র পৃথিবীর অন্যত্র প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব্বে ভারতে, ত্রিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে, উদ্ভূত হইয়াছিল। ভারতের বিজ্ঞানবিষয়ক গবেষণা চীনা-, ইরানী- ও আরবী-ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। ম্যাক্সমুলার বলেন, বহু প্রাচীনকালে হিন্দু এবং গ্রীকগণ ব্যাকরণশাস্ত্রে উৎকর্ষলাভ করেন; কিন্তু পাণিনির রচনাপদ্ধতি গ্রীক-বৈয়াকরণের রচনাপদ্ধতির তুলনায় উন্নত ছিল। অধ্যাপক হল বলেন, "গ্রীক- ও লাটিন-ভাষা অপেক্ষাও সংস্কৃত-ভাষা পূর্ণাবয়বসম্পন্ন, অধিকতর ভাবদ্যোতক, সৌন্দর্য্যশালী ও শব্দপ্রাচুর্য্যময়।"

Statesman-এ ছয় বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল যে, মহীশূর আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি গবেষণা পরিষৎ ভরদ্বাজ-সঙ্কলিত, দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত, 'বৈমানিক শাস্ত্র' নামক প্রাচীন পুঁথির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছেন। উহাতে 'সুন্দর, শকুন ও রুক্ম' নামক ত্রিবিধ ব্যোমযানের অঙ্কনচিত্র ও নির্ম্মাণপ্রণালীসহ তাহাদের চালনাপদ্ধতি বিবৃত আছে। এইরূপ 'পুষ্পক রথ' এই দেশে নির্ম্মিত হইত যাহা কোনও প্রকারে ভগ্ন অথবা অগ্নিদগ্ধ হইবার আশঙ্কা ছিল না। বিবিধ 'যন্ত্র' ও কৃত্রিম হীরকনির্ম্মাণের এবং মেঘ হইতে কৃত্রিম উপায়ে বারিবর্ষণের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার পাণ্ডুলিপিও পরিষদের হস্তগত হইয়াছে। মহর্ষি দত্তাত্রেয় তদীয় শিষ্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে অবিনাশী, অক্ষয় একটি সুবর্ণখচিত বিমানপোত উপহার প্রদানপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, উহা

আকাশমার্গে সর্ব্বত্র পরিচালিত করা যাইবে (মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১১৫-১৭ অধ্যায়)। 'রামায়ণ' ও 'রঘুবংশ' 'পুষ্পক রথ'-বিমানের উল্লেখ করিয়াছে। 'কুমারসম্ভব'-কাব্যের দ্বাদশ সর্গের তৃতীয় শ্লোক হইতে জানা যায় যে, দেবরাজ ইন্দ্র 'মেঘাত্মক' বিমানপোতে আরোহণ করিয়া হরগৌরীর দর্শনমানসে কৈলাসে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

১৯৫৪ সালের ২৯শে জুলাই কলিকাতায় 'বাণিজ্যসম্বন্ধীয় পূর্ত্তবিজ্ঞান'-প্রসঙ্গে অনুষ্ঠিত একটি সভার অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে UNESCO সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি এবং ভারত গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব বাণিজ্যসচিব স্যার এ. রামস্বামী মুদলিয়র বলিয়াছিলেন, "অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে ভারতীয় বাণিজ্যপোত সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতেই তাঁহাদের অর্ণবপোত নির্ম্মাণ করাইতেন। ট্রাফলগর যুদ্ধবিজয়ে ভারতে নির্ম্মিত রণতরীসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছিল। ভারতের সহিত প্রতিযোগিতায় লণ্ডন এবং লিভারপুলের জাহাজ-নির্ম্মাণের কারখানাগুলি বন্ধ হইবার আশঙ্কায় ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একটি বিশেষ আইন জারি করিয়াছিলেন যদ্দারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে জাহাজ নির্ম্মাণ বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

কণাদ, কপিল, আর্য্যভট্ট, বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্তের সমতুল জ্যোতির্ব্বিদ এবং চরক, সুশ্রুত ও জীবকের মত চিকিৎসক, শল্যক ও পেশীবিদ্ সমসাময়িক পাশ্চাত্ত্য জগতে দুর্লভ ছিল বলিয়া কথিত আছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা জৈব শারীরতত্ত্বের উপর সৌর প্রকৃতির প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আয়ুর্ব্বেদ প্রণয়ন করেন (১২৭ চিত্র)। মূল বেদরূপী মহীরুহের প্রশাখার ন্যায় আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ ও স্থাপত্যবেদ উপবেদের অন্তর্গত। বৃক্ষলতা, পত্রপুষ্প, গিরিনদী প্রভৃতি প্রকৃতিসৃষ্ট 'প্রাণময়' পদার্থ হইতেই আয়ুর্ব্বেদীয় উপাদানসমূহ আহরিত। ভারতে প্রকৃতির অনুকূল উপাদানে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ, পথ্য ও সাধারণ আহার্য্য প্রস্তুত হইত বলিয়া ভারতবাসিগণ সুস্থ, সবল ও দীর্ঘজীবী হইতেন। ১৯০৫ সালে King's Institute of Preventive Medicine প্রতিষ্ঠাকালীন বক্তৃতায় মাদ্রাজের গভর্ণর লর্ড অম্পথিল বলিয়াছিলেন, "খৃষ্টযুগের প্রারম্ভে গ্রীস ও রোম প্রভৃতি রাজ্যসমূহে যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান প্রচলিত ছিল তাহার কৃতিত্ব উক্ত বিজ্ঞানের জনক হিসাবে ভারতবর্ষের

প্রাপ্য।” “য়ুরোপ যখন অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল রোগপ্রতিষেধক ও রোগপ্রতিকারক ভেষজবিজ্ঞানে ভারতবর্ষ তখন অভিজ্ঞ ছিল।”—কর্ণেল কিং যুক্তিসহকারে এই মন্তব্যের সমর্থন করিয়াছেন। ভৈষজ্যবিদ্যার মত বিবিধ অস্ত্রোপচারে এবং শল্য, শালাক্য ও ধাত্রীবিদ্যাতেও হিন্দু-চিকিৎসকগণ প্রসিদ্ধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টজন্মের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আয়ুর্ব্বেদীয় অনুশীলন সজাগ ছিল। তখন এদেশে শরীর ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাবিদ্যার প্রাথমিক অবস্থা প্রত্যক্ষীভূত হয়। “আয়ুর্ব্বেদের সমতুল প্রকৃষ্ট চিকিৎসাবিজ্ঞান তদানীন্তন পাশ্চাত্ত্য জগতে অজ্ঞাত ছিল। আয়ুর্ব্বেদ আরবের মাধ্যমে ঈজিপ্ট, ইতালী, গ্রীস প্রভৃতি রাজ্যে প্রচারিত হয়।” ক্রমশঃ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা, ভারতীয় প্রকৃতির কল্যাণে বহুধা উন্নত হইয়া, পাশ্চাত্ত্যে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। এডওয়ার্ড গিল্ড মাইস্টার, ফ্রিডরিচ হফম্যান্, আলবেরুনি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকগণ হিন্দুর চিকিৎসা-বিজ্ঞানের প্রাধান্য অকুণ্ঠিতভাবে স্বীকার করিয়াছেন। অশোক জগতে সর্ব্বপ্রথম আরোগ্যশালা (হাসপাতাল) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আলগ্‌জাণ্ডার এদেশে অবস্থানকালে গ্রীক-চিকিৎসকবৃন্দ সঙ্গে রাখিতেন। কিন্তু তাঁহারা যেসকল রোগের উপশম করিতে অক্ষম হইতেন হিন্দুবৈদ্যগণ সেসকল আরোগ্য করিতেন। আয়ুর্ব্বেদে প্রাণিতত্ত্ব এবং বিবিধ পশুচিকিৎসার নির্দ্দেশ আছে যাহা তৎকালীন য়ুরোপে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল। পালযুগে বঙ্গদেশীয় মহর্ষি পালকাপ্য ‘হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ’-নামক হস্তিচিকিৎসার অপূর্ব্ব গ্রন্থ সূত্রিত করিয়াছিলেন। মৌর্য্যযুগে কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রেও ‘হস্তিপ্রচার’-অধ্যায়ে হস্তিচিকিৎসার ব্যবস্থা নির্ণীত হইয়াছিল। বিজ্ঞানাচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ‘হিন্দু রসায়নের ইতিহাস’-গ্রন্থে দেশীয় চিকিৎসা ও রসায়নবিজ্ঞান বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বরাহমিহির এবং উদয়ন উদ্ভিদবিদ্যায় ও উদ্ভিদের রোগচিকিৎসায় পারদর্শী ছিলেন। দর্শনাচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল লিখিয়াছেন যে, প্রাচীন গ্রীক-দার্শনিক প্লেটোর চিন্তাপ্রণালীর তুলনায় প্রাচীনতর যুগের ভারতের দার্শনিক চিন্তাধারা সুস্পষ্ট ও শ্রেষ্ঠ ছিল। হিন্দুই পাটীগণিতশাস্ত্রে ‘শূন্য’ সংখ্যার এবং দশমিক গণনার উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহ ভারত হইতেই

বীজগণিত ও জ্যামিতি শিক্ষা করেন। সম্প্রতি পুরীধামের গোবর্দ্ধন মঠাচার্য্য জগদ্গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভারতীকৃষ্ণতীর্থ, পি-এইচ.ডি. কলিকাতার প্রকাশ্য সভায় 'বৈদিক যুগে গণিতবিদ্যা'-প্রসঙ্গে গবেষণামূলক অমূল্য বক্তৃতা প্রদানকালে বলিয়াছেন, বৈদিক ষোড়শসূত্র-শাস্ত্রদ্বারা কলিত জ্যোতিষ, গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নসম্বন্ধীয় যাবতীয় অনুসন্ধান ও সন্দেহগুলি মীমাংসিত হইতে পারে; তদ্বিষয়ে তিনি একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করিবেন। আর্য্যভট্ট ভূমণ্ডলের আহ্নিক- এবং বার্ষিক-গতির তথ্য উদ্ভাবিত করেন। উলূক্য মহর্ষি কণাদ সর্ব্বাগ্রে 'আণবিক (Atom) শক্তির আভাস প্রদান করিয়াছিলেন। ঋষি-মহর্ষিগণ ধ্যানযোগে নক্ষত্রমণ্ডলে মানবের অবস্থিতি প্রণিধান করিতেন। পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিকসঙ্ঘ সম্প্রতি মঙ্গল- ও চন্দ্র-গ্রহে মানবের বসতিসম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়া তাহাদের সহিত সংযোগস্থাপনে প্রয়াস করিতেছেন। শুক্রগ্রহেও জীবের অবস্থান অনুমান করিয়া বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পরিচালিত হইতেছে। অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, খৃঃ পূঃ ভারতে, অশোকের রাজ্যশাসন-কালে, ডাক-হরকরার মাধ্যমে পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল।

বস্তুতান্ত্রিকতার কবলে বর্ত্তমান ভারত

বস্তুতান্ত্রিক-যান্ত্রিক সভ্যতা ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি ও সমাজকে ক্রমশঃ দুর্ব্বল করিয়া নির্ম্মূল করিবার প্রয়াস করিতেছে। প্রগতিপরায়ণ প্রতীচ্যের সহিত ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক সদ্ভাব রক্ষা করিতে হইলে ভারতীয় কর্ম্মজীবনের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিকাশের প্রয়োজন সত্য। আচার- ও বিচার-ক্ষেত্রে বর্ত্তমান ভারতের চিন্তা- ও কর্ম্ম-ধারার পরিবর্ত্তন হইয়াছেও প্রচুর। কিন্তু জাতীয় সমাজ ও আদর্শে, শিক্ষা ও শিল্পে, নিছক বস্তুতান্ত্রিকতার একাধিপত্য ভারতের বৈদান্তিক সাধনাসম্ভূত ধর্ম্মময় কর্ম্মজীবনের স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকাশের অনুকূল নহে। পরাধীনতা-শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবাসিগণ 'য়ুরো-আমেরিকান' জীবনযাত্রার সর্ব্বাঙ্গীণ অনুকরণ সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করুন; নচেৎ অদূর ভবিষ্যতে জাপানের মত দুর্গতির অকূল পাথারে তাঁহাদের নিমজ্জিত হইতে হইবে। দেশীয় প্রকৃতির অনুকূল পরিবেশে, জাতীয় সংস্কৃতি-প্রণোদিত স্বদেশী বাসভবনে, ভারতীয় জীবন বিকশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; তাহার অন্যথা

হইলে ভারতের পরিণাম হইবে অশুভ। দেশীয় প্রকৃতি ও জাতীয় সংস্কৃতিসম্মত বাসভূমি-, পল্লী- ও নগরী-বিন্যাসের উপরেই জাতীয় জীবনের মঙ্গল নির্ভর করে।

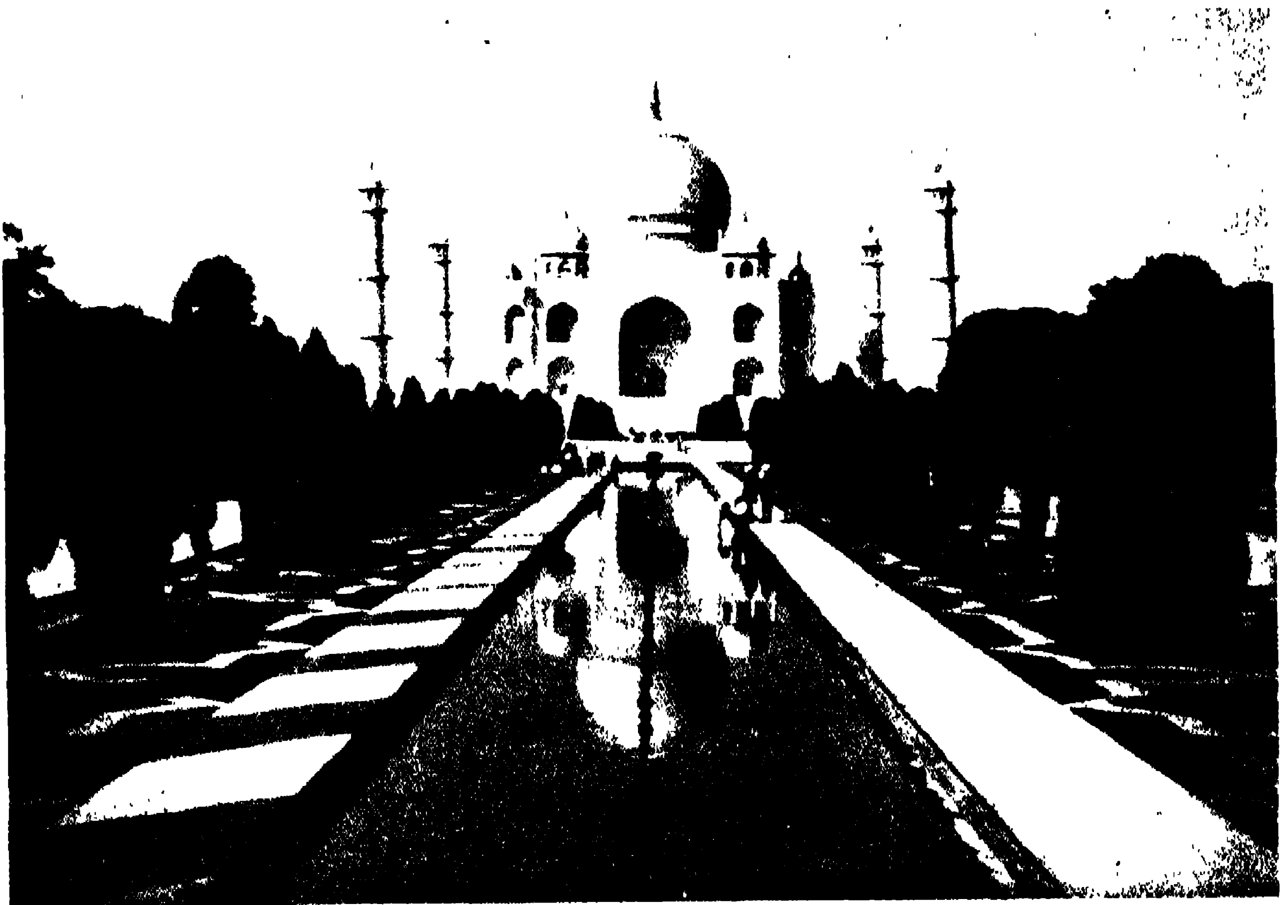
শ্রেষ্ঠিগণ প্রভূত অর্থব্যয়ে, অদ্ভুত অসমঞ্জস স্থাপত্যে, সৌধমন্দির ও উদ্যান নির্মাণ করিতেছেন। তদ্দ্বারা জাতীয় আদর্শ তথা আভিজাত্য কলুষিত হইতেছে। ভারতীয় ধরণের বিশিষ্ট উদ্যান একদা বিশ্বের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল। মধ্যযুগীয় রাজস্থানে আভিজাত্যগরিমাদীপ্ত নয়নাভিরাম উদ্যানরচনার ধারাবাহিক পদ্ধতি বহুলপরিমাণে সংরক্ষিত হইয়াছিল। মুঘল আসিয়া তৎসহ পারস্য ও মধ্য এশিয়ার শ্রেষ্ঠ উপাদানসমূহ সুসঙ্গতভাবে মিশ্রিত করিলেন। সুসমঞ্জস মিশ্রণের ফলে মুঘল-ভারতের অপূর্ব্বশোভন বিলাসোদ্যানের সৃষ্টি। সেইরূপ উদ্যানের মনোহর নিদর্শন মধ্যযুগীয় উত্তর ও মধ্যভারতীয় এবং রাজস্থানীয় কয়েকটি সহরে ও দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। উদয়পুরের 'সজ্জনবিলাস' কুঞ্জকানন, যোধপুরের রাইকাবাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী 'যশোবন্ত' উদ্যান, বিকানীরের 'গজনির বাগ', পাতিয়ালার 'মতিবাগ' এবং বারাণসীর 'রামনগর' রাজোদ্যান তাহাদের অন্তর্গত। তাজমহলের প্রসারিত উদ্যান, কাশ্মীরের নূরজাহান-রচিত 'শালিমর বাগ' ও শাহ্‌জাহান-রচিত 'নিশাত বাগ' হিন্দু-মুঘল বিলাসকাননের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ (১২৮ চিত্র)। অষ্টাদশ শতকে ভরতপুরাধিপতি সুরযমল-বিরচিত 'ডিগ' প্রাসাদোদ্যান প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। উহা প্রধানতঃ শুক্রাচার্য্য-নির্দ্দেশিত উদ্যানরচনার অনুসরণ করিয়াছিল।

হিন্দুস্থানের উদ্যানশোভন চারুশিলাগৃহ, যন্ত্রধারাগৃহ, প্রেক্ষাগার, নাট্য ও নৃত্যমণ্ডপ, চন্দ্রশালা, সাগরগৃহ, মণিশিলাপট্ট, স্ফটিক-সোপানবেষ্টিত কৃত্রিম স্ফটিক-সরোবর, মানমন্দির, তমালবীথিকা, বকুলবীথিকা, জবাবিতান, লতাকুঞ্জ, বেণুকুঞ্জ, মাধবীকুঞ্জ, বসন্তমঞ্চ, পারাবত-রব-মুখরিত উদ্যান-বাটিকার বলভী, অপিচ প্রাসাদ-হর্ম্ম্যের শুককপোত-সেবিত আলিসার তলে তুষারধবল বিটঙ্কগুলি—তাহাদের প্রাচীন অভিধার মোহমাধুরিমাসহ এক্ষণে সংস্কৃত সাহিত্যেই অধিষ্ঠিত আছে। মধ্যযুগীয় 'মতিবাগিচা'র কমল-উৎস, 'মতিমহল', 'বারাদরী', 'আঙ্গুরী বাগ', 'যশমিন বাগ', 'আসমান চবুত্রা', 'রাওটি', 'সজ্জনবিলাস মণ্ডপ', 'বারিযন্ত্র', 'ঘটিকাযন্ত্র', 'মর্ম্মরবেদী', 'দোলমঞ্চ', সুপ্রশস্ত রাজপথাচ্ছাদনকারী 'সূর্য্যতোরণ'—প্রাচীন প্রমোদকাননেরই

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—কেবলমাত্র ভিন্ন নামে, পরন্তু অভিন্ন আকারে, একশত বৎসর পূর্ব্বেও শ্রেষ্ঠীর উপবনে বিরাজ করিত। ইতালীয় ও ফরাসী উদ্যানের অনুকরণে ভারতের অধুনাতন ধনিক সম্প্রদায় ভারতীয় প্রকৃতির প্রাণপ্রিয় উদ্যানরচনার বিশিষ্ট বিশিষ্ট পদ্ধতিসমূহ ক্রমে ক্রমে পরিত্যাগ করিতেছেন। বর্ত্তমান প্রমোদোদ্যানে 'প্লাস্টারের ভেনস্' প্রতিমা, জুতাপায়ে-'ব্রেসলেট'-হাতে উড্ডীয়মানা 'সিমেন্টের' পরী, 'লৌহের রেলিং', 'লৌহের বেঞ্চ', 'ল্যাম্প পোস্ট', লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া গার্ডেনের ফোয়ারার অনুকৃতি 'ঢালাই লোহার' কৃত্রিম 'ফোয়ারা' প্রভৃতি বিচিত্র বস্তুর বিসদৃশ সমাবেশ! অথচ উদয়পুর, লাহোর, বিকানীর, রামনগর ও বিজয়নগরের প্রসারিত রাজোদ্যানে প্রাচীনপন্থী স্নিগ্ধশীতল তরুবীথিকা, পুষ্পোজ্জ্বল কুঞ্জকানন, মরালসেবিত কমল সরোবর, মনোহারী ক্রীড়াশৈল অদ্যাবধি দৃশ্যমান।

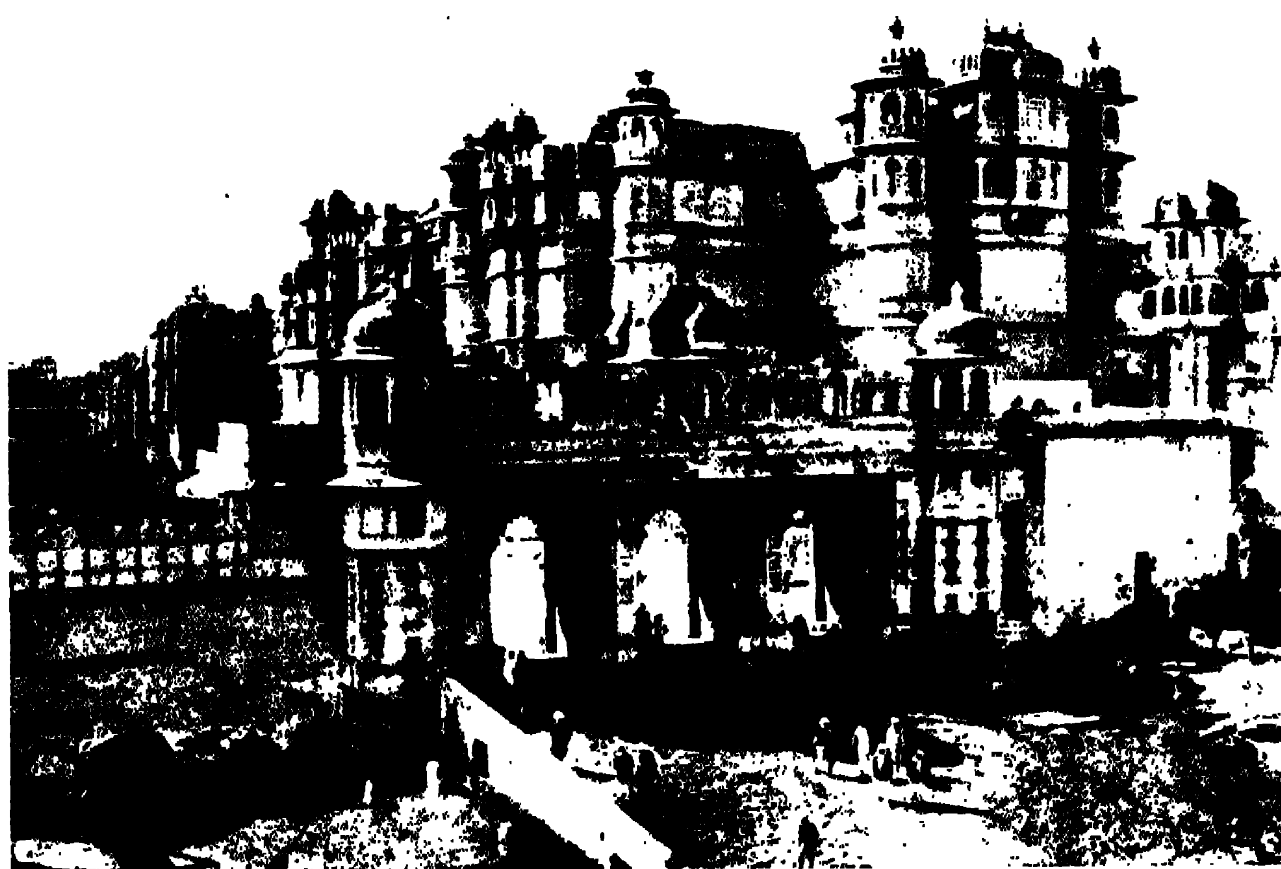
অর্ব্বুদ (আরাবল্লী) শিখরে অবস্থিত উদয়পুর মহানগরীর সূর্য্যবংশীয় মেবারপতি মহারাণার 'কিরনিয়া' (মহারাণাবংশের আভিজাত্যের প্রতীক সূর্য্যকিরণচ্ছটা) বিকীর্য্যমাণ সূর্য্যদেবখচিত, কিরীট-কলস-ইন্দ্রকোষালঙ্কৃত, সূর্য্যরথসদৃশ প্রস্তরময় মহাপ্রাসাদে অপিচ প্রাসাদনিহিত অতুলনীয় চিত্রশালায় ভারতীয় স্থাপত্যের ও ভারতীয় চিত্রসম্ভারের বিরাট্ গাম্ভীর্য্য, মহান্ সৌন্দর্য্য, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অম্লান রহিয়াছে (১২৯ চিত্র)। ত্রিপুরাধিপতির 'উজ্জয়ন্ত' প্রাসাদের 'করিন্থিয়ন'-স্তম্ভশোভিত 'দরবার হলে', 'ইতালীয়ন' কাচের বর্ত্তিকাধারে, 'ভিনিসিয়ন মার্ব্বেলের হেলেন' প্রতিমা ও ফরাসী তৈলচিত্রশোভিত 'ড্রয়িং রুমে' মেবার প্রাসাদের অনুপম শিল্পশ্রী আদৌ অনুভূত হয় না। আরাবল্লী (আবু) গিরিশিরে বিরাজমান মর্ম্মর দিলবারার সুঠাম মুখমণ্ডপে, প্রস্ফুটিত পদ্মের অনুকৃতি শ্বেত প্রস্তরের চন্দ্রাতপনিম্নে, অথবা গাইকোয়াড়ের 'লক্ষ্মীবিলাস' (বরোদা)-প্রাসাদের বিশাল রাজসভাকক্ষে, পাষাণময়ী অপ্সরাগণের হাস্ত-লাস্য-ভঙ্গিমা-ভরা 'টোডি' (bracket)-সমূহ স্বর্গের সুষমা উৎসারিত করিতেছে (১৩০ চিত্র)। বিশুদ্ধ জৈনস্থাপত্যগঠিত পবিত্র দেবায়তন অপূর্ব্ব সুন্দর দিলবারার সহিত কলিকাতার বিকৃত-স্থাপত্য-দুষ্ট পরেশনাথ মন্দিরের তুলনামূলক বিচার করিলে সহস্র বৎসর পূর্ব্বকালীন 'অনুন্নত' ভারতবাসীর এবং অধুনাতন 'অত্যুন্নত' ভারতীয় জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা ও মনোবৃত্তির সম্যক পরিচয়

চিত্রফলক ১০৫



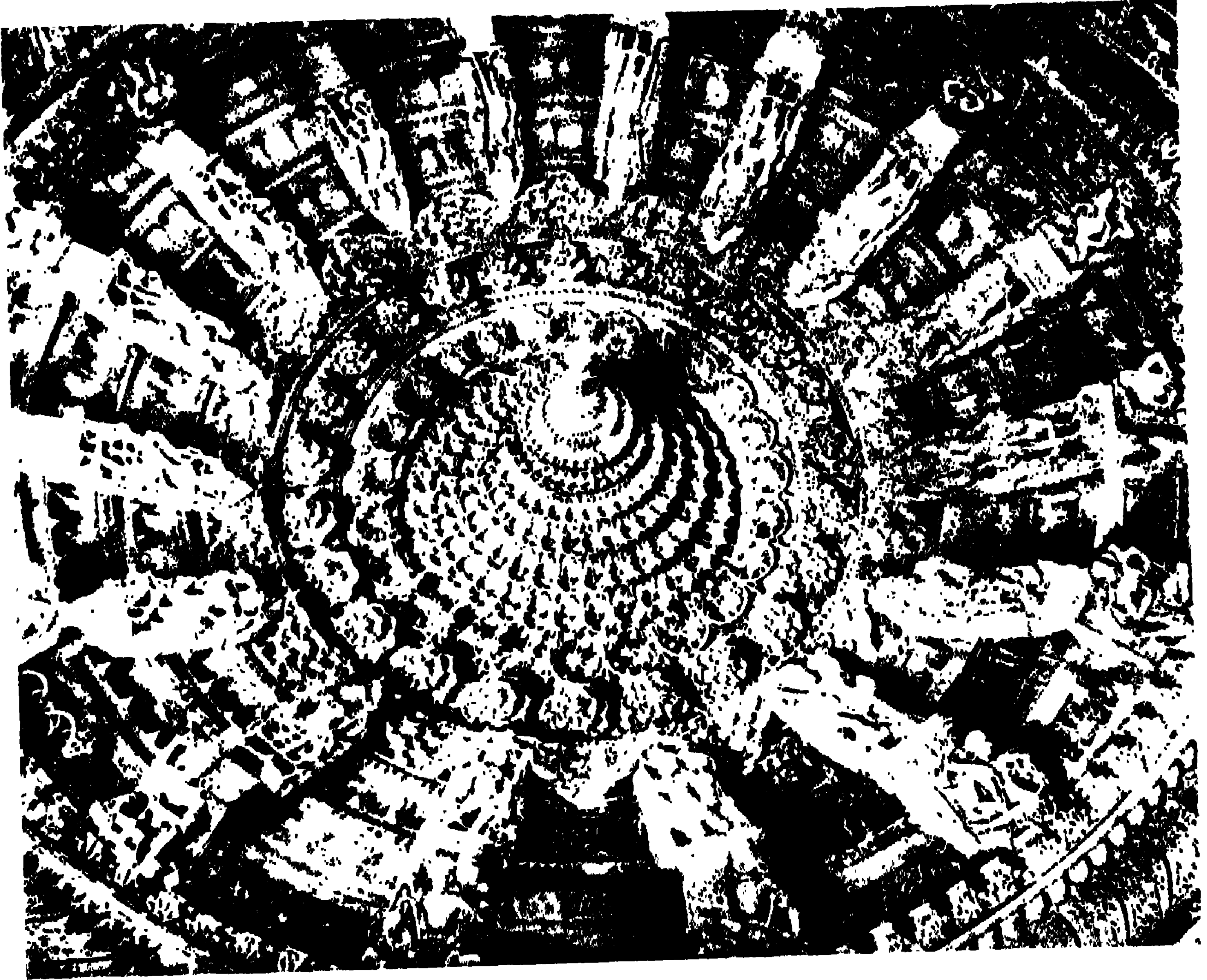
১২৮ চিত্র—তাজমহল

চিত্রফলক ১০৬



১২৯ চিত্র—মহারাণা প্রাসাদ, উদয়পুর

চিত্রফলক ১০৭



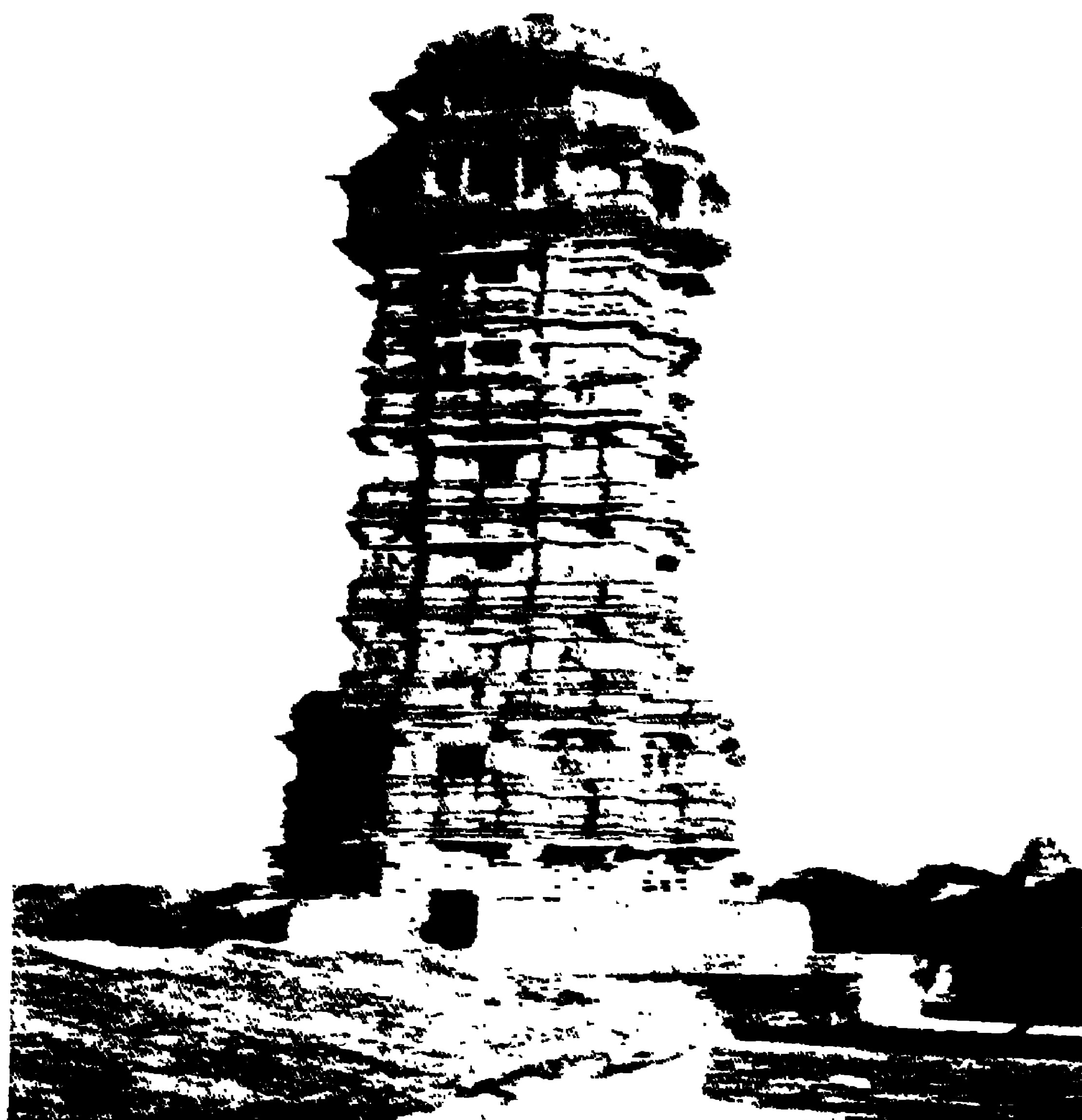
১৩০ চিত্র—পার্শ্বনাথ মন্দির-মণ্ডপ, আবুপর্বত

চিত্রফলক ১০৮



১৩১ চিত্র—মণিকর্ণিকাঘাট, বারাণসী

চিত্রফলক ১০৯



১৩২ চিত্র— জয়স্তম্ভ, চিতোর গড়

চিত্রফলক ১১০



১৩৩ চিত্র—জয়সমুদ্র, মেবার



১৩৪ চিত্র—গশল্মীর নগরী, রাজস্থান

চিত্রফলক ১১১



১২৩ চিত্র — কুম্ভলমীর দুর্গ, রাজস্থান

চিত্রফলক ১১২



পাওয়া যায়। তদ্রূপ বেঙ্গল-নাগপুর রেল স্টেসন খড়্গপুরের সান্নিধ্যে হিজলী উপনগরে অবস্থিত বিগত মহাসমরকালীন রাজনৈতিক বন্দিনিবাসের বর্ত্তমান যুগোপযোগী দেশীয় স্থাপত্যের সহিত Indian Institute of Technologyর অধুনাতন ultramodern স্থাপত্যকলার তুলনামূলক বিচারও বাঞ্ছনীয়।

মধ্যযুগে ও মুঘল-আমলে দেশীয় নগরীর সৌন্দর্য্যরাশি দেশী-বিদেশী সর্ব্বদর্শকের সোৎসুক দৃষ্টি সমভাবে আকৃষ্ট করিত। বারাণসী, রমাবতী (গৌড়), মাদুরা, ত্রিচিহ্নপল্লা, পালিটানা, গিরনার, ফতেপুরসিক্রী, উদয়পুর, চিতোর, অম্বর, পুষ্কর (অজমীর), বীকানীর, যশল্মীর, কমল্মীর (কুম্ভলগড়), ভাটগাঁও (নেপাল) প্রভৃতি তৎকালীন নগরীর নিদর্শন (১৩১-৩৬, ৬৩ ও ৫২ চিত্র)। সেই সকল নগরের আধুনিক মহল্লায় অথবা কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, জামশেদপুর প্রভৃতি শহরের শ্বাসরোধী পরিবেশে ঐশ্বর্য্য-শিল্প-সমৃদ্ধ অতীত ভারতের সুষমাস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যগরিমা অনুভূত হয় না। মধ্যযুগের এবং বিংশ শতাব্দীর উজ্জয়িনীর নগরীয় স্থাপত্য পরীক্ষা করিলে বর্ত্তমান বিবৃতির সত্যাসত্য নির্ণীত হইবে।

প্রশস্ত পরিখা, বিশাল 'নিতম্ব'-প্রাকার ও উন্নত তোরণ-পরিবেষ্টিতা সুন্দরী উজ্জয়িনীর—নির্ব্বাপিত তৈলপ্রদীপের কৃষ্ণকালিমালিপ্ত 'কুম্ভপঞ্জর' কুলঙ্গিসমন্বিত, সিন্দূর-রঞ্জিত, সিংহদ্বারের পশ্চাদ্বর্ত্তী প্রস্তরময় সৌধমালাশোভিত শ্রেষ্ঠিমহল্লায় রেশমী উষ্ণীষধারী তাম্বূল ও গন্ধতৈল বিক্রেতাগণের সারি সারি মনোহারী বিপণীশ্রেণী এবং কল্পনামূলক 'মৃচ্ছকটিকের' কাল্পনিক নায়কনায়িকা 'চারুদত্ত ও বসন্তসেনা'-ব্যবহৃত, সুধাংশু-কিরণধৌত, প্রাসাদকিরীটিনী পল্লীসংলগ্ন, সর্পিলসঙ্কীর্ণ পাষাণপথে আলোছায়ার লুকোচুরি-খেলা এবং উদাস অপরাহ্নে 'মহাকাল'-মন্দির প্রাঙ্গণে দীপস্তম্ভ-সন্নিহিত, অর্দ্ধশায়িত, অলঙ্কারভূষিত, উল্কাচিত্রিত বৃষবরের শ্রমবিমুখ অলসনেত্রে উন্মন রোমন্থন যিনি কল্পনা করিতে পারেন—ভারতীয় নগরের, ভারত স্থাপত্যের ভারত সভ্যতার ও হিন্দু-আভিজাত্যের সত্তা ও আত্মা কোথায় নিহিত আছে তাহা অনুমান করা তাঁহার সাধ্যাতীত নহে।

বর্ত্তমান ভারতবাসিগণের অনেকেই ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও জাতীয় আদর্শমূলক প্রায় সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বতোভাবে পাশ্চাত্ত্যের অনুরাগী। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, পাশ্চাত্ত্য

সমাজনীতি ও পাশ্চাত্ত্য স্থাপত্যকলা হইতে হিতকর বহু অংশ বর্জ্জন করিয়া অহিতকর উপাদানসমূহ গ্রহণ এবং প্রতীচ্য আচারানুষ্ঠানের সর্ব্বাঙ্গীণ অনুসরণ করিতেছেন তাঁহারা নির্ব্বিচারে। তাহার ফলে ভারতের আপন আদর্শ, আপন জীবন, ভারতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ পথে চলিয়াছে। এতাদৃশ অন্ধানুসরণের পরিণাম হইবে ভয়ঙ্কর। পোর্ত্তুগীজ-কবলিত প্রাচীন আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান' সংস্কৃতির ন্যায় প্রতীচ্য-প্রভাবিত ভারত সভ্যতার ঐতিহ্য চিরতরে অবলুপ্ত হইবে। জাপানের শোচনীয় দৃষ্টান্ত হইতে ভারতবর্ষ শিক্ষালাভ করিতে পারিবে। রবীন্দ্রনাথ জাপান হইতে স্বদেশে আসিয়া প্রতীচ্যের যান্ত্রিক সভ্যতা ও শোষণশীল সাম্রাজ্যবাদ-নীতির অনুকরণমত্ত জাপানীগণের ভয়াবহ ভবিষ্যৎপ্রসঙ্গে যে বিবৃতি প্রকাশিত করিয়াছিলেন তাহা অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। যান্ত্রিক, বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার করাল কবল হইতে আধ্যাত্মিক-আন্তর্জাতিক অবদানকে রক্ষা করিবার কামনায় মহামতি বিচারপতি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পোস্ট-গ্রাজুয়েট' শিক্ষার প্রবর্ত্তন করেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অধ্যাত্মদর্শন এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ভারতবর্ষে কার্য্যকরী (অর্থকরী) শিক্ষাসহ স্বদেশী সংস্কৃতির যথোপযোগী অনুশীলন তথা যুগোপযোগী বিকাশ করা তাঁহার কাম্য ছিল। ভারতের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ব্রিটিশ-প্রবর্ত্তিত, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতিকূল শিক্ষাকেন্দ্রগুলি জাতীয় সভ্যতাকে ধ্বংসের পথে আনয়ন করিয়াছে। সত্যদ্রষ্টা মহাত্মা গান্ধী যান্ত্রিক ও বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতামূলক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সর্ব্বথা অনুসরণ কদাপি অনুমোদন করেন নাই। ভারত স্বাধীন হইলে 'রাধাকৃষ্ণণ কমিশন'-এর সেক্রেটারি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত ভারতের অনুকূল শিক্ষাগঠনে ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তব্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় নগরবিন্যাস এবং স্থাপত্যরচনা রাজনীতি ও অর্থনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। রাজনীতি-বিশারদ কৌটিল্য-প্রণীত 'অর্থশাস্ত্র' অনুসরণ করিয়া প্রাচীন নগরনির্ম্মাণ, বাস্তুবিদ্যা এবং শিল্পশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। বৃহস্পতি, অগস্ত্য, শুক্র, বিশালাক্ষ প্রভৃতি পূর্ব্বতন বাস্তুবিদ্যার ধর্ম্মপ্রাণ গ্রন্থকারগণ

অর্থনীতিশাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। শেষনাগ, হয়নাগ, নগ্নজিৎ প্রভৃতি রাজনীতি-পরায়ণ রাজ্যাধিপতিগণ স্থাপত্য-পরিকল্পনায় তথা প্রাসাদসৌধ-নির্ম্মাণে নির্দ্দেশ প্রদান করিতেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনুক্রমে স্থাপত্যশিল্প ও নগর-রচনা পদ্ধতি উন্নত ও বিকশিত অথবা অবনত হইত। প্রিয়দর্শী অশোক, বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য, মহামতি শের শাহ., উদারচেতা আকবর এবং ধর্ম্মান্ধ ঔরঙ্গজেবের শাসনকালে দেশীয় স্থাপত্য, সংস্কৃতি, সমাজনীতি ও নগরনির্ম্মাণরীতি তত্তৎকালীন রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতির অনুকূল অথবা প্রতিকূল পরিস্থিতির অনুক্রমে প্রভাবিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ-শাসনকালে দেশীয় স্থাপত্য, সংস্কৃতি এবং আর্থিক অবস্থা ধ্বংসপথে পরিচালিত হইয়াছিল।

হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণের কেহ কেহ কোনও রাজ্য অধিকার করিবার পরে বিজিত রাজধানীর অদূরে তাঁহাদের অধিকতর আড়ম্বরপূর্ণ নূতন নূতন রাজধানী স্থাপন করিতেন। শিল্পশাস্ত্রের নির্দ্দেশমত—সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদাসঙ্গত—রাজধানীগুলি বিরচিত হইত। তদ্দ্বারা বাস্তুবিন্যাস ও স্থাপত্যশৈলীর নব নব বিকাশ ঘটিত। শিল্পিসঙ্ঘের স্বতঃস্ফূর্ত্ত পরিপুষ্টি সাধিত হইত। পাটলিপুত্র, ইন্দ্রপ্রস্থ, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, গৌড় এবং মধ্যযুগীয় রাজস্থানে ও দাক্ষিণাত্যে বহুসংখ্যক নব নব রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং শিল্পকলার অভিনব সংস্করণ হইয়াছিল, রাজ্যের শাসনভার হস্তান্তরের পরে। বিশ্ববিশ্রুত বিষ্ণুসূর্য্য মন্দির (আঙ্করভাট) সান্নিধ্যে কম্বোজের প্রাচীন রাজধানী আঙ্করথম্ (নগরধাম) প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুরাজধানীর সহিত উপমেয়। শাস্ত্রসম্মত হিন্দুরাজধানী-বিন্যাসের বিধানানুসারে নরপতি ইন্দ্রবর্ম্মণ উহা পরিকল্পিত এবং নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়কর্ত্তৃক এতদ্বিষয়ে বিধিমত গবেষণা বাঞ্ছনীয়।

মেবারপতি উদয়সিংহ আরাবল্লী (অর্ব্বুদ) শিখরে নববিকশিত রাজপুত-স্থাপত্যশোভিত রাজধানী উদয়পুর প্রতিষ্ঠিত করেন তৎকালীন রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অনুকূল। কৃষ্ণপ্রাণা মেবারমহিষী মীরার প্রেমনিষ্ঠার অমৃত-সিঞ্চন তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবায়তনসমূহের স্থাপত্যশৈলী অপরূপ ছন্দোলাবণ্যে রূপায়িত, মহিমান্বিত করিয়াছিল। মুস্‌লিমযুগে উত্তরভারতীয় হিন্দু-পাঠান এবং হিন্দু-মুঘল

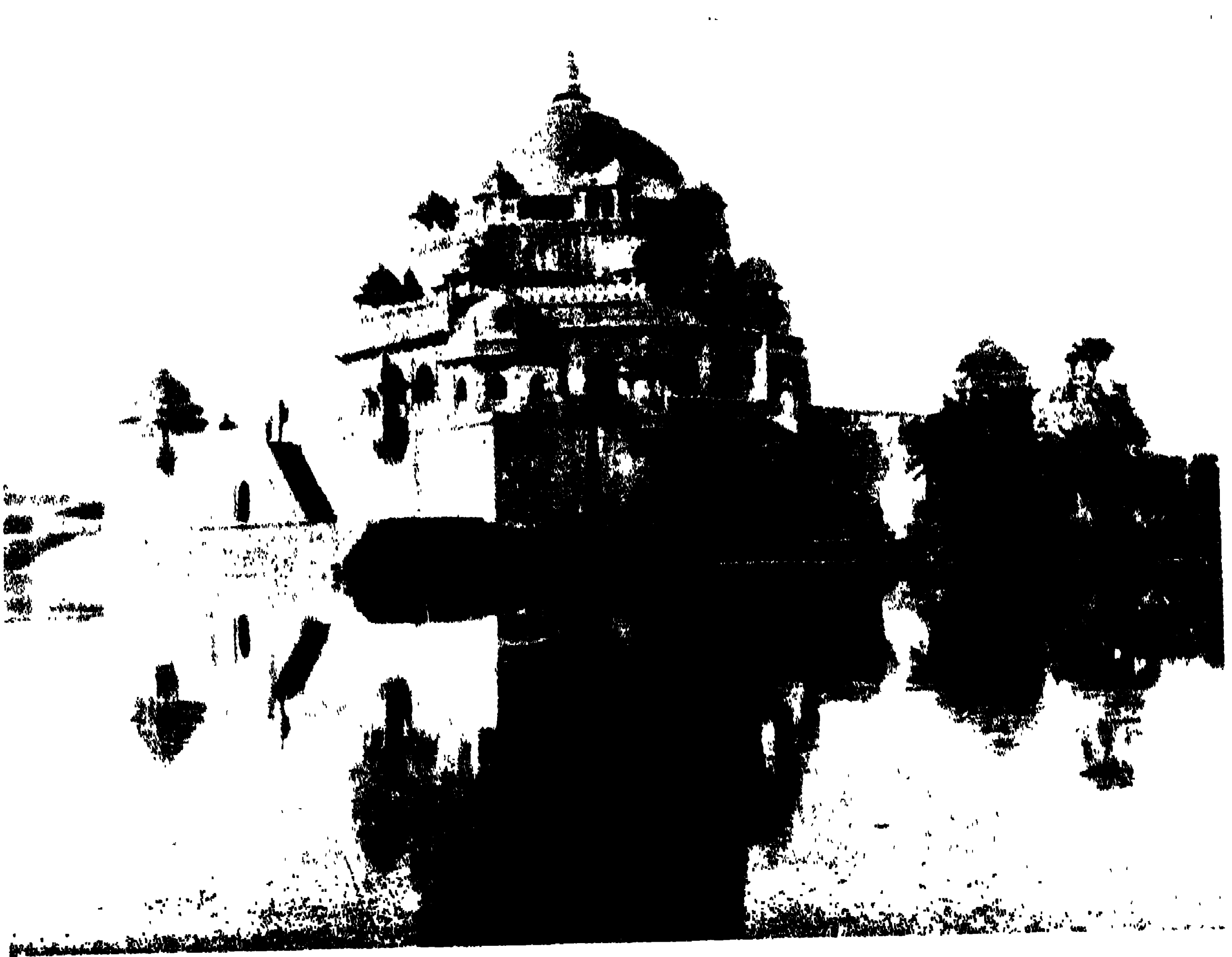
স্থাপত্যকলা মুসলমান ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী মূর্ত্তি ও জীবজন্তুর ভাস্কর্য্য ও 'জালি' শিল্পকে পরিবর্জ্জন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, ভারতের ধর্ম্ম ও মনীষা, পরম্পরীণ নগরনির্ম্মাণ ও সমাজবিজ্ঞানের প্রেরণা, ভারতের গ্রামীয় এবং নগরীয় স্থাপত্যে অব্যাহত রহিল। হিন্দু- ও মুসলমান-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহের সমন্বয়ে মুঘল-সম্রাট্ আকবর ভারতীয় স্থাপত্যবিকাশের বিশিষ্ট ধারা উদ্ভাবিত করেন। তাঁহার নব-রাজধানী ফতেপুরসিক্রীর হিন্দু-মুঘল স্থাপত্যশৈলী তাঁহারই সৃষ্ট। আগ্রা দুর্গের যোধাবাঈ মহল এবং ফতেপুরসিক্রীর মরিয়ম বিবির ও তুর্কী-সুলতানার মহল দুইটি, তাঁহার নির্দ্দেশমত, হিন্দুরীতির অনুযায়ী—মুসলমান ধর্ম্মানুশাসনের বিরোধী—পশুপক্ষী ও মানবমানবীর ভাস্কর্য্যে এবং আরণ্য প্রকৃতির চিত্রে বিভূষিত করা হইয়াছিল।

হিন্দুস্থাপত্যের সহিত বাঈজান্তাইন স্থাপত্যকলানুপ্রাণিত আরবীয় স্থাপত্যের এবং পারস্যের স্থাপত্যের মিশ্রণে হিন্দু-মুঘল স্থাপত্যের উদ্ভব। সম্রাট্ শাহ্‌জাহান আকবর-উদ্ভাবিত মুঘল-ভারতীয় স্থাপত্যকে অধিকতর অলঙ্কৃত ও সুস্পষ্ট করিয়া দিল্লীর প্রাসাদ এবং আগ্রার তাজমহল রচিত করেন। সম্রাট্ শেরশাহ্, আকবরের পূর্ব্বে, ভারতীয় স্থাপত্যের সুন্দর সংস্করণ করিয়াছিলেন। দিল্লীতে এবং সাসারামে, হিন্দু-পাঠান স্থাপত্যে গঠিত তাঁহার একটি রমণীয় মস্‌জিদ এবং নয়নশোভন একটি সমাধিভবন বিদ্যমান আছে (১৩৭ চিত্র)।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মূলগত ঐক্য

বহুধা উন্নত প্রতীচ্যের অধুনাতন ব্যবহারিক বিজ্ঞান আধুনিক জীবনযাত্রার পক্ষে কার্য্যকরী হইয়া বিবিধ প্রকারে মানবের সমাজসংগঠনী ও জীবনসংরক্ষণী শক্তি বর্দ্ধিত করিতেছে সত্য। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ইদানীন্তন প্রতিষ্ঠানসমূহ পরাপ্রকৃতির ও সৌরজগতের পরস্পর সম্বন্ধ ও তাহাদের শক্তির অনাবিষ্কৃত রহস্য ও তথ্যগুলি উদ্ঘাটিত করিতেছেন। প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে অণু, পরমাণু ও তেজ বিকীরিত ও বিশ্লেষিত করিয়া এবং বায়বীয়, বাষ্পীয়, ক্ষিতিজ, খনিজ, জলজ ও উদ্ভিজ্জ উপাদান-গুলি সংগৃহীত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে অথবা মিশ্রণে, অশেষ প্রকার ব্যবহারিক

চিত্রফলক ১১৩



১৯৭ চিত্র—শেরশাহের সমাধি-মণ্ডপ, বিহার

চিত্রফলক ১১৪



১৩৮ চিত্র— রাজা রামমোহন রায়

রসায়ন উৎপাদিত করিতেছেন। বিশ্বের হিতে তাঁহাদের অবদান অসামান্য। কিন্তু তথাকথিত অত্যুন্নত পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সর্ব্বমানবের পক্ষপাতহীন কল্যাণের জন্য, বৈজ্ঞানিক বিপুল শক্তির সর্ব্বতোভাবে সদ্ব্যবহার করিবার অনুকূল মনোবৃত্তি অর্জ্জনের উদ্দেশে সার্ব্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন কি? সংহার-রাক্ষসীর সেবায় তাহার অপপ্রয়োগেই বরঞ্চ আধুনিক বিজ্ঞান বহুধা নিয়োজিত নয় কি? UNESCO সেইরূপ উদার শিক্ষাদানের এবং শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল মনোবৃত্তিলাভের জন্য দেশে দেশে আন্তর্জাতিক মহা-ধর্ম্মশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আয়োজন করিবার বিবেচনা করুন। তজ্জন্য বশিষ্ঠ, যাজ্ঞবল্ক্য, লাওৎজে, জৈনসূরি হেমচন্দ্র, রামমোহন, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ, আশুতোষ, ইকবাল, ওয়াল্ট্ হুইটম্যান এবং বার্নার্ড শ'র মতন দীক্ষাগুরুর সৃষ্টি করিতে হইবে (১৩৮ চিত্র)।

অধ্যাত্মদর্শানুশীলনরত অতীত ভারতের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বিংশ শতাব্দীর বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক- ও অর্থনীতিবিদ্-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত ও নিন্দিত হইয়াছে। অথচ প্রাচীন ভারতের সমদর্শী ন্যায়নীতি, উদার ধর্ম্মদর্শন ও অতীন্দ্রিয় যোগসাধনই যে বর্ত্তমান যুধ্যমান রাষ্ট্রনীতির আমূল সংস্কার সাধন করিয়া বিশ্বব্যাপী অহিংস সমাজের প্রবর্ত্তন, নিয়ন্ত্রণ ও পোষণ করিতে পারিবে, উইনটারনীজ, সোপেনহাওর, ম্যাক্সমুলার, পার্ল বাক, শ্রীমতী এলিনর রুজভেল্ট প্রভৃতি মনীষিগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। আণবিক বোমার নির্ম্মম এই যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ দর্শন, মনোবিজ্ঞান, লোকসাহিত্য ও সুকুমার শিল্পশাস্ত্র শিক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। গীতার অভয়বাণী ও গীতাঞ্জলীর সুনীতিলহরী বিক্ষুব্ধ, বিভ্রান্ত, বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীকে আশান্বিত ও সঙ্ঘবদ্ধ করিবে। বিশ্বে সুচির শান্তি এবং সর্ব্বজনহিতকর সার্ব্বজনীন মহাসমাজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে তখন—যখন বিশ্বমানবের প্রতি ধর্ম্ম ও প্রতি রাষ্ট্র-সম্প্রদায়ের প্রতি আদর্শ, জ্ঞান ও কর্ম্ম, সত্য-সাম্য-করুণা-মৈত্রীর অনুসরণ করিবে। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বম নিহিতং গুহায়াম্ মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রতি ধর্ম্মপীঠে, প্রত্যেক সংস্কৃতিকেন্দ্রে, বেদের পরম বাণী ঘোষিত হউক যে, "একই পরমেশ্বরের মন্দিরসৌধে সর্ব্বসম্প্রদায়ের জন্য সহস্র-দ্বার উন্মুক্ত আছে।" সর্ব্বসম্প্রদায়ের ঐক্যবিধায়ক মহামানবতার মন্দিরসৌধে—

মানবের আরাধ্য অন্যবিধ দেবদেবীসহ 'রেড ইণ্ডিয়ান'-উপাস্য Tezcatlipoca (ব্রহ্মা), Tlaloc (বিষ্ণু), Huitzlipochtli (শিব), Cibuacoatl (শক্তি), Qultzalcoatl (পবন), Kulkulkan (বরুণ), Chicomecohuatl (লক্ষ্মী) এবং Tonacaichva (সরস্বতী) প্রভৃতি সকলেই একই পরমেশ্বরের বিশেষ বিশেষ শক্তিরূপে পূজা পাইতে থাকুন। সেই সর্ব্বপ্রিয় দেবদেউলে গ্রীক ও রোমান Apollo (সূর্য্য), Hestia (অগ্নি), Hercules (ইন্দ্র), Venus (উষা)-সহ আসিরীয় ত্রিমূর্ত্তি—Shamsh (সূর্য্য), Sin (চন্দ্র) ও Ishtar (ব্রহ্মা) এবং আসিরীয় ত্রিগুণাত্মা Baal (ক্ষিতি), Ea (অপ্) ও Anu (স্বর্গ, ব্যোম) প্রভৃতি নিজ নিজ পদ্মাসনে একত্র বিরাজ করুন। ভারতীয় দেবদেবীর মত প্রাকৃতিক মহাশক্তিনিচয়ের পৃথক্ পৃথক্ প্রতীকরূপে বরণীয় ও বরণীয়া তাঁহারা। মধ্য আমেরিকা, গ্রীস, ইতালী এবং মেসোপটেমিয়ার সুকুমার প্রতিমা, চিত্র ও কারুশিল্পশোভিত সুন্দর সুন্দর দেবগৃহসমূহে তাঁহারা অধিষ্ঠিত ও অধিষ্ঠিতা আছেন।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধবাদিগণ হিন্দুর বিগ্রহ (প্রতিমা) পূজার নিন্দা করেন। তাঁহারা অনুধাবন করিবেন যে, প্রাগৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক যুগে যুগে প্রায় সকল ধর্ম্মেই মূর্ত্তি, চিত্র অথবা প্রতীকের মাধ্যমে একই পরমেশ্বরের পূজা অথবা উপাসনা সমাহিত হইয়াছে। ইস্‌লামী ধর্ম্মাচরণেও তদ্রূপ অনুষ্ঠান বর্ত্তমান আছে। সম্রাট্ আকবর সকাল-সন্ধ্যায় সূর্য্যোপাসনা করিতেন। শ্রেষ্ঠ ইতিহাসকার অল্ বোদায়ূনি তদ্বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রতীচ্য এবং প্রাচ্য ধর্ম্মতন্ত্রের বিবিধ চিন্তাধারা মনোদর্শনের বিবিধ প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়াছে, নানা যুগে, নানা ভাবে। কিন্তু একই মহাসত্যকে ভিন্ন ভিন্ন দিগ্‌দেশ হইতে প্রণিধান করিয়াছেন ভিন্ন ভিন্ন মুনিঋষি ও ধর্ম্মযাজকগণ, যদিও তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহে তাঁহাদের বিভিন্নমুখী দৃষ্টিভঙ্গী প্রকটিত হইয়াছে। সর্ব্ববিধ দার্শনিক মতবাদের মূলসূত্ররূপী সেই মহাসত্যের পরমতত্ত্বটিকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন এবং হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে প্রাচ্য তথা পাশ্চাত্ত্য দর্শনসম্ভূত বিভিন্ন মতবাদগুলির জটিল সমস্যা বিলীন হইয়া যায় অখণ্ড অব্যয় সৃষ্টিতত্ত্বের শাশ্বত মহিমায়। এই সত্যই ঘোষিত হইয়াছিল—কঠোর তপস্যাপরায়ণ বৈদিক ঋষির শান্ত-শীতল আশ্রমকাননে,

"একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"-মহাবাক্যে। পরবর্ত্তী যুগের মহাযোগী এই পরম সত্যেরই ঘোষণা করিয়াছিলেন :—

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদ ধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ।"

আধ্যাত্মিক জীবনের ঐক্যমূলক আদর্শ হইতে ভারতীয় চিন্তাধারার এবংবিধ ঐক্যভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদিত হয়। খ্রীঃ একাদশ শতকে জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র উল্লেখ করিয়াছিলেন :—

"যত্র তত্র সময়ে যথা তথা যোঽসি সোঽস্যাভিধয়া যয়া তয়া।
বীতরাগকলুষঃ স চেদ্ ভবানেক এব ভগবন্নমোঽস্তু তে॥"

ক্রোধ ও দ্বেষকে যিনি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাকেই আদর্শচরিত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ভারতের দার্শনিকগণ। চরিত্রের দৃঢ়তা-দ্বারা নৈয়ায়িক মনীষিগণের বিচার ও যুক্তির স্বাতন্ত্র্য নিরূপিত হইয়াছে। ভারতের প্রতি ধর্ম্মতত্ত্বের সম্যক্‌রূপে বিচার করিবার প্রাক্কালে বিচারককে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, প্রতি সৎ ধর্ম্মের ধ্রুব লক্ষ্য—সকল মানবকে মহামিলনের মহাতীর্থে একপ্রাণ, একমন, একাত্মা করা বিশ্ববাসী সর্ব্বজীবের চিরস্থায়ী ইষ্টকামনায়।

ব্রাহ্মণ্য ভারতে বশিষ্ঠের বিদ্যা ও বুদ্ধি, বিশ্বামিত্রের বাহুবল ও রাজনীতি এবং বাল্মীকির কোমল অন্তরের অফুরন্ত অনুকম্পা একত্র নিয়োজিত হইয়াছিল, বিশ্বের কল্যাণকামনায়, বিরোধবিক্ষুব্ধ নরসমাজে সাম্য-মৈত্রী-প্রেমতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিবার জন্য। তাহার পরিচয় 'রামায়ণ'-মহাকাব্যের কাণ্ডে কাণ্ডে দেদীপ্যমান—আদর্শ নগরপল্লী, আদর্শ মানবমানবী, আদর্শ জীবসমাজ ও শাসনপ্রণালী, আদর্শ বৈরী এবং আদর্শ গণতন্ত্র। অযোধ্যার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, নিষাদ, চণ্ডাল, রাক্ষস ও বানরগণ সরযূতীরে শ্রীরামচন্দ্রের পৌরসভামণ্ডপে সমবেত হইয়াছিলেন—করুণার সাগর বাল্মীকির আদর্শ শিষ্যদ্বয় কুশ-লবের বীণাবাদনসহ রামায়ণগান শ্রবণ করিতে।

নভোমণ্ডলের বহু ঊর্দ্ধস্তরে অবস্থিত সপ্তর্ষিলোক হইতে দেবর্ষি অঙ্গিরা, মরীচি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় সপ্তর্ষিগণ এবং বিশ্বাবসু প্রমুখ বীণাবাদক গন্ধর্ব্বগণ রামায়ণ শ্রবণ করিতে সরযূতীরে উপনীত হইলেন। সবিতৃমণ্ডলস্থ দিব্যলোক হইতে বিনির্গত ঋভুগণ সমস্বরে সমতানে রামায়ণ কীর্ত্তন করিতে করিতে অযোধ্যায় অবতীর্ণ হইলেন। নরনারায়ণ শ্রীরামচন্দ্র তদীয় প্রজাপুঞ্জ, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতিসহ সেই মহান্ নৃত্যসঙ্গীতে যোগদান করিলেন। আকাশ-বাতাস-ভূলোক-দ্যুলোক রামায়ণ-গানে পরিপূর্ণ হইল।

অতঃপর—নভোমণ্ডলে "সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সরসিজাসনসন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলধারী কিরীটীহারী হিরণ্ময় বপুঃ....শঙ্খচক্রধারী মুরারি...বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।...শশিসূর্য্যনেত্র, দীপ্তহুতাশবক্ত্র-শরীরপ্রভায় দিগন্তপ্রকাশী নারায়ণ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মধ্যস্থল পূর্ণ করিয়া রহিলেন। দেব-যক্ষ-রক্ষাদি সকলে, মানব ও জীবজন্তু সকলেই সেই বিরাটের মুখে প্রবেশ করিতেছে। উহার প্রতি লোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিলীন রহিয়াছে।...দেখিয়া বাল্মীকি স্তব করিতে লাগিলেন—

"নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্বঃ।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ॥"

তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "বাল্মীকে! তুমি দেখ সকল মানুষ সমান, সব ভাই ভাই, আর সবাই এক। যাও, পৃথিবীময় এই সাম্য, ভ্রাতৃভাব ও একতা গাইয়া বেড়াও, তুমি অমর হইলে।"[১৪]

গুপ্ত-পালযুগে সত্যমন্দিরকেন্দ্রী হিন্দুস্থানের সাম্যমৈত্রীর মিলনতীর্থ নালন্দা সত্যনিষ্ঠ সর্ব্বমানবকে সাদরে আবাহন করিত। ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন দেবায়তনের

---

১৪ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-প্রণীত 'বাল্মীকির জয়'-গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। তাঁহার মহতী কল্পনায় কুরুক্ষেত্রে বাসুদেবের বিশ্বরূপ প্রদর্শন প্রতিফলিত হইয়াছিল।

শান্তিনিকেতন এলোরা ('ইলাপুরী') সর্ব্বজীবের কল্যাণকল্পে মঙ্গলময় পরমেশ্বরের স্বস্তিবাচন প্রতিঘোষিত করিত। মালয়, কম্বুজ, চম্পা ও প্রাম্বাণমের শৈব, বৈষ্ণব ও বৌদ্ধ মন্দিরের মর্ম্মবীণায় সেই শক্তিমন্ত্র প্রতিনিয়ত অনুরণিত হইত।

উদীয়মান নব্যভারতের ভবিষ্যতন্ত্র

মিসর, মেসোপটেমিয়া, বাবিলন, গ্রীস, রোম, কার্থেজ ও বাইজান্টাইন নিজ নিজ সভ্যতাসমৃদ্ধির দীপ্তিদ্বারা একদা সমগ্র জগৎকে আলোকিত, অভিভূত ও অনুপ্রাণিত করিয়া একে একে বিস্মৃতির তিমিরগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ধ্বংস, অবলুপ্ত হইয়াছে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদিতার অস্তিত্ব—যেহেতু জড় বস্তুতান্ত্রিকতার প্রবল ঐশ্বর্য্যের পার্থিব ভোগবিলাসের মোহমাদকতার ভঙ্গুর ভিত্তির উপরে তাহাদের তমোগুণান্বিত সভ্যতাসঞ্জাত অত্যুজ্জ্বল আড়ম্বরপূর্ণ বিরাট্ বস্তুতান্ত্রিক সাম্রাজ্য অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। অথচ, তাহাদের সমসাময়িক আধ্যাত্মিক আত্মজ্ঞানদীপ্ত, বিশাল ঐশ্বর্য্য-সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ—সত্য, সাম্য, মৈত্রী ও প্রেমের আধার দেবায়তনের ক্রোড়ে, অধ্যাত্ম ষড়্দর্শনের বজ্রবেদিকার উপরে বিন্যস্ত হওয়ায় অদ্যাবধি অটুট অম্লান রহিয়াছে।

কিন্তু বেদব্যাসের হোমানল আজ নির্ব্বাণোন্মুখ। তাহাকে শিখায়িত, বৈদিক বিবস্বান্‌কে রাহুমুক্ত, বৈদান্তিক বিশ্বধর্ম্মকে পুনর্জাগ্রত, গীতাস্রষ্টা বাসুদেবকে পুনঃপ্রকটিত, বুদ্ধের ধর্ম্মচক্রকে পুনর্নিয়ন্ত্রিত এবং বিক্রমাদিত্যের গরুড়ধ্বজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

একদা ভারত-প্রকৃতির প্রাণপ্রিয়, প্রাচুর্য্য-পরিপূরিত 'সর্ব্বতোভদ্র, সুমঙ্গল, স্বস্তিক ও পদ্মিক' পর্য্যায়ের সুসমঞ্জস-সুন্দর-স্বতঃস্ফূর্ত্ত গ্রাম, নগর ও জনপদের কল্যাণময় পরিবেশের প্রশান্তিময় পারিপার্শ্বিকের শিল্পসম্ভারী আনন্দমাঝারে সত্যাশ্রয়ী গণতন্ত্রের অভিব্যক্তি এবং সম্প্রসারণ সুসাধ্য হইয়াছিল। গ্রামনগরীর অন্তরস্থিত দেবায়তনে অধিষ্ঠিত মঙ্গলময় ব্রহ্মণ্যদেব অধিবাসিগণের ধর্ম্ম- ও কর্ম্ম-জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতেন। শ্রেষ্ঠিশ্রেষ্ঠ অনাথপিণ্ডিকা, বিমলশা প্রভৃতি তত্তৎকালীন অধিবাসিগণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর বহুধা-উন্নত ব্যবহারিক বিজ্ঞানসম্মত, পাশ্চাত্ত্য-প্রবর্ত্তিত, নগর-বিন্যাসের প্রেরণায় দেশীয় সংস্কৃতিসঙ্গত সুকুমার স্থাপত্যশৈলীর সুষমাসৌন্দর্য্যসিক্ত, সুরুচিসঙ্গত, স্বদেশী গ্রাম, নগর ও জনপদের সমাবেশ করিয়া উদীয়মান নব্যভারতের অত্যুন্নত কর্ম্মজীবন ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মহামানবের মহান্-দেবদেউল-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বজনীন মহাসমাজের প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। অটল ধৈর্য্যসহকারে ইহা সমাহিত করিতে পারিলে—উদীয়মান নব্যভারতে, নব-অভ্যুদয়ের অরুণকিরণোদ্ভাসিত, সর্ব্বজনপ্রিয় সমাজতন্ত্রের স্ফুরণ হইয়া, যুধ্যমান রাষ্ট্রশক্তিসমূহকে সাম্য-মৈত্রী-করুণামন্ত্রে অভিষিক্ত করিয়া, বেদান্তপ্রাণ হিন্দুস্থান, 'পঞ্চশীল' নীতির মাধ্যমে, বিশ্বব্যাপী সুখশান্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস করিবে।

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বুদ্ধ, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ তাঁহাদের মহাশক্তিসম্পন্ন ধর্ম্মসঙ্ঘসমূহের উদ্যোগে প্রেম-মৈত্রী-করুণার বীজমন্ত্রসিঞ্চনে বিশ্বমাঝে সুখ-শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিয়মানু-বর্ত্তিতা প্রতিষ্ঠার বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিক্ষুব্ধ জনগণের বিভেদ-বিরোধ বিদূরিত করিয়া নরসমাজে ব্যাপকভাবে শান্তি- ও সাম্য-নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থকাম হইলেন।

বিগত দুইটি মহাসমরের প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের মাধ্যমে দুর্নীতির কবল হইতে সৃষ্টি ও সভ্যতাকে রক্ষা করিবার প্রয়াস বিফল হইল; নিরাহ হিরোশিমা ধ্বংস হইল এবং দুর্নীতির প্রকোপ বৃদ্ধি পাইল।

বিগত দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া বহুবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও দর্শন ও বিজ্ঞান মানবগোষ্ঠী-সমূহের বিভেদ-বৈষম্যের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সুচির শান্তি, সৌহার্দ্দ্য ও নিয়মানুবর্ত্তিতা স্থাপন করিতে অসমর্থ হইয়াছে।

তাহার প্রধান কারণ—একযোগে লক্ষ লক্ষ জনগণের পার্থিব ও অপার্থিব অভাবসমূহ দূরীকরণের বন্দোবস্ত সাধনে অবহিত না হইয়া কেবলমাত্র ধর্ম্ম-দর্শনের ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে জনসাধারণের নৈতিক গ্লানি অবমোচিত এবং স্ব স্ব সম্প্রদায়গত বিজয়াভিযানের পথে, অথবা রাষ্ট্রসংশ্লিষ্ট আধিপত্যের প্রসারের পথে, বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট, নেপোলিয়ন ও লেনিন, ষ্টালিন ও হিটলার প্রভৃতি ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরগণ তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণসহ।

উন্নয়নের পরিবর্ত্তে বাধাবিঘ্ন-উচ্ছেদনের হীনকার্য্যেই আরোপিত করিতে হইয়াছিল নেপোলিয়ন ও হিটলারের অধিকাংশ শক্তিসামর্থ্য ; শান্তিস্থাপনে তাঁহাদের কূটকৌশল সক্ষম হইল না এবং দুঃখদারিদ্র্যের পীড়ন বৃদ্ধি পাইল। প্রাণধারণের উদরনীতি-ব্যবস্থা অটুট থাকিলে তবেই নরনারীগণ ধর্ম্মদর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের অনুশীলনকরতঃ আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক সম্ভোগমূলক সমীক্ষণ ও কর্ম্মবৃত্তির বিকাশ-সাধনে তৎপর হইতে পারেন। তাহা করিতে হইলে ধীমান্ ও ধর্ম্মপ্রাণ, শাস্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞান-পরায়ণ, একনিষ্ঠ ও কর্ম্মপ্রবণ, অভিনব মানব-সমাজগঠনের প্রয়োজন।

এতাদৃশ জ্ঞানবিজ্ঞানদীপ্ত, সুনীতিপরায়ণ, গণতন্ত্রী সমাজের সংগঠন করিতে হয়ত অর্দ্ধশত বৎসর অতিবাহিত হইতে পারে। আশৈশব যাঁহারা বিশিষ্ট আচার্য্যগণের সকাশে সুনীতিপূর্ণ ন্যায়শিক্ষাদ্বারা নিজ নিজ পরিকল্পনাশক্তি উর্ব্বর তথা কর্ম্মশক্তি প্রখর এবং মনোবৃত্তি উদার করিয়াছেন, তাঁহারাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে নব্যভারতের নবীন কর্ম্মক্ষেত্রে সাম্যমৈত্রীর বীজ বপন করিতে সক্ষম হইবেন। অনুদার, আত্মগত অথবা দলগত, স্বার্থান্বেষী চিন্তা তাঁহাদের সংযত চিত্তে, উন্নত চরিত্রে স্থান পাইবে না। প্রতিনিয়ত ন্যায় ও ধর্ম্মনীতির পরিবেষ্টনে প্রবর্দ্ধমান—তাঁহাদের অপেক্ষাও শক্তিমান্—তাঁহাদের বংশধরগণ, স্বদেশে সুখ-শান্তি-সম্পদ্-সমৃদ্ধ ধর্ম্মরাজ্য প্রবর্ত্তিত করিয়া, 'অষ্টশীল'-'পঞ্চশীল'-প্রণোদিত অহিংসমন্ত্রের প্রভাবে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের বিবিধ চিন্তাধারাপুষ্ট ভিন্ন ভিন্ন আদর্শপরায়ণ, আধ্যাত্মিক ও বস্তুতান্ত্রিক নীতিপ্রবণ, ছিন্নবিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়সমূহকে শিবসত্যের প্রতীক ন্যায়দণ্ডের প্রেমসঞ্চারী পতাকামূলে ভ্রাতৃভাবে সমবেত হইতে অনুপ্রাণিত করিবেন। বৈদিক ঋষির ব্রহ্মাণ্ডপ্রসারী ভূমার পরিকল্পনা তখনই মূর্ত্তিমন্ত হইবে ; অহিংসরুচি মহাত্মাগণের কাম্য শান্তিসমাজ তখনই প্রতিষ্ঠিত হইবে (১৮৯ চিত্র)।

প্রাচুর্য্যপরিপূরিত গ্রামনগরের আনন্দময়ী প্রকৃতিসঞ্জাত শান্তিময় পরিবেশে, মহাসত্যের দেবায়তনে অধিষ্ঠিত পরমপিতা পরমেশ্বরের নিয়ন্ত্রণে, ধর্ম্মময় জনসঙ্ঘের মঙ্গলময় নির্দ্দেশে, সাম্যমৈত্রীর অভেদ দর্শন ও বিশ্বপ্রেমী সমাজতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হওয়াই সম্ভব—মহাপ্রাণ বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট, লেনিন ও বার্ণার্ড শ, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধী ও অরবিন্দ যাহার কামনা করিতেন। সমাজের কর্ম্মনিষ্ঠ, শ্রমপরায়ণ প্রত্যেক

মানব 'অষ্টশীল'- অথবা 'পঞ্চশীল'-প্রণোদিত অহিংসমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া জ্ঞানী ও কর্ম্মী, শাস্ত্রবিদ্ ও বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্যগণের সকাশে বিশ্বপ্রেমের উদারনীতি শিক্ষা করিবেন এবং তৎসহ ঐহিক সুখসম্ভোগের পন্থাগুলির বিকাশনকল্পে প্রয়োজনমত সহযোগিতাদানে সাধারণতন্ত্রী শক্তিশীল সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট রাখিবেন। তাহা করিতে পারিলে দর্শন ও বিজ্ঞানের, নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তির, সংস্কৃতি ও শিল্পের, জ্ঞান ও কর্ম্মের, মস্তিষ্ক ও বাহুর সমন্বয় সাধিত হইবে। তাহা করিলে ভবিষ্য-ভারতে প্রকৃত গণতন্ত্রী 'রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বদেশের সর্ব্বজীবের পার্থিব-অপার্থিব কল্যাণসাধন অনুপ্রাণিত করিবে। এতদ্ব্যতীত হয়ত বিশ্বশান্তি প্রবর্ত্তনের দ্বিতীয় পন্থা নাই।

পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবাসিগণ জীবনধারণোপযোগী আহার্য্য- তথা শ্রমশিল্প-উৎপাদনে স্বাবলম্বী ছিলেন। তখন ভারতবর্ষ হইতে ভারতজাত শস্যপূর্ণ অর্ণবপোতসমূহ পৃথিবীর বহু বন্দরে প্রেরিত হইত। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও দেশীয় কৃষিক্ষেত্রের উৎপাদিকা-শক্তি বৰ্দ্ধিত করিবার জন্য বিদেশ হইতে সার, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম এবং কৃষিকর্ম্মে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের আমদানী করার প্রয়োজন হইত না। ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য কুহকের প্রভাবে, প্রতীচ্যের ব্যবসাসুলভ প্ররোচনায়, বিদেশের যতই মুখাপেক্ষী হইতেছেন তাঁহাদের দুঃখদারিদ্র্য ততই বিবৰ্দ্ধিত হইতেছে।

আহার, বস্ত্র, বাসগৃহ, স্বাস্থ্যরক্ষা ও সুশিক্ষার জটিল সমস্যাগুলির সমাধান করিয়া ধীরে ধীরে প্রভূত ব্যয়সাপেক্ষ চাহিদাগুলির মীমাংসা করিবার প্রয়াস বাঞ্ছনীয়। তজ্জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ স্বদেশেই সংগৃহীত হইতে পারে। হিসাব করিয়া চলিলে আশুপ্রয়োজনীয় উদরসেবা ও শরীর-রক্ষার উপকরণগুলির সুব্যবস্থা করিয়া অদূর-ভবিষ্যতে, বিবিধ ব্যবসাবাণিজ্যের সাহায্যে, প্রচুর অর্থার্জ্জনের বহু পন্থা উদ্ভাবিত হইতে পারে—গুপ্ত ও মধ্যযুগের এবং নবাবী শাসনকালে ভারতে যাহা সম্ভাবিত হইয়াছিল। ক্রমশঃ সদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থরাশি পরিপুষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ভারতের ক্ষিতিজ, খনিজ, উদ্ভিজ্জ ও জলজ উপাদানসমূহ আহরিত করিয়া রসায়নাগারের এবং কলকারখানার মাধ্যমে বহুবিধ ব্যবহারিক রসায়নের ও শ্রমশিল্পের উৎপাদন সহজসাধ্য হইতে পারে। লেখকপ্রণীত এবং কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত *India and New Order* গ্রন্থে এতদ্বিষয় বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা—হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ ও ব্রাহ্ম প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায়গুলির পরোক্ষভাবে পরস্পরের প্রতি বিরোধিতা। একই সার্ব্বভৌম বৈদান্তিক ভাবধারা হইতেই যে তাঁহাদের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি তাঁহারা তাহা বিস্মৃত হইয়াছেন। গৃহসংসার বর্জ্জনান্তর কপিলবাস্তুর শাক্যসিংহ রাজগৃহে, আলার কালাম ও উদ্দকরামপুত্র নামক ব্রাহ্মণগুরুদ্বয়ের সমীপে, ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা ও যোগাভ্যাস করিয়াছিলেন। অতঃপর বুদ্ধগয়ায় সম্বোধিলাভ করিয়া তিনি শাস্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতেই তাঁহার প্রধান প্রধান সহকর্ম্মী ও শিষ্যসমূহের প্রায় সকলকে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ শারীপুত্র তাঁহাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। উরুবেলাকশ্যপ, গয়াকশ্যপ প্রভৃতি সহস্র সহস্র জটিল (বাণপ্রস্থী) ব্রাহ্মণের একনিষ্ঠ সহযোগিতার উপর বৌদ্ধসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গার্হস্থ্যাশ্রমাবলম্বী ব্রাহ্মণগণও তৎকালে ভগবান্ বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত সদ্ধর্ম্ম পালন করিতেন। তদ্দ্বারা উদার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত কোনও বিরোধ হইত না। বুদ্ধদেবের অর্চ্চনা এবং অষ্টশীল পালন করিয়া ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্মচ্যুত হইতেন না। 'ভক্তিশতক'-প্রণেতা রামচন্দ্র কবিভারতী, বৌদ্ধাগমচক্রবর্ত্তী (খৃঃ পঞ্চদশ শতক), নিজেকে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া সিংহলে উল্লেখ করিতেন। জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক ভগবান্ পার্শ্বনাথ এবং শেষতীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান্ মহাবীরও ব্রাহ্মণগণের সক্রিয় সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মণ্যদেব বিষ্ণুসূর্য্য এবং বুদ্ধঅমিতাভ উভয়েই ধর্ম্মচক্রদ্বারা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। উপনিষদের ধর্ম্মদর্শন হইতেই জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের উৎপত্তি। হিন্দুর জন্মান্তরবাদ ও কর্ম্মফলকে জৈন ও বৌদ্ধ বিশ্বাস ও স্বীকার করেন। জৈন- ও বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রথম পর্ব্বে যদিও জৈন ও বৌদ্ধগণ যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করিতেন এবং বুদ্ধ যদিও বেদের অপৌরুষেয়ত্ব এবং বিশ্বনিয়ন্তা ব্রহ্মণ্যদেবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কালক্রমে তাঁহারা কিন্তু হিন্দুদেবদেবীর অর্চ্চনা করিতেন ; ধর্ম্মকর্ম্মে পুরোহিত নিযুক্ত করিতেন। তাঁহারা ব্রাহ্মণ্য কর্ম্মকাণ্ডের সারভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তীর্থঙ্কর এবং বুদ্ধমূর্ত্তিকে তাঁহারা, হিন্দুর মত, দেবতাজ্ঞানে আরাধনা করিতেন।

তিনটি ধর্ম্মেরই প্রধান লক্ষ্য—অহিংসা, সংযম, ত্যাগ, জ্ঞানার্জ্জন ও আত্মোন্নতি। পক্ষান্তরে, বৌদ্ধ দর্শনের কয়েকটি সূত্রের সহিত ব্রাহ্মণ শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক বিচার-প্রণালীর এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল যে, অনেকে শঙ্করকে 'প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ' বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। চিয়েংমাই (শ্যাম) রাজ্যে থাইবৌদ্ধ নরপতি (ধর্ম্মরাজ) হিন্দু ও বৌদ্ধের সাম্য ও মৈত্রীভাব জাগ্রত রাখিতে স্থানীয় বৌদ্ধধর্ম্মপীঠে শিব ও বিষ্ণুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বাঙ্ককের প্রসিদ্ধ মহাচক্রীপ্রাসাদসংলগ্ন বুদ্ধমন্দির-গাত্রে, বৌদ্ধতন্ত্রোক্ত প্রকৃতিবিজ্ঞানমূলক চিত্রের সানুদেশে, রামলীলা অঙ্কিত আছে। বৌদ্ধসম্রাট্ ধর্ম্মপালদেবের শাসনকালে (অষ্টম শতক) বুদ্ধগয়ামন্দিরে শিবব্রহ্মার প্রতীক, চতুর্ম্মুখ শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল। উহা অদ্যাপি পূজিত হইতেছে। বেলুড় (মহীশূর) মন্দিরে বৌদ্ধগণ হিন্দুর দেবতা কেশবদেবকে বুদ্ধজ্ঞানে অর্চ্চনা করিতেন; প্রত্নলিপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। প্রাম্বানমের (যবদ্বীপ) বহু মন্দিরেই শৈব, বৌদ্ধ ও জৈন দেবমূর্ত্তি একত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাদের অস্তিত্ব বর্ত্তমান। শ্যামের প্রাচীন রাজধানী আয়ুথিয়ার (অযোধ্যা) প্রতিষ্ঠাতা বৌদ্ধনরপতি 'রামাধিপতি' স্বীয় রাজ্যে শিব ও বাসুদেবের দুইটি মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। কম্বোজ প্রাসাদে বাকুবংশীয় ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধরাজবংশীয়গণের সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠানে, বৌদ্ধ ধর্ম্মযাজকগণসহ একযোগে পৌরোহিত্য করেন। সিংহলের পোলোন্নারুয়া মন্দির হিন্দুবৌদ্ধের মিলন ঘোষিত করিতেছে। তৎস্থানে নটরাজ, বিষ্ণু ও অষ্টভুজা দুর্গা প্রভৃতির মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিলবারা দেবায়তনে জৈন-তীর্থঙ্করগণের ধর্ম্মলীলাসহ শ্রীকৃষ্ণপ্রমুখ ব্রাহ্মণ্য দেবতাসমূহের চিত্র খোদিত আছে।

অহিংসাবাদ এবং অহিংসার মহিমা বুদ্ধজন্মের বহুপূর্ব্বেই উপনিষদ্ ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র, মনুসংহিতা ও মহাভারত প্রচার করিয়াছিল। 'অহিংসা সত্যমস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। এতৎ সামাসিকং ধর্মং চাতুর্বর্ণ্যেঽব্রবীন্মনুঃ॥"—(মনুসংহিতা, একাদশ অধ্যায়)। "ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুর্ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"—(মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৬৯ অধ্যায়)।

জৈনধর্ম্মের মূল—অহিংসা। অহিংসাই ধর্ম্মপ্রাণ জৈনসাধুর প্রধান লক্ষ্য। এক হিসাবে ব্রাহ্মণ্য মতবাদেরই চরম বিকাশ হইয়াছিল মহান জৈন ও বৌদ্ধ দর্শনের

মৈত্রী ও করুণার সার্ব্বভৌম উদারতায়। ব্রাহ্মণ্য দর্শনশাস্ত্র, শিল্প ও সংস্কৃতিকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়াই বৌদ্ধ- ও জৈন-সংস্কৃতি (ধর্ম্মশাস্ত্র, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্প) বিবিধভাবে বিকশিত হইয়াছিল। বুদ্ধপূর্ব্ব বৈদিক সমাধিস্তূপের আদর্শেই প্রথম বৌদ্ধস্তূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল। স্তূপ- ও চৈত্য-স্থাপনে বৌদ্ধগণ সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণ্য আচারানুষ্ঠানের অনুসরণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের ন্যায় স্থাপত্য ও শিল্প-কলাতেও বস্তুতত্ত্ব ও পরতত্ত্বের অনুশীলন ও বিচারের দ্বারা অনুভূতির উদ্দীপন হয়। ইন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা বস্তুতত্ত্বকে এবং অতীন্দ্রিয়ানুভূতির দ্বারা পরতত্ত্বকে ধারণা করা যায়। বস্তুতত্ত্বের সহিত পরতত্ত্বের মিলন হইতেই ভারতীয় দেবায়তন এবং ভারত সভ্যতা উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছে। এতৎকল্পে উপনিষদ্, জৈনদর্শন ও বৌদ্ধদর্শনের অবদান অপরিসীম।

অগস্ত্যের আশ্রমকানন-মুখরিত সামগান-সুরতরঙ্গ তদীয় শিষ্যপ্রশিষ্য স্থপতি শিল্পিগণের হৃদিতন্ত্রী ঝঙ্কারিত করিয়া ভূমার পরিকল্পনায় প্রবুদ্ধ করিত। ধ্যানযোগে অতীন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে তাঁহারা সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের অনুসন্ধান করিতেন। উপনিষদ্-সঞ্জাত জ্ঞানবর্ত্তিকা শিল্পিগণের মানসপটে ব্রহ্মণ্যদেবের দিব্যকান্তি উদ্ভাসিত করিত। বস্তুতত্ত্বসহ পরতত্ত্ব তাঁহাদের অনুপ্রাণিত করিত মহান্ দেবায়তন-সৃজনে। সচ্চিদানন্দের শাশ্বত সৌন্দর্য্য অনুরঞ্জিত হইত শিল্পিসৃষ্ট দেবদেউলে, প্রতিমাবিগ্রহে, চিত্রে, ভাস্কর্য্যে এবং সুঠাম সুচারু সৌধাবাস পরিশোভিত ও সুচিন্তিতভাবে সুবিন্যস্ত গ্রামনগরের প্রফুল্লতাময় পরিবেশে। সমগ্র জাতির পার্থিব অপার্থিব সাধনাকামনা অভিব্যক্ত হইয়াছিল দেবায়তনকেন্দ্রী হিন্দুস্থানের শিল্পোজ্জ্বল আনন্দলোকের মঙ্গলালোকে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও শক্তিনিচয়ের ধ্যানধারণার মাধ্যমে অগস্ত্য, নগ্নজিৎ, শেষনাগ, ময়, বিশ্বকর্ম্মা প্রভৃতি স্থপতিগণ স্থাপত্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট রূপ প্রণিধান করিতেন। তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ, দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-প্রণালীর ঐতিহ্যদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া, নব নব স্থাপত্যশৈলীর বিকাশ করিয়াছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্থাপত্য-ভাস্কর্য্যের এবং অপার্থিব অতিপ্রাকৃত অঙ্কনচিত্রের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় স্পন্দিত হইত ধর্ম্মপ্রাণ শাস্ত্রপ্রাণ মহাজাতির অবিনশ্বর অন্তরাত্মা।

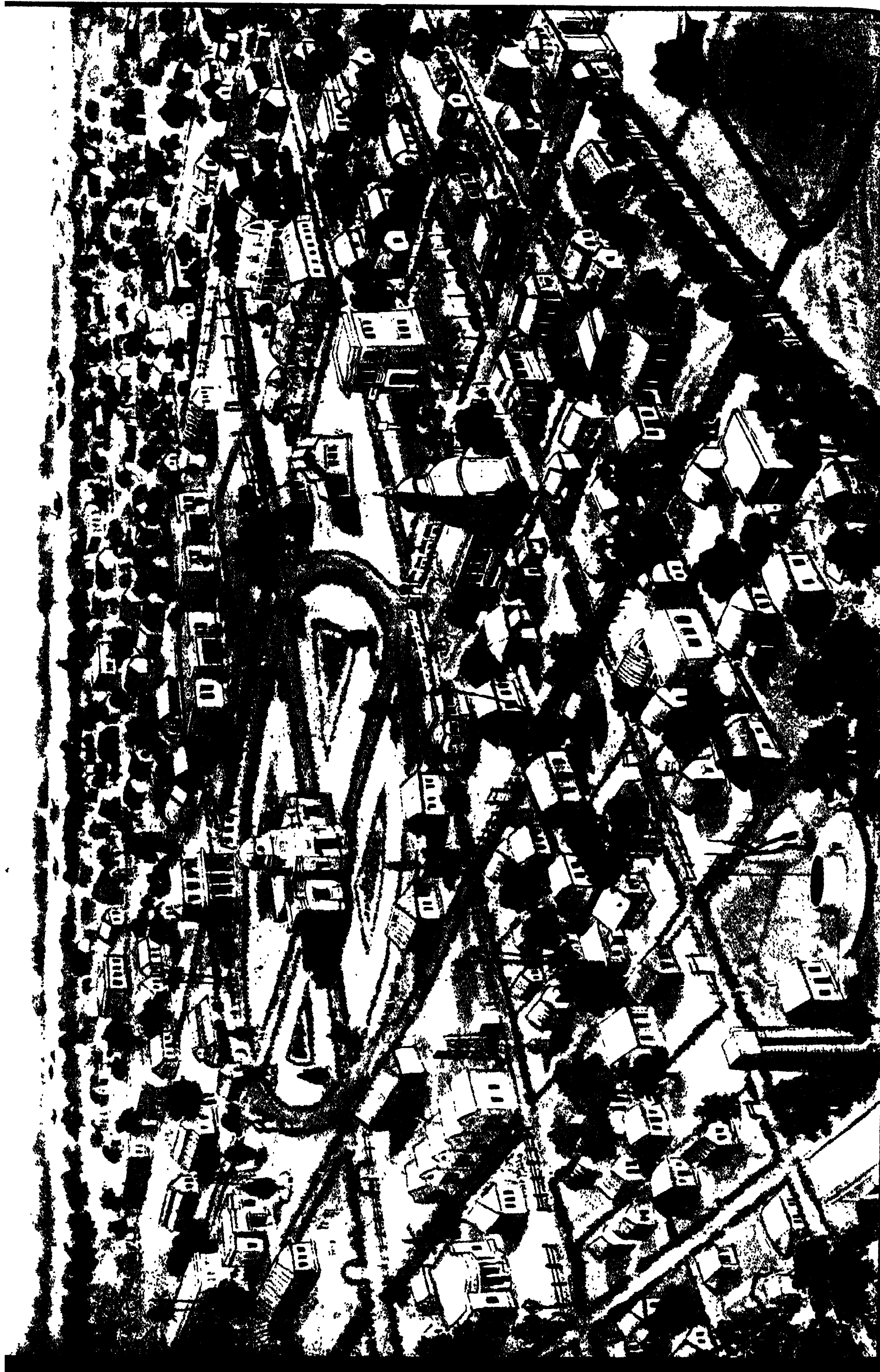
ধ্যানলব্ধরসোপলব্ধি-সমৃদ্ধ দর্শনমূলক স্থাপত্যের অধুনাতন সংস্করণের মূল নিহিত হউক সনাতন শিল্পসংস্কৃতির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে। দেবস্থান ও বাসস্থান বিনির্ম্মিত হউক দেশজাত উপাদানে, দেশীয় জলবায়ুর অনুকূল পরিবেশে, বহুযুগ-ব্যাপী পরীক্ষার ফলে দেশীয় অর্থনীতি ও প্রকৃতিসঙ্গত যে সকল বাস্তুবিধান ব্যবস্থিত ও শিল্পশাস্ত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল তাহাদের বর্ত্তমানকালোপযোগী বিকশিত করিয়া। তৎকরণে পাশ্চাত্ত্য বাস্তুগঠন- এবং স্থাপত্যরচনা-প্রণালীর হিতকর অংশসমূহ গ্রহণ করিতেই হইবে। ধ্যানলব্ধ সৃজনী প্রতিভার সহিত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নির্ম্মাণ-কৌশল এবং অর্থনীতির সমুচিত সমন্বয় করিতে হইবে। জাতীয় নব-অভ্যুদয়ের মাহেন্দ্রক্ষণে জাতীয় স্থপতিশিল্পীর চিত্তে যথার্থ উদ্ভাবনীশক্তি সঞ্চারিত করিতে হইবে। দক্ষিণভারত, সৌরাষ্ট্র, রাজস্থান, উৎকল ও বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশসমূহে যে সকল স্বদেশী স্থপতি ও শিল্পী জীবিত এবং শিল্পগঠনে বংশপরম্পরায় সক্রিয় রহিয়াছেন তাঁহাদের ধারাবাহিক কর্ম্মপদ্ধতি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ ও অটুট রাখিয়া—পাশ্চাত্ত্য শিল্পবিজ্ঞানের সহযোগে তাহাকে বিকশিত করিয়া—তাঁহাদের নববলে বলীয়ান এবং স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁহাদের নবোৎসাহে অনুপ্রাণিত করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তাঁহাদের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা তথা দেশী ও বিদেশী স্থাপত্যের অসমীচীন মিশ্রণে অদ্ভুত স্থাপত্যের সৃষ্টি করা ভারত শিল্পের পক্ষে বিপজ্জনক। তজ্জন্য একটি স্বতন্ত্র, সর্ব্বভারতীয়, জাতীয় স্থাপত্য শিক্ষায়তনের বিধিমত প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। প্রস্তাবিত শিক্ষায়তনে দেশের বিভিন্ন প্রদেশীয় শিল্পাচার্য্যগণ মধ্যে মধ্যে একত্রিত হইয়া পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান করিয়া ভারতীয় স্থাপত্যের বিভিন্ন প্রদেশজাত বিবিধ শৈলী-সমূহের শ্রেষ্ঠ বিকাশ সংসাধিত করিতে পারিবেন। ক্রমশঃ আন্তর্জাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে সর্ব্বজনীন জাতীয় স্থাপত্যের উদ্ভব সহজসাধ্য হইবে।

ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলাকে স্থাপত্যজননীর ক্রোড় হইতে বিচ্যুত করা অসঙ্গত। দরিদ্রের কুটীরেও মহতী ভাবোদ্দীপক অন্ততঃ দুই-একটি শিল্পফলক সন্নিবেশিত করিয়া সমগ্র গ্রামনগরের প্রাসাদ, সৌধ ও বাসভবনের সমবেত সৌন্দর্য্য-সঙ্গীতের সহিত সরল কুটীরশৈলীর সবল সুরলয়ের ঐক্যতান মন্দ্রিত করিতে হইবে। পৌর-স্থাপত্যের দেবভাষা প্রাণবন্ত ও অবিকৃত রাখিতে হইবে (১৪০-১৫২ চিত্র)। গুপ্ত,

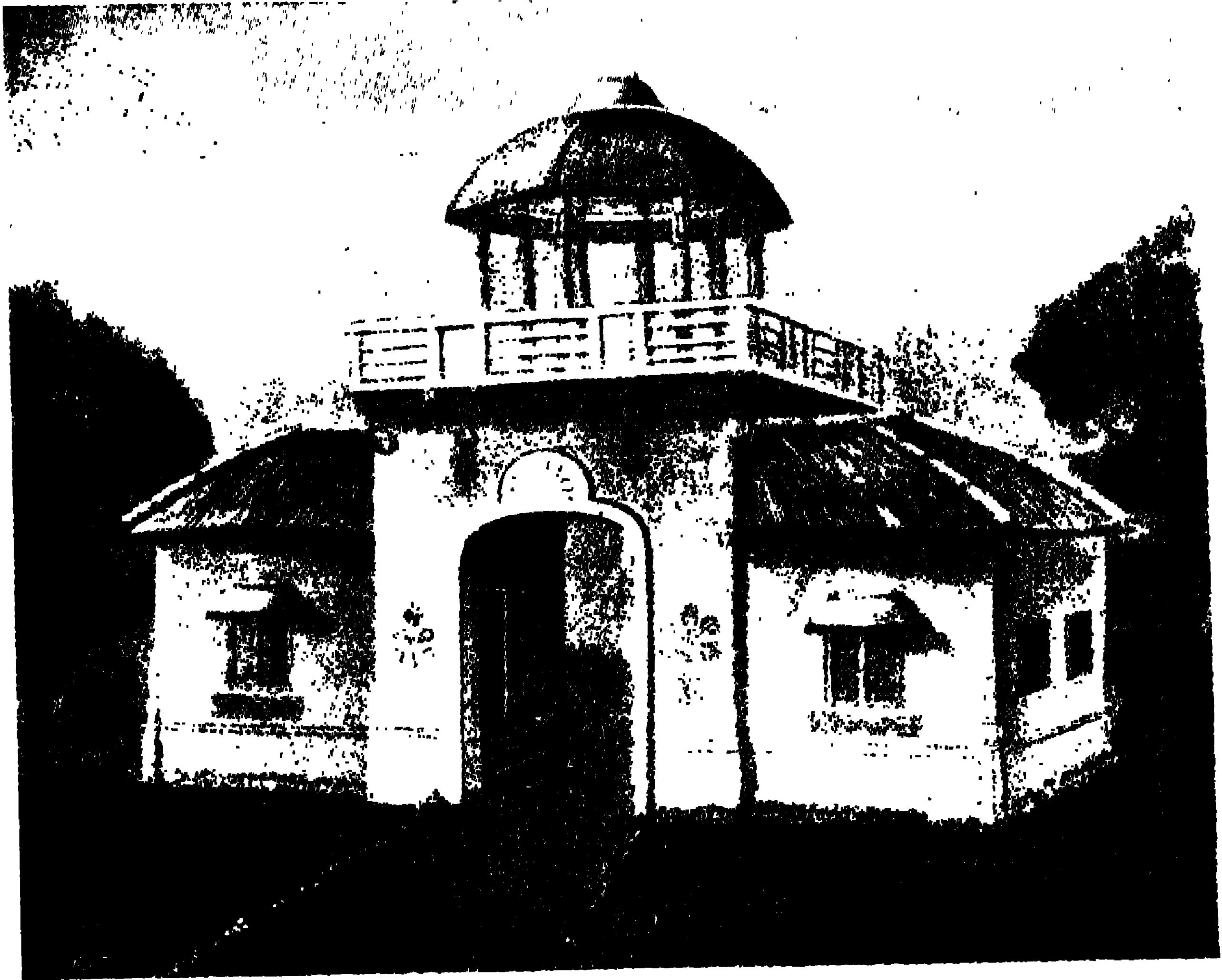
চিত্রফলক ১১৫



[illegible] চিত্র—ভারত রাষ্ট্রের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী [illegible]



চিত্রফলক ১১৭



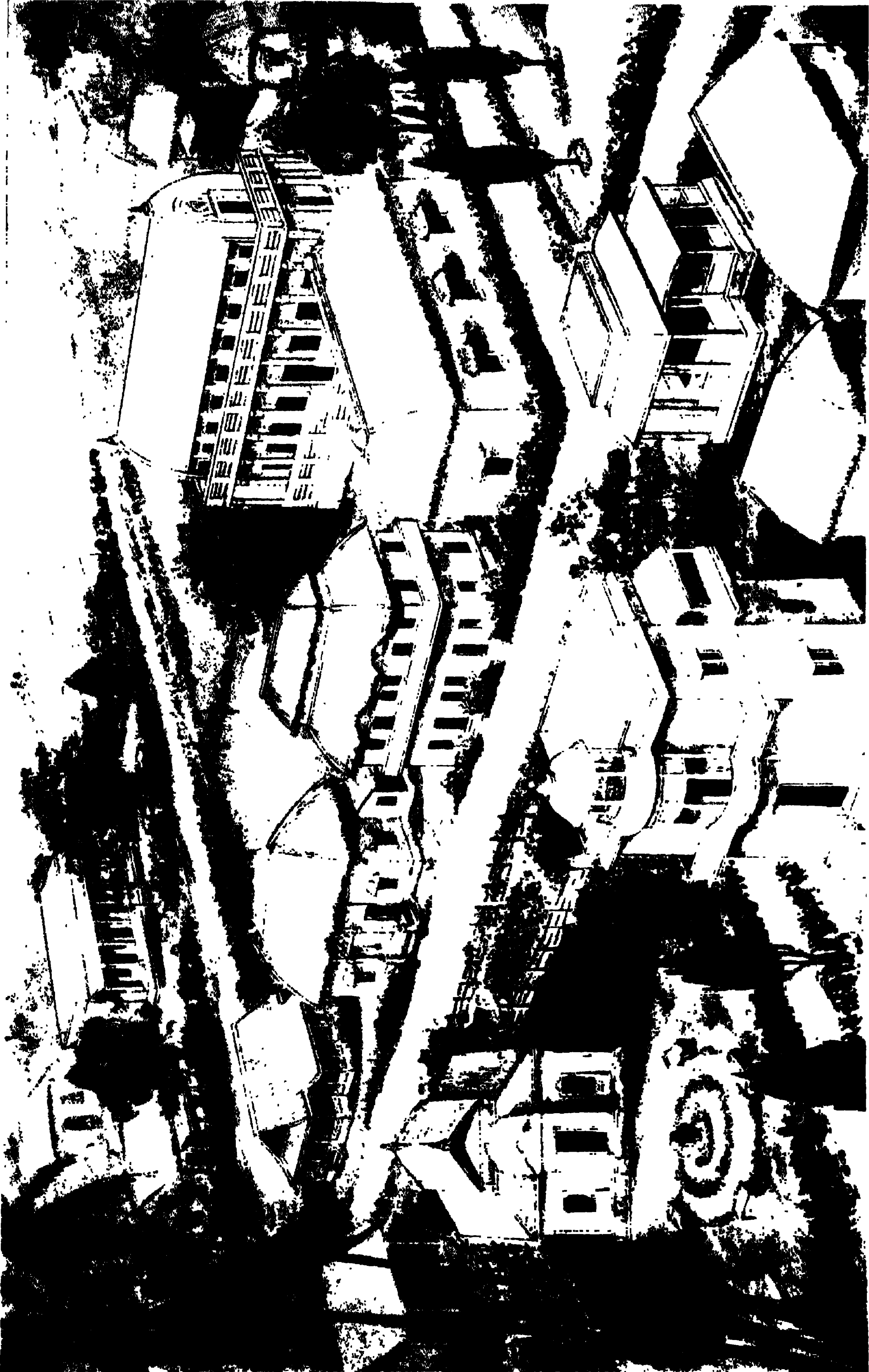
১৪. চিত্র – গ্রামপ্রবেশের প্রধান তোরণ

চিত্রফলক ১১৮



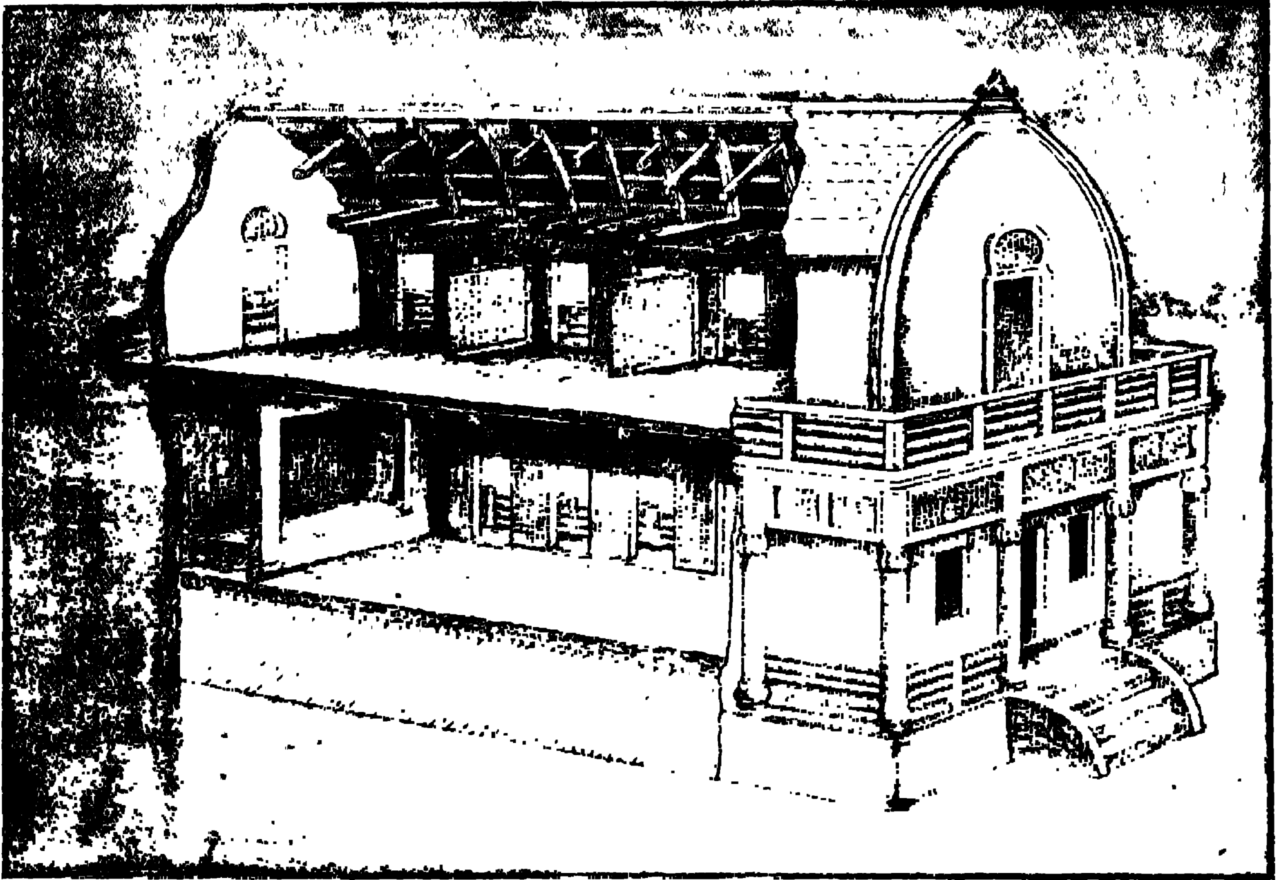
১৪২ চিত্র—গ্রামীণ জাতীয় ভবন

চিত্রফলক ১১৯



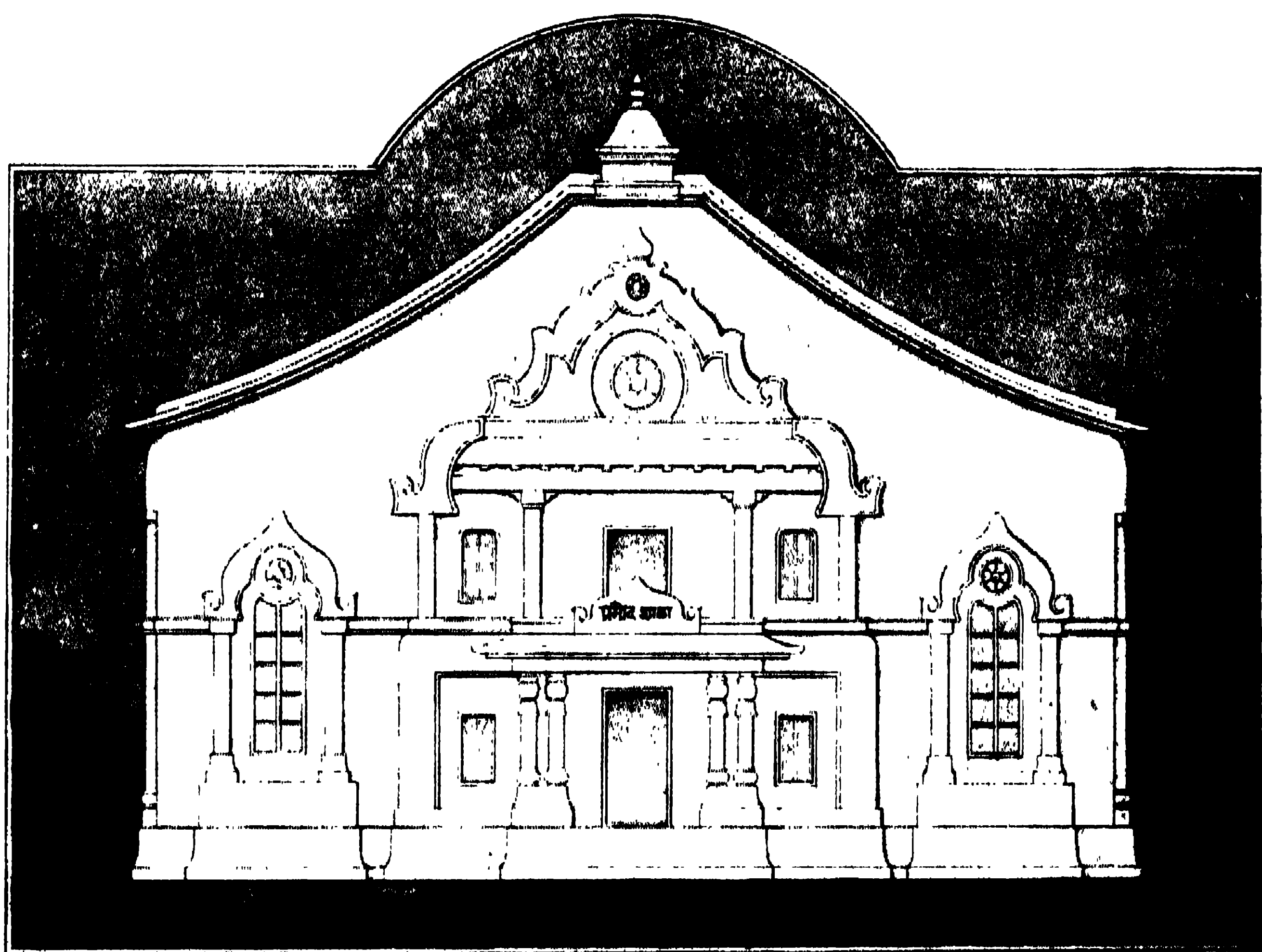
১৪৩ চিত্র— প্রাচীন সংস্কৃতিকেন্দ্র

চিত্রফলক ১২০



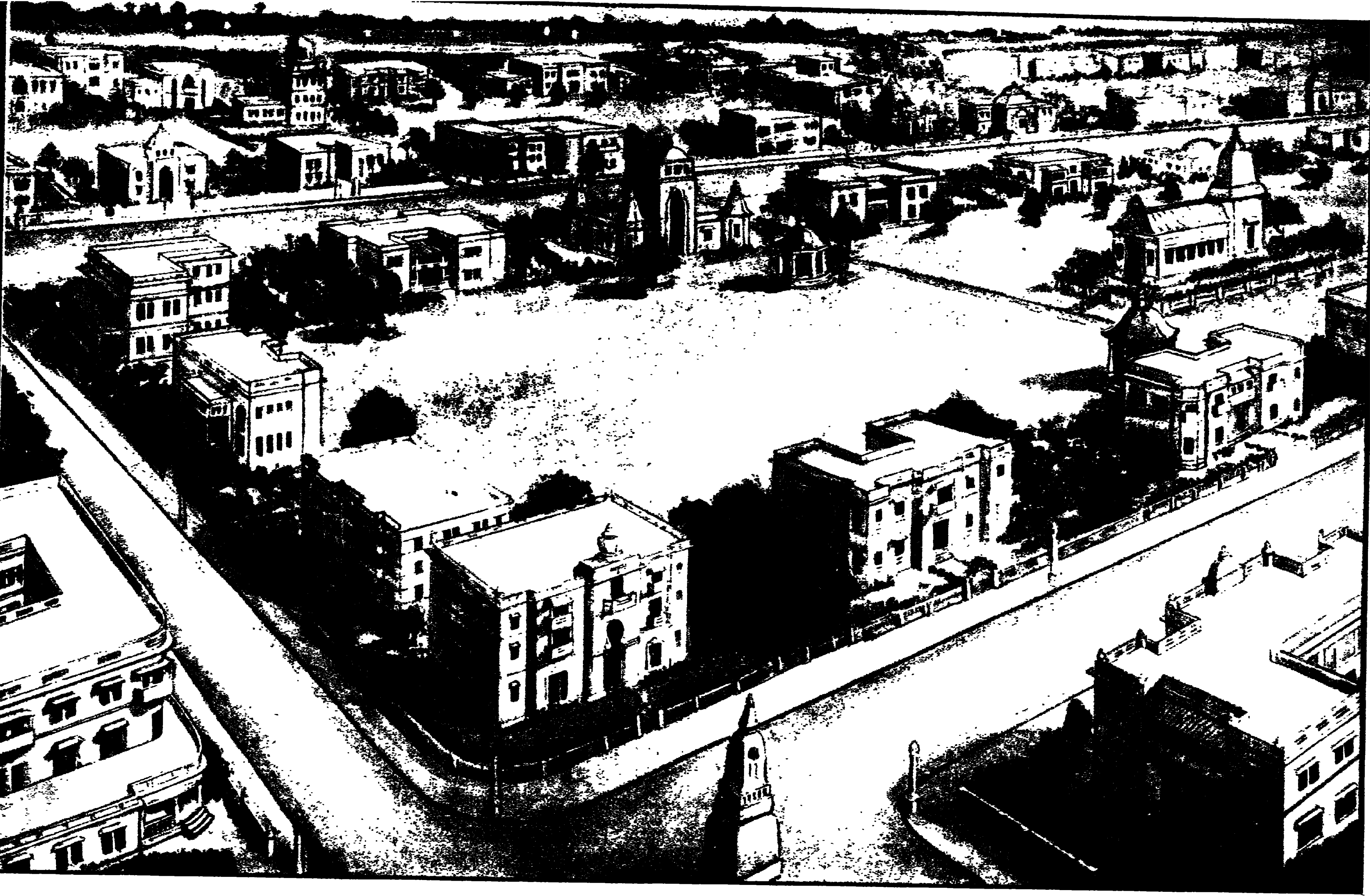
২৪৮ চিত্র — উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়

চিত্রফলক ১২১



১৪৫ চিত্র—প্রমোদশালা

চিত্রফলক ১২২



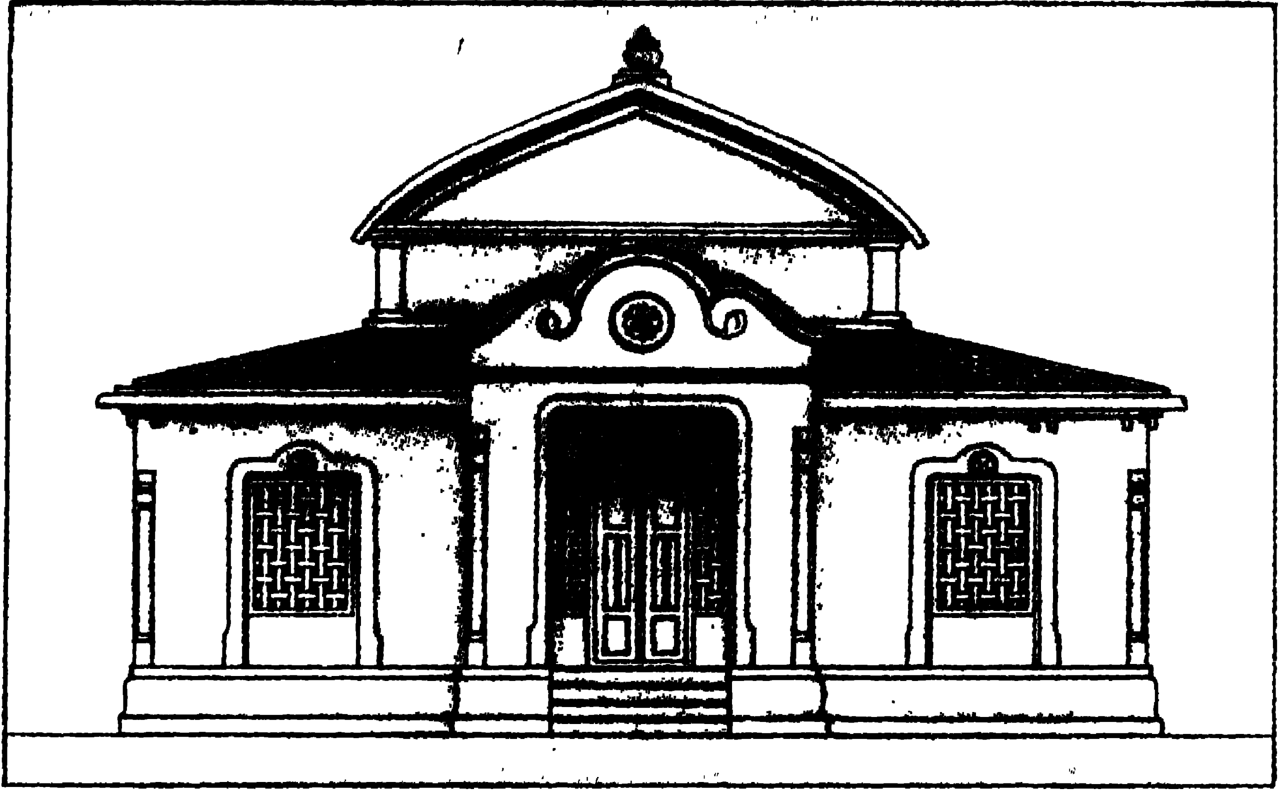
১৪৬ চিত্র— উন্নত নগর

চিত্রফলক ১২৩



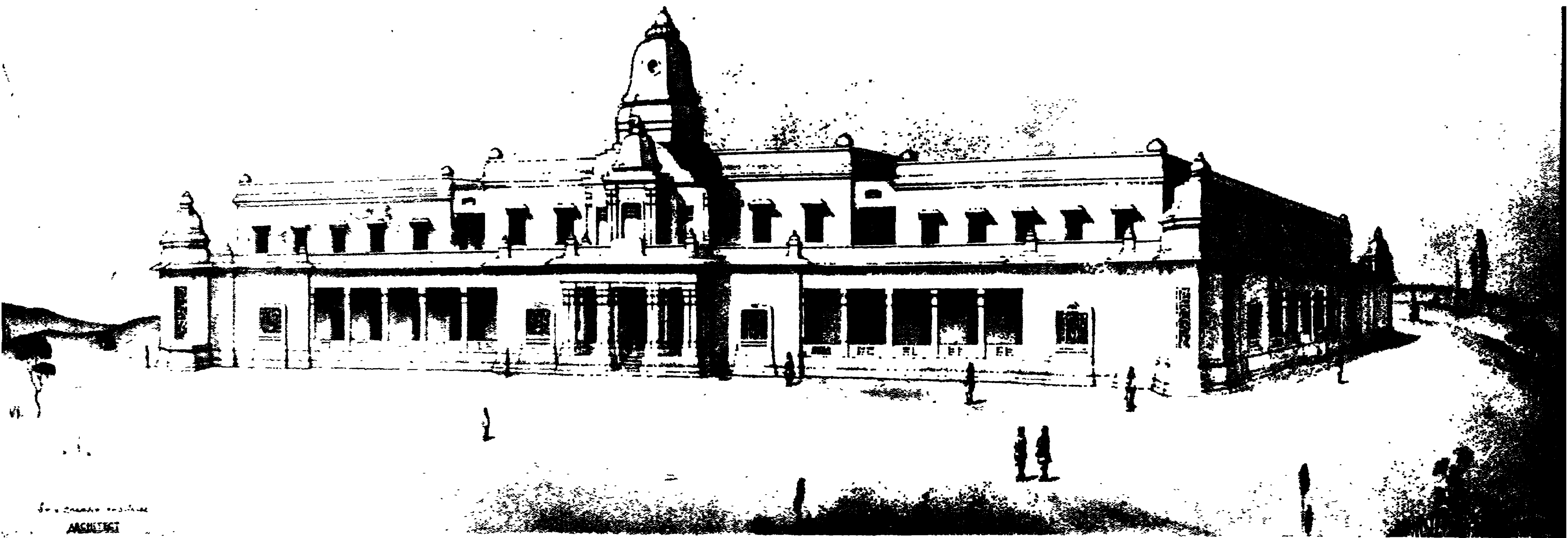
১৪৭ চিত্র—পেন্টিনবন

চিত্রফলক ১২৪



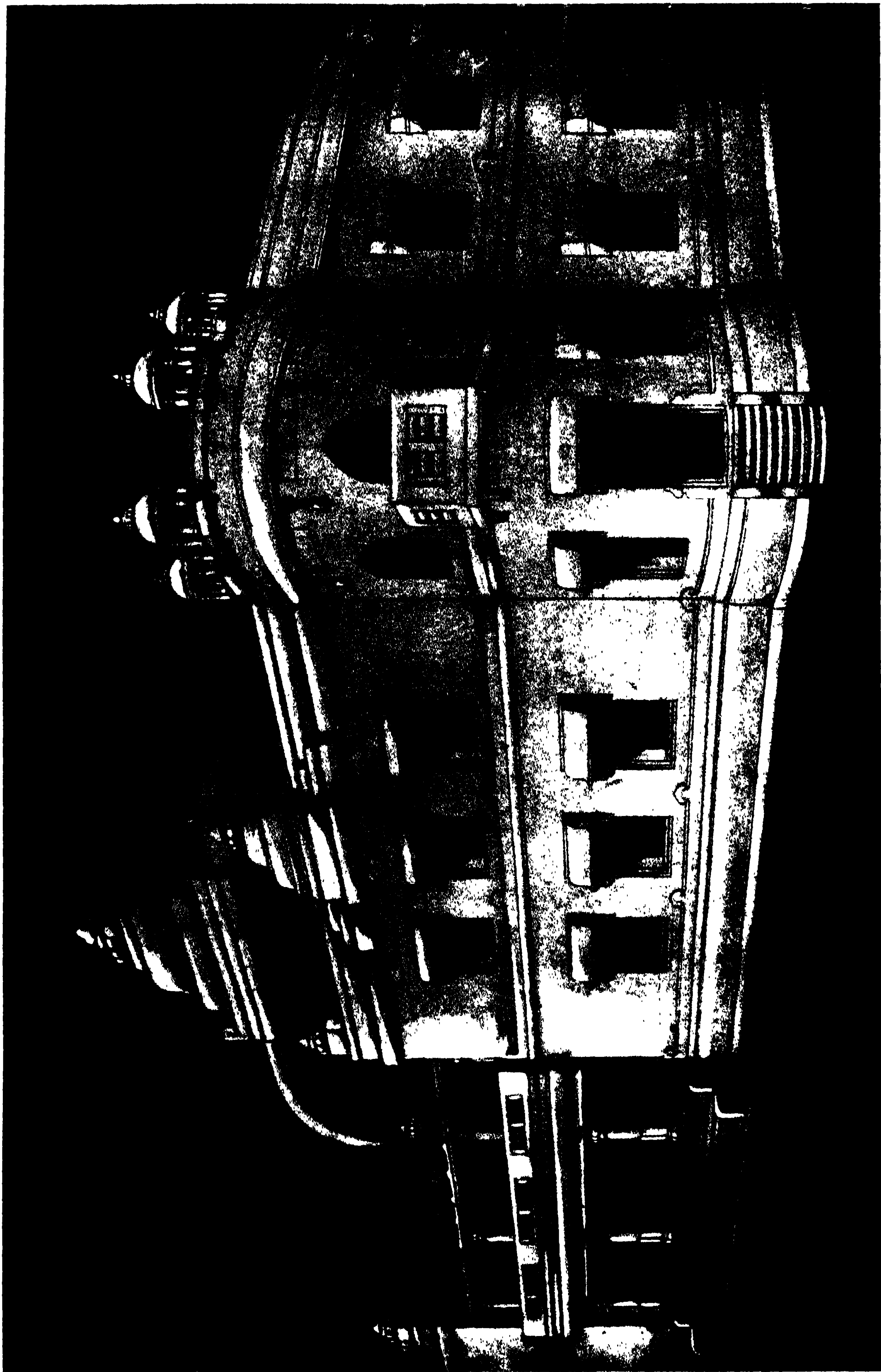
১৪৮ চিত্র—গৃহস্থাবাস

চিত্রফলক ১২৫



১৪৯ চিত্র—শিক্ষামন্দির

চিত্রফলক ১২৬



১৩০ চিত্র—জাতীয় ভবন

চিত্রফলক ১২৭



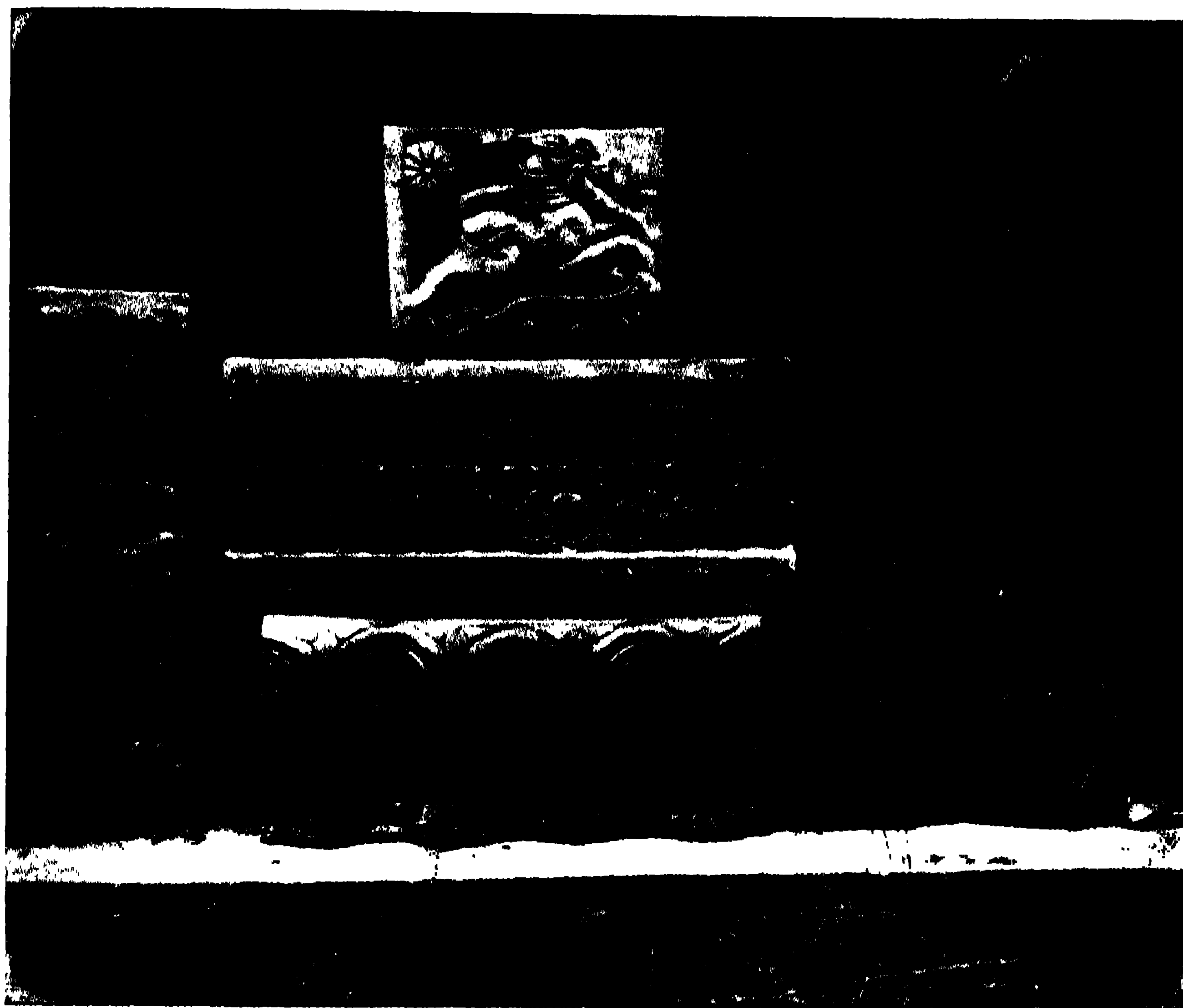
১৫১ চিত্র—কৃত্রিম উৎস (শিবগঙ্গা)

চিত্রফলক ১২৮



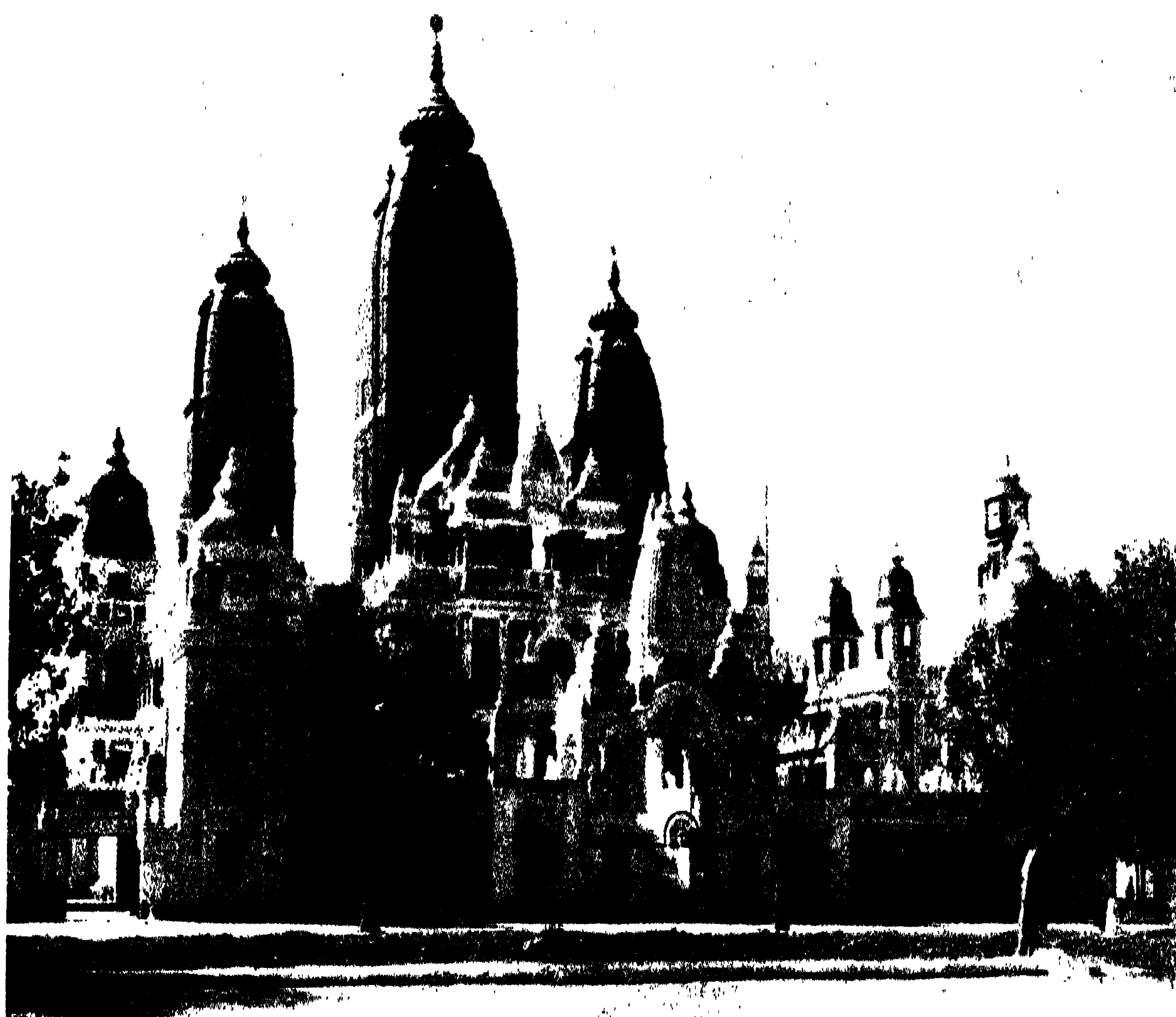
১৫১ক চিত্র—নৃত্যরত গণেশ

চিত্রফলক ১২৯



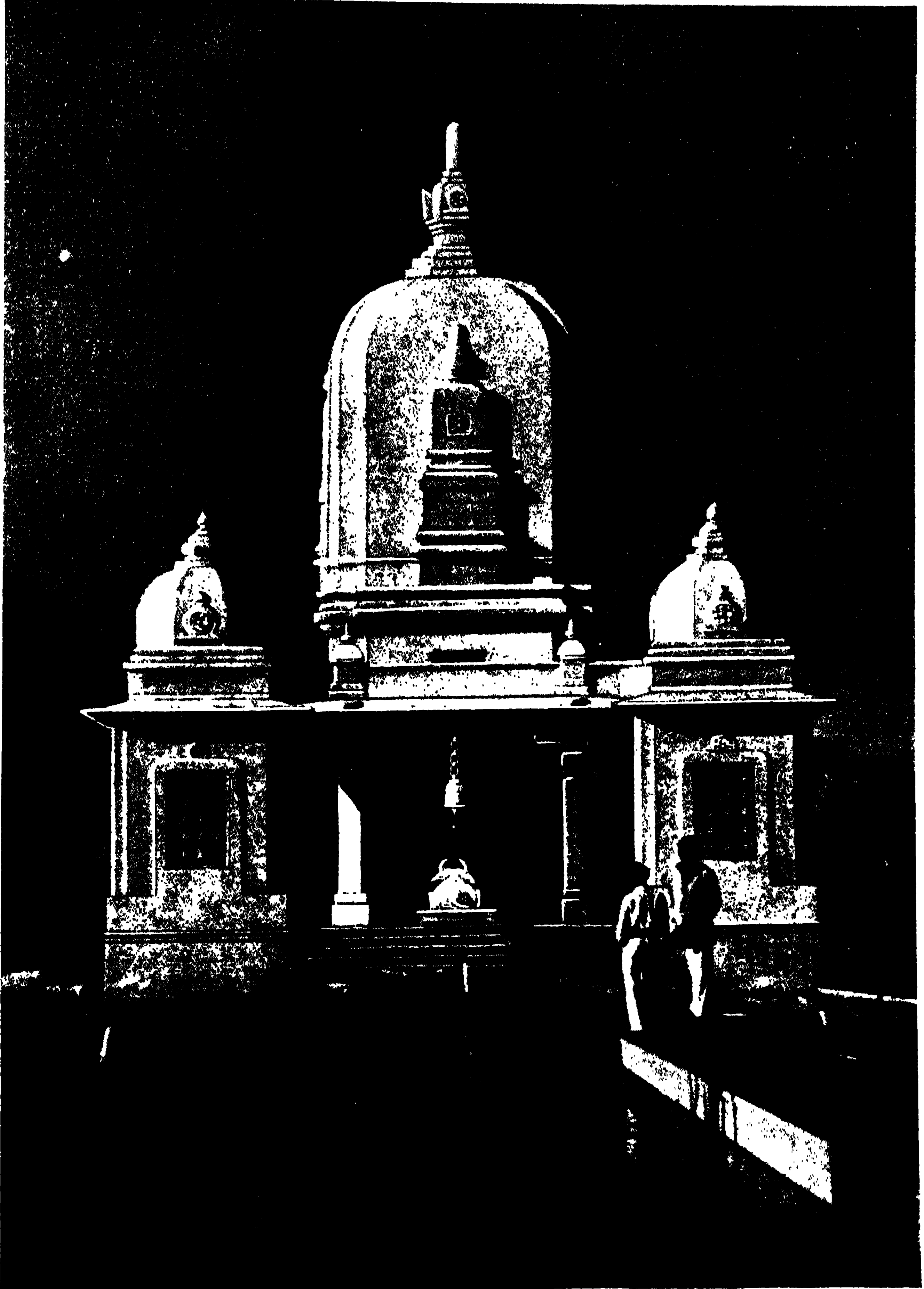
১৫২ চিত্র—তক্ষণ-, মৃন্ময়- ও সিমেন্ট-শিল্প

চিত্রফলক ১৩০



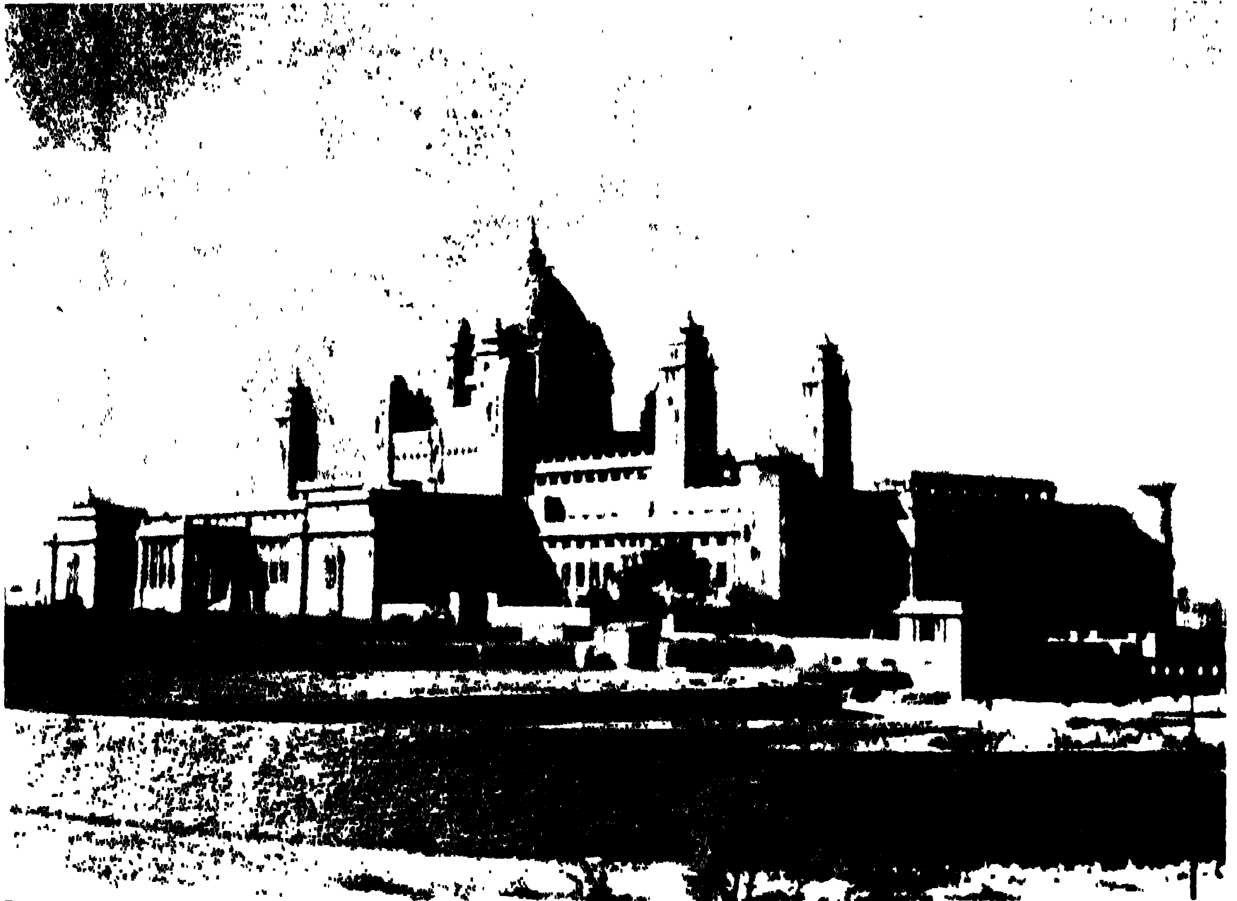
৫৩ চিত্র - লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, নয়াদিল্লী

চিত্রফলক ১৩১



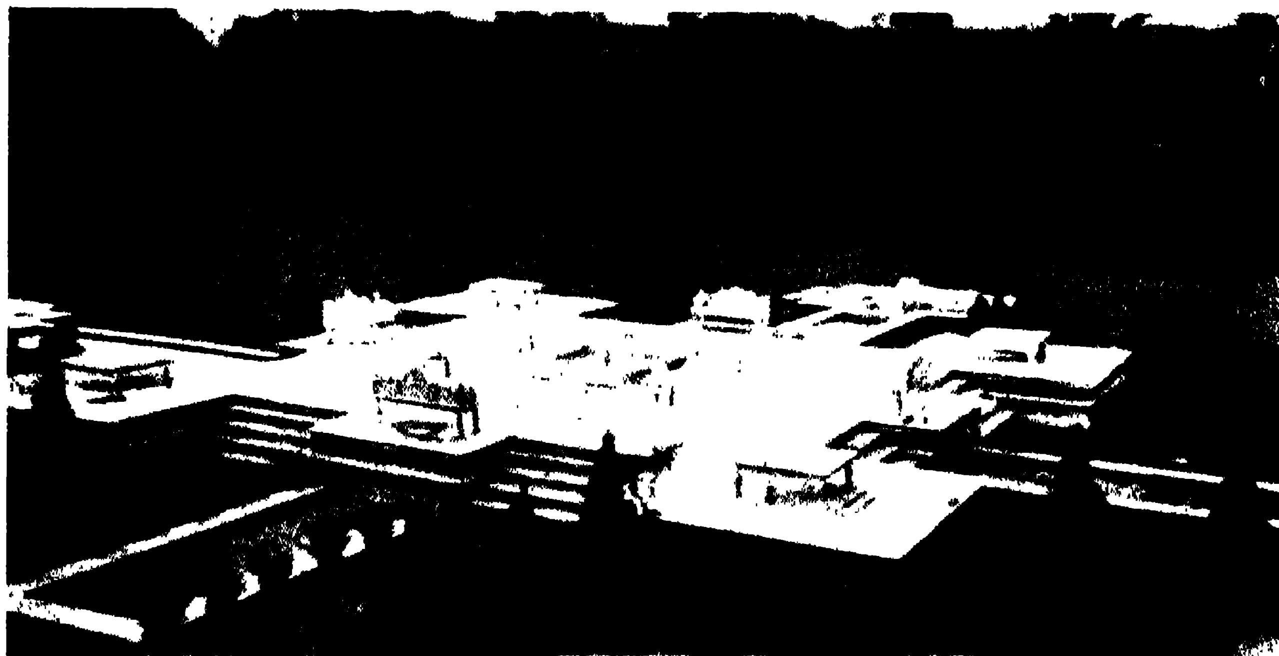
১৫৪ চিত্র—শিবমন্দির, রতনগড় (রাজস্থান)

চিত্রফলক ১৩২

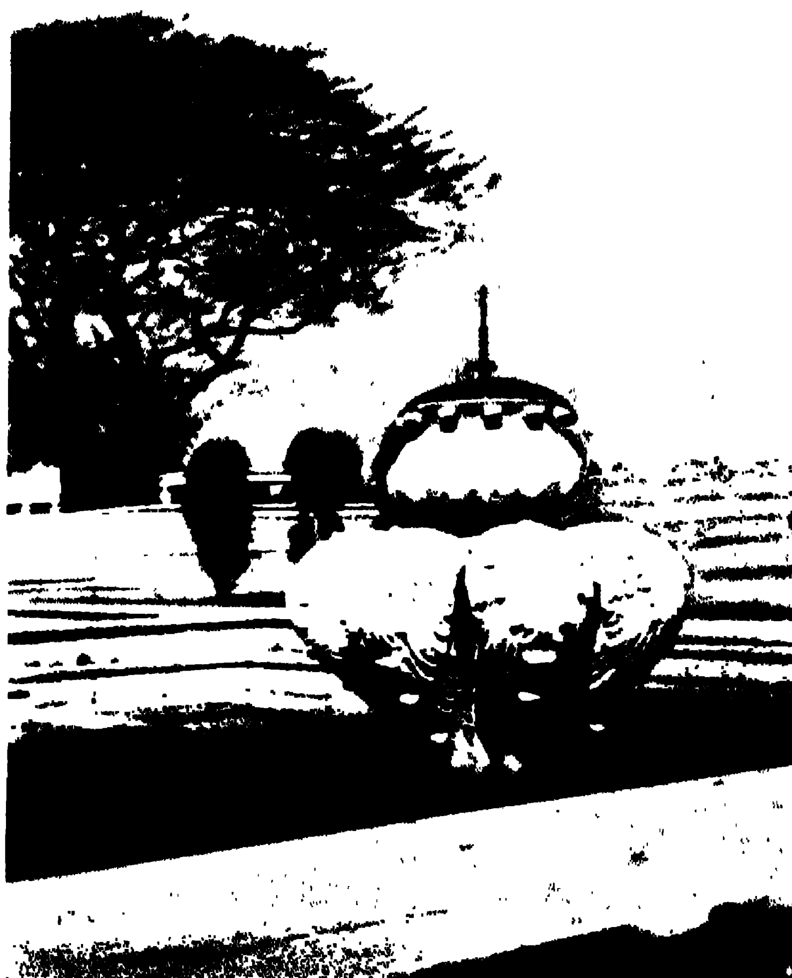


১৫৫ চিত্র—নব্য ভারতীয় রাজপ্রাসাদ, যোধপুর

চিত্রফলক ১৩৩



১৫৬ চিত্র—নব্য ভারতীয় পদ্মোদ্যান, সিংথী পার্ক (কলিকাতা)



১৫৬ক চিত্র—কৃত্রিম কেতক-প্রস্রবণ

চিত্রফলক ১৩৪



১৫৭ চিত্র—'নয়নতারা' উদ্যানবাটিকা, মধুপুর

চিত্রফলক ১৩৫



১৫৮ চিত্র—উদ্যানবাটিকার প্রবেশতোরণ

চিত্রফলক ১৩৬



১৫৯ চিত্র—গৌরীশঙ্করশীর্ষ ভারতবর্ষ

পাল এবং বিজয়নগরীর সুশাসনকালে ভারতের পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে, তাহা সম্প্রসারিত হইয়াছিল। দেশের প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের সহিত ভাস্কর্য্য, তক্ষণ, কারু ও চিত্রশিল্প তথা বেদান্তপ্রাণ মহাজাতির সাংস্কৃতিক আদর্শ অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ছিল। মধ্যযুগে য়ুরোপ মহাদেশেরও গির্জ্জা, রাজভবন ও বিদ্যায়তন প্রভৃতির স্থাপত্যশৈলীসমূহ সুকুমার কারুশিল্পমণ্ডিত হইত।

আধুনিক গ্রামনগরে নব্যভারতীয় জাতীয় স্থাপত্যের অনধিক অর্থব্যয়ী অনাড়ম্বর বিকাশ তথা শাখাশিল্পনিচয়ের সমবেত সংরক্ষণসহ সর্ব্বাঙ্গীণ পরিপুষ্টি অসম্ভব নহে। বিগত কয়বৎসর যাবৎ আধুনিক গৃহনির্ম্মাণের উপাদানে, অধুনাতন নির্ম্মিতি-কৌশলে, যে কয়টী ভারতীয় ধরণের মন্দির, উদ্যান, সৌধ ও সাধারণ বাসগৃহ পরিগঠিত হইয়াছে, পরীক্ষামূলকভাবে তাহাদের বিচার করিলে দেশীয় স্থাপত্যের এবং উদ্যানের যথাযথ, যুগোপযোগী, বিকাশে তাহাদের অবদান উপেক্ষণীয় নহে (১৫৩-১৫৮ চিত্র)।

স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণচিত্ততা, সৎকার্য্যে সক্রিয় সহযোগিতার পরিবর্ত্তে সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতা এবং জাতীয় আভিজাত্যের ও ঐতিহ্যের মহিমানির্দ্ধারণে অক্ষমতা—আধুনিক ভারতের প্রকৃত উন্নতিপথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। "বর্ণে বর্ণে, জাতিতে জাতিতে অপবিত্র ভেদবুদ্ধির নিষ্ঠুর মূঢ়তা ধর্ম্মের নামে আজ পঙ্কিল ক'রে তুলেছে এই ধরাতল; পরস্পর হিংসা ও ঘৃণায় মানুষ এখানে পদে পদে অপমানিত।"—(রবীন্দ্রনাথ)।

'সর্ব্বভূতেষু আত্মবৎ', 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', 'নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং। অবেরেন চ সম্মন্তি এসো ধম্মো সনন্তনো।'—প্রভৃতি মহাঘোষণা, উদীয়মান নব্যভারতের মাধ্যমে, যুধ্যমান মানবশক্তিসমূহকে সত্য-, করুণা- ও মৈত্রী-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবে। রক্তে পঙ্কিল ধরাতলের পাপপঙ্ক প্রক্ষালিত করতঃ প্রেমতন্ত্রী অহিংসসমাজ এবং সার্ব্বভৌম 'পঞ্চশীল' ধর্ম্মধ্বজ স্থাপিত করিয়া জ্ঞানদীপ্ত ভবিষ্য ভারত দেশে দেশে চিরস্থায়ী সুখ, শান্তি, সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার প্রেরণা প্রদান করিবে।

উদীয়মান নব্যভারতে, ন্যায়পরায়ণ গণতন্ত্রের সুপরিচালনায়, মহামানবতার অগ্রদূতরূপী জাতীয় স্থাপত্য পুনঃ প্রচলিত হইলে এবং প্রাচুর্য্যপরিপূরিত, স্বয়ং-সম্পূর্ণ, ব্যবহারিক বিজ্ঞানসম্মত, শান্তিশৃঙ্খলাপূর্ণ, সত্যমন্দিরকেন্দ্রী গ্রামনগর পুনঃ

প্রতিষ্ঠিত ও ধরাতলে পুনঃ প্রদর্শিত হইলে প্রতীচ্যের স্বপ্নসাম্রাজ্য 'সিন্ধু'- 'হিন্দু'-স্থান, 'ভূস্বর্গ'রূপে পুনঃ প্রদীপ্ত হইয়া, মোহমদে দিশেহারা নরসমাজসমূহকে বস্তুতান্ত্রিক বিষয়বৈভবের যক্ষসুলভ পুঁজীবাদের, অর্থনৈতিক ঈর্ষাবিদ্বেষের উন্মাদনা পরিহার করিতে উদ্বুদ্ধ করিবে।

সৃষ্টিসংরক্ষণী শান্তিযজ্ঞের পৌরোহিত্য করিবে—গৌরীশঙ্করশীর্ষ ভারতবর্ষ

আত্মানম্ অমৃতম্ কৃধি ॥ ওঁ শান্তি ॥

১৫৯ চিত্র দ্রষ্টব্য।

চিত্রবিবরণী

১ চিত্র—নব্য-প্রস্তরযুগের কুঠারফলক (পঞ্চদশ সহস্র বৎসর প্রাচীন)

[আশুতোষ মিউজিয়ম]

২ চিত্র—মোহেন্-জো-দড়ো (বিন্যাস-চিত্রাংশ)

রাজধানীর প্রধান পথ- ও গলিপথ-সংলগ্ন কয়েকটি বাসগৃহ ও গৃহগুলির সীমানা।

৩ চিত্র—বহু প্রাচীন সিন্ধু উপত্যকাবাসীর পল্লীজীবন

[পাঠাগার-প্রাচীরচিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সৌজন্যে মুদ্রিত]

বৃক্ষলতা-ফলফুল-পশুপক্ষী-পরিপূর্ণ, মোহেন্-জো-দড়ো-অঞ্চলীয় একটি পল্লীগ্রামের একাংশ। বৃক্ষকোটরে দৃশ্যমান শৃঙ্গধারী দেবতাসমীপে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন সাধক, কূপপার্শ্বে রজ্জুহস্তে দণ্ডায়মানা সুবেশা সালঙ্কৃতা পল্লীবধূ এবং সুচিত্রিত মৃন্ময়কুম্ভগুলি দ্রষ্টব্য। বামকোণে বল্লমধারী শিকারী বনচারী মৃগের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছে।

4 চিত্র—বাসগৃহ, মোহেন্-জো-দড়ো

৮ ফুট বিস্তৃত পথের পার্শ্বে ইষ্টকনির্মিত বাসগৃহের অনুচ্চ প্রাচীরগুলির স্থূলতা ৪ ফুট। গৃহের আয়তন ৮৫'×৯৭'। ৮৫' দীর্ঘ সম্মুখভাগের বাম প্রান্তে সারবান্ কাষ্ঠের প্রবেশদ্বার ৬' উচ্চ। 5 চিহ্নিত উঠানের উপর দিয়া অন্দরমহলের 18a চিহ্নিত প্রাঙ্গণে গমনাগমন হইত। প্রাঙ্গণের দক্ষিণপার্শ্বস্থ শৌচাগার 6 ও স্নানকক্ষ 7 হইতে নালীর মাধ্যমে, জল নির্গত হইয়া পথের সুদৃঢ় পয়ঃপ্রণালীতে পড়িত। দ্বিতলে উঠিবার সোপানপথ দুইটি 8 এবং 14 চিহ্নিত। অন্দরের উঠানের ঊর্দ্ধভাগে অবস্থিত অপ্রশস্ত বারান্দা অবলম্বনে দ্বিতলের কক্ষগুলিতে যাওয়া যাইত। 17 চিহ্নিত কক্ষটি অতিথির জন্য। নিম্নতলের কক্ষগুলির ছাদ মেঝে হইতে ৭' উপরে। 17 চিহ্নিত কক্ষে শাল অথবা দেবদারু কাষ্ঠের কড়ি ও বরগার উপরে ইষ্টকাচ্ছাদন নির্মিত হইয়াছিল। তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। 12a চিহ্নিত মৃন্ময় চুঙ্গীর ('পাইপ') মাধ্যমে দ্বিতলের অপরিষ্কার জল ইষ্টকাবৃত উঠানের কুণ্ডমধ্যে নীত হইত। তথা হইতে ইষ্টকাচ্ছাদিত জলনিকাশের মধ্য দিয়া সেই জল পথিমধ্যে সাধারণ পয়ঃপ্রণালীতে চলিয়া যাইত।

৫ চিত্র—শীলমোহর, মোহেন্-জো-দড়ো

9 চিহ্নিত মোহরে দীর্ঘদেহ নগ্নদেবতা—ত্রিমুখ, ত্রিশীর্ষ ও শৃঙ্গধারী—কাষ্ঠের বেদীর উপরে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট (৩ চিত্রের দেবতা দ্রষ্টব্য)। শার্দূল, হস্তী, গণ্ডার, মহিষ ও মৃগ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ভক্তিবিহ্বল চিত্তে দণ্ডায়মান। মার্শালের মতে ইনি শিব পশুপতি। খননকালে এইপ্রকার ধ্যানিদেবতা-চিহ্নিত তিনটি মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুইটি ত্রিমুখ।

8 চিহ্নিত মোহরে শৃঙ্গধারিণী দেবী অশ্বত্থবৃক্ষে দণ্ডায়মানা। নতজানু দেবতাটি তাঁহাকে আরাধনা করিতেছেন। দেবতার পশ্চাৎ হইতে নরমুণ্ড অজরাজ দেবীকে দর্শন করিতেছেন। দেবীর সম্মুখে সারিবদ্ধ দণ্ডায়মান সপ্তসংখ্যক শিখাধারী গণদেবতা।

12 চিহ্নিত মোহরে করিশুণ্ড মেষদেব উৎকীর্ণ।

3 চিহ্নিত মোহরে অশ্বত্থবৃক্ষের কাণ্ড হইতে বিনির্গত যুগল শাখাসদৃশ দুইটি করিশুণ্ড মেষ-দেবতা। এইরূপ মোহর সিন্ধু উপত্যকার বহু স্থানে সংগৃহীত হইয়াছে।

৬ চিত্র—মাতৃকা, মোহেন্-জো-দড়ো

সিন্ধু উপত্যকা খননকালে দগ্ধ মৃত্তিকার মাতৃকামূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মাতৃকাদেবী নগরীপল্লীর পৌরসমাজকে এবং অধিবাসীদের রক্ষা করিতেন; শিশুদের পালন করিতেন। বঙ্গদেশের ষষ্ঠীমাতা তাঁহার রূপান্তর।

৭ চিত্র—সন্তরণবাপী, মোহেন্-জো-দড়ো

অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকে নির্মিত সুপরিসর অট্টালিকার বাম পার্শ্বে দুইটি সোপান। সোপানের প্রতি ধাপ প্রায় এক ফুট উচ্চ ও দশ ইঞ্চি প্রস্থ। অট্টালিকার মধ্যভাগে প্রায় ৪০′ দীর্ঘ ও ২৩′ প্রস্থ সন্তরণবাপী। বাপীর চারিদিকে প্রশস্ত চত্বর। চত্বরকে বেষ্টন করিয়া চারি পার্শ্বে অলিন্দগুলিতে যাইবার জন্য ২৬টি খিলানপথ ছিল। পুরোহিতবর্গের ব্যবহারের জন্য চত্বরসংলগ্ন ৮টি স্নানাগার দ্রষ্টব্য। একটিতে কূপ ছিল। সেই কূপ হইতে বাপীতে জল সরবরাহ হইত। স্নানকক্ষগুলি হইতে নিঃসৃত জলরাশি সুপরিকল্পিত জলনিকাশের মাধ্যমে সুপ্রশস্ত পথসংলগ্ন সুবিন্যস্ত পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে নীত হইত। কক্ষগুলির সান্নিধ্যে ঊর্দ্ধগামী সোপানপথের অবশেষ হইতে অনুমিত হয় যে, অট্টালিকাটি দ্বিতল ছিল।

৮ চিত্র—পয়ঃপ্রণালী, মোহেন্-জো-দড়ো

রাজধানীর প্রতি গৃহ পার্শ্ববর্তী পথসংলগ্ন পয়ঃপ্রণালীর সহিত, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতিসম্মত উন্নত নির্মিতিকৌশলে, সুন্দরভাবে সংযুক্ত ছিল। সুদৃঢ় ইষ্টকনির্মিত, সুকঠিন বজ্রলেপলিপ্ত, সুগভীর

পয়ঃপ্রণালীর শীর্ষভাগ দগ্ধমৃত্তিকার সুমসৃণ টালি অথবা প্রস্তরদ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত। পথচারী জনতার এবং ভারবাহী শকটের গমনাগমন-কালে আচ্ছাদন ভগ্ন হইত না। ঘন বর্ষার প্রবল বারিরাশি যখন নগরীপ্রান্তীয় বিপুল পয়ঃপ্রণালীতে সবেগে প্রবেশ করিত, তখন সমগ্র মোহেন্-জো-দড়োর অবাধে জলনির্গমনের বাধা হইত না; প্রশাখা ও শাখারূপী ক্ষুদ্র ও বৃহৎ জলনিকাশগুলিতে জল উপচাইয়া পড়িত না। উদ্গত ইষ্টকনির্মিত, চূণবালির 'পলস্তারা'-লিপ্ত খিলানের শ্রেণীসমূহ তাহাদের আচ্ছাদিত করিয়াছিল। স্থানবিশেষে প্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী এরূপ গভীর হইত যে, দীর্ঘদেহ সম্মার্জকগণ তন্মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া অনায়াসে কার্য্য করিতে পারিত।

৯ চিত্র—মৃৎশিল্প, মোহেন্-জো-দড়ো

অগ্নিদগ্ধ মৃৎপাত্র, মৃৎভাণ্ড, চুল্লী, ছাঁকনী, জলশোধনে ব্যবহৃত বহুচ্ছিদ্র মৃৎকুম্ভ প্রভৃতি গৃহস্থালী সামগ্রী। ঘনকৃষ্ণ, গাঢ়লোহিত অথবা শ্বেতবর্ণে সুরঞ্জিত, সুমসৃণ, সুচিক্কণ ও সুচিত্রিত পাত্র ও ভাণ্ডগুলির শিল্পনৈপুণ্য বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

১০ চিত্র—মূর্ত্তি ও কবচ, মোহেন্-জো-দড়ো

1 চিহ্নিত শৃঙ্গধারী মূর্ত্তি এবং 2 চিহ্নিত বানর দৈবশক্তির অধিকারী রূপে পূজা পাইত। 3 চিহ্নিত ধাতুময় রক্ষাকবচ পুরবাসিগণ বক্ষোদেশে ধারণ করিতেন।

১১ চিত্র—অলঙ্কার, মোহেন্-জো-দড়ো

সিন্ধুর গ্রাম ও নগরের গৃহে গৃহে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও ব্রোঞ্জের বহুবিধ অলঙ্কার রৌপ্য, তাম্র অথবা ব্রোঞ্জনির্ম্মিত পাত্রাধারের মধ্যে রক্ষিত করিয়া গৃহতলে প্রোথিত রাখার নিরাপদ প্রথা প্রচলিত ছিল। 6 চিহ্নিত কণ্ঠহারের সবুজনিভ পীতবর্ণের বকুলফলের অনুকৃতি সচ্ছিদ্র-মরকতমণিসমূহ সূক্ষ্ম স্বর্ণসূত্রে গ্রথিত। দুই-দুইটি মণির মধ্যে পাঁচ-পাঁচটি বকুল ফুলের সমতুল স্বর্ণচক্র সংযুক্ত। ঘননীল 'যশব' প্রস্তরের (নীলকান্তমণি) সাতটি কুণ্ডল কণ্ঠহারে দ্রষ্টব্য। মোহেন্-জো-দড়ো খননকালে একটি গৃহের ভিত্তির মধ্যে রৌপ্যাধারে রক্ষিত এই কণ্ঠহার আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আধুনিক মুক্তামালার মত 7 চিহ্নিত কণ্ঠমালাটি সচ্ছিদ্র-সুবর্ণগোলক এবং স্বর্ণসূত্রাবলম্বনে গ্রথিত।

কনক কঙ্কণ, কর্ণাভরণ (দুল), 'সম্বৃতাগ্রসূচী' (Safety Pin), 'কবরী-সম্বৃতকরী' সোনার কাঁটা (Hair Pin) এবং নীলকান্তমণিখচিত রৌপ্যাঙ্গুরী প্রভৃতিও চিত্রে দৃশ্যমান।

১২ চিত্র—বৈদিক যজ্ঞবেদী (শ্যেনচিতি)

সোমযাগের অন্তর্গত পশুযাগে উত্তর বেদীর উপরে একটি স্থণ্ডিল (যজ্ঞার্থ পরিষ্কৃত ভূমি) নির্ম্মাণ এবং তদুপরি আহবনীয় (হোম করিবার উপযোগী) কুণ্ড স্থাপনপূর্ব্বক উহাতে হোম অনুষ্ঠিত

হয়। স্থণ্ডিলের নির্মাণপদ্ধতি 'চয়ন' এবং নির্মিত স্থণ্ডিল 'চিতি' অভিধায় অভিহিত। চিতি দুই প্রকার: 'ক্ষুদ্র চিতি' এবং 'মহাগ্নি চিতি'। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ডে নির্মিত চিতির নাম ক্ষুদ্র চিতি এবং সহস্রসংখ্যক বৃহৎ ইষ্টকে নির্মিত চিতির নাম মহাগ্নি চিতি। উত্তরবেদীর উপরে মহাগ্নি চিতি নির্মাণ অসুবিধাজনক। সেইজন্য সাধারণতঃ ভূপৃষ্ঠেই উহা গঠিত হয়। বৈদিক গ্রন্থে বহুবিধ চিতি বর্ণিত আছে। তাহাদের মধ্যে 'অরুণ' (সূর্য্য), 'সুপর্ণ' (গরুড়) এবং 'শ্যেনচিতি' সুবিদিত।

শ্যেনচিতি-যজ্ঞবেদী—মহাব্যোমে প্রসারিত-পক্ষ উড্ডীয়মান শ্যেন (বাজ) পক্ষীর প্রতীক। তদুপরি হোমযাগের সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি এইরূপ: 'অধ্বর্য্যু' নামক ঋত্বিক্‌ সোমযাগের আহবনীয় কুণ্ড হইতে প্রজ্বলিত অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া বালুকাময় পাত্রে রক্ষা করিয়া চিতির পুচ্ছসমীপে গমনপূর্ব্বক 'প্রতিপ্রস্থাতা' নামক ঋত্বিকের করপুটে পাত্রটি স্থাপন করিবেন এবং স্বয়ং চিতির পার্শ্বদেশে আরোহণপূর্ব্বক প্রতিপ্রস্থাতার করপুট হইতে পুনঃ সেই অগ্নিপাত্রটি লইয়া চিতিমধ্যে অগ্ন্যাধান (বেদমন্ত্র পঠনান্তর অগ্নিহোত্রযাগ) করিবেন। তৎপরে তিনি চিতির উপরস্থ আহবনীয় কুণ্ডে সপ্তমরুৎ দেবতার উদ্দেশে হোম করিবেন এবং 'বৈশ্বানর যজ্ঞ' সমাপনান্তে কুণ্ডানলে 'বসুধারা'-ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন।

শ্যেনপক্ষী অন্তরীক্ষলোকের প্রতীক। শ্যেনচিতির উপরে অগ্ন্যাধান করার তাৎপর্য্য এই যে, অন্তরীক্ষলোকের প্রতীক শ্যেনপক্ষীর প্রতিভূ নচিতি বৈশ্বানর (অগ্নি) দ্বারা পরিব্যাপ্ত হউক। এই অগ্নিই মানবদেহে আত্মারূপে বিরাজমান, দ্যুলোকে সূর্য্যরূপে দ্যুতিমান এবং অন্তরীক্ষলোকে শ্যেনগতি অশনিরূপে ঝলকমান।

অগ্নিময় ব্রহ্মণ্যদেব—সৌরমণ্ডলের তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র তেজ, শক্তি, সৃজন, পালন ও সংহারের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। শরীরী-অশরীরী-পার্থিব-অপার্থিব সমগ্র জীবজগৎসহ অনন্তব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই সৃষ্ট। তদীয় মহিমাপ্রকাশের তথা তুষ্টিসাধনের উদ্দেশেই বেদের মন্ত্র বিরচিত হইয়াছে, অপিচ সৃজনের প্রতীক অরুণ (ব্রহ্মসূর্য্য) চিতি, পালনের প্রতীক সুপর্ণ (বিষ্ণু) চিতি এবং সংহারের প্রতীক শ্যেনচিতি প্রভৃতি বিবিধ চিতির মাধ্যমে অনুষ্ঠেয় বিবিধ যজ্ঞক্রিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে।

(চিত্রখানি পণ্ডিত এ. চিন্নস্বামী শাস্ত্রী-প্রণীত 'যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশ' গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অযোধ্যানাথ সান্যাল, ব্যাকরণাচার্য্য, যজ্ঞতত্ত্বপ্রসঙ্গে অনুশীলন করিতেছেন।)

১৩ চিত্র—বৈদিক গ্রাম

[লেখক কর্ত্তৃক পরিকল্পিত]

চিত্র পরিচয় ১১ হইতে ১২ এবং ১৭ হইতে ১৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

১৪ চিত্র—বৈদিক ব্রাহ্মণাবাস

[প্রাচীন বাস্তুশাস্ত্রের বিবৃতি অনুসারে লেখক কর্তৃক পরিকল্পিত]

প্রাচীন ব্রাহ্মণের ইষ্টক ও কাষ্ঠনির্ম্মিত আবাস (১৩ চিত্রে □ চিহ্নিত কুটীর দ্রষ্টব্য)। কুটীরের উত্তরভাগে—ছাদের উপর ধূম্রনির্গমনের ব্যবস্থাসহ—সমচতুর্ভুজ সমকোণী 'অগ্নিশালা'। এই 'চতুঃশালা' বাটিকার বিন্যাসপ্রণালী যুগে যুগে বিকশিত হইয়া বিশাল হিন্দু দেবায়তনে এবং বৌদ্ধ চৈত্যবিহারে ও চৈত্যমন্দিরে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। অগ্নিশালাটি গর্ভমন্দিরে, বৃক্ষকাণ্ডের স্তম্ভসমন্বিত মধ্যবর্ত্তী বৃহৎ কক্ষটি মন্দিরের সভামণ্ডপে, দক্ষিণভাগের শয়নকক্ষটি মন্দিরের মুখমণ্ডপে এবং চারিদিকের বারান্দাগুলি মন্দির-পরিক্রমার অলিন্দপথে পরিণত হইয়াছিল। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কার্লি চৈত্যমন্দিরের এবং সহস্র বৎসর প্রাচীন কৈলাস (এলোরা) মন্দিরের আসনবিন্যাসে—প্রাচীন ব্রাহ্মণাবাসের আদর্শ হয়ত অনুসৃত হইয়াছিল। কলিকাতার সান্নিধ্যে নির্ম্মিত বেলুড় (রামকৃষ্ণদেব) মন্দির বৈদিক ব্রাহ্মণের অনাড়ম্বর কুটীরেরই অধুনাতন যুগের উপযোগী অভিব্যক্তি বলিলে হয়ত ভুল হয় না।

১৫ চিত্র—সাঁচিফলকে গ্রামীয় স্থাপত্য, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক

জেতবনের আম্র ও চম্পককুঞ্জে অবস্থিত, অনাড়ম্বর স্থাপত্যশিল্পে অলঙ্কৃত—গন্ধকুটী, কোশাম্বকুটী এবং করোরিকুটী-নামক বুদ্ধদেবের সঙ্ঘের কার্য্যে উৎসর্গীকৃত কুটীরত্রয়। চিত্রের উপরিভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকা বাম পার্শ্বে যোড়করে দণ্ডায়মান, জেতবনের ভূতপূর্ব্ব অধিকারী, জেতের নিকট হইতে জেতবন ক্রয় করিয়া ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের কার্য্যে কুটীরগুলি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিজনবর্গ নিম্নে দৃশ্যমান। নিম্নভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে দৃশ্যমান চালা-কুটীরের সমতুল বহুসংখ্যক কুটীর বঙ্গদেশের এবং মালাবার প্রদেশের নানা স্থানে পরিদৃষ্ট হয়। মহাবলীপুরের একটি রথমন্দির উক্ত কুটীরের আদর্শে নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে অঙ্কনচিত্র কিরূপ উন্নত হইয়াছিল কুটীরের পারিপ্রেক্ষিক দৃশ্য হইতে তাহা প্রতীয়মান হয়।

১৬ চিত্র—যক্ষী, মৌর্য্য-শুঙ্গযুগ, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক

[আশুতোষ মিউজিয়ম]

বাঁকুড়া (পশ্চিমবঙ্গ) অঞ্চলীয় পোখড়নায় প্রাপ্ত পাষাণমূর্ত্তি।

১৭ চিত্র—বৈদিক আশ্রম

[পাঠাগার-প্রাচীরচিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সৌজন্যে মুদ্রিত।]

মহাপাদপমূলে বেদীচত্বরে উপবেশন করিয়া মহর্ষি শ্রুতি ব্যাখ্যা করিতেছেন। অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে উপবিষ্ট শিষ্যমণ্ডলী একাগ্রচিত্তে তাহা শ্রবণ করিতেছেন। বাম পার্শ্বে আশ্রম বালিকাগণ বৃক্ষরোপণে নিযুক্তা। পশ্চাতে মহর্ষির আশ্রমকুটীর। দক্ষিণে স্রোতস্বিনী।

১৮ চিত্র—সাঁচিফলকে রাজগৃহ

রথারূঢ় রাজগৃহাধিপতি অজাতশত্রু অমাত্য, পরিজন ও যন্ত্রিগণসহ উৎসবমণ্ডপে গমন করিতেছেন। কনক দর্পণ-করে রাজমহিষী, সখীগণসহ, বাতায়নের সম্মুখবর্ত্তী দারুময় 'ইন্দ্রকোষ' (বারান্দা) হইতে শোভাযাত্রা অবলোকন করিতেছেন।

রাজগৃহের দারুনির্ম্মিত বারান্দা অবশেষে রাজস্থানে 'ঝরোকা ও খাবার' গঠনশিল্পে বিকশিত হইয়াছে। রাজগৃহের খিলান-ছাদ নালন্দা, ভুবনেশ্বর ও গোয়ালিয়রে অনুসৃত হইয়াছে।

রাজগৃহের প্রস্তরখণ্ডাবৃত পথগুলি মোহেন্-জো-দড়ো এবং বারাণসীর তোরণদ্বার-সমন্বিত অপরিসর পথগুলির সদৃশ ছিল। বেণুবাদনরত নাগরিকবৃন্দের শিরোবেষ্টনী বস্ত্রগুচ্ছ (পাগড়ী) বৈদিক ভারতের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজনগণের পাগড়ীর অনুরূপ ছিল (১৩ চিত্র)। মগধের মহিষী ও সখীগণের ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলির অধিকাংশ রাজস্থানে অদ্যাপি অনুসৃত হইতেছে।

১৯ চিত্র—মনসা, খৃঃ একাদশ শতক

[আশুতোষ মিউজিয়ম]

উত্তর বাংলার দিনাজপুর অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্ত্তি মনসা।

২০ চিত্র—অশোক স্তম্ভ, সাঁচি, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক

[সাঁচি-স্তূপের বেদিকাগাত্রে খোদিত পাষাণফলকোৎকীর্ণ অশোক স্তম্ভের প্রতিকৃতি]

মেঘদূত মহাকাব্যে বর্ণিত—বেত্রবতী নদীতীরস্থ পূর্ব্ব-মালবের রাজধানী—বিদিশার (বেশনগর) উপকণ্ঠস্থিত অনুচ্চ শৈলোপরি (বর্ত্তমান সাঁচি, প্রাচীন 'কাকনায়') মহাসম্রাট্ অশোক স্তূপ এবং স্তূপের দক্ষিণ তোরণের পূর্ব্বপার্শ্বে বুদ্ধপ্রবর্ত্তিত 'ধর্ম্মচক্র'শীর্ষ সিংহস্তম্ভ (অশোকস্তম্ভ) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সাঁচিক্ষেত্রে একটি মহাবিহারও তিনি স্থাপিত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, বুদ্ধপূর্ব্বযুগে সাঁচি শৈলদেশে বৈদিক আর্য্যগণ যজ্ঞক্রিয়া সমাহিত তপা কুলপতি মহর্ষিগণের সমাধিস্তূপ প্রতিষ্ঠিত করিতেন। উক্ত সমাধিস্তূপের আদর্শে সাঁচিস্তূপ পরিকল্পিত হইয়াছিল।

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে খৃঃ একাদশ শতাব্দী অবধি বৌদ্ধ-সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ হইয়া সাঁচি ভারতীয় স্থাপত্য কলার উত্তরোত্তর বিকাশ সংসাধিত করিয়াছিল।

অশোক স্তম্ভ—মঙ্গলময় ব্রহ্মকমলের প্রতীক। মানসসরোবরের অমৃতপুষ্ট ব্রহ্মকমলের মৃণালপ্রতিম অশোক স্তম্ভের স্কন্ধ হইতে স্বর্গমুখে উত্থিত অস্ফুট কমল-কোরকত্রয় এবং মর্ত্ত্যমুখে অবনত স্তবকদলের কারুমণ্ডন সঙ্কেত করিতেছে যে, হিমালয়সঞ্জাত, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-সংযোজক, ব্রহ্মকমলের আদর্শে অশোক স্তম্ভ সৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ণপ্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমলের স্বরূপই প্রকটিত করিতেছে পদ্মপ্রতিম ধর্ম্মচক্র। পশুশক্তির প্রতিভূ পশুরাজের শিরে ধর্ম্মশক্তির মঙ্গলচক্র। পাশবিক-শক্তি-দলিত বাধ্যতা-মূলক দমন ও শাসনের পরিবর্ত্তে প্রেমধর্ম্মের মধুময় চক্রসঞ্চালনে সৃজন ও পোষণের নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিল অশোকীয় রাজনীতির অহিংস ধর্ম্মদণ্ড।

ধর্ম্মচক্রের পরিচয় বুদ্ধের উপদেশপূর্ণ 'ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন-সূত্র' নামক পালি গ্রন্থে পাওয়া যায়।

আগ্রা-বোম্বাই রেলপথের সাঁচি ষ্টেসন ভূপাল জংসনের দশ ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী।

২১ চিত্র—জরাসন্ধকা বৈঠক, রাজগৃহ, খৃঃ পূঃ ৮০০

২২ চিত্র—দক্ষিণ তোরণের অবশেষ, রাজগৃহ, খৃঃ পূঃ ৮০০

২৩ চিত্র—মনিয়ার মঠ, রাজগৃহ

২৪ চিত্র—সোণার ভাণ্ডার গুহা, রাজগৃহ

২৫ চিত্র—উদ্গাত ভাস্কর্য্য, মনিয়ার মঠ, রাজগৃহ

২৬ চিত্র—সাঁচিস্তূপ ও উত্তর তোরণ, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয়-প্রথম শতক

২৭ চিত্র—বুদ্ধগয়া মন্দিরের অনুকৃতি, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক

উরুবিল্ব অরণ্যে মহাবোধিপাদপমূলে যে স্থানে বুদ্ধদেব সম্বোধিলাভ করিয়াছিলেন মহাসম্রাট্ অশোক তদুপরি যে বজ্রসিংহাসন ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহার চিত্র ভরুৎস্তূপে খোদিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান চিত্রখানি ভরুৎস্তূপে খোদিত অশোকনির্ম্মিত বুদ্ধগয়া মন্দিরের অনুকৃতি।

২৮ চিত্র—হুবিষ্কনির্ম্মিত হার্ম্মিকাশীর্ষ মন্দির, বুদ্ধগয়া, খৃঃ পূঃ প্রথম শতক

২৯ চিত্র—খৃঃ পঞ্চদশ শতকে পুনর্নির্ম্মিত বুদ্ধগয়া মন্দির

৩০ চিত্র—তেলিকা মন্দির, গোয়ালিয়র, মধ্যভারত, খৃ. একাদশ শতক

৯৫০ হইতে ১০৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খাজুরাহো রাজ্যের চন্দেল নরপতিগণ প্রায় একবর্গ মাইল-পরিমিত ভূখণ্ডের উপর শৈব-, বৈষ্ণব- ও জৈন-পর্য্যায়ী কতিপয় সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন; গোয়ালিয়র দুর্গে বিদ্যমান তেলিকা মন্দির তাহাদের মধ্যে একটি।

৬০'×৪৬'×৮০' উচ্চ মন্দিরের নাগরশৈলী, অঙ্গবিন্যাস ও মনোরম আকৃতি সম্পূর্ণ অভিনব। সমগ্র ভারতে কেবলমাত্র ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের 'বৈতাল দেউল' (৯০০ খৃঃ) শিবমন্দির ইহার অনুরূপ। ৩০'×১৫' আয়ত গর্ভগৃহের চতুষ্প্রাচীর সরল অবক্রভাবে ৬০' উপরে 'স্কন্ধ' দেশ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে।

তদুপরি চৈত্য-খিলানাকার আচ্ছাদন। আচ্ছাদনের উভয় পার্শ্বে দ্বিসংখ্যক চৈত্য-বাতায়ন। মন্দিরের পুরোভাগসংলগ্ন, মন্দিরেরই অনুকৃতি, মুখমণ্ডপের প্রবেশপথাবলম্বনে গর্ভগৃহে যাওয়া যায়।

৩১ চিত্র—বেগুনিয়া মন্দির, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ ষষ্ঠদশ শতক

উৎকল প্রদেশীয় গুপ্ত-স্থাপত্যশৈলীর বঙ্গোপযোগী অভিব্যক্তি।

৩২ চিত্র—মদনমোহন মন্দির, বিষ্ণুপুর, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ সপ্তদশ শতক

প্রাচীন মল্লভূম রাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুরের মল্লরাজগণ বহু শতাব্দী যাবৎ বঙ্গের পশ্চিম সীমান্তে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের মদনগোপাল, মদনমোহন, জোড়বাংলা প্রভৃতি মন্দিরগুলি বঙ্গীয় স্থাপত্যের অপূর্ব্ব নিদর্শন। বিষ্ণুপুর প্রাচীনবঙ্গীয় শিল্প ও সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র ছিল।

৩৩ চিত্র—কান্তমন্দির, দিনাজপুর, উত্তরবঙ্গ, খৃঃ অষ্টাদশ শতক

কান্ত নগরে একটি বহু প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, একদা ইহা মহাভারতোক্ত মৎস্যরাজ বিরাটের দুর্গ ছিল। বিবিধ কারুকার্য্য এবং রামায়ণ ও মহাভারতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট ঘটনাবলী উৎকীর্ণ, অগ্নিদগ্ধ মৃত্তিকার সুদৃঢ় ফলকমণ্ডিত 'নবরত্ন' বিষ্ণুমন্দিরটি অতীব সুন্দর ছিল। অর্দ্ধ-শত বৎসর পূর্ব্বে, প্রবল ভূমিকম্পের ফলে, মন্দিরের শিখর ভূমিসাৎ হয়। তৎপরে মন্দিরের সংস্কার হয়। বর্ত্তমান চিত্রখানি প্রাচীন মন্দিরের।

৩৪ চিত্র—বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দির, গুপ্তিপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ অষ্টাদশ শতক

ত্রিবেণী ও নবদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী স্থানীয় গুপ্তিপাড়ায় একদা বহুসংখ্যক দেবায়তন বিরাজ করিত। তাহাদের মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র, কৃষ্ণচন্দ্র, রামচন্দ্র ও চৈতন্যদেবের মন্দিরগুলি দণ্ডায়মান আছে। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ কারুকলাভূষিত। রক্তবর্ণ ইষ্টকে নির্ম্মিত দেবালয়গাত্রে দেবদেবীর প্রাণবন্ত মূর্ত্তি, রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী ও প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আখ্যায়িকা উৎকীর্ণ আছে।

৩৫ চিত্র—ব্যাধরমণী, মহীশূর, খৃঃ দ্বাদশ শতক

চিত্র পরিচয় ২৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

৩৬ চিত্র—মহাযোগী, হড়প্পা

চিত্র পরিচয় ২৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

৩৭ চিত্র—গজলক্ষ্মী, ভরুৎ, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক

চিত্র পরিচয় ৩০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে।

৩৮ চিত্র—নারায়ণের অনন্তশয়ন, দেবগড় (মধ্যভারত), ৫০০ খৃঃ

গুপ্তমন্দির প্রবর্তনের প্রথম পর্বে ক্ষুদ্র চতুরস্র গর্ভগৃহোপরি শিখরবিহীন সমতল আচ্ছাদন এবং প্রবেশদ্বারের সম্মুখে একটি অনাড়ম্বর অলিন্দ (মুখমণ্ডপ) নির্মিত হইত। ক্রমশঃ সেই প্রথা বর্জন করিয়া গর্ভগৃহের শীর্ষভাগে আমলক- ও কলস-শোভিত বিমান এবং মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে সমতল আচ্ছাদনবিশিষ্ট চতুঃসংখ্যক অলিন্দ গঠিত হইয়াছিল।

দেবগড়ের বিষ্ণুমন্দির তদ্রূপ বিমানবিশিষ্ট, আমলক ও কলসশীর্ষ, গুপ্ত-দেবায়তনের উদাহরণ। প্রস্তরময় দেবদেউলের সর্ব্ব অঙ্গ, প্রবেশদ্বার এবং স্তম্ভসমূহ অনুপম দেবমূর্ত্তিশোভিত তথা কীর্ত্তিমুখ ও লতাপুষ্পের শ্রেষ্ঠ কারুমণ্ডিত। চিত্রে দৃশ্যমান নারায়ণের অনন্তশয়নের উদ্গত-ফলক অপূর্ব্ব সুন্দর ও মহিমাময়।

৩৯ চিত্র—নৃত্যোৎসব, অজণ্টার ১নং বিহারের প্রাচীরচিত্র, ৬০০ খৃঃ

দারুময় স্থাপত্যের বিচিত্র রাজপ্রাসাদ-সংলগ্ন প্রস্তরময় প্রাঙ্গণে উৎসব-উৎফুল্ল পুরনারীগণের হাস্য-লাস্য-ভরা আনন্দ নৃত্যের বহুবর্ণ চিত্র মহাযানীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতির অপূর্ব্ব অবদান। চিত্র হইতে প্রাচীন ভারতের পুরললনার বেশভূষা, আভরণ ও বাদ্যযন্ত্রের অভিজ্ঞান আহরিত হয়।

৪০ চিত্র—প্রাসাদজীবন, অজণ্টার ১নং বিহারের প্রাচীরচিত্র, ৬০০ খৃঃ

অজণ্টার ১নং গুহা-প্রাচীরগাত্রে উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত, মহাজনক জাতকে বর্ণিত, প্রাসাদ-জীবনের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। দারুময় স্তম্ভবিশিষ্ট বিচিত্র মণ্ডপমধ্যে সপ্তফণানাগচিহ্নিত পর্য্যঙ্কে উপবিষ্ট রাজা ও রাণীকে আবেষ্টন করিয়া চামরধারিণী ও করঙ্কবাহিনীসহ সখীবৃন্দের হর্ষোল্লাস এবং চিত্রের বাম প্রান্তে দণ্ডায়মান কঞ্চুকীর উৎফুল্ল আনন দ্রষ্টব্য। অজণ্টার ধ্যানসিদ্ধ সাধকশিল্পী অতিপ্রাকৃত অনুভূতিসম্পাতে তদীয় বহুবর্ণোজ্জ্বল চিত্রের মাধ্যমে ধর্ম্মপ্রাণ প্রাসাদজীবনের মহিমা প্রকটিত করিয়াছেন।

৪১ চিত্র—প্রাচীরচিত্র, কৈলবারা (রাজস্থান), খৃঃ উনবিংশ শতক

মেবার রাজধানী উদয়পুর হইতে আরাবল্লীর গিরিসঙ্কটপথে উত্তর-পশ্চিমে কুম্ভলগড় (কমলমীর) দুর্গ অভিমুখে গমনকালে, প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে, প্রসিদ্ধ কৈলবারা দুর্গনগরী অতিক্রম করিতে হয়। চিত্রে কৈলবারার একাংশে অবস্থিত একটি কৃষকের মৃন্ময় কুটীরগাত্রে অঙ্কিত গতিশীল অশ্ব ও হস্তীকে প্রাচীন ভারতীয় চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির পরম্পরাগত অভিব্যক্তিরূপে বিবেচিত করা যায়।

আলাউদ্দীনের কবল হইতে চিতোর-দুর্গরক্ষাকল্পে কৈলবারার রাজপুতসর্দার স্বীয় প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন। দুর্গের পাষাণ-প্রাকারপ্রান্তে যথায় তাঁহার পতন হইয়াছিল তথায় একটি প্রস্তরময় ছত্রী তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বহন করিয়া দণ্ডায়মান।

৪২ চিত্র—প্রাচীরচিত্র, রতনগড় (বীকানীর), খৃঃ ঊনবিংশ শতক

রাজস্থানীয় রতনগড় নগরীর শ্রেষ্ঠী মহল্লায় অবস্থিত একটি সৌধভবনের অন্দরমহলের প্রাচীরগাত্রে চিরাচরিত প্রথামত বিবিধ বর্ণে চিত্রিত রাজপুতজীবন-কাহিনীর বিশেষ পর্ব।

৪৩ চিত্র—যক্ষী, দিদারগঞ্জ, পাটলিপুত্র, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক

পাষাণময়ী চামরধারিণী যক্ষীর বলদৃপ্তা প্রতিমা মৌর্য্য ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যসমূহের অন্যতম।

৪৪ চিত্র—বুদ্ধ, সারনাথ, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক

বুদ্ধগয়ায় উরুবিল্ব অরণ্যের মহাবোধিপাদপমূলে সম্বোধিলাভের পরে সদ্ধর্ম প্রচারের উদ্দেশে বুদ্ধ বারাণসীতে গমন করেন। চিত্রে বারাণসীর প্রত্যন্তাঞ্চলীয় সারনাথের মৃগদাব অরণ্যে ধর্মপ্রচাররত তথাগতসমীপে তদীয় শিষ্যবৃন্দ ও শ্রোতৃমণ্ডলী দৃষ্ট হইতেছে।

৪৫ চিত্র—লিঙ্গরাজ মন্দির, ভুবনেশ্বর (উড়িষ্যা), ১০০০ খৃঃ

কেশরীবংশীয় প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি যযাতি কেশরী ভুবনেশ্বর তীর্থে শ্রীমন্দিরের 'বিমান' (মূল গর্ভমন্দির) নির্ম্মাণ সূচিত করাইয়াছিলেন। ললাটেন্দুকেশরীর রাজত্বকালে সেই 'বিমান'-সংলগ্ন জগমোহনমণ্ডপ স্থাপিত করা হয়। অতঃপর গঙ্গাবংশীয় নৃপতি নৃসিংহদেব মন্দিরসংশ্লিষ্ট নৃত্যমণ্ডপ এবং ভোগমণ্ডপ নির্ম্মিত করাইয়া দেন।

প্রস্তরময় দৃঢ় প্রাকারবেষ্টিত ৫২০' দীর্ঘ ও ৪৬৫' প্রস্থ প্রাঙ্গণমধ্যে ইতস্ততঃ বিদ্যমান দেবদেউলসহ ১৮০' উচ্চ 'রথপাগ' বিমান শোভিত—আমলক, কলস ও ত্রিশূলবিশিষ্ট—'স্বয়ম্ভু' মহালিঙ্গসমন্বিত বিপুল বিরাট্ পাষাণ দেবায়তন লিঙ্গরাজ সৌন্দর্য্যগাম্ভীর্য্যে অভূতপূর্ব্ব। অতুলনীয় তাহার লতামণ্ডনশিল্প তথা পার্ব্বতী ও কার্ত্তিকেয় প্রভৃতির উদ্গত ভাস্কর্য্য! গুপ্ত-স্থাপত্যশৈলীর পরম উৎকর্ষ হইয়াছিল ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ এবং কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরে।

পরশুরামেশ্বর (৭৫০ খৃঃ), বৈতাল দেউল (৯০০ খৃঃ), মুক্তেশ্বর (৯৭৫ খৃঃ), অনন্ত বাসুদেব (১১০০ খৃঃ) ও রাজারাণী (১২০০ খৃঃ) প্রভৃতি অনিন্দ্যসুন্দর দেবায়তনসমূহ ভুবনেশ্বরের আম্রকাননেই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল।

৪৬ চিত্র—কন্দর্য্য মহাদেব মন্দির, খাজুরাহো (মধ্যভারত), ১০০০ খৃঃ

প্রাচীন ভারতীয় বহু মন্দিরের মণ্ডপসমূহ মূল মন্দির হইতে বিচ্যুত এবং মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ

উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে মন্দিরসান্নিধ্যে গঠিত করা হইত। খৃঃ সপ্তম-অষ্টম শতকে নির্মিত মহাবলীপুরের রথমন্দির (৫৭ চিত্র) এবং ১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মুধেরার সূর্য্যমন্দির (৫৬ চিত্র) প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। অতঃপর মূল মন্দিরের সহিত মণ্ডপকে 'অন্তরাল' দ্বারা সংযুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়। কন্দর্য্যদেবের মূল গর্ভমন্দিরের সহিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শিখর কিরীটবিশিষ্ট সুন্দর সুন্দর মণ্ডপ, অর্দ্ধ-মণ্ডপ, অন্তরাল, অলিন্দ এবং পঞ্চসংখ্যক সুপরিসর ইন্দ্রকোষ (বারান্দা) অঙ্গাঙ্গিভাবে একত্র গ্রথিত হইয়াছে।

দেবায়তনের অভ্যন্তরভাগে আলোক আনয়নের নিমিত্ত সারি সারি বাতায়নের ব্যবস্থা এবং বৃষ্টিপ্রবেশ রুদ্ধ করিবার জন্য প্রসারিত 'ছাজা'র (cornice) প্রয়োগ কন্দর্য্য মন্দিরের গঠনে সম্পূর্ণ অভিনব। পরবর্ত্তী যুগে যুগে হিন্দু-যুবন তথা রাজস্থানী সৌধমন্দির-নির্মাণে উক্ত প্রকার বাতায়ন এবং 'ছাজা'র প্রয়োগ ব্যাপকভাবে অনুসৃত হইয়াছিল।

১৪' উচ্চ সুশোভন পাদপীঠের উপরে দণ্ডায়মান ১২০' উচ্চ শিখরসমন্বিত, ৬৫০ সংখ্যক সুঠাম সুন্দর প্রতিমাভূষিত নয়নাভিরাম দেবায়তনের গুপ্তপর্য্যায়ী স্থাপত্যশৈলী মধ্যযুগের রাজস্থানী মন্দিরস্থাপত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

৪৭ চিত্র—উদয়েশ্বর মন্দির, গোয়ালিয়র (মধ্যভারত), খৃঃ একাদশ শতক

সৌন্দর্য্যসুষমাপূর্ণ উদয়েশ্বর দেবদেউল ভারতের শ্রেষ্ঠ দেবায়তনসমূহের অন্যতম। তাহার সৌষ্ঠব, অঙ্গবিন্যাস এবং অনিন্দ্যসুন্দর রূপায়ণ স্থাপত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

মন্দিরের চন্দেল-গুপ্ত স্থাপত্যভঙ্গিমা পূর্ব্বোক্ত কন্দর্য্য মন্দিরশৈলীর অভিনব অভিব্যক্তি। পাদভাগের 'খুরপৃষ্ঠ' হইতে বিমানের 'স্কন্ধ' পর্য্যন্ত বিলম্বিত চতুঃসংখ্যক সুদীর্ঘ, সুচারু শিল্পখচিত, শিলাফলক (বরাণ্ডি) এবং পাদমূল হইতে শীর্ষদেশের আমলক পর্য্যন্ত লঘুবক্র, ঈষৎসূচল, সুডোল গঠন ভারতীয় মন্দিরসম্পৃক্ত বহুবিধ বিমানসমূহের মধ্যে বিচিত্র ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

কম্বোজীয় আঙ্করভাট (দ্বাদশ শতক) বিষ্ণুমন্দিরের গগনস্পর্শী বিমানের গঠন (৭২খ চিত্র) প্রাচীনতর উদয়েশ্বর বিষ্ণুমন্দিরের বিমানের গঠনের প্রায় অনুরূপ।

৪৮ চিত্র—উদয়েশ্বর মন্দিরের কারুকলা, খৃঃ একাদশ শতক

মন্দিরের বিমান হইতে উদ্গত, লতাপুষ্পমণ্ডিত, চৈত্যবাতায়নের শীর্ষভাগে মন্দিরের রক্ষক 'কীর্ত্তিমুখ', মধ্যভাগে শিবলীলা এবং নিম্নদেশে নারায়ণের সমভঙ্গ সৌম্যমূর্ত্তি উৎকীর্ণ।

৪৯ চিত্র—বৃহদীশ্বর (শিব) মন্দির, তাঞ্জোর (মাদ্রাজ), ১০০০ খৃঃ

ধর্মপরায়ণ চোল নরপতি রাজরাজদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৃহদীশ্বর দেবায়তন শক্তিমান্ চোল স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

১৮০'X ১৮০' চতুরস্র আসনের (পাদপীঠ) উপরে ২০০' উচ্চ স্তরবদ্ধ-ক্রমসূক্ষ্ম, বৃত্তাখ্যাত্মক, বিমানোপরি বিরাট্ স্তূপতুল্য মন্দিরশিখর গগনস্পর্শী যোগিরাজ মহাদেবের উদাত্ত গাম্ভীর্য্য প্রকটিত করিতেছে।

সাড়ম্বর শোভাযাত্রাসহ শিবক্ষেত্রে সমাগত ধর্ম্মপ্রাণ রাজর্ষির মন্দিরপ্রতিষ্ঠা-সম্পৃক্ত মহোৎসবের প্রাচীন চিত্রপট সাধনাসিদ্ধ শৈবশিল্পীর শ্রেষ্ঠ সৃজনী-প্রতিভার পরিচায়ক।

৫০ চিত্র—বিরূপাক্ষ মন্দির, পট্টদকল (বোম্বাই), ৭৪০ খৃঃ

খৃঃ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে বোম্বাই প্রদেশীয় ধারওয়ার বিভাগে প্রথম পর্য্যায়ী গুপ্তস্থাপত্য প্রচলিত ছিল। বিমানবিহীন দেবালয়সমূহের আচ্ছাদন হইত সমসাময়িক মধ্যভারতীয় গুপ্ত দেবায়তনের সমতল ছাদের সমতুল্য।

ষষ্ঠ শতকে বাদামি নগরের সপ্তক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী চালুক্য রাজধানী আইহোল মহানগরে, গুপ্ত-চালুক্য স্থাপত্যের আদর্শে, কলস-আমলকশীর্ষ অনুচ্চ বিমানসহ সুষ্ঠু দুর্গামন্দিরের প্রথম সৃষ্টি।

সপ্তম শতকে স্থানীয় চালুক্য স্থাপত্যশৈলীর পরবর্ত্তী বিকাশকালে উচ্চবিমান বিষ্ণুমন্দির পাপনাথ গঠিত হয়।

খৃঃ অষ্টম শতকে চালুক্যপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বাদামির পঞ্চক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ববর্ত্তী পট্টদকলে ত্রিশূল, কলস ও অনুচ্চ স্তূপপ্রতিম অনতি-উচ্চ শিখরবিশিষ্ট—হিমালয় পর্ব্বতের কৈলাসশৃঙ্গের অনুকৃতি—যে নয়নাভিরাম বিরূপাক্ষ (শিব)-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন তাহাকে গুপ্তসংস্কৃতি-প্রভাবিত চালুক্য স্থাপত্যের পরম পরিণতি বলা যায়। সুঠাম বিরূপাক্ষ দেবায়তনের আদর্শেই ইলাপুরী (এলোরা) ধামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৈলাসমন্দির সৃষ্ট হইয়াছিল এবং হিমালয়ের কৈলাসশৃঙ্গই কৈলাসমন্দিরের শিখর-পরিকল্পনায় প্রেরণা প্রদান করিয়াছিল, এইরূপ জনশ্রুতি বিদ্যমান আছে।

৫১ চিত্র—হয়শালেশ্বর মন্দির, হালবিদ (মহীশূর), খৃঃ দ্বাদশ শতক

খৃঃ ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত চালুক্যরাষ্ট্র দক্ষিণ ভারত শাসন করিয়াছিল। ষষ্ঠ শতকের প্রারম্ভেই কিন্তু ধারওয়ারে চালুক্যস্থাপত্যের উন্মেষ হইয়াছিল। সপ্তম-অষ্টম শতকে উত্তরভারতীয় গুপ্ত এবং দক্ষিণভারতীয় পহ্লবস্থাপত্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অবদানপুষ্ট চালুক্যস্থাপত্যের সুশোভন বিকাশ এবং দশম শতকাবধি দাক্ষিণাত্যে তাহার প্রবর্দ্ধমান প্রসার। তৎপরে হয়শালা রাষ্ট্রের জৈন নরপতিগণ চালুক্যশক্তিকে ক্রমশঃ নিস্তেজ করিয়া, একাদশ হইতে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে, স্থানীয় পরম্পরাগত মহীশূরী (জৈন) শিল্পিসঙ্ঘের উদ্যোগে চালুক্যসংস্কৃতি-প্রভাবিত নববিকশিত হয়শালা-স্থাপত্যে বহুসংখ্যক দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত করেন।

হয়শালা মন্দিরের আসনবিন্যাস ভারতের অন্যান্য মন্দিরের আসন হইতে স্বতন্ত্র ছিল। মূল মন্দিরের পাদপীঠ (আসন) হইত নক্ষত্রের অনুকৃতি; শিখরও নক্ষত্রাকার হইত। সু-উচ্চ বেদীপীঠে দণ্ডায়মান দেবায়তনের অভ্যন্তরে প্রদক্ষিণ-পথ থাকিত না। দেবায়তনের বহির্ভাগে, চতুষ্পার্শ্বেই, বিবিধ দেবদেবীর প্রতিমা সন্নিবেশিত হইত। লতামণ্ডন-বিভূষিত বিচিত্র তোরণসদৃশ উদাত্ত-ইন্দ্রকোষের অর্থাৎ কুলুঙ্গীর মধ্যে সুঠাম সুভঙ্গিম প্রতিমাসমূহ—রসগ্রাহী দর্শকবৃন্দের চিত্তমুকুরে মহীশূরের চন্দনকাষ্ঠ অথবা ত্রিবাঙ্কুরের হস্তিদন্ত-খোদিত, অতি সূক্ষ্ম, সুকুমার মূর্ত্তিশিল্প তথা শ্রেষ্ঠ মণিকারের সুনিপুণ হস্তসম্ভূত সুচারু অলঙ্কারের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত করে (৩৫ ও ৩৪ চিত্র)।

চিত্রে মন্দিরের প্রধান প্রবেশদ্বারসহ পুরোভাগের নিম্নাংশ (মণ্ডোবর) পরিলক্ষিত হইতেছে। নক্ষত্রসদৃশ আমলকশিলা-শোভিত, সুবর্ণকলসশীর্ষ, চতুরস্র, উন্নত বিমান ভূমিসাৎ হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও সমগ্র মন্দিরের হয়শালা (জৈন)-স্থাপত্য কিরূপ আকর্ষণীয় ছিল বর্ত্তমান অঙ্গহীন দেবায়তনের অতুলনীয় 'মণ্ডোবর' হইতেই তাহা অনুমান করা যায়।

হয়শালা নরপতির হয়শালেশ্বর-দেবদেউল-কেন্দ্রী বিশাল রাজধানী দ্বারসমুদ্রের ভগ্নাবশেষ মহীশূর হইতে পঞ্চবিংশতি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। মৌনমহিম প্রকৃতিরাণীর মনোরম আবেষ্টনে বিরাজমান—একদা প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পদসমৃদ্ধ দ্বারসমুদ্রের বর্ত্তমান শোচনীয় পরিণাম এবং দ্বারসমুদ্র নামধেয় অধুনাতন নগণ্য গ্রামপল্লীর শ্রীহীন কলেবর অতীব মর্ম্মন্তুদ।

৫২ চিত্র—রাধাকৃষ্ণ ও ভবানী মন্দির, ভাটগাঁও (নেপাল), খৃঃ ষষ্ঠদশ শতক

অভিরাম স্থাপত্যশিল্পের আভিজাত্যগরিমাদীপ্ত বিশাল মহানগরীপ্রান্তে শান্তিময় সৌন্দর্য্যময় পরিবেশে বিরাজমান—চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে দৃশ্যমান—রাধাকৃষ্ণ মন্দির উত্তরভারতীয় গুপ্তস্থাপত্যের নাগর-শিখর-শৈলীর আদর্শে গঠিত। মধ্যভাগে বিচিত্র ভবানী মন্দির; তাহার রূপায়ণে চীনদেশীয় 'প্যাগোডা'-মন্দিরের ঋজু (অবক্র) গঠন প্রতিভাত হইয়াছে।

মেবারের পতন হইলে মহারাজকুমার কর্ণসিংহ বহুসংখ্যক মেবারী পরিজন, অমাত্য, সৈন্যসামন্ত ও শিল্পিসহ নেপালে অভিযান করিয়া একটি নূতন রাষ্ট্রের তথা প্রখ্যাত 'নেবার' শিল্পের প্রবর্ত্তন করেন। রাজোয়াড়া সংস্কৃতিসম্ভূত নয়নশোভন স্থাপত্যের সহিত গুপ্ত-পাল শিল্পসংস্কৃতি এবং ব্রহ্ম-চীন-প্রভাবিত-নেপাল-জাত তক্ষণশিল্পের সুসমঞ্জস সমন্বয়ে যে শ্রেষ্ঠ 'নেবার' স্থাপত্য ও রূপকর্ম্ম উদ্ভূত হইয়াছিল মধ্যযুগের অলঙ্কারবহুল নেপালী স্থাপত্য ও তক্ষণশিল্প, চিত্রকলা ও ধাতুময় ভাস্কর্য্য তাহার উদাহরণ।

উত্তর-পূর্ব্ব হিমালয়সঞ্জাত নেপালী স্থাপত্যের গঠনে দক্ষিণ-পশ্চিম-ভারতীয় অরণ্যানীসম্ভূত কানাড়ী এবং মালাবারী দারুময় স্থাপত্যের বিস্ময়প্রদ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

৫৩ চিত্র—শঙ্করাচার্য্য মন্দির, শ্রীনগর (কাশ্মীর), খৃঃ অষ্টম শতক

গুপ্তরাষ্ট্রের অবসানকালে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্যের উদ্যোগে, কাশ্মীর রাজ্যে, উত্তরভারতীয় গুপ্তস্থাপত্য বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল। সু-উচ্চ শৈলশিখরে তৎপ্রতিষ্ঠিত শঙ্করাচার্য্য মন্দির বেদান্ত-ভাষ্যকারের আত্মকেন্দ্রিক সমাধিস্থভাব প্রকটিত করিতেছে।

বৃষস্কন্ধ শিবমন্দিরের স্তূপপ্রতিম কলেবর নিম্নভূমি শ্রীনগর উপত্যকার বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়।

৫৪ চিত্র—চতুর্ভুজ মন্দির, ওর্চ্ছা (মধ্যভারত), ১৬০০ খৃঃ

বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল রাজধানী ওর্চ্ছা নগরীর, নরপতি বীরসিংহ দেও-নির্ম্মিত, অতিকায় প্রাসাদসৌধ—স্বচ্ছসলিলা সর্পিল উপনদী বেত্রবতীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। খরস্রোতার পশ্চিম তীরে, রাজপ্রাসাদের সম্মুখ সান্নিধ্যে, বিপুলায়তন চতুর্ভুজ মন্দিরের চন্দেল-গুপ্ত স্থাপত্যশৈলী তথা গঠন-প্রণালী বিস্ময়জনক ও বৈশিষ্ট্যমূলক।

ঝাঁসী মহানগরীর দক্ষিণপ্রান্তস্থ, প্রাতঃস্মরণীয়া 'ঝাঁসীর রাণী' লক্ষ্মীবাঈ-ব্যবহৃত, প্রসিদ্ধ গিরিদুর্গ হইতে পঞ্চক্রোশ দূরে সমতল বিন্ধ্য উপত্যকায় ওর্চ্ছা অবস্থিত।

৫৫ চিত্র—সূর্য্যমন্দির, কোণার্ক (উড়িষ্যা), ১২৫০ খৃঃ

গঙ্গাবংশীয় উৎকলনৃপতি প্রথম নৃসিংহদেব-প্রতিষ্ঠিত, সূর্য্যরথের প্রতীক, মূলমন্দিরের উপরিভাগ ভূমিসাৎ হইয়াছে। চিত্রে মূল সূর্য্যমন্দির-সংলগ্ন ১০০'×১০০'×১০০' মুখমণ্ডপ (জগমোহন) দৃশ্যমান।

৮৭৫'×৫৪০' প্রাঙ্গণমধ্যে প্রস্তরময় প্রাকার এবং ত্রিসংখ্যক তোরণদ্বার পরিবেষ্টিত, চতুর্বিংশতি-সংখ্যক প্রস্তর-খোদিত ৩০' পরিধিবিশিষ্ট রথচক্র-সমন্বিত, সপ্তসংখ্যক শক্তিমন্ত অশ্ব-সংযোজিত, ২২৭' উচ্চ সূর্য্যমন্দিরের রথাকৃতিগঠন ও অপূর্ব্ব শিল্পায়ন অতুলনীয় ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। বিমানবিহীন শ্রীমন্দিরের বর্ত্তমান যুগে বিদ্যমান বলিষ্ঠ-কারুসমৃদ্ধ নিম্নাংশ অর্থাৎ পাদভাগ ব্যতীত জগমোহনমণ্ডপ, বিরাট্ রথচক্র এবং ভগ্ন প্রস্তরাশ্ব কিংবদন্তীর সত্যতার সমর্থন করে। অভগ্ন পাদপীঠ ও জঙ্ঘার উচ্চতার অনুপাতের হিসাবে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কোণার্কের উচ্চতা ছিল ২২৭'। এতদ্বিষয়ে স্বর্গীয় মনমোহন গাঙ্গুলী-সঙ্কলিত মৌলিক গ্রন্থ *Orissa and Her Remains* বহুসংখ্যক চিত্রসহ বহুবিধ তথ্য ও যুক্তি প্রদান করিয়াছে। অধ্যাপক নির্ম্মলকুমার বসু-প্রণীত *Canons of Orissan Architecture* ও পঠিতব্য।

পুরীধামের দশ ক্রোশ ঈশানকোণে, ভারত মহাসমুদ্রের প্রসারিত বেলাভূমির উপরে, বিরাট্ সূর্য্যমন্দিরের বিশাল ভগ্নস্তূপ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

৫৬ চিত্র—সূর্য্যমন্দির, মুধেরা (উত্তর গুজরাট), ১০২৭ খৃঃ

১০২৫ খৃষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মামুদ প্রভাসপত্তনস্থিত প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও বিধ্বংস করিবার দুই বৎসর পরে উত্তর গুর্জ্জরের সোলাঙ্কিরাজ প্রথম ভীমদেব মুধেরায় সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। ১২৯৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জী গুর্জ্জর অধিকার করিবার পূর্ব্বে নববিকশিত জৈনস্থাপত্যে সোমনাথ পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৎকালে সোলাঙ্কি রাজধানী অনহিলবর পত্তন (পাটন) বহির্ভারতের সহিত ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রান্ত বিশিষ্ট কেন্দ্রসমূহের অন্যতম ছিল।

পত্তনের নয় ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে, বর্ত্তমান আহমেদাবাদ মহানগরীর ত্রিশ ক্রোশ উত্তরে, সূর্য্যমন্দিরের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। মন্দিরের উপরিভাগ বিনষ্ট হইয়াছে। গর্ভগৃহের বিগ্রহশূন্য, ভগ্ন, বেদীগাত্রে সপ্তাশ্ব উৎকীর্ণ। শিখরহীন দেবায়তনের আসন (ভিত্তি) ৮০′×৫০′। তাহার পূর্ব্ব পার্শ্ব (পুরোভাগ) হইতে, অতি সুন্দর স্তম্ভশোভিত অলিন্দ অতিক্রম করিয়া, ২৫′×২৫′ 'গূঢ়মণ্ডপ' এবং তৎপরে 'গর্ভগৃহে' যাওয়া যায়। চতুরস্র গর্ভগৃহের চতুষ্পার্শ্ব-সংলগ্ন প্রদক্ষিণপথ বর্ত্তমান।

অনুপম ভাস্কর্য্যমণ্ডিত সুষমাময় সূর্য্যমন্দিরের সুঠাম আকৃতি ছিল ত্রিধা বিভক্ত—পীঠ (আসনভিত্তি), মণ্ডোবর (শিল্পফলক-খচিত প্রাচীরাবরণ) এবং স্বর্ণকলসশীর্ষ উন্নত বিমান।

শ্রীমন্দিরের সম্মুখ সান্নিধ্যে, মাত্র দুই গজ ব্যবধানে, বিংশতিসংখ্যক সুদৃশ্য স্তম্ভ এবং চতুঃসংখ্যক সুরম্য তোরণবিশিষ্ট বিচিত্র সভামণ্ডপ। মন্দিরবিচ্যুত সেই সভামণ্ডপের অপর পার্শ্বস্থিত, অমূল্য কারুকলাসমৃদ্ধ কীর্ত্তিতোরণের মধ্যপথাবলম্বনে প্রস্তরময় সোপানশ্রেণী লঙ্ঘনান্তে ১৭৬′×১২০′ 'সূর্য্যকুণ্ড' সরোবরে অবতরণ করিতে হয়।

কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বস্থিত কতিপয় সোপানচত্বরে কয়টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবগৃহ বিগ্রহসহ বিদ্যমান আছে। বিষ্ণু এবং শীতলা মন্দিরদ্বয়ের গঠন অপূর্ব্বশোভন। সেই জলকুণ্ডমধ্যে সোমদেব চন্দ্রের একটি সুন্দর বিগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভারতবর্ষের অন্যত্র এতাদৃশ চন্দ্রমূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না।

নিস্তরঙ্গ সাগরসৈকতে সন্ধ্যারাণীর অবতরণের পূর্ব্বে গুর্জ্জরের দিগন্তপ্রসারিত সমতল ভূভাগ স্বর্ণাভ কিরণে অনুরঞ্জিত করিয়া মরীচিমালী যখন অস্তাচলে গমন করিতেন—প্রসারিত সভামণ্ডপের পাষাণকুট্টিমে পদ্মাসনে উপবিষ্ট অহিংসরুচি জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্রসূরি শিষ্যপ্রশিষ্যসহ তখন ধর্মসূত্র শাস্ত্রালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। কভু বা মণ্ডপে সুখাসনে উপবিষ্ট সত্যান্বেষী শিষ্যগণ মহাব্রতি (আচার্য্য) কণ্ঠনিঃসৃত আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব একাগ্রচিত্তে শ্রবণান্তে স্ব স্ব অতীন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে মননজ্ঞান-সম্পৃক্ত ন্যায়দর্শনের ধ্যানধারণা করিতেন। পূর্ণপ্রস্ফুটিত স্থাপত্যকমলে সন্নিবেশিত

পেলব প্রতিমার ভাস্কর্য্যনিচয়—অপরা প্রকৃতির আনন্দময় আবেষ্টনে—ধর্ম্মসূত্রের ব্যাখ্যায় মন্ত্রের অনুষ্টুপ্ ছন্দের সমতানে, আরণ্যকসংহিতায় সামমন্ত্র প্রতিঘোষিত করিয়া সূর্য্যদেবায়তনের শান্তিনিকেতন মধুময় প্রেমময় করিত।....শমন্বিত সূর্য্যমন্দিরের বর্ত্তমান সূর্য্যহীন মাধুর্য্যহীন পরিবেশ হতশ্রী হয়শালেশ্বর ও কোণার্ক মন্দিরের মত হৃদয়বিদারক।

চিত্রের মধ্যভাগে সভামণ্ডপ এবং বাম পার্শ্বে মূলমন্দিরের পুরোভাগের কিয়দংশ দৃশ্যমান। দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান তোরণস্তম্ভদ্বয়ের দক্ষিণ-নিম্নে সূর্য্যকুণ্ড অবস্থিত; চিত্রে দৃষ্ট হয় না।

৫৭ চিত্র—রথমন্দির, মহাবলীপুর (মাদ্রাজ), ৭০০ খৃঃ

পহ্লব (খৃঃ ৬০০-৯০০), চোল (৯০০-১১৫০), পাণ্ড্য (১১০০-১৩৫০), বিজয়নগর (১৩৫০-১৫৬৫) এবং মাদুরার নায়ক (১৬০০-১৭০০) রাজন্যবর্গের পোষকতায় দ্রাবিড়স্থাপত্য, সহস্র বৎসরকাল নব নব ভাবে বিকশিত হইয়াছিল। পহ্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্ম্মণ (৬১০-৬৪০) তদীয় কাঞ্চীরাজ্যের অন্তর্গত একটি অনুচ্চ শৈলগাত্রে অনাড়ম্বর স্তম্ভ ও মণ্ডপবিশিষ্ট সর্ব্বপ্রথম গুহাচৈত্য খোদিত করাইয়াছিলেন সদ্যঃ-উন্মেষিত পহ্লবস্থাপত্যে। তৎপরে নরপতি রাজসিংহের শাসনকালে মহাবলীপুরে, অনুচ্চ শৈলখোদিত—পহ্লব রাজসম্ভ্রমের প্রতীক সিংহচিহ্নিত—পহ্লবীয় রথমন্দিরের উদ্ভব। সেই রথমন্দিরে গুপ্ত স্থাপত্যশৈলীর প্রভাব অনুভূত হইয়াছে।

চিত্রে রাজসিংহ-প্রবর্ত্তিত 'রাজসিংহ'-পর্য্যায়ী সেই গুপ্ত-পহ্লবীয় রথমন্দির এবং মন্দিরের প্রাকারচুম্বী ভারতমহাসাগর দৃশ্যমান।

প্রস্তরময় প্রাকার ও সিংহতোরণ-পরিবেষ্টিত প্রসারিত অঙ্গনমধ্যে সপ্তস্তরী—চতুরস্র ও ক্রমসূক্ষ্ম—বিমানোপরি স্তূপসদৃশ-কলসশীর্ষ শক্তিমান্ শিবায়তন। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে—মন্দির হইতে বিচ্যুত—তাহারই অনুকৃতি সভামণ্ডপ। মণ্ডপের আচ্ছাদন ধারণ করিতে মণ্ডপের প্রাচীরমধ্যে কয়েকসংখ্যক সিংহস্তম্ভ বিন্যস্ত হইয়াছে।

মহাবলীপুর তৎকালে দক্ষিণ ভারতের সমৃদ্ধিপূর্ণ বন্দর-নগরীসমূহের অন্যতম ছিল।

৫৮ চিত্র—১৯নং গুহাচৈত্য, অজন্টা, খৃঃ ষষ্ঠ শতক

খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক হইতে খৃঃ পূঃ প্রথম শতক পর্য্যন্ত পূর্ব্ব ও মধ্যভারতে যখন গয়া, সারনাথ, সাঁচি ও ভরুতের গুহাচৈত্য, স্তূপ ও স্তম্ভ নির্ম্মিত হইতেছিল ভারতের অন্যত্র, বিশেষতঃ পশ্চিমঘাট পর্ব্বতগাত্রে, তখন বহুসংখ্যক হীনযানীয় চৈত্যমন্দির ও বিহার খোদিত হয়। খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতকে, বিহার প্রদেশীয় বরাবর শৈলগাত্রে 'লোমশ ঋষি' ও 'সুদামা' গুহাচৈত্যদ্বয়ের নির্ম্মাণে, হীনযানীয় চৈত্যমন্দিরের সূচনা। খৃঃ দ্বিতীয় শতকাবধি তাহার ক্রমবিকাশ। ভুবনেশ্বর অঞ্চলীয় উদয়গিরি ও

খণ্ডগিরির 'বাঘগুম্ফা' এবং 'রাণীগুম্ফা' খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে খোদিত। সেই সময়েই বর্তমান পুণার নিকটবর্তী পশ্চিমঘাট শৈলে কার্লিগুহায় প্রসিদ্ধ চৈত্যমন্দির খোদিত হয়। কার্লি মন্দিরের স্থাপত্যেই হীনযানীয় শিল্পসংস্কৃতির চরম অভিব্যক্তি। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগে আলোক আনয়নের জন্য তাহার প্রবেশপথের উপরে একটি সুবৃহৎ চৈত্যবাতায়ন খোদিত হইয়াছিল। পূর্ত্তবিজ্ঞানের বিকাশনে বিশিষ্ট অবদান কার্লির ওই চৈত্যবাতায়ন।

কার্লি, ভাজা, কোণ্ডেন, জুনার ও কাহেরী গুহায় এবং অজণ্টার ১০নং গুহায় বিবিধ বৌদ্ধমন্দিরসমূহ খোদিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন বাদামি, নাসিক, অজণ্টা, এলোরা এবং এলিফান্টা—বিষ্ণু, নটরাজ, ধর্ম্মরাজ, ইন্দ্রসভা, জগন্নাথ সভা, রামেশ্বর, দশ-অবতার ও ত্রিমূর্ত্তি প্রভৃতি হিন্দু ও জৈন-বিগ্রহ ও প্রতিমাসমন্বিত—বিবিধ গুহামন্দিরের প্রবর্ত্তন করে। ৪৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অজণ্টা, এলোরা (ইলাপুরী) ও ঔরঙ্গাবাদে (ইলাপুরী অঞ্চলীয়) মহাযানীয় চৈত্যস্থাপত্য ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছিল।

নাগপুর-বোম্বাই রেলপথের জলগাঁও ষ্টেসনের দক্ষিণ-পূর্ব্বে ৩৬ মাইল দূরে অজণ্টার গুহাগুলি অবস্থিত। সর্পিল অজণ্টা শৈলমালার সু-বক্র ক্রোড়ে যেখানে বাঘোরা নদী অর্দ্ধবৃত্তাকারে প্রবহমাণা তথাকার দীর্ঘবক্র নদীতটের দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রান্তস্থ, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দীর্ঘ, ধনুরাকৃতি পর্ব্বতগাত্রে প্রায় অষ্টশত বৎসরকাল ব্যাপিয়া ৪ সংখ্যক চৈত্যমন্দির এবং ২৪ সংখ্যক বিহার খোদিত হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক হইতে দ্বিতীয় খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২ ও ৩ সংখ্যক হীনযানীয় চৈত্য ও বিহার এবং ৪৫০ হইতে ৬৪২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২ ও ২১ সংখ্যক মহাযানীয় চৈত্য ও বিহার গঠিত হয়। ৬৪২ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীরাজ্যের পহ্লবপতি নরসিংহবর্ম্মণ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করিয়া অজণ্টার স্থপতি ও শিল্পিগণকে কাঞ্চীরাজ্যের মহাবলীপুরে এবং অন্যত্র লইয়া যান। তাহার ফলে অজণ্টার চৈত্য ও বিহার নির্ম্মাণ চিরতরে বন্ধ হইয়া যায়।

অজণ্টার ২৮ সংখ্যক শিল্পশালার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থাপত্যভাণ্ডার ১৯নং গুহাসংশ্লিষ্ট চৈত্যমন্দিরেই মহাযানীয় স্থাপত্যশৈলীর শ্রেষ্ঠ বিকাশ। চিত্রে উক্ত গুহার পুরোভাগস্থ বৃহৎ চৈত্যবাতায়ননিম্নে সুশোভন অলিন্দের সমতল আচ্ছাদন এবং আচ্ছাদনধারী সুঠাম সুন্দর স্তম্ভদ্বয় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বর্ত্তমান বিংশ শতাব্দীর প্রাসাদসৌধ-গঠনে উক্ত অলিন্দ 'গাড়ি বারান্দা'য় রূপান্তরিত হইয়াছে। বিপুল চৈত্যবাতায়নের মাধ্যমে মন্দিরমধ্যে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে। গুহার সম্মুখভাগ ৩২′ দীর্ঘ ও ৩৮′ উচ্চ। ৪৬′×২৪′ গুহাকক্ষের পশ্চাৎপ্রান্তে সমভঙ্গ-দণ্ডায়মান-বুদ্ধমূর্ত্তি-উৎকীর্ণ, ত্রয়-ছত্র-শীর্ষ, একটি মনোহর স্তূপিকা। কক্ষের উভয় পার্শ্বসংলগ্ন পরিক্রম-পথের ও কক্ষমধ্যস্থ উপাসনা-কুট্টিমের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভসমূহ। প্রত্যেক স্তম্ভ ১১′ উচ্চ। উহাদের উপরিভাগে উদ্গত শিল্পশোভিত ৫′ উচ্চ প্রস্তরফলকের সারি। কক্ষের ঊর্দ্ধদেশে

অর্দ্ধবৃত্তাকার, প্রস্তরময়, খিলানশিরের উপরে অর্দ্ধচন্দ্রসদৃশ শিলাচ্ছাদন। পদ্মপুষ্প এবং গন্ধর্ব-কিন্নর-পরিবৃত, বিমানচারী গন্ধর্ব-সেবিত, বুদ্ধ ও বোধিসত্বগণের লীলাচিত্র কক্ষগাত্রে এবং গুহার পুরোভাগে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। বাতায়নপ্রক্ষিপ্ত তরল আলোকতরঙ্গ মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিল্পচক্রে, বুদ্ধ-মূর্ত্তি-উন্নত ভূমিকাগাত্রে, প্রশান্ত: পুলকের পেলব প্রলেপ অনুলিপ্ত করিয়া দেয়।

অজন্টার ১, ২, ১০, ১৬ ও ১৭নং গুহার অভ্যন্তরে বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণে জাতক-কাহিনী চিত্রিত (৩৯ ও ৪০ চিত্র)। ২৬নং গুহার ভূমিকা এবং বুদ্ধজীবনীর ভাস্কর্য্য-ফলকশীর্ষ স্তম্ভশ্রেণী সুচারু স্থাপত্যভূষিত।

৫৯ চিত্র—কৈলাস মন্দিরের বিন্যাসচিত্র, ইলাপুরী (এলোরা), খৃঃ অষ্টম-নবম শতক

অঙ্কনচিত্রের মধ্যভাগে দুইটি সেতুদ্বারা সংযুক্ত মূলমন্দির, নন্দীমণ্ডপ ও প্রবেশ-প্রকোষ্ঠ; মন্দিরের তিন পার্শ্বে উন্মুক্ত প্রশস্ত অঙ্গন অর্থাৎ পথ। সেই পথসংলগ্ন পর্ব্বতগাত্রে খোদিত গুহামন্দির ব্যতীত সারিবদ্ধ স্তম্ভবিশিষ্ট, সুদীর্ঘ একতল ও দ্বিতল বারান্দা।

৫৯ক চিত্র—কৈলাস মন্দির, ইলাপুরী (এলোরা), খৃঃ অষ্টম-নবম শতক

নাগপুর-বোম্বাই রেলপথের মানমাদ ষ্টেসন হইতে ৪০ মাইল দূরে কৈলাসমন্দির অবস্থিত।

অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে রাষ্ট্রকূটপতি প্রথম কৃষ্ণদেব দাক্ষিণাত্যে একটি ঢালু উপত্যকা খনিত করিয়া কৈলাস মন্দিরের নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। 'গ্রানাইট' প্রস্তরময় ঢালু উপত্যকার উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ৩০০' এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় ১৭৫' স্থানের উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমার অন্তঃভাগ-সংলগ্ন প্রায় ৩২' প্রস্থ ও ১০০' গভীর খাত খননান্তে, মধ্যবর্ত্তী-অখণ্ডিত-অংশের উত্তর ভাগে ১৬৪' দীর্ঘ, ১১০' প্রস্থ ও ৯৬' উচ্চ দ্বিতল শিবায়তন খোদিত হয়। সেই অখণ্ডিত অংশের দক্ষিণ ভাগেও একটি ৪০'×৪০' চতুরস্র দ্বিতল নন্দীমণ্ডপ, একটি ৮০'×৪০' একতল প্রবেশ-প্রকোষ্ঠ এবং নন্দীমণ্ডপের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে দুইটি ত্রিশূলশীর্ষ—৫১' উচ্চ—ধ্বজস্তম্ভ খোদিত হয় (৫৯ চিত্র)।

মূলমন্দির, নন্দীমণ্ডপ, প্রবেশ-প্রকোষ্ঠ এবং ধ্বজস্তম্ভদ্বয় পরস্পর-বিচ্যুত; দুইটি ২০' দীর্ঘ ও ১৮' প্রস্থ প্রস্তরময় সেতু যথাক্রমে প্রবেশ-প্রকোষ্ঠের ছাদ ও নন্দীমণ্ডপের দ্বিতল ভাগ এবং নন্দীমণ্ডপের দ্বিতল ভাগ ও মূল মন্দিরের দ্বিতল অংশ সংযুক্ত করিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখ (দক্ষিণ) ভাগের উভয় প্রান্তে, নিম্নভূমি হইতে দ্বিতলস্থ মুখমণ্ডপে আরোহণ করিবার জন্য, দুই প্রস্থ সোপান পথ আছে।

৫৯ক চিত্রের বাম হইতে দক্ষিণে—যথাক্রমে একতল প্রবেশ-প্রকোষ্ঠের উত্তর-পূর্ব্ব কোণাংশ, প্রথম সেতু, দ্বিতল নন্দীমণ্ডপ, দ্বিতীয় সেতু এবং তৎপরে স্তূপসদৃশ-শিখরশীর্ষ দ্বিতল শিব মন্দিরের

পূর্ব্ব পার্শ্ব দৃশ্যমান। মন্দিরের ২৫' উচ্চ পাদপীঠকে (ভিত্তি) প্রথম তল রূপেই ধরা হয়। নন্দীমণ্ডপের পূর্ব্ব পার্শ্বে, প্রশস্ত সমতল অঙ্গনমধ্যে, ৫১' উচ্চ ধ্বজস্তম্ভ। চিত্রের ঊর্দ্ধদেশে অসমতল 'গ্রানাইট' উপত্যকা এবং দক্ষিণ পার্শ্বে খননের উত্তর সীমানায়, প্রায় লম্বভাবে দণ্ডায়মান পর্ব্বতাংশে খোদিত গুহামন্দিরের অলিন্দসংলগ্ন সারিবদ্ধ স্তম্ভসমূহ দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রেণীবদ্ধ-প্রমাণাকার-হস্তী-উৎকীর্ণ, ২৫' উচ্চ, পাদপীঠের উপরে দেবায়তনের আসন বিন্যস্ত। সেই আসনে গর্ভগৃহ, ষোড়শসংখ্যক সুদৃশ্য 'ব্রহ্মকান্ত'-স্তম্ভসমন্বিত ৭০'×৬২' সভামণ্ডপ এবং পার্ব্বতী ও গণপতি প্রভৃতির জন্য সপ্তসংখ্যক দেবগৃহ অবস্থিত (৫৯ চিত্র)। চতুরস্র গর্ভগৃহ বেষ্টন করিয়া পরিক্রম-অলিন্দ।

গভীর খাতখননান্তে উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমানার প্রান্তভাগে যে ত্রিসংখ্যক পর্ব্বতাংশ প্রায় লম্বভাবে দণ্ডায়মান ছিল তাহাদের গাত্রদেশে গঙ্গাপ্রমুখ দেবদেবীর জন্য কয়েক সংখ্যক গুহামন্দির ও অলিন্দ খোদিত হইয়াছিল। খননকালে খাতত্রয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে ২৭০'×১১০'×১০০' অংশ অব্যাহত রাখা হইয়াছিল তাহাকে অতি সন্তর্পণে, ভাস্করসুলভ যত্নসহকারে, ধীরে ধীরে খোদিত করিয়া কৈলাস মন্দির, নন্দীমণ্ডপ, প্রবেশ-প্রকোষ্ঠ, সেতুদ্বয় এবং ধ্বজস্তম্ভদ্বয় গঠিত হয়। গঠনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিকল্পনা—মন্দির, মণ্ডপ, প্রকোষ্ঠ ও স্তম্ভদ্বয়ের কারুকার্য্য ও ভাস্কর্য্যের যাবতীয় নক্সাসমূহ—বিরাট্ প্রস্তরখণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে, পর্য্যায়ক্রমে, প্রমাণাকারে অঙ্কিত করা হয়।

ধাতুময় করপত্র (করাত), পাষাণ-ভেদকারক শিলাকুট্টক (ছিদ্র করিবার যন্ত্র), গুরুভার মুষল (হাতুড়ী), তীক্ষ্ণধার শলাকা (ছেনী), সমকোণ নির্ণয়ের 'মাটাম', ক্ষুরধার শল্য (নরুণ) প্রভৃতির সাহায্যে মন্দিরের শীর্ষদেশ হইতে পাদভাগ পর্য্যন্ত—উপর হইতে ক্রমশঃ নিম্নে—ধ্যানসিদ্ধ, ধর্ম্মপ্রাণ, সুস্থ ও সবল শিল্পিগণ একাগ্রচিত্তে রূপায়িত ও ছন্দায়িত করিয়াছিলেন। ভূতত্ত্ব তথা বাস্তুবিদ্যায় এবং পার্ব্বত্য ভূভাগের বিভিন্ন স্তরের ও ফাটলের প্রকৃতি- ও শক্তি-নির্ণয়ে তাঁহাদের গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ছিল।

অদম্য অধ্যবসায় সহকারে একাদিক্রমে একশত বৎসরকাল কার্য্য করার ফলে যোগসিদ্ধ মহাস্থপতি, সহকারী মহাতক্ষকগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যপ্রশিষ্যমণ্ডলী অপূর্ব্ব সুন্দর শিবায়তনের অনুপম স্থাপত্যের সৃজনে অসাধ্যসাধন করিলেন। শক্তিমান্ সুঠাম দেবদেবী প্রতিমার, প্রমাণাকার হস্তীর ও বিচিত্র লতামণ্ডপের, অপূর্ব্ব ভাস্কর্য্য ও শিল্পশোভিত, অতীব বিস্ময়প্রদ, বিশাল কৈলাস দেবায়তন বিশ্বসভ্যতার বিচারসভায় বেদান্তপ্রাণ ভারতবর্ষকে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা অর্পণ করিয়াছে।

হিমালয়ের কৈলাস শিখরই ইলাপুরীর কৈলাস মন্দিরসৃজনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল (১৫৯ চিত্র)।

৬০ চিত্র—ইন্দ্রসভা-জৈনগুহা, এলোরা, খৃঃ নবম শতক

কমনীয় কারুকলাখচিত, অমিততেজসম্পন্ন, বিপুলায়তন প্রস্তরস্তম্ভসমন্বিত, অমরাবতীর ইন্দ্রপুরীপ্রতিম ইন্দ্রসভা-গুহাকক্ষের শিল্পসুষমামণ্ডিত অলিন্দপ্রান্তে সিংহপৃষ্ঠে সমাসীনা মহাশক্তি ইন্দ্রাণী। অপর পার্শ্ববর্ত্তী অলিন্দপ্রান্তে ঐরাবতপৃষ্ঠে দেবরাজ ইন্দ্র উপবিষ্ট।

কৈলাস মন্দির হইতে ইন্দ্রসভাগুহা অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত।

৬১ চিত্র—বিঠলস্বামী মন্দিরের অলিন্দ, বিজয়নগর (দক্ষিণ ভারত), খৃঃ ষষ্ঠদশ শতক

চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যভাগে যখন ভারতের অন্যান্য ভূভাগসমূহ মুসলমান রাষ্ট্রভুক্ত, দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদী হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ দ্রাবিড় দেশে তখন বুক্কা রায়-স্থাপিত নব হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের রাজধানী বিজয়নগর হইতে হিন্দু নরপতিগণ দুই শতাব্দীর অধিককাল দ্রাবিড়ভূমি শাসন করিয়াছিলেন। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বীজাপুর, গোলকোণ্ডা, আহমদনগর প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমান রাষ্ট্রগুলির সমবেত চক্রান্তের ফলে তালিকোট যুদ্ধে বিজয়নগরাধিপতি রামরাজ নিহত হইলে বিরাট্ শিল্পৈশ্বর্য্যময় বিজয়নগর লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, অপূর্ব্ব শিল্প ও অতুল সমৃদ্ধিপরিপূর্ণ 'সমগ্র এশিয়ার শ্রেষ্ঠ মহানগরীসমূহের অন্যতম' বিজয়নগর তুঙ্গভদ্রা নদীর পার্ব্বত্য তীরভূমিতে অবস্থিত ছিল। প্রস্তরময় প্রাকার ও সিংহদ্বার-পরিবেষ্টিত বিশাল দুর্গনগরীর অভ্যন্তরস্থিত স্তরবদ্ধ-ক্রমসূক্ষ্ম-শিখর-কিরীটশীর্ষ বহুতল প্রাসাদ, দ্বিতল ও ত্রিতল সৌধশ্রেণী এবং শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠীসদনের শিল্পায়ন এক্ষণে পর্ব্বতপ্রমাণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে। কেবলমাত্র 'জয়প্রাসাদ', শতস্তম্ভ-'রাজদর্শনমণ্ডপ', বিশাল 'হস্তিশালা', দ্বিতল 'উদ্যান-ভবন' প্রভৃতি অল্পসংখ্যক প্রাচীন সৌধাবাস মহানগরীর অতীত গৌরবের সাক্ষ্যদানে দণ্ডায়মান। মহাপ্রাসাদসান্নিধ্যে বিজয়নগরীয় (গুপ্ত-দ্রাবিড়) অনুপম স্থাপত্যে গঠিত রাজকুলদেবতা 'হাজার রাম' দেবদেউল অধুনা দীপ্তিহীন মহাজ্যোতিষ্কের মত নিষ্প্রভ।

বিজয়নগর সংস্কৃতির অমূল্য অবদান 'পম্পাপতি' বিঠলস্বামী (বিষ্ণু) মন্দির। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে রাজা কৃষ্ণদেব উহার নির্ম্মাণের সূচনা করেন। ত্রিসংখ্যক গোপুরম্ ও প্রস্তরময় প্রাচীরসংলগ্ন ৫০০'×৩২০' প্রাঙ্গণমধ্যে অসম্পূর্ণ মন্দিরের অতুলনীয় অলিন্দশোভিত প্রশস্ত মহামণ্ডপ, অর্দ্ধ-মণ্ডপ ও গর্ভগৃহ বর্ত্তমান। প্রাঙ্গণে 'গ্রানাইট' প্রস্তরের লতামণ্ডন ও ভাস্কর্য্য-উৎকীর্ণ 'ঈয়লি'-স্তম্ভসম্বলিত পঞ্চসংখ্যক সুদৃশ্য মণ্ডপ ব্যতীত কমলকোরকসদৃশ বিমানশীর্ষ, সচল রথচক্রবিশিষ্ট, একটি প্রস্তরময় বিষ্ণুরথ দর্শকের চিত্ত সম্মোহিত করে।

বর্ত্তমান চিত্রে মন্দিরসংলগ্ন অলিন্দের একাংশ উপলব্ধ হয়। রোষভরে দণ্ডায়মান তেজীয়ান

অশ্বের খুর দিয়ে এবং উত্তেজিত পশুরাজের নখাঘুধ থাবাতলে ভাবপ্রবণ মানবমূর্তিবিশিষ্ট বিস্ময়প্রদ 'গ্রানাইট' স্তম্ভগুলি বিজয়নগরীয় শিল্পশৈলীর বৈশিষ্ট্য।

এতাদৃশ বিচিত্র স্তম্ভালঙ্করণ মহাবলীপুরের পল্লব দেবায়তনে উদ্ভূত এবং বিজয়নগরে পূর্ণ-বিকশিত হইয়া অবশেষে দক্ষিণ ভারতের বহু মন্দিরেই প্রচলিত হইয়াছিল। মাদুরা, কাঞ্চী, ত্রিবাঙ্কুর, কুম্ভকোণম্, শ্রীরঙ্গম ও সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি তীর্থস্থানের মন্দিরে মন্দিরে বিজয়নগরীয় স্থাপত্যশিল্পের অমোঘ প্রভাব অনুভূত হয়।

৬২ চিত্র—পোলোন্নারুয়া (পুলস্তপুর) মন্দির, সিংহল, খৃঃ দ্বাদশ শতক

সিংহলদ্বীপস্থ পুলস্তপুর ভূভাগ একাদশ ও দ্বাদশ শতকে চোল রাষ্ট্রের অধিকারভুক্ত থাকায় কালে তথায় চোল (গুপ্ত-দ্রাবিড়) স্থাপত্যে বহুসংখ্যক হিন্দুমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বহু স্থানেই ব্রোঞ্জের অষ্টভুজা দুর্গা, নটরাজ, কার্ত্তিকেয়, গণপতি, বিষ্ণু, লক্ষ্মী ও সূর্য্যমূর্ত্তি এবং সুন্দরমূর্ত্তিস্বামী ও মাণিক্যবাসগর প্রভৃতি শৈবসাধুর সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়াছে। অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী-সঙ্কলিত মূল্যবান্ গ্রন্থ *Southern Indian Bronzes* এতৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছে। চিত্রে প্রদর্শিত পোলোন্নারুয়ার ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দিরটি চোলপ্রধান দ্রাবিড় স্থাপত্যে গঠিত হইলেও তাহার শৈলী বুদ্ধগয়া মন্দিরদ্বারা প্রভাবিত। মণ্ডপের আচ্ছাদন গুপ্ত মণ্ডপের সমতল আচ্ছাদনের সমতুল।

৬৩ চিত্র—ত্রিচিহ্নপল্লীর (ত্রিচিনপল্লী) একাংশ

বহু প্রাচীন শ্রীরঙ্গম মন্দিরের ক্ষুদ্র আয়তনকে কেন্দ্র করিয়া, ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতকের মধ্যে পাণ্ড্য, বিজয়নগর ও মাদুরার নায়ক নরপতিগণের বদান্যতায়, সপ্ত প্রাকার এবং একবিংশতি সংখ্যক গোপুরতোরণবেষ্টিত—শ্রীরঙ্গম মন্দিরকেন্দ্রী—সপ্তসংখ্যক সীমানার মধ্যস্থিত সপ্তসংখ্যক মন্দিরক্ষেত্র আবৃত করিয়া ২৮৮০'×২৪৭৫' শ্রীরঙ্গম উপনগরী ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছিল। অনাড়ম্বর মূল মন্দিরের অনুচ্চ বিমানশীর্ষে সুবর্ণমণ্ডিত কলস। তাহার অপরিসর প্রাঙ্গণ অনুচ্চ প্রাকার ও অনতিবৃহৎ গোপুরবেষ্টিত। প্রাঙ্গণের অন্তর্ব্বর্ত্তী ধর্ম্মগৃহ এবং আবাসগুলি শিল্পবিবর্জ্জিত।

ব্রাহ্মণ ও পরিজনবর্গের জন্য নিয়ন্ত্রিত দ্বিতীয় ও তৃতীয় ক্ষেত্রের মধ্যবর্ত্তী পৃথক পৃথক পল্লীর সমতল ছাদবিশিষ্ট বাসভবনগুলিও অলঙ্কারবিহীন।

চতুঃসংখ্যক বিপুলায়তন, সুশোভন, তোরণবেষ্টিত চতুর্থ ক্ষেত্রোপরি বিরাজমান 'সহস্র স্তম্ভমণ্ডপ' সুচারু স্থাপত্যসমৃদ্ধ। তৎসংলগ্ন পূর্ব্ব গোপুরমের শীর্ষভাগ হইতে শ্রীরঙ্গম ও ত্রিচিহ্নপল্লী নগরীদ্বয়ের দৃশ্য উপভোগ্য।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ ক্ষেত্রস্থ মন্দির ও বাসভবনসমূহ স্থাপত্যভূষিত।

সপ্তম সীমানার অন্তর্বর্তী বিস্তৃত স্থানে আবাসগৃহ ও মঠ, পুরাণপরিষদ্ ও গীতাভবন প্রভৃতি ব্যতীত বহুসংখ্যক যাত্রিনিবাস, পান ও ভোজনশালা এবং চকমিলানো বাজার ও বহুবিধ পণ্যপূর্ণ সারিবদ্ধ বিপণীশ্রেণী। সপ্তম সীমানার উত্তর গোপুরমসংলগ্ন সুপ্রশস্ত রাজপথ কাবেরী নদীতটস্থ, সুকুমার কারুকলাশোভিত, বৃহৎ ঘাটমণ্ডপে সম্মিলিত হইয়াছে। উক্ত পথাবলম্বনে একক্রোশ পার্শ্ববর্তী ত্রিচিন্‌পল্লী নগরীতেও যাওয়া যায়।

চিত্রে ত্রিচিন্‌পল্লীর প্রান্তবর্তী অত্যুচ্চ শৈলশীর্ষস্থ দেবায়তনের তোরণ হইতে প্রস্তরময় সোপান ও উন্মুক্ত চত্বরবেষ্টিত সুপরিসর সরোবরসংলগ্ন শিবমন্দিরসহ সুবৃহৎ নগরীর একাংশ দৃশ্যমান।

৬৪ চিত্র—তক্ষণশিল্প, মহীশূর, খৃঃ অষ্টাদশ শতক

চন্দনকাষ্ঠের পেটিকার সযত্নে খোদিত হংসহংসী- ও পুষ্পলতা-পরিবৃত মনোহর তোরণ। তোরণের শীর্ষ এবং নিম্নভাগে কীর্তিমুখ এবং গরুড়ারূঢ় বিষ্ণুমূর্তি প্রাণবন্ত বলিয়া ভ্রম হয়। পেটিকার আচ্ছাদন মহীশূর রাজকুলাধিষ্ঠাত্রী দশভুজা-দুর্গাসমন্বিত। দেবীর উভয় পার্শ্বে শক্তিমান্ সিংহদ্বয় দৃশ্যমান।

৬৫ চিত্র—সূচীশিল্প, শ্রীনগর (কাশ্মীর), খৃঃ অষ্টাদশ শতক

লতাপুষ্প, পশুপক্ষী ও অপ্সরীশোভিত, স্বর্ণমুক্তাখচিত, রেশমী শয্যাভরণ।

৬৬ চিত্র—সুকুমার শিল্প, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ ঊনবিংশ-বিংশ শতক

আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে মুদ্রিত।

৬৭ চিত্র—তক্ষণশিল্প, ত্রিপুরা (আসাম), খৃঃ ঊনবিংশ শতক

বালক-বালিকার খেলনা ; কাষ্ঠের ঘোড়াগাড়ি।

৬৮ চিত্র—সরস্বতী, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ একাদশ শতক

সুন্দরবনে আবিষ্কৃত কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের শক্তিময়ী বীণাপাণির বসন ও ভূষণ দ্রষ্টব্য।

৬৯ চিত্র—পশুপতিনাথ মন্দির, কাঠমাণ্ডু (নেপাল), খৃঃ ষষ্ঠদশ শতক

নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু হইতে দেড় ক্রোশ দূরে বাগমতী উপনদীতীরে চতুর্মুখ শিবলিঙ্গ-সমন্বিত প্রসিদ্ধ পশুপতিনাথ মন্দির চিত্রের উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে দৃশ্যমান। চৈনিক প্যাগোডার অনুকৃতি দারুময় মন্দিরের পাষাণপ্রাঙ্গণসংলগ্ন প্রশস্ত সোপানপথ নদীসংলগ্ন অন্ত্যেষ্টিঘাটে নামিয়াছে। নদীর অপর তীরে—চিত্রের সম্মুখনিম্নে দৃশ্যমান গুহ্যেশ্বরী মন্দির একটি পবিত্র কুণ্ডপার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত। অল্পসংখ্যক ক্ষুদ্রায়তন দেবদেউল, সাধুর আশ্রম, মঠ, পণ্যশালা ও যাত্রিনিবাস চিত্রের বাম পার্শ্বে বিদ্যমান।

৭০ চিত্র—শান্তিনাথ মন্দির, বগরীর (পশ্চিম রাজস্থান), খৃঃ দ্বাদশ শতক

স্তূপাকৃতি বিমানোপরি অতিকায় আমলক-শিলাবিশিষ্ট, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কমল-কোরকরূপ বহুসংখ্যক কলসসহ শতগজসিংহ-পরিবেষ্টিত, ঈষৎ হরিদ্রাভ চূণা ('কনড়ী') প্রস্তরের অসাধারণ শান্তিনাথ দেবায়তন জৈনপর্য্যায়ী মন্দিরস্থাপত্যে অভিনব।

রাজধানীর প্রান্তভাগে অত্যুচ্চ শৈলশিখরে, মহারাওয়ালের দুর্গপ্রাসাদের সান্নিধ্যে বিরাজমান উক্ত দেবায়তনের স্বর্ণমণ্ডিত কলস দিগন্তবিস্তৃত 'থর' মরুভূমির বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয় (১৩৪ চিত্র)।

৭১ চিত্র—সরস্বতী, বীকানীর (রাজস্থান), খৃঃ ত্রয়োদশ শতক

চতুষ্করে পদ্ম, পুঁথি, ভৃঙ্গার ও জপমালাধারিণী, ত্রিভঙ্গিম দণ্ডায়মানা, স্মিতহাসিনী, জৈন সরস্বতীর মোহন প্রতিমা শ্বেতমর্ম্মর হইতে খোদিত।

৭২ চিত্র—আঙ্করভাট ক্ষেত্র, কম্বোজ, খৃঃ দ্বাদশ শতক

কম্বোজের শাল সেগুন মেহগিনি পাদপ-পরিপূর্ণ, পশুপক্ষী বিষধর অজগর পরিবৃত, অরণ্য-সমাকীর্ণ পার্ব্বত্যপ্রদেশে, ৫,৫০০ বর্গমাইল-প্রসারিত প্রখ্যাত 'ষারে' (Tonla Sale) হ্রদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, বহুদূরবিস্তৃত বালুকাময় মালভূমে আঙ্করভাট (নগরবাট) বিষ্ণুসূর্য্যমন্দির অবস্থিত। মন্দিরের দুই ক্রোশ উত্তরে বিরাট্ বায়ন মন্দিরকেন্দ্রী প্রাচীন খ্মের রাজধানী আঙ্করথম (নগরধাম)। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতারণ্যের অন্তস্তলে এবং পূর্ব্বতন রাজধানী হরিহরালয়ের প্রত্যন্তাঞ্চলীয় বৃক্ষপুঞ্জের অন্তরালে অন্তরালে নবম শতাব্দীর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বিবিধ জীর্ণ দেবালয় ব্যতীত বহু গ্রামনগরীর ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণ্যশিল্পশাস্ত্রসম্মত 'চতুর্ম্মুখ' ও 'স্বস্তিক' গ্রামনগরীর আদর্শেই হরিহরালয়, আঙ্করথম এবং আঙ্করভাট বিন্যস্ত হইয়াছিল।

কাননোপম উদ্যানপরিবৃত মন্দিরক্ষেত্রের সমগ্র সীমানা প্রায় ৩,২৪০'×৩,৩০০'। সীমানার চতুর্দ্দিকে ৬৯০' প্রস্থ ও ২৫' গভীর স্বচ্ছ সলিলপূর্ণ নীলাভ পরিখা ময়ূরপঙ্খী নৌকা ও ফুল্লকমলদলে একদা শোভমান ছিল। পরিখাসহ মন্দিরসীমানার পরিধি প্রায় দেড় ক্রোশ।

সীমানার মধ্যভাগে ৫৭০'×৬৫০' স্থান আবৃত করিয়া নবরত্ন রথাকৃতি ত্রিস্তর (ত্রিতল) দেবায়তন। প্রথম তলের আয়তন ৫৭০'×৬৫০'×১৫', দ্বিতীয় তল ৩৪০'×৩৪৫'×২০' এবং ২০০'×২০০' তৃতীয় তল প্রায় ৩০' উচ্চ।

প্রত্যেক স্তরের প্রতি চত্বরকে পরিবেষ্টিত করিয়া সু-উচ্চ সুশোভন প্রাকার (৭২ক ও ৭২খ চিত্র)। প্রথম চত্বরের চারিপার্শ্বস্থ প্রতি প্রাকারের মধ্যস্থলে, ত্রিসংখ্যক, 'গোপুর'-সদৃশ, উত্তুঙ্গ তোরণমণ্ডপ এবং দুই প্রান্তে উন্নতবিমানশীর্ষ দ্বিসংখ্যক অলিন্দমণ্ডপ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চত্বরের প্রতিভুজ বেষ্টনীর অন্তস্তলে এক একটি তোরণমণ্ডপ এবং উভয় প্রান্তে দ্বিসংখ্যক

উচ্চবিমানবিশিষ্ট অলিন্দমণ্ডপ। ভূমিতল হইতে প্রস্তরময় সোপানপথে তোরণমণ্ডপ অথবা অলিন্দ-মণ্ডপের প্রশস্ত অন্তরাল অবলম্বনে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় চত্বরে আরোহণকরতঃ আকাশচুম্বী বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়।

এতাদৃশ বিশাল প্রাকার, উন্নত তোরণ ও বিপুল অলিন্দ-পরিবেষ্টিত ২০০' দীর্ঘ ও ২০০' প্রস্থ তৃতীয় চত্বর প্রাঙ্গণের মধ্যমণিরূপী বিষ্ণুহর্ম্য দেবায়তনের আসন সমচতুর্ভুজ, সমকোণী, 'ব্রহ্মছন্দ' ও চতুর্মুখ। দেবায়তনের চতুরস্র গর্ভগৃহের চতুর্দ্দিকস্থ চতুঃসংখ্যক প্রবেশ দ্বার স্ব স্ব সম্মুখবর্ত্তী স্তরে স্তরে ক্রমনিম্ন চত্বরত্রয়ের প্রান্তমধ্যস্থিত তোরণত্রয়ের সহিত ঋজু ঋজু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চত্বরের দুই প্রস্থ প্রাকারবেষ্টনীর চারিকোণে অবস্থিত অষ্টসংখ্যক অলিন্দমণ্ডপের উপরিস্থিত অষ্টসংখ্যক উচ্চশির বিমানসমূহ মূল মন্দিরের অভ্রংলিহ শিখরবিমানসহ আক্করভাটকে অপূর্ব্বসুন্দর নবরত্ন দেবায়তনে পর্য্যবসিত করিয়াছে (৭২খ চিত্র)।

একটি সুদৃঢ় প্রস্তরময় সুদীর্ঘ সেতুর দ্বিসংখ্যক সপ্তফণানাগস্তম্ভসমন্বিত স্থূল প্রাচীরদ্বয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রশস্ত পথাবলম্বনে, ৬৯০' প্রস্থ পরিখা অতিক্রম করিয়া, স-উদ্যান সমগ্র মন্দিরসীমানার পশ্চিম প্রাকারের মধ্যবর্ত্তী, প্রায়-পরস্পর-সংলগ্ন তোরণত্রয়ে প্রবেশ করা যায়। তোরণত্রয় আচ্ছাদিত করিয়া পঞ্চতল গোপুরসৌধ। সেই বিশাল সৌধমালার সুষ্ঠু স্থাপত্যের দেবভাষার মন্দাক্রান্তা ছন্দালঙ্কারের সহিত তৎসংলগ্ন ৬০০' দীর্ঘ 'চাঁদনী'র অর্থাৎ চন্দ্রাতপের কমনীয় কারুকলার সুললিত সুরলয়ের সুসমঞ্জস সংমিশ্রণ অপরিসীম শিল্পসঙ্গীতের অপ্রমেয় আনন্দ সঞ্চারিত করিয়াছে।

সমগ্র দেবোদ্যানের চতুঃসীমাবেষ্টনী চতুঃসংখ্যক প্রাকারের মধ্যে কেবলমাত্র পশ্চিম প্রাকার-সংলগ্ন পূর্ব্বকথিত বিরাট্ সেতুবন্ধ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ প্রাকারের মধ্যদেশে ত্রিসংখ্যক প্রায়-পরস্পর-সংযুক্ত তোরণপথ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তোরণের অসম্পূর্ণ মণ্ডপগুলি অশোভন অবস্থায় দৃশ্যমান। উহাদের প্রত্যেকের সংলগ্ন পরিখা অতিক্রম করিবার জন্য কোন জলবন্ধ নাই ; হয়ত নির্ম্মাণের সুযোগ হয় নাই।

সেতু (জলবন্ধ)-সংযুক্ত পশ্চিম তোরণ হইতে, প্রসারিত কুঞ্জকাননের অন্তরাল অবলম্বনে, একটি প্রায় ১,৪০০' দীর্ঘ এবং ৩৬' প্রস্থ, বালুময় প্রস্তরাবৃত, সরল পথ ('মঙ্গলবীথি') একটি ২৫০' দীর্ঘ, ২৫০' প্রস্থ এবং ৭' উচ্চ ক্রশাকৃতি (+ সদৃশ) 'চবুতর' অর্থাৎ চত্বরবেদী লঙ্ঘন করিয়া উদ্যানের সেই অংশের পূর্ব্বপ্রান্তে সন্নিবেশিত, প্রথম চত্বরে উঠিবার, তোরণমণ্ডপে মিলিত হইয়াছে। সেই অংশস্থিত নয়নশোভন উপবনের সুদীর্ঘ ছায়াপ্রসারী মহীরুহরাজির বিজড়িত শাখাপ্রশাখার সুগভীর তোরণনিম্নে, সুলম্বিত মঙ্গলবীথিকার উভয় পার্শ্বে, বহুসংখ্যক সপ্তফণানাগশীর্ষ বিচিত্র স্তম্ভাবলী পরিশোভিত, অতিকায় নাগরাজের বিপুলবপুসদৃশ বিরাট প্রাচীরদ্বয়। প্রতি পাষাণ-প্রাচীরের পৃষ্ঠভাগে বলদীপ্ত দানববাহিনী সারিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট। বীথিকার উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে

ধর্মায়তন, অতি সুন্দর, পরিত্যক্ত 'পুস্তকাশ্রম' বিদ্যমান। দলবদ্ধ ময়ূরময়ূরী বর্ণাঢ্য পুষ্প-উপবনের ইতস্ততঃ কেকাধ্বনি করিতেছে।

এই অংশের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ ত্রিশীর্ষ গোপুরমকাকৃতি তোরণত্রয়ের অন্তর্নিহিত উচ্চধাপ-সোপান-পথাবলম্বনে ত্রিতল মন্দিরের প্রথম তলচত্বরে উপনীত হওয়া যায়। প্রথম চত্বর দ্বিতল প্রাকারমঞ্চ-বেষ্টিত, দ্বাদশসংখ্যক চতুর্মুখী তোরণমণ্ডপ এবং অষ্টসংখ্যক অলিন্দমণ্ডপ পরিবৃত। উক্ত দ্বিতল প্রাকারমঞ্চ একটি ১২' প্রস্থ এবং একটি ৬' প্রস্থ, পরস্পর-সংযুক্ত, যুগ্ম বারান্দাসমন্বিত সুদীর্ঘ অলিন্দসহ সুলম্বিত সুগভীর মঞ্চের (gallery) অনুরূপ (৭৩ চিত্র)।

উক্ত মঞ্চের দুই সারি 'ব্রহ্মকান্ত' স্তম্ভবিশিষ্ট ১২' এবং ৬' প্রস্থ বারান্দাদ্বয়ের অর্থাৎ অলিন্দ-যুগলের আচ্ছাদন (ছাদ) দুইটি বালুময় প্রস্তরনির্ম্মিত। আচ্ছাদনদ্বয়ের ছেদিত আকৃতি যথাক্রমে ছত্র ও অর্দ্ধ-ধনুসদৃশ।

স্তম্ভসমূহের অন্তরালে অন্তরালে ১৫' উচ্চ, প্রস্তরময়, চত্বরগাত্রের নিম্নদেশে চত্বরের চারি পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া সারিবদ্ধ—সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ২,০০০' দীর্ঘ ও ৬' উচ্চ—পাষাণফলকসমূহে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের তথা কম্বোজবাসীর সমাজজীবনের প্রধান প্রধান আখ্যায়িকা ব্যতীত স্বর্গ এবং নরকের চিত্রাবলী উৎকীর্ণ আছে (৭৩ ও ৭৩ক চিত্র)।

প্রথম চত্বরের উপরিভাগে—প্রথম ও দ্বিতীয় চত্বরের সুদীর্ঘ ও সু-উচ্চ প্রাকারদ্বয়ের মধ্যস্থিত উদ্যানাংশে—শতাধিক প্রস্তরস্তম্ভ-সম্বলিত, ১৮০'×১৫০' পরিমিত একটি উন্মুক্ত মণ্ডপ। ৭২ক চিত্রে প্রত্যেকটি স্তম্ভ এক একটি বিন্দুবৎ প্রদর্শিত হইয়াছে। সায়াহ্নে সায়াহ্নে সেই মণ্ডপচত্বরের উত্তর- ও দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ নৃত্য ও সঙ্গীতপীঠে রামলীলা অভিনীত ও মহাভারত কীর্ত্তিত অথবা ভাগবতগীতা পঠিত হইত।

পূর্ণচন্দ্র-কিরণোজ্জ্বল পূর্ণিমা নিশীথে, মেঘহীন আকাশতলে, নবরত্ন দেবায়তনের ক্রোড়াঙ্কে অবস্থিত আচ্ছাদনবিহীন বিস্তৃত চত্বরের বালুময় পাষাণ অঙ্গনে—সুতন্বী সহাস বিদ্যাধরী ও অপ্সরীগণের সুভঙ্গিম ভাস্কর্য্যভূষিত চারুশিলার অনুচ্চ প্রাচীরপরিবেষ্টিত চতুঃসংখ্যক অচ্ছোদ সরোবরের প্রশান্তিময় পরিবেশে আম্বরধাম অমরাবতীর রূপরাশি উদ্ভাসিত করিয়া দেয়। দুইটি সরোবর দক্ষিণ পার্শ্বে এবং দুইটি বাম পার্শ্বে রাখিয়া সম্মোহিত রসগ্রাহিগণ দ্বিতীয় চত্বরে উঠিবার তোরণমণ্ডপে অবতীর্ণ হয়েন।

দ্বিতীয় চত্বরের অনতিপ্রশস্ত অঙ্গন অতিক্রম করিলে তৃতীয় চত্বরে উঠিবার উচ্চধাপ-সোপানপথ-সংযুক্ত তোরণমণ্ডপে প্রবেশ করা যায়। তৃতীয় তলের ২০০'×২০০' অঙ্গনের আবেষ্টনীমঞ্চের চতুষ্কোণে মধ্যভারতীয় গুপ্তমন্দির উদয়েশ্বর-প্রভাবিত শিখর-বিমানসমন্বিত চতুঃসংখ্যক অলিন্দ-মণ্ডপ। অঙ্গনমধ্যে চতুরস্র গর্ভমন্দির। মন্দিরের চতুর্ম্মুখী চতুর্দ্বার স্ব স্ব সম্মুখস্থ এক একটি

মঞ্চ হিসাবে সর্ব্বশুদ্ধ চতুঃসংখ্যক মঞ্চ (gallery)-সহ তৃতীয় তলের বেষ্টনীসংলগ্ন চতুঃসংখ্যক তোরণের সহিত সংযুক্ত। এইরূপে চতুর্মুখ গর্ভগৃহের চতুর্দ্বারে চতুঃসংখ্যক সুদীর্ঘ মঞ্চসহ অঙ্গনের চারিপার্শ্বস্থ চতুঃসংখ্যক প্রাকারমধ্যস্থ চতুঃতোরণের সহিত অপিচ অষ্টসংখ্যক অলিন্দমণ্ডপের সহিত সংযুক্ত হওয়ায় অঙ্গনে অপরূপ স্বস্তিকচক্র গঠিত হইয়াছে (১২ক চিত্র)।

দ্বিতীয় তল হইতে যাত্রিগণ উত্তুঙ্গ সোপানপথের উচ্চ উচ্চ ধাপগুলি লঙ্ঘনকরতঃ তৃতীয় তলের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব তোরণে আরোহণ করিয়া সম্মুখস্থ মঞ্চের সুন্দর সুন্দর স্তম্ভশোভিত সুগভীর সরণি অনুসরণে গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করেন।

বিষ্ণুসূর্য্যমন্দিরের স্বস্তিকচ্ছন্দী—সূর্য্যদেবের গতিচক্রের অনুরূপ—আসনগ্রহন মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা পরম দার্শনিক 'পরম বিষ্ণুলোক' দ্বিতীয় সূর্য্যবর্ম্মণের ধ্যানধারণায় লক্ষ্যীভূত হয়ত ছিল। চতুর্মুখ নগরবাটের প্রথম ও দ্বিতীয় চত্বর (তল)-সংলগ্ন প্রাকারমঞ্চ ও পথসমূহের স্বস্তিকচ্ছন্দী রচনা হইতে এবং বিষ্ণুলোকের প্রতীক তৃতীয় চত্বরাঙ্গনস্থ 'ব্রহ্মচ্ছন্দ'-দেবায়তনকেন্দ্রী মঞ্চসমূহ উদ্ভূত স্বস্তিক-মণ্ডলের সন্নিবেশ হইতে ইহাই অনুমিত হয়। ১২ক ও ১২খ চিত্রে দৃষ্ট মন্দিরাঙ্গনের স্বস্তিক-রূপায়ণের সহিত ১৩ চিত্রের নিম্নস্থ বাম কোণে প্রদর্শিত স্বস্তিকাকৃতি বৈদিক গ্রামবিন্যাসের তুলনামূলক অনুশীলনসহ ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও জ্যোতিষিক গবেষণা প্রার্থনীয়।

ত্রিতলস্থ স্বস্তিকচক্রের কেন্দ্রস্থলে প্রস্ফুটিত মন্দিরকমলের সৃজন-উৎস (বীজকোষ) হইতে দেবায়তনের রত্নবেদী উত্থিত। তদুপরি সমভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান বিশ্বপালনকর্তা—আজানুলম্বিত, কমলনয়ন—ষড়্ভুজ নারায়ণ। নারায়ণের হেমময় মুকুট আচ্ছাদিত করিয়া সুবর্ণকলসশীর্ষ, নবতল, ক্রমসূচল, বিচিত্র বিমান। সেই বিরাট্ শিখরবিমান দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের চারি কোণে বিরাজমান অষ্টসংখ্যক অনুরূপ নবতল শিখরসহযোগে আঙ্করভাটকে অনুপম নবরত্ন মন্দিরে রূপায়িত করিয়াছে।

উৎসব পর্ব্বের নিশীথে নিশীথে নবস্তর-দীপস্তম্ভ-সমতুল্য নবসংখ্যক সুঠাম সুডৌল শিখর-নিচয়ের গাত্রে গাত্রে স্তরে স্তরে চক্রে চক্রে নিবদ্ধ শত শত 'কুড়ু' (বন্ধনী)নিহিত প্রজ্জ্বলিত প্রদীপসঞ্জাত শত শত তরল অনলশিখা, সৌরমণ্ডলে দ্যুতিমান নবগ্রহসদৃশ, অমলধবল উজ্জ্বল আলোক বিকীরণ করে।

সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববৃহৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবায়তন আঙ্করভাটের সর্ব্ব অঙ্গে ইন্দ্রপুরীর শিল্পশ্রী প্রতিফলিত। উহার দর্শনমূলক আসনবিন্যাস তথা উদ্যাননিয়ন্ত্রণ ব্রাহ্মণ্যশিল্পশাস্ত্রানুমোদিত। শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরের শান্তিনিকেতন বিহগকূজনমুখরিত কুসুমিত উপবন তথা হংসহংসী-নিষেবিত স্বচ্ছসলিল কমল সরোবর পরিশোভিত।

দেড় ক্রোশ দীর্ঘ বিশাল পরিখাখননে প্রাপ্ত পর্ব্বতপ্রমাণ উর্ব্বর মৃত্তিকারাশি চত্বরত্রয়ের

শূন্যগর্ভপূরণে ব্যবহৃত হইয়াছিল; তাহার ফলে চত্বরে চত্বরে উদ্যানের অবস্থিতি সহজসাধ্য হইয়াছে।

অপরূপ দেবদেউলের গ্রথিহের ছন্দগ্রহন, অঙ্গে অঙ্গে খণ্ডে খণ্ডে মুগ্ধবোধ অলঙ্করণ, সুষমামণ্ডিত ভাস্কর্য্যতরঙ্গের উচ্ছলিত উত্তেজন এবং পরিখাবিদারক সেতুবন্ধের মোহসঞ্চারক বিন্যাস—মধ্যযুগীয় বৃহত্তর ভারতের অপরাজেয় পরিকল্পনাশক্তি, অত্যুন্নত পূর্ত্তবিজ্ঞান এবং অপরিসীম সৌন্দর্য্যানুভূতির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

ভারতীয় শিল্পের সহিত গ্রীক শিল্পের সুসঙ্গত সমন্বয় গান্ধারকলার অপূর্ব্ব ছন্দলাবণ্য উদ্ভাবিত করিয়াছিল। খ্মের ভাস্কর্য্যের সহিত ভারতীয় স্থাপত্যের সুষীম সংমিশ্রণ হইতে কম্বোজীয় স্থাপত্যশৈলীর অভিনব বিকাশ।

বিষ্ণুস্বর্গ্য দেবায়তনের বিচিত্র রূপগঠন প্রধানতঃ দ্রাবিড়-ভারতীয় বৃহদীশ্বর মন্দির শৈলীদ্বারা প্রভাবিত। উহার ক্রমবক্র ক্রমসূচল সুচারু মুকুটাভরণ মধ্যভারতীয় উদয়েশ্বর দেবদেউলের সুঠাম শিখরের কম্বুজোপযোগী তথা যুগোপযোগী অভিব্যক্তি (৪৭ চিত্র)। উহার ভাস্কর্য্যমালায় অন্ধ্র-ভারতীয় অমরাবতীর অপিচ পালবঙ্গীয় পাহাড়পুরের যুগ্মপ্রভাব প্রকটিত। কম্বোজের বান্তেইস্রেই-প্রমুখ কয়টি দশম শতাব্দীর মন্দিরগঠনে গুপ্ত-দ্রাবিড়ীয় স্থাপত্যরচনা অনুসৃত হইয়াছিল এবং নবম-দশম শতকে নির্ম্মিত কয়েক সংখ্যক দেবালয় প্রথম পর্য্যায়ী গুপ্তস্থাপত্যের শিখরবিহীন দেবগৃহের প্রতিকৃতি। আঙ্করভাটে কোনও প্রকার বুদ্ধমূর্ত্তি অথবা বৌদ্ধ আখ্যায়িকা খোদিত অথবা চিত্রিত হয় নাই।

খৃঃ পঞ্চদশ শতকে বৌদ্ধরাষ্ট্র তৎকালীন প্রতীচ্য ও প্রাচ্যজগতের ঐশ্বর্য্যশিল্পসমৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ রাজধানীসমূহের অন্যতম আঙ্করথম মহানগরী অধিকার করিলে জ্ঞানদীপ্ত আঙ্করভাট হইতে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একাধিপত্য অপসারিত হইয়াছিল। তথাপি কম্বোজের সাংস্কৃতিক জীবনে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শ সর্ব্বতোভাবে অনুসৃত হইতেছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নরোদাম, মণিভজ্র প্রভৃতি কম্বোজাধিপতিগণের রাজধানী প্নোম্‌পেনের (নমপেন) প্রাসাদে অনুষ্ঠিত উৎসবপার্ব্বণাদি 'বাকু' শ্রেণীর শৈব ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণগণের নির্দ্দেশমত পরিচালিত হইয়াছে ও হইতেছে। তদ্দেশীয় সঙ্গীত, নৃত্য, নাট্য ও অভিনয়কলা, বয়ন ও ধাতুশিল্প এবং আভরণ ও অলঙ্করণ মধ্যযুগীয় ভারতের শিল্পরীতি প্রভাবিত। সামাজিক আচারানুষ্ঠানে, সাজসজ্জা ও পোষাক পরিচ্ছদে হিন্দুর সংস্কার ও সংস্কৃতি পরিস্ফুট। ঈশানপুর, অমরেন্দ্রপুর, ব্যাধপুর, শ্রেষ্ঠপুর প্রভৃতি প্রাচীন রাজধানী-সমূহের ভববংশীয়, পুষ্করবংশীয়, সূর্য্যবংশীয় নরপতিগণ ভববর্ম্মণ, জয়বর্ম্মণ, ইন্দ্রবর্ম্মণ ইত্যাদি হিন্দু নামে ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক, পরমেশ্বর ইত্যাদি অভিধায় অভিহিত হইতেন।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে কম্বোজরাজ সবই সোরাম পঞ্চশত বৎসর পরে আঙ্করভাটে,

ব্রাহ্মণ পুরোহিতবর্গের নির্দ্দেশে বিষ্ণুসূর্য্যের পূজা সমারোহসহকারে সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদবধি তৎস্থানীয় অধিবাসিগণের ধর্ম্মসংক্রান্ত প্রধান প্রধান আচার অনুষ্ঠান আঙ্করভাট সূর্য্য-মন্দিরের পূতপবিত্র প্রস্তর-কুট্টিমেই সমাহিত হইতেছে; আঙ্করভাটের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যসমৃদ্ধ মণ্ডপে মণ্ডপে রামলীলা, গীতা ও পুরাণ পাঠ হইতেছে।

৭২ক চিত্র—আঙ্করভাটের বিন্যাসচিত্র

চিত্রের বাম পার্শ্বে মন্দিরের প্রথম চত্বরের পশ্চিম প্রাকারমধ্যবর্ত্তী তোরণত্রয় পরিদৃষ্ট হইতেছে। প্রথম চত্বরের পশ্চিম প্রাকারমঞ্চের এবং দ্বিতীয় চত্বরসংলগ্ন পশ্চিম প্রাকারের মধ্যস্থিত প্রসারিত উদ্যানে শতাধিক প্রস্তরস্তম্ভবিশিষ্ট ১৮০′×১৫০′ উন্মুক্ত মণ্ডপ। অঙ্কনচিত্রে স্তম্ভসমূহের প্রত্যেকটি এক একটি বিন্দুর আকারে চিহ্নিত হইয়াছে; সোপানশ্রেণী ও চত্বরবেষ্টিত চতুঃসরোবরও দৃষ্ট হইতেছে। তৃতীয় চত্বরের মধ্যভাগে মূলমন্দিরের চতুরস্র আসন নিহিত।

৭২খ চিত্র—বিষ্ণুসূর্য্য মন্দির (আঙ্করভাট), খৃঃ দ্বাদশ শতক

উত্তুঙ্গ 'গোপুর'সদৃশ উন্নত তোরণমণ্ডপবেষ্টিত ও দ্বিতল প্রাকারমঞ্চসংলগ্ন নবমসংখ্যক শিখর-সমন্বিত নবরত্ন মন্দিরের ত্রিসংখ্যক চত্বর স্তরে স্তরে দৃশ্যমান। চিত্রের উপরিভাগে উদ্যানশোভিত শ্রীক্ষেত্রের উত্তর ও পূর্ব্ব প্রাকারদ্বয় সমকোণে মিলিত। উহাদের পশ্চাতে প্রশস্ত পরিখা; চিত্রে দৃষ্ট হয় না।

৭৩ চিত্র—প্রথম চত্বরবেষ্টনীর ছেদিতাংশ, আঙ্করভাট

বর্ত্তমান অঙ্কনচিত্রে যুগ্ম অলিন্দের ছত্র এবং অর্দ্ধ-ধনুরাকৃতি আচ্ছাদন দুইটি ব্যতীত চত্বরগাত্রে মহাবীর হনুমান কর্ত্তৃক দশাননকে আক্রমণ এবং ঐরাবতপৃষ্ঠে উপবিষ্ট ইন্দ্রজিতের যুদ্ধাভিযান দ্রষ্টব্য। উদ্গত ভাস্কর্য্যমণ্ডিত, সারিবদ্ধ প্রস্তরফলক-বেষ্টনীর সমবেত দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০০′। চতুষ্পার্শ্বের চতুঃসংখ্যক তোরণপথ বেষ্টনীকে অষ্টভাগে বিভক্ত করিয়াছে। যুগ্ম অলিন্দের আচ্ছাদনদ্বয়ের প্রান্তে প্রান্তে সপ্তফণা নাগের বন্ধনীসমূহও (brackets) দ্রষ্টব্য।

৭৩ক চিত্র—সমুদ্রমন্থন, আঙ্করভাট

চত্বর গাত্রোৎকীর্ণ ভাস্কর্য্যফলকে দৃশ্যমান মেরু পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড এবং নাগরাজ বাসুকিকে মন্থনরজ্জুরূপে নিয়োজিত করিয়া মুকুটশীর্ষ দেবগণ এবং শিরস্ত্রাণধারী অসুরগণ সমুদ্রমন্থনে অনুরত।

৭৪ চিত্র—বিষ্ণুনটরাজ, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ একাদশ শতক

পশ্চিমবঙ্গীয় সুন্দরবনের প্রত্যন্তভাগে আবিষ্কৃত প্রস্তরময় সুদর্শনচক্রে উৎকীর্ণ নৃত্যরত নারায়ণ। পালযুগের অপরাজেয় শিল্পাচার্য্য ধীমান ও তৎপুত্র বীতপাল-নিয়ন্ত্রিত শিল্পিসংঘ হয়ত

চিত্রস্থ বিষ্ণুনটরাজ ভাস্কর্য্যের স্রষ্টা। পাল শিল্পিসংঘ অতঃপর আঙ্করভাটের শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, ইহা অনুমিত হইয়াছে।

৭৫ চিত্র—ত্রিমূর্ত্তি, শিবপুরী (এলিফ্যাণ্টা), ৭৫০ খৃঃ

ত্রিমূর্ত্তির গুহামন্দির (শিবপুরী) বোম্বাই হইতে ৩ ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র দ্বীপমধ্যস্থ অনুচ্চ শৈলগাত্রে সমুদ্র হইতে ২৫০′ উপরে খোদিত। ইতস্ততঃ অনিবিড় অরণ্যাবৃত এলিফ্যাণ্টা দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত ষ্টীমারঘাট হইতে পশ্চিম এবং তৎপরে উত্তরমুখে এক ক্রোশ ঘুরিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে আরোহণ করিতে হয়।

ভারতীয় অন্য অন্য গুহামন্দিরের তুলনায় শিবপুরী মন্দিরের আসনবিন্যাস এবং আকৃতি পৃথক ধরণের। শৈলের একাংশ, ঝুলন্ত বারান্দার মত উদ্গতভাবে খোদিত মন্দিরকে আচ্ছাদিত করিয়াছে; কিন্তু মন্দিরের সহিত সাধারণ দেবায়তনের বিশেষ পার্থক্য নাই। উহার উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমপ্রান্তবর্ত্তী ত্রিসংখ্যক অলিন্দের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণত্রয় উন্মুক্ত। ফলতঃ ইলাপুরীর (এলোরা) কৈলাস মন্দিরের অপরূপ স্তম্ভসমতুল্য রুদ্রচ্ছন্দ, সকোরক কমলমৃণালসদৃশ, স্থূলকায় স্তম্ভাবলীসমন্বিত সুবৃহৎ সভামণ্ডপের প্রস্তরময় কুট্টিমে প্রচুর সূর্য্যালোক প্রবেশ করতঃ ১৭′ উচ্চ বিরাট্ ত্রিমূর্ত্তির পুঞ্জীভূত সৌন্দর্য্যপূর্ণ উদাত্ত গাম্ভীর্য্য প্রকটিত করিয়া দেয়। মন্দিরের আসন ১৩০′×১২৯′।

উত্তরমুখী অলিন্দাবলম্বনে দক্ষিণমুখে সভামণ্ডপে প্রবেশকালে উভয় পার্শ্বের প্রাচীরগাত্রস্থ পাষাণফলকোদ্গত নটরাজের 'সয়ংকাল' এবং 'ভৈরব মহাকাল' তাণ্ডব নৃত্যের বিশাল ভাস্কর্য্যদ্বয় যাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নরমুণ্ডের মাল্যগলে অষ্টভুজ মহাকালের অতিভঙ্গ পাষাণ অঙ্গ ১২′ উচ্চ। অন্য অন্য ফলকে ফলকে 'অর্দ্ধনারী' (শিবশক্তি), হরপার্ব্বতীর পরিণয়, হংসারূঢ় ব্রহ্মা, গরুড়ারূঢ় বিষ্ণু, ঐরাবতপৃষ্ঠে দেবরাজ এবং গঙ্গাবতরণ প্রভৃতির কমনীয় ভাস্কর্য্য। কক্ষের আচ্ছাদনতলে মেঘমণ্ডলে উড্ডীয়মান গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অপ্সর ও বিদ্যাধরগণ এবং প্রস্তরময় মসৃণ গাত্রের ঊর্দ্ধভাগে ভূচর-খেচর-পশুপক্ষিনিচয় এবং তেজোদীপ্ত লতামণ্ডন। শিল্পান্বিত অন্তর্ভাগের সর্ব্বত্র একদা শ্বেত বজ্রলেপলিপ্ত অপিচ বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছিল।

মন্দিরের দক্ষিণ ভাগে, আধ-আঁধার-আধ-আলোকের মোহময় পরিবেশে, ত্রিমূর্ত্তির দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপুটত্রয়ে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-নিয়ন্ত্রণের অটল সঙ্কল্প প্রকটিত। ১৭′ উচ্চ মূর্ত্তির শীর্ষত্রয় পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পশ্চিম প্রান্ত অবধি ২৩′ দীর্ঘ; প্রতিটি আয়ত আনন প্রায় ৫′ উচ্চ।

মহালিঙ্গ (ত্রিমূর্ত্তি) তৎসংপুরুষ মহাশিবের ত্রিবিধ সত্তার ত্রয় প্রতীক্। মধ্যস্থিত 'মহেশ্বর' গৌরীশঙ্কর তদীয় দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত সংহারের প্রতীক্ 'রুদ্র'-ভৈরবের এবং বামপার্শ্বস্থ পোষণের প্রতীক্ 'উমা'-শক্তির সমন্বয়ে 'ত্রিমূর্ত্তি'রূপে সৃজন, পোষণ ও সংহারের নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন।

মহেশ্বরের অনন্ত মহিমা নীলাম্বু জলধি সগর্কে ঘোষণা করিতেছে অম্বর ভেদিয়া সহস্র বর্ষ ব্যাপিয়া।

৭৬ চিত্র—সুন্দরেশ্বর মীনাক্ষী মন্দির, মাদুরা, খৃঃ ষষ্ঠ-সপ্তদশ শতক

৮৫০′ দীর্ঘ এবং ৭২৫′ প্রস্থ শ্রীমন্দির ক্ষেত্র চতুঃসংখ্যক ১৫০′ উচ্চ গোপুরতোরণশোভিত সু-উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত; সমতল শ্রীক্ষেত্রের প্রায় মধ্যস্থলে একপ্রস্থ চতুঃসংখ্যক গোপুর ও অনতি-উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত ৪২০′×৩১০′ অঙ্গনসংলগ্ন গর্ভগৃহ, জগমোহন ও সভামণ্ডপসমন্বিত সুন্দরেশ্বর (শিব) মন্দির। সুন্দরেশ্বরের দক্ষিণ সান্নিধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমমুখী দুইটি গোপুরমসহ অনতি-উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত অন্য একটি ২৫০′×১৬০′ প্রাঙ্গণমধ্যে মীনাক্ষীর মন্দির। সুন্দরেশ্বরের দক্ষিণ এবং মীনাক্ষীর পূর্ব্বপ্রান্তসংলগ্ন স্বর্ণকমল সরোবর।

পূর্ব্ব গোপুরমের উন্নত তোরণমধ্যেই মন্দিরপ্রবেশের প্রধান পথ। নগর হইতে তাহার অভ্যন্তর দিয়া পশ্চিমদিকে মন্দিরাভিমুখে গমনকালে দক্ষিণ পার্শ্বে, সীমানার উত্তরপূর্ব্ব কোণে, দৃশ্যমান সুবিশাল 'সহস্রস্তম্ভ মণ্ডপ' যাত্রিগণের বিস্ময় উৎপাদন করে। সম্মুখস্থ সুপরিসর মহামণ্ডপের সারিবদ্ধ স্তম্ভসম্বলিত বিচিত্র অলিন্দ অবলম্বনে সুন্দরেশ্বর মন্দিরের পূর্ব্ব গোপুরম্ অতিক্রম করিয়া সুন্দরেশ্বর প্রাঙ্গণে উপনীত হওয়া যায়। সেই প্রাঙ্গণের দক্ষিণ গোপুরম্ হইতে মীনাক্ষীর পূর্ব্ব তোরণ প্রায় একশত ফুট দূরে।

চিত্রের বাম ভাগে 'স্বর্ণকমল সরোবর' ও সীমানার দক্ষিণ গোপুরম্; মধ্যভাগে মীনাক্ষীর পূর্ব্ব গোপুরম্ এবং দক্ষিণ ভাগে সুন্দরেশ্বরের দক্ষিণ গোপুরম্ দৃশ্যমান। স্বর্ণকলসশীর্ষ সুন্দরেশ্বর দেবায়তনের অত্যুচ্চ উপরিভাগ এবং অত্যুচ্চ মীনাক্ষী-মন্দিরের স্বর্ণ কিরীট যথাক্রমে সুন্দরেশ্বরের দক্ষিণ গোপুরম্ ও মীনাক্ষীর পূর্ব্ব গোপুরমের পশ্চাতে বিদ্যমান থাকায় চিত্রে দেখা যায় না।

৭৭ চিত্র—সুন্দরেশ্বর মন্দিরের অলিন্দ, মাদুরা, খৃঃ সপ্তদশ শতক

চিত্র পরিচয় ৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৭৮ চিত্র—তাণ্ডব নৃত্য (ব্রোঞ্জ), তাঞ্জোর (মাদ্রাজ), খৃঃ দ্বাদশ শতক

অজ্ঞানতার মূর্ত্ত প্রতীক্ অপস্মার পুরুষকে পদদলিত করিয়া তাণ্ডবের আনন্দনৃত্যে অভিভঙ্গ নটরাজ ব্রহ্মজ্ঞান প্রকটিত করিতেছেন। ব্রহ্মময়ী বিশ্বপ্রকৃতির লাস্যলীলান্বিত প্রভা তোরণশীর্ষে আনন্দের অনলশিখা নৃত্যরত। গৌরীশঙ্করের কম্বুকণ্ঠনিঃসৃত ওঁকারনাদ মহাব্যোমে অনুরণিত হইতেছে।

৭৯ চিত্র—প্রধান মন্দির (৩নং), নালন্দা, খৃঃ সপ্তম শতক

(পুনর্মুদ্রণের স্বত্ব ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত)

গুপ্ত রাজত্বকালীন মগধে, খৃঃ চতুর্থ হইতে সপ্তম শতকের মধ্যে, নালন্দায় ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-প্রভাবিত মহাযানীয় বৌদ্ধমন্দির, চৈত্য ও বিহারসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু উহাদের প্রতিষ্ঠার বহু শত বৎসর পূর্ব্বে একটি সঙ্ঘারাম তথায় সক্রিয় ছিল এবং বুদ্ধ তথায় তিনমাস কাল অবস্থান করতঃ ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, এইরূপ কিংবদন্তী হুয়েন সঙ্ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রায় ২০০০' এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে প্রায় ৭০০' সমতল ভূমি আবৃত করিয়া নালন্দার অবশেষ বিদ্যমান। সীমানার পশ্চিম ভাগে কয়েকসংখ্যক মন্দির ও চৈত্য, পূর্ব্ব ভাগে একাদশ সংখ্যক চৈত্যবিহার এবং একটি ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের ভিত্তি খনিত হইয়াছে। নালন্দায় প্রাপ্ত বহুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তি কলিকাতার যাদুঘরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

খনন হইতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, একটি ক্ষুদ্রকায় সমচতুর্ভুজ মন্দিরকে আচ্ছাদিত করিয়া ষষ্ঠসংখ্যক বৃহৎ ও বৃহত্তর দেবায়তন পরে পরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান চিত্রে দৃশ্যমান চতুরস্র প্রধান-মন্দির সর্ব্বশেষ আচ্ছাদন। ইহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া কয়েকসংখ্যক স্তূপিকা বর্ত্তমান। ইহার চারি কোণে চতুঃসংখ্যক অনতিবৃহৎ স্তূপের গাত্রে, এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সারিবদ্ধ কুলুঙ্গীনিচয়ের মধ্যে, বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের সুচারু মূর্ত্তিগুলি বজ্রলেপে মণ্ডিত করা হইয়াছিল। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে, একটি উচ্চ বেদীর উপরিভাগে, কয়েকটি গোল-ভিত্তি 'নিবেদন (votive) স্তূপ' বিদ্যমান অপিচ বহুপরবর্ত্তী যুগে (বিংশ শতাব্দী?) নির্ম্মিত একটি দারুময় আচ্ছাদনতলে প্রাচীন সমচতুষ্কোণ মন্দিরমধ্যে অবলোকিতেশ্বরের মোহন মূর্ত্তি বিরাজমান। দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে, একটি অপরিসর গৃহমধ্যে, নালন্দার রসায়নবিশারদ-ধর্ম্মাচার্য্য মহর্ষি নাগার্জ্জুনের (?) প্রশান্ত প্রতিমূর্ত্তি সমাসীন।

সীমানার দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রান্তে ১নং মহাচৈত্যবিহার আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহাবিহারের পশ্চিম পার্শ্বসংলগ্ন প্রবেশমণ্ডপের উত্তর-পশ্চিম কোণে পালবংশীয় তৃতীয় নরপতি দেবপালের (নবম শতক) প্রসিদ্ধ তাম্রশাসন সংগৃহীত হইয়াছিল যাহাতে সুবর্ণদ্বীপের অধিপতি বালপুত্রদেবকে নালন্দায় বিহারনির্ম্মাণের জন্য পঞ্চসংখ্যক গ্রামদানের ব্যবস্থা উৎকীর্ণ আছে। খননকালে উক্ত ১নং বিহারের তলদেশে নয়টি স্তর প্রকটিত হয়। স্তরে স্তরে প্রাপ্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের পৃথক পৃথক ভিত্তিপ্রাচীরের প্রকৃষ্ট প্রকৃষ্ট নিদর্শনগুলি প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, উক্ত বিহার অষ্ট বার পরিত্যক্ত এবং পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বিহারের অন্তঃভাগে ছাত্রগণের অবস্থানোপযোগী, প্রশস্ত বারান্দাবিশিষ্ট, সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠ-সমন্বিত, চকমিলান দ্বিতল ভবন বিদ্যমান ছিল। পূর্ব্ব পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ শ্রেণীর মধ্যভাগের পশ্চাতে—বিহার-প্রবেশমণ্ডপের ঋজু ঋজু—একটি পশ্চিমমুখী চৈত্যমন্দির বিপুলায়তন বুদ্ধমূর্ত্তিসহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উহার ১৩' নিম্নস্থ ভূস্তরে বুদ্ধের চরণযুগলের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুচারু তক্ষণশিল্পশোভিত দারুময় স্তম্ভাবলী এবং চতুরস্র ঢালু আচ্ছাদন-সম্বলিত একটি বিচিত্র মণ্ডপ নির্ম্মিত

হইয়াছিল পূর্ব্ব বারান্দাসংলগ্ন প্রশস্ত অঙ্গনে। উক্ত মণ্ডপের আভাস ৪০ চিত্র হইতে পাওয়া যায়। মণ্ডপমধ্যে উচ্চ বেদীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাশ্রমণ (অধ্যাপক) সুপরিসর অঙ্গনোপরি সমাসীন শ্রমণ (ছাত্র)দের শিক্ষাদান করিতেন। অধ্যাপকের পশ্চাতে, মন্দিরের সু-উচ্চ পদ্মাসনে ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট, স্বর্ণাভ-বর্ণরঞ্জিত, বজ্রলেপলিপ্ত, অতিকায় বুদ্ধের প্রশান্ত আনন ছাত্রগণ নিরীক্ষণ করিতে পারিতেন। প্রবেশমণ্ডপের সিংহদ্বার হইতেও সম্মিলিত জনগণ তথাগতকে দর্শন করিতে পারিতেন। বৈশাখ মাসে বিহারপ্রাঙ্গণে সর্ব্বভারতীয় ধর্ম্মসম্মিলন অনুষ্ঠিত হইত, ইহা অনুমান করা যায়। পরবর্ত্তী কোনও সময়ে সেই প্রাঙ্গণোপরি একটি দ্বিতল অথবা ত্রিতল মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। খনন-সাহায্যে উহার অগ্নিদগ্ধ-ইষ্টকনির্ম্মিত সুদৃঢ় ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১নং মহাবিহারের উত্তর-পূর্ব্বে এবং ৭নং ও ৮নং বিহারের পশ্চাতে একটি প্রস্তরময় হিন্দু-মন্দিরের ১০০'×১০০' আসন (পাদপীঠ) দৃষ্ট হয়। উহার উচ্চ পাদপীঠের চতুষ্পার্শ্বে—সারি সারি কুলুঙ্গীর মধ্যে—শিব, পার্ব্বতী, কার্ত্তিকেয়, গজলক্ষ্মী, অগ্নি প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি এবং বহুসংখ্যক সঙ্গীতমুখরা ও বাদনরতা কিন্নরী ও গন্ধর্ব্বী ব্যতীত মকর, সাপুড়িয়া এবং তীরন্দাজ প্রভৃতির চিত্রোৎকীর্ণ পাষাণফলকসমূহ শিল্পরসিকের সোৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

দ্বাদশ শতকের শেষভাগে মুহম্মদ বখ্‌তীয়র খল্‌জী বিহার প্রদেশ বিজয়ান্তে নালন্দা লুণ্ঠিত ও বিনষ্ট করিলে নালন্দা মহাবিদ্যালয় পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

৮০ চিত্র—'নিবেদন-স্তূপ', নালন্দা

(পুনর্মুদ্রণের স্বত্ব ভারতীয় প্রত্নবিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত; চিত্রপরিচয় ৭৯ চিত্রপরিচয়ে দ্রষ্টব্য।)

৮১ চিত্র—দীপঙ্করের তিব্বতাভিযান

(পাঠাগার-প্রাচীরচিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।)

একাদশ শতকে পালসম্রাট্ নয়পালের রাজত্বকালে নালন্দার মহাচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বৌদ্ধনীতি প্রচারকল্পে হিমালয় লঙ্ঘন করিয়া তিব্বতাভিমুখে গমন করিতেছেন।

৮২ চিত্র—প্রসাধনরতা, পম্পেই (রোম), খৃঃ প্রথম শতক

(Hindusthan Standard ও আনন্দবাজার পত্রিকার Managing Director শ্রীঅশোক-কুমার সরকার মহোদয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত।)

মূর্ত্তিটি দর্পণের দণ্ডরূপে ব্যবহৃত হইত। হস্তিদন্তখোদিত বক্ষীর গুরুভার তনু, পীনোন্নত পয়োধর, ক্ষীণ কটির মধুর ভঙ্গিমা, পত্রপুষ্পবহুল সজ্জাভরণ, পত্রলেখা এবং কবরীভূষণের আধিক্য

দ্রষ্টব্য। প্রসাধনান্তে যৌবনভারাবনতা তরুণীর হর্ষোৎফুল্ল চন্দ্রাননের পেলব কমনীয়তা খৃঃ প্রথম শতকে মথুরায় উদ্ভূত কুষাণ ভাস্কর্য্যের স্মারক তথা ভারতবর্ষীয় শিল্পপ্রতিভার পরিচায়ক।

কুষাণযুগের মথুরায় ভাস্করশিল্পিসৃষ্ট—শুকপক্ষীর সহিত ক্রীড়ারতা, দক্ষিণ করে পিঞ্জরধারিণী—সুতনু নারীকে প্রসাধনরতা যক্ষীর সহোদরারূপে বিবেচিত হয়। মথুরার নারী খৃঃ দ্বিতীয় শতকে নির্ম্মিত।

৮৩ চিত্র—সহস্রবুদ্ধ গুহায় প্রাপ্ত চিত্রফলক, পশ্চিম চীন, খৃঃ নবম শতক

উত্তর গগনের পরাক্রান্ত দিক্‌পাল দৈত্যপতি বৈশ্রবণ স্বীয় সৈন্যসামন্ত ও অনুচরবর্গসহ মেঘযানে সাগর অতিক্রম করিতেছেন। তদীয় বামপার্শ্বে শ্রীদেবী। চীনাভারতীয় চিত্রাঙ্কনরীতি অনুসারে তাঙ্‌যুগে বিরচিত চিত্রের বাম কোণে দৃশ্যমান ক্রুদ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষ—দৈত্যপতির অমূল্য রত্নাপহরণে দৃঢ়সঙ্কল্প এবং ব্যোমপ্রান্তে উড্ডীয়মান—খগরাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া, স্বীয় ধনুকে তীর যোজনা করিতেছেন।

৮৪ চিত্র—সোমপুর বিহার-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ, পাহাড়পুর (উত্তরবঙ্গ), খৃঃ সপ্তম-অষ্টম শতক

মহাস্থানগড় (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন) হইতে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১৫ ক্রোশ দূরে অধুনালুপ্ত একটি নদীর পশ্চিম তীরে উচ্চ প্রাকারবেষ্টিত গড়ের মধ্যস্থলে পালযুগীয় সোমপুর মহাবিহার অবস্থিত ছিল। ত্রিতল বিহার-মন্দিরের প্রতি তলে প্রদক্ষিণপথ বিন্যস্ত হইয়াছিল। বিহারকে বেষ্টন করিয়া ৮২২'×৮২২' সঙ্ঘারাম। ১৮৯ সংখ্যক প্রকোষ্ঠ এবং ৯' প্রশস্ত বারান্দাসমন্বিত সমচতুর্ভুজ সঙ্ঘারামের ৯২ সংখ্যক কক্ষের প্রত্যেকটিতে পূজাবেদীর চিহ্ন বিদ্যমান আছে। এতাদৃশ বৃহৎ সঙ্ঘারাম ভারতবর্ষের অন্যত্র দেখা যায় না।

প্রতি প্রদক্ষিণপথের প্রাকারে প্রাকারে সন্নিবদ্ধ, সারিবদ্ধ নক্সাখচিত, বজ্রলেপলিপ্ত, মৃন্ময় ফলকনিচয়ে বিবিধ জীবজন্তু, হংস ও মৎস্য ব্যতীত 'পঞ্চতন্ত্র' ও 'হিতোপদেশ'-বর্ণিত আখ্যায়িকাসমূহ উৎকীর্ণ হইয়াছিল। উহাদের কয়টি নিদর্শন কলিকাতার যাদুঘরে দেখা যায়। মহাবিহারের পাদমূলে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ ৬৩ সংখ্যক নয়নাভিরাম মূর্ত্তির কতকগুলি বর্তমান চিত্রে দ্রষ্টব্য। খননকালে পৌরাণিক দেবদেবীর বহুসংখ্যক মূর্ত্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে।

যবদ্বীপের বরবুদুর, প্রাম্বাণমের চাণ্ডিলোরো জোঙগ্রাঙ্ এবং কম্বোজের আঙ্করভাট মন্দিরের সহিত উহাদের পূর্ব্বে নির্ম্মিত সোমপুর মহাবিহারের মন্দিরবিন্যাস এবং গঠনের সাদৃশ্য উপলক্ষিত হইয়াছে।

৮৫ চিত্র—আনন্দমন্দির, পাগান (উত্তর ব্রহ্ম), খৃঃ একাদশ শতক

ব্রহ্মের বহুপ্রাচীন মোন (তালেইং) সাহিত্যে উল্লিখিত কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে,

প্রিয়দর্শী অশোক, শোন এবং উত্তর নামক দুইজন ধর্মপ্রচারককে সদ্ধর্ম প্রচারার্থে 'সুবর্ণভূমি' ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করার ফলে সিটাং নদীতীরবর্তী তালেইং রাজধানী থাটনের অধিবাসিগণ সাগ্রহে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।

তৎকালে তাম্রলিপ্তি হইতে ভারতীয় বাণিজ্যপোতসমূহ বঙ্গোপসাগর লঙ্ঘনান্তে থাটন বন্দর হইয়া চীনে এবং বৃহত্তর ভারতের অন্যত্র গমনাগমন করিত। ব্রহ্মে সদ্ধর্ম প্রসারণের অনুক্রমে স্থানীয় সংস্কৃতি ও সুকুমার শিল্প ভারতীয় সভ্যতা ও স্থাপত্যদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। ১০৮০ খৃষ্টাব্দে সহস্রবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাপরিপুষ্ট থাটন মহানগরী পেগুরাজ অধিকার এবং বিনষ্ট করেন।

তৎপূর্ব্বে, ৮৪৭ খৃষ্টাব্দে, মন্দালয়ের ৪৫ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে, ইরাবতী নদীতটে, উত্তর ব্রহ্মের—প্রাকার ও সিংহদ্বারবেষ্টিত—অন্যতম রাজধানী পাগান (অরিমর্দ্দনপুরী) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু অরিমর্দ্দনপুরীর আয়তন এবং ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধি ও স্থাপত্য উত্তরোত্তর উন্নত হইয়াছিল ১০১৭ খৃষ্টাব্দে পাগানপতি আনাওরথ (Anawratha) রাজসিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে। উহার আয়তন বর্দ্ধিত হইয়াছিল ৪ ক্রোশ দীর্ঘ ও ১ ক্রোশ প্রস্থ পার্ব্বত্য উপত্যকা আবৃত করিয়া। আনাওরথ ব্রহ্মরাজ্যের সীমানা মালাক্কা, শ্যাম, বঙ্গদেশ এবং চীনপ্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তারিত করিয়াছিলেন। তিনি ৪৩ সংখ্যক নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তদীয় শাসনকালে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ ও হিন্দুমন্দির গঠিত হইয়াছিল। গুপ্ত ও পালযুগে যে সকল ভারতীয় ব্যবসায়ী ও শ্রেষ্ঠিগণ বংশপরম্পরা সুবর্ণভূমিতে বসবাস করিতেছিলেন তাঁহারাই পাগানের হিন্দুমন্দির-গঠনে অংশ গ্রহণ করেন। একাদশ শতকের প্রায় শেষভাগে সিংহলী বৌদ্ধধর্ম এবং পালিভাষা পাগানে প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তাহার কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বেও পাগানে সংস্কৃতভাষা ও হিন্দুসংস্কৃতি-প্রভাবিত মহাযানীয় মতবাদ প্রচলিত ছিল; তাহার প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

পাগানের 'মনুহা'র প্রাসাদসৌধকেন্দ্রী ৯৯৯৯ সংখ্যক দেবদেউল একদা পাগানকে অলঙ্কৃত ও মহিমান্বিত করিয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানকালে পঞ্চ সহস্রাধিক মন্দিরের জীর্ণ ভিত্তিসমূহ প্রাচীন রাজধানীর ইতস্ততঃ পরিদৃষ্ট হয়। পাগান এক্ষণে তরঙ্গায়িত জঙ্গলমধ্যে বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ধ্বংসাবশেষমধ্যে 'মনুহা'র প্রাসাদ ব্যতীত আনন্দ, থাপিন্যু, গড়পালিন, নাটহ্লাউং চাউং প্রভৃতি কয়েকটি উচ্চ-শ্রেণীর দেবমন্দির অভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। হিন্দু-দেবায়তনগুলির মধ্যে কেবলমাত্র নাট-হ্লাউং চাউং বিদ্যমান।

'আনন্দ'-প্রমুখ বৌদ্ধমন্দিরত্রয়ের আসনবিন্যাস ও গঠনরীতি বহুধা ভারতীয় ধরণের। আনন্দ মন্দিরের ১৭৫'×১৭৫' আসনের চতুষ্পার্শ্বসংলগ্ন চতুঃসংখ্যক ৯০' দীর্ঘ × ৫৫' গভীর মুখমণ্ডপ। সপ্ততল দেবায়তন ১৮৩' উচ্চ। ছয়টি তল চতুরস্র এবং ক্রমসূক্ষ্ম স্তরে স্তরে উত্থিত। সপ্তম তল অষ্টকোণী; উত্তরভারতীয় নাগর (গুপ্ত) শৈলীর সমতুল্য ক্রমহ্রস্ব বিমানবিশিষ্ট। অভ্রংলিহ

বিমানের সুবর্ণনিভঘণ্টাকৃতি, ত্তরখণ্ড, কিরীটশীর্ষে কুম্ভ, আমলক এবং স্বর্ণছত্র ('টি')। ৯০'×৯০' চতুরস্র গর্ভগৃহের মধ্যবর্ত্তী চতুর্গাত্রসংলগ্ন চতুঃসংখ্যক উন্নত রত্নবেদীর উপরে চতুঃসংখ্যক ২০ হস্ত উচ্চ, বজ্রলেপলিপ্ত, স্বর্ণমণ্ডিত, বিরাট্ বুদ্ধমূর্ত্তি সমাসীন।

গর্ভমন্দিরের উপরস্থ বিমানভেদী-বাতায়ন পথ হইতে প্রক্ষিপ্ত সূর্য্যাংশু ও চন্দ্রকিরণ প্রতিটি বুদ্ধের স্বর্ণকরণী প্রশান্ত আননে ঝলকিত হইয়া থাকে।

বৈশাখী পূর্ণিমার রজত রজনীর প্রথম প্রহরে হরিদ্রাবাস-পরিহিত 'ফোঙ্গি'-(শ্রমণ)গণ এবং রেশমী 'লোঙ্গি' (লুঙ্গী), 'এইঙ্গি' (জ্যাকেট) ও 'কাপা' (চপ্পল-বিনামা) বিভূষিত, 'তানাখা' (চন্দন)-চর্চ্চিত মং-ফো-লোন্ (ভাই রেশমী গোলা), মা-পান্ (বোন কুসুম) প্রভৃতি গৃহস্থ নরনারীগণ স্ব স্ব অঞ্জলিপুটে সুগন্ধি পুষ্প, মাল্য, ধূপ, চন্দন, কদলী, নারিকেল এবং মোমবাতি প্রভৃতি উপচার বহন করিয়া বুদ্ধের জন্মোৎসব পালনকল্পে চতুষ্পার্শ্বস্থ মণ্ডপমধ্যস্থ অলিন্দপথাবলম্বনে গর্ভমন্দিরে বিরাজমান চৌদিক্‌মুখী চতুঃবুদ্ধের চরণ সমীপে সমবেত হয়েন।

গর্ভমন্দির পরিক্রমণের নিমিত্ত ৯০'×৯০' গর্ভগৃহকে বেষ্টন করিয়া দুইটি সমান্তরাল অলিন্দপথ বিদ্যমান। উভয় পরিক্রমপথের উভয়পার্শ্বস্থ ইষ্টকনির্ম্মিত স্থূল প্রাচীরের বজ্রলেপলিপ্ত সুমসৃণ গাত্রে সিদ্ধার্থের সুন্দর সুন্দর ধ্যানী মূর্ত্তিনিচয় গ্রথিত হইয়াছে তথা বুদ্ধজীবনীর প্রধান প্রধান আখ্যায়িকা-সম্বলিত ৮১ সংখ্যক ভাস্কর্য্যফলক সন্নিবেশিত রহিয়াছে। চৈনিক, ভারতীয় ও শ্লেব স্থাপত্য-কলার সহিত স্থানীয়, সেগুণময়, প্রাচীন তক্ষণশিল্পের অভিরাম মিশ্রণে ব্রহ্মদেশীয় অলঙ্কারবহুল অভিনব স্থাপত্যের বিকাশ। পাগান, প্রোম, মারগুই, থাটন, আরাকান প্রভৃতি প্রদেশে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, গরুড়, হনুমান, শিব, দুর্গা, সূর্য্য ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। নারায়ণের অনন্তশয়ন এবং হরপার্ব্বতীর পরিণয়সংক্রান্ত দ্বিসংখ্যক ভাস্কর্য্যফলকও পরিদৃষ্ট হয়।

পাগানের নাট-হ্লাউং চাউং বিষ্ণুমন্দিরের গর্ভগৃহমধ্যে একটি সমচতুর্ভুজ, সমচতুষ্কোণ, উচ্চ বেদীর চতুর্গাত্রে চতুঃসংখ্যক নারায়ণ সমভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান; গৃহপ্রাচীরগাত্রে ইন্দ্রকোষের (কুলুঙ্গী) মধ্যভাগে দশাবতারের মূর্ত্তিসমূহ গ্রথিত। গর্ভগৃহের উপরে, বিমাননিম্নস্থ, টোপাকৃতি খিলানের বিচিত্র চন্দ্রাতপ। নারায়ণের পূজার্চ্চনার সুব্যবস্থা স্থানীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় সমাহিত করিতেন।

এতদ্বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়ের সচিত্র গ্রন্থ *Brahmanical Gods in Burma* পঠিতব্য। কয়েক বৎসর ব্রহ্মদেশে অবস্থানকালে, বহু গবেষণার ফলে, অধ্যাপক মহাশয় উক্ত গ্রন্থ এবং ভারত ও সুবর্ণভূমির সংস্কৃতি ও শিল্পের সম্বন্ধ-নির্ণায়ক কতিপয় পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন।

Colonel Michael Symes-সঙ্কলিত *An Account of an Embassy to Ava in 1795* এবং Colonel Sir Henry Yule-সঙ্কলিত *Narrative of the Mission to the Court of Ava*

in 1855 নামক গ্রন্থদ্বয় ব্যতীত Dr. James Fergusson-প্রণীত *History of Indian and Eastern Architecture* (1876), ব্রহ্মদেশীয় সংস্কৃতি ও স্থাপত্যশিল্পপ্রসঙ্গে বহু চিত্রসহ বহুবিধ তথ্য প্রদান করে। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি কলিকাতার 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী'তে রক্ষিত আছে।

সুবর্ণভূমির ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সমাজজীবন-বিকাশে ভারতের অবদান অপ্রমেয়। হিন্দুর সংস্কার ও ধর্ম্মবিশ্বাস প্রাচীন ব্রহ্মবাসীর জীবনে ওতপ্রোতভাবে বদ্ধমূল হইয়াছিল। সংস্কৃত বর্ণমালাই ব্রহ্মদেশীয় সাহিত্যের বর্ণমালার জনক। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ইয়ুল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ মিণ্ডোনমিনের রাজ্যাভিষেককালে ব্রহ্মরাজবংশের ব্রাহ্মণগুরু বারাণসী হইতে আনীত গঙ্গাজল সিঞ্চনে মিণ্ডোনমিনের দেহ ও চিত্ত শুদ্ধকরতঃ, হিন্দুশাস্ত্রসম্মত অভিষেকানুষ্ঠানে, সংস্কৃতভাষায় মন্ত্রপাঠসহ, তদীয় ললাটে রাজতিলক পরাইয়াছিলেন। সমগ্র উৎসব হিন্দুরীতির বহুধা অনুসরণ করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে তৎ-প্রতিষ্ঠিত মন্দালয় (মিণ্ডোনালয়?) রাজপ্রাসাদের আসনবিন্যাস হইয়াছিল হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের নির্দ্দেশানুযায়ী। অরিমর্দ্দনপুরী এবং পরবর্ত্তী রাজধানীদ্বয়, আভা ও অমরপুর, হিন্দু শিল্পশাস্ত্রের বিধানমত বিন্যস্ত হইয়াছিল।

অরিমর্দ্দনপুরীর 'থর্ব' (Tharba) তোরণসান্নিধ্যে প্রাপ্ত, মোন ভাষায় উৎকীর্ণ, লিপিমালা হইতে জানা যায় যে, তোরণ-প্রতিষ্ঠাকালে, ব্রাহ্মণ জ্যোতিষিগণ কদলীগুচ্ছ ও ইক্ষুদণ্ডদ্বারা তোরণকে সজ্জিত এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যময় ভৃঙ্গারসমূহে রক্ষিত গঙ্গাজলে তোরণের স্তম্ভগুলি পরিশুদ্ধ করিয়া, একটি নূতন মাদুরোপরি বিস্তৃত তণ্ডুল (আতপ?), কদলী ও দূর্ব্বা, স্বর্ণাভ পুষ্পরাশি ও মোমবাতি প্রভৃতির উপচার অর্পণে বাস্তুদেব নারায়ণের পূজা সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

পাগানরাজের বিশাল দরবারে বহুসংখ্যক 'পোন্না' ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, জ্যোতির্ব্বিদ এবং বাস্তুনির্ম্মাণবিশারদ ব্রাহ্মণশিল্পী সম্মানের আসন পাইয়াছিলেন।

সুদূর সহরে ধান্য বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে—মা-মী (বোন অধীনী), মা-হেন্ (বোন বিলাসিনী) প্রভৃতি গৃহকর্ত্রীগণের নেতৃত্বে জঙ্গলাঞ্চলীয় পল্লীগ্রামসমূহের প্রধান কো-মং-গ্নে (বড়ভাই ক্ষুদ্র)-প্রমুখ কৃষকগণ সেগুণকাঠের নৌকাতে ধান্য বোঝাই করিয়া, 'পিয়াক-কা-ড্যিন' (পঞ্জিকা)-নির্দ্দিষ্ট শুভক্ষণে নদীতীর পরিত্যাগ করিবার প্রাক্কালে, ধান্য, দূর্ব্বা, পান, সুপারি, ইক্ষুগুড় ও পক্ককদলীর নৈবেদ্যপ্রদানে গঙ্গাদেবী 'জীয়েনাৎ'-এর পূজা করিয়া থাকেন।

সুচিরযৌবনা ইরাবতীর পাগানঘাটস্থ বিস্তৃত মঞ্চ ('জেটি') হইতে, উত্তুঙ্গ চড়াইপথে, প্রবাসী পর্য্যটক উপত্যকার উপরে আরোহণ করিলে—কুন্দশুভ্র মন্দিরমঠের বরমাল্যবিভূষিত নীলকান্তি 'টাউংজি' শৈলরাজের প্রসারিত ক্রোড়মধ্যে অবস্থিত, 'অরিমর্দ্দনপুরীর' দেবদেউলের অরণ্যমাথারে

বিরাজমান, 'আনন্দ' মন্দিরের হেমময় ছত্রশীর্ষস্বর্ণকিরীট তাঁহার লোৎসুকচিত্তকে সর্ব্বপ্রথম আকর্ষণ করে।

সায়াহ্নে প্রত্যাবর্ত্তনকালে, হরিৎবরণী স্রোতস্বিনীর বক্ষসায়রে কম্পমান, যন্ত্রচালিত অর্ণবপোত হইতে অরণ্যসমাকীর্ণ অরিমর্দ্দনপুরীর মর্ম্মন্তুদ ধ্বংসাবশেষের প্রতি নেত্রপাত করিলে—, বৃক্ষপুঞ্জের অন্তরালে, অস্তাচলগামী-দিনমণিদীপ্ত, সপ্ত-স্তর-স্বর্ণছত্র-সমৃদ্ধ, 'আনন্দ' দেবায়তন—আনন্দলোকের মঙ্গলালোকস্নিগ্ধ সত্যনিকেতন—দর্শকের অন্তরাত্মাকে বুদ্ধ ভগবানের চরণারবিন্দে বিলীন করিয়া দেয়।

৮৬ চিত্র—আদিনা মসজিদের 'মেহ্‌রাব', পাণ্ডুয়া (গৌড়), খৃঃ চতুর্দ্দশ শতক

চতুর্দ্দশ শতকের মধ্যভাগে পাঠান সুলতান সেকেন্দার শাহ তৎকালীন গৌড়বঙ্গীয় রাজধানী পাণ্ডুয়ায় (মালদহ) তদীয় আদিনা মসজিদ প্রতিষ্ঠিত করেন। মসজিদের আয়তন প্রায় ৫০০'×৩০০'। উহার অভ্যন্তরস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্বে ৮৮ সংখ্যক খিলান এবং ২৬৬ সংখ্যক স্তম্ভবিশিষ্ট, দুই প্রস্থ ৭৫' ও ১০০' প্রশস্ত দরদালান।

পশ্চিমভাগের, চতুঃসারি স্তম্ভাবলীসহ ১০০' প্রশস্ত, অলিন্দের অন্তর্বর্ত্তী যে 'মেহ্‌রাব' হইতে ধর্ম্মপ্রাণ মোয়াজ্জীন মক্কাতীর্থের পবিত্র 'কাবা'র অভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্বাসিগণকে উপাসনার জন্য মসজিদে সমবেত হইতে আহ্বান করিতেন এবং তাঁহারা একত্রিত হইলে ইমাম সাহেব জমাঅত্ গান করিতেন, পাল-সেন স্থাপত্যে গঠিত সেই 'মেহ্‌রাব'-এর আকৃতি চিত্রে দ্রষ্টব্য।

৮৭ চিত্র—সিংহপুর, চম্পা (বৃহত্তর ভারত) প্রাক্-মধ্যযুগ
(প্রাচীন চিত্রের পুনর্মুদ্রণ।)

মাস্তল-পাল-বিশিষ্ট অর্ণবপোতপূর্ণ বিস্তৃত নদীসঙ্গমের প্রসারিত তটভাগের প্রশস্ত ঘাটে গুপ্তস্থাপত্য-প্রভাবিত শিখর-মন্দিরশোভিত প্রাচীন চ্যাম রাষ্ট্রের শিল্পৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধ রাজধানী সিংহপুরের একাংশ।

৮৮ চিত্র—চাণ্ডিকলসন, যবদ্বীপ, ৭৭৮ খৃঃ

দ্বীপময় ভারতের গহন অরণ্যচ্যুত সেগুণ, মেহগিনি, আবলুস প্রভৃতি সারবান্ কাষ্ঠসম্ভূত তক্ষণশিল্পজাত পরম্পরাগত অনাড়ম্বর অলঙ্করণে হয়ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃহত্তর ভারতীয় —প্রস্তরময় অথবা ইষ্টকময়—আবাসভবন ও ধর্ম্মগৃহ রূপায়িত হইত। খ্রীষ্টজন্মের পরবর্ত্তী কাল হইতে তদ্দেশীয় ধারাবাহিক স্থাপত্যপদ্ধতির সহিত ভারতীয় স্থাপত্যরীতির উত্তরোত্তর মিশ্রণে—ভারতীয় বণিক্‌সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবায়তনের প্রভাবে—দ্বীপময় তথা বৃহত্তর ভারতের বিবিধ দেবায়তন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্থাপত্যশৈলীর বহুলাংশ গুপ্ত-দ্রাবিড় স্থাপত্যের আদর্শে

বিকশিত হইলেও, স্থানীয় তক্ষণশিল্পের অনুপ্রেরণায়, উহাদের বিন্যাসপ্রণালী ও শিল্পায়ন বহুক্ষেত্রেই পূর্ব্বতন প্রথাপদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিল, ইহা অনুমান করিলে সম্ভবতঃ ভুল হয় না।

উত্তরভারতীয় নাগরশিখর মন্দিরের অনুরূপ দেবদেউলের নিদর্শন এবং আচ্ছাদনের ভারবাহী—কারুমণ্ডিত অথবা নিরাভরণ—কোনও স্তম্ভ বৃহত্তর ভারতের প্রাচীন মন্দিরসৌধে পরিদৃষ্ট হয় না। প্রাচীন ভারতীয় মন্দির ও সৌধনির্ম্মাণের উপকরণভুক্ত চুণ ও সুরকি অথবা বালুকামিশ্রিত 'আগাড়' (mortar) তত্রস্থ প্রাচীন দেবালয় ও আবাসগৃহ-নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হইত কিনা তাহা অজ্ঞাত; কিন্তু ভারতীয় বাস্তুনির্ম্মাণ প্রথামত উদ্গত প্রস্তরের অথবা উদ্গত ইষ্টকের কোণাকৃতি খিলানের উপরে প্রস্তরের অথবা সুদৃঢ় কাষ্ঠের সর্দ্দল রাখিয়া তদুপরি গুরুভার বিমান ও গৃহাচ্ছাদন গঠিত হইত।

সেগুণসমৃদ্ধ যবদ্বীপ এবং কম্বুজের হিন্দু ও বৌদ্ধদেবায়তন-নির্ম্মাণের প্রথম পর্ব্বে সেগুণ-কাষ্ঠই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইত। খৃঃ সপ্তম শতকে মধ্য যবদ্বীপের ডিয়েং (Dieng) উপত্যকায় প্রতিষ্ঠিত 'অর্জ্জুন, শ্রীকেন্দি, ধর্ম্মরাজ' প্রভৃতি প্রস্তরময় শিবমন্দিরসমূহের উপরিভাগ দক্ষিণ-ভারতীয় মহাবলীপুরের—দারুময় স্থাপত্যের অনুকারী—রথমন্দিরের স্তরবদ্ধ-শিখরের অনুকৃতি। বাহুল্য-বর্জ্জিত, লঘুভার-অলঙ্কার-চিহ্নিত, অপরিসর মুখমণ্ডপ এবং ক্ষুদ্রায়তন, নিরাভরণ, গর্ভগৃহসমন্বিত প্রাথমিক পল্লবমন্দিরের আদর্শেই উহারা পরিগঠিত হয়। মুখমণ্ডপের শীর্ষভাগে কীর্ত্তিমুখ উদ্গত হইত। ডিয়েং অঞ্চলীয় মন্দিরশিখরস্থ স্তূপিকাসমূহ, স্থানোপযোগী বৈশিষ্ট্যমূলক হওয়া সত্ত্বেও, দ্রাবিড় শিবায়তনের স্তূপাকৃতি-শিখরের বহির্ভারতীয় অভিব্যক্তি।

চিত্রে প্রদর্শিত চাণ্ডি (মন্দির) কলসন গুপ্ত-পল্লব মন্দিরের আদর্শে গঠিত। তান্ত্রিক (মহাযানীয়) তারাদেবীকে উহা উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। মকর ও লতামণ্ডনভূষিত বৃহৎ বৃহৎ কীর্ত্তিমুখ মন্দিরের প্রবেশ তোরণ এবং বাতায়নের উপরে খোদিত আছে। স্তূপিকাশীর্ষ মন্দির চূড়া ভূলুণ্ঠিত হইয়াছে।

৮৯ চিত্র—স্তূপমন্দির, বরবুদুর (যবদ্বীপ), ৮৫০ খৃঃ

সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে মধ্য যবদ্বীপে একটি ক্ষুদ্র অর্দ্ধ-ভূমণ্ডলাকার পর্ব্বতশৃঙ্গ খোদিত করিয়া ৫০০'×৫০০'×১১৬' উচ্চ একটি স্তূপমন্দির গঠিত হইয়াছিল। নবমতল মন্দিরের অঙ্গ চারি ভাগে বিভক্ত করা যায়; প্রথম ভাগ সু-উচ্চ পাদপীঠ, দ্বিতীয় ভাগ পঞ্চমসংখ্যক চতুরস্র-ক্রমহ্রস্ব উন্নত চত্বর, তৃতীয় ভাগ ত্রিসংখ্যক ক্রমহ্রস্ব-সুগোল চত্বর, চতুর্থ ভাগ—অষ্টম চত্বরের সুগোল প্রাঙ্গণস্থিত, সূচল-ঘণ্টাসদৃশ শিখরসমন্বিত—বৃহৎ স্তূপমন্দির।

বৃহৎ স্তূপমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এবং নিম্নের সুগোল চত্বরত্রয়কে বেষ্টন করিয়া যথাক্রমে ১৬, ২৪ এবং ৩২ অর্থাৎ সর্ব্বসমেত ৭২ সংখ্যক সূচল ঘণ্টাবৎ স্তূপিকামন্দির বিদ্যমান আছে। প্রত্যেক

স্তূপিকামন্দিরের গাত্রভাগ চতুঃসারি—সমবাহু, অসমকোণী চতুর্ভুজ ('রুইতনের টেক্কা'র মত)—গবাক্ষবিশিষ্ট। প্রতিটি মন্দিরে প্রশান্ত আনন তথাগত পদ্মাসনে ধ্যানরত।

দ্বিসপ্ততিতম স্তূপিকামন্দির-বিশিষ্ট, অতিকায় স্তূপমন্দিরশীর্ষ, নবমঞ্জরী বরবুদুর—ত্রিসপ্ততিতম দেবায়তনরূপে নীলাম্বরের চন্দ্রাতপতলে বিরাজমান।

উচ্চ পাদপীঠের এবং অষ্টসংখ্যক চত্বরতলের প্রতিটির চতুর্দিকে, চারিটি হিসাবে, ৯×৪=৩৬ সংখ্যক প্রশস্ত সোপানপথ বর্তমান আছে। প্রতি চত্বরের চতুঃপ্রান্তের মধ্যভাগে উক্ত সোপানপথ আচ্ছাদিত করিয়া এক একটি মকরতোরণ। প্রতিটি মকরতোরণ কীর্তিমুখশীর্ষ তথা কমনীয় কারুকলামণ্ডিত।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ চত্বরবেষ্টনী প্রদক্ষিণপথের উভয় পার্শ্বে স্থূলাকার প্রস্তর-প্রাচীর। উভয় প্রাচীরের অন্তর্ভাগে বুদ্ধজীবনীর প্রধান প্রধান আখ্যায়িকাবলী উৎকীর্ণ। এতদ্ভিন্ন আবাসভবন, প্রাসাদসৌধ, রাজসভা, চৈত্যমন্দির, পূজার দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি, শকটযান, অর্ণবযান ও গৃহস্থলী তৈজস প্রভৃতি এবং উদ্যান-অরণ্য, পশুপক্ষী, কিন্নরকিন্নরী, বিদ্যাধরবিদ্যাধরী প্রভৃতি প্রাচীরগাত্রে সুচারুরূপে উৎকীর্ণ আছে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ চত্বরবেষ্টনী স্থূল প্রাচীরে—সারিবদ্ধ চারিপ্রস্থ—১৩০০ সংখ্যক শিল্পফলকসমূহের সমবেত দৈর্ঘ্য দেড় ক্রোশের অধিক হইবে।

মর্মস্পর্শী মণ্ডনসমৃদ্ধ অভিনব বরবুদুরের বিরাট্ গঠন ভূমার উদ্দীপক। উহার ভাস্কর্যরাশি অতীব সুন্দর। ভারতীয় শিল্পাত্মা দ্বারা উহা সর্বতোভাবে প্রভাবিত। সুঠাম সুডৌল বরবুদুর ভুবনপ্রসিদ্ধ দেবায়তনসমূহের অন্যতম। দেবধামের গঠনরচনা স্থানীয় পারম্পরীণ স্থাপত্যরীতিপ্রসূত ; কিন্তু উহার আত্মা ভারতীয় পাল-চোল শিল্পসংস্কৃতির সঞ্জীবনীসিঞ্চনে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। উহার স্বর্ণকিরীটের, হেমমুকুটের, বিচিত্র রূপায়ণ পল্লবমন্দিরের স্তূপশিখরের কমনীয় বিকাশন। সমাধিমগ্ন বরবুদুর মহাযোগী সমন্তভদ্রের শাশ্বত সত্তার মহান্ প্রতীক।

নবমতল রত্নমন্দিরের অষ্টম চত্বর হইতে—বিবিধ বর্ণোজ্জ্বল, দিগন্তপ্রসারিত, উপত্যকার সুদূর সীমান্তস্থিত অস্পষ্ট আগ্নেয়গিরির ধূম্রায়মান কলেবর বয়োবৃদ্ধ দৈত্যপতির লোলচর্ম জীর্ণ তনুবৎ প্রতীয়মান হয়।

৯০ চিত্র—চাণ্ডি লোরো জোঙ্‌গ্রাঙ্, প্রাম্বাণম (যবদ্বীপ), খৃঃ নবম-দশম শতক

একশত বৎসর কাল দ্বীপময় ভারত শাসনান্তে ৮৬০ খৃষ্টাব্দে বরবুদুরস্রষ্টা শৈলেন্দ্ররাষ্ট্রের অবসান হইলে, যবদ্বীপের পূর্বতন রাজবংশীয় অভিজাত ব্যক্তিবর্গ পূর্ব-যবদ্বীপ হইতে মধ্য-যবদ্বীপান্তর্গত প্রাম্বাণমে (ব্রহ্মবনং) আসিয়া নবরাজ্যস্থাপন করতঃ চাণ্ডি সেবু (সহস্রমন্দির)-প্রমুখ

সুশোভন বৌদ্ধ দেবায়তনসমূহ এবং বহুসংখ্যক হিন্দু দেবালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। মহাযানীয় বৌদ্ধসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি অজন্টা-স্থাপত্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইলাপুরীয় (এলোরা) শৈব দেবায়তন কৈলাসের সবল স্থাপত্যের সমতুল্য বৃহত্তরভারতীয় বৌদ্ধসংস্কৃতির অন্যতম অমর অবদান বরবুদুর স্তূপমন্দিরের অভিরাম শিল্পের সমস্পর্দ্ধী—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর-অধিষ্ঠিত—ত্রিতল ব্রাহ্মণ্য-দেবায়তন চাণ্ডি লোরো জোঙ্ গ্রাঙের অনুপম শিল্পশ্রীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন প্রাম্বাণমের ধর্ম্মপ্রাণ শৈবনরপতি রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ 'দক্ষ'। ডক্টর কুমারস্বামী, স্যর ষ্টামফোর্ড র‍্যাফলস্ প্রভৃতি প্রখ্যাত শিল্পবিচারকগণের নিরপেক্ষ অভিমতে সমগ্র যবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পসমৃদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেবায়তন—চাণ্ডি লোরো জোঙ্ গ্রাঙ্।

বরবুদুর-শীর্ষস্থ স্তূপমন্দিরকেন্দ্রী তিন সারি, ৭২ সংখ্যক, স্তূপিকামন্দিরের অনুরূপ ত্রিতল চাণ্ডি লোরোর বিষ্ণু-শিব-ব্রহ্মা মন্দিরকেন্দ্রী তিন সারি, ১৫৬ সংখ্যক, দেবদেউল—গ্রহাধীশ সূর্য্য এবং গ্রহরাজ চন্দ্র ও বৃহস্পতিকে আবেষ্টনকারী গ্রহপুঞ্জসদৃশ—মহাসত্যের শাশ্বত আলোকে একদা দীপ্তিময় ছিল।

তৃতীয় তলের সুপরিসর প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে বিপুলায়তন পাদপীঠের উপরে ত্রিমূর্ত্তির ত্রিমন্দির গঠিত হইয়াছিল। মধ্যস্থিত শিবমন্দিরের গর্ভগৃহে, নাগরাজ বাসুকিচিহ্নিত পাষাণবেদিকার উপরিভাগে দণ্ডায়মান, ষষ্ঠ হস্ত উচ্চ, চতুর্ভুজ মহেশ্বরের শক্তিমান্ প্রশান্ত আনন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শিখরহীন মন্দিরের নিম্নভাগের পরিমাণের অনুপাতে স্থির করা যায় যে, মন্দিরের বিমান বহু উচ্চ ছিল।

শিবমন্দিরের উভয় পার্শ্বে ব্রহ্মা ও বিষ্ণু মন্দিরদ্বয়ের নিম্নাংশ দৃষ্ট হয়। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সমভঙ্গ গঠনসৌষ্ঠব তথা জ্ঞানদীপ্ত উদাত্ত ভঙ্গিমা অতুলনীয়—অপূর্ব্ব সুন্দর। বিগ্রহটি স্থানীয় শিল্পসংগ্রহ-শালায় সুরক্ষিত আছে।

বরবুদুরের চত্বরে চত্বরে, প্রাচীর বেষ্টনীর অন্তর্ভাগে, যেরূপ বুদ্ধজীবনী খোদিত আছে চাণ্ডি লোরোর পরিক্রমপথের পাষাণপ্রাকারের অন্তর্ভাগেও তদ্রূপ রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড হইতে লঙ্কাকাণ্ড-সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ আখ্যানসমূহ অপরূপ লাবণ্যসম্পাতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ভাস্কর্য্য-নিচয়ের নিদর্শন তথায় বিদ্যমান আছে। অনুমিত হইয়াছে যে, রামায়ণের পরবর্ত্তী অংশের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলিও ব্রহ্মামন্দিরের পরিক্রমপথের প্রাকারগাত্রে উৎকীর্ণ হইয়াছিল; উহারা এক্ষণে ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে নিহিত আছে।

বরবুদুর হইতে দশ ক্রোশ পূর্ব্ব-দক্ষিণে, প্রাচীন হিন্দুরাজধানী প্রাম্বাণমের ধ্বংসাবশেষমধ্যে, চাণ্ডি লোরোর ভগ্নাংশ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে।

৯১ চিত্র—রামকর্তৃক বালিবধ, চাণ্ডি লোরো জোঙ্‌গ্রাঙ্‌, খৃঃ নবম-দশম শতক

প্রায় ত্রিশ ফুট দীর্ঘ পাষাণফলকে উৎকীর্ণ ভাস্কর্যমালার মাধ্যমে কমললোচন রামচন্দ্রের দিব্য দেহী মোহনভঙ্গিমাসমৃদ্ধ ও চন্দ্রাননের মাধুরিমা-মহিমা বিচ্ছুরিত প্রাণবন্ত চিত্র প্রতীয়মান। ঋষ্যমূক পর্ব্বতারণ্যের সতেজ তরুর সজীব কিশলয় দ্রষ্টব্য। উহা সাঁচির বেদিকাফলকে উদ্গত আম্র ও চম্পকশাখার লীলায়িত প্রশাখাপুষ্ট মুকুলিত ফলফুলের এবং পেলব পত্রগুচ্ছের, কোরকস্তবকের, প্রফুল্ল সরসতা স্মরণ করাইয়া দেয় (১৫ চিত্র)।

৯১ক চিত্র—রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধ, চাণ্ডি লোরো জোঙ্‌গ্রাঙ্‌, খৃঃ নবম-দশম শতক

মদমত্ত দশাননের অঙ্কপাশে আবদ্ধা ক্রন্দনরতা সীতাকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে পক্ষিবর জটায়ু রাবণকে আক্রমণ করিয়াছেন। রাবণের কবল হইতে মুক্তি পাইবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা সীতার সর্ব্ব-অঙ্গের সর্ব্বশিরা-উপশিরায় সম্যক্‌ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রাম্বাণমের অনুপম ভাস্কর্য্যে গুপ্তপর্য্যায়ী মূর্ত্তিশিল্পের চরম উৎকর্ষ সমাহিত হইয়াছিল।

৯২ চিত্র—গণেশ-চিত্রখোদিত মৃৎফলক, মধ্য আমেরিকা

(Hewith-সঙ্কলিত *Primitive Traditional History* হইতে পুনর্মুদ্রিত)

চিত্রে দ্রষ্টব্য গণেশ ব্যতীত ভারতীয় ধরণের অন্তবিধ মূর্ত্তি, হস্তী, হংস, পদ্ম, মকর প্রভৃতির সুন্দর সুন্দর কল্পচিত্রখোদিত কয়েক সংখ্যক ফলক মধ্য আমেরিকায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। New Yorkএর Natural History Museum এবং Philadelphia প্রভৃতি মহানগরীর শিল্প-সংগ্রহশালায় সেইগুলি সংরক্ষিত আছে।

৯৩ চিত্র—মঠ, মধ্য আমেরিকা

(New York Sun সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিত্রের পুনর্মুদ্রণ)

চিত্রের মধ্যভাগে দৃশ্যমান 'রেড ইণ্ডিয়ান মায়া'-মঠ মধ্য আমেরিকার অন্তর্গত Yucatan অঞ্চলে গহন অরণ্যমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রস্তরময় মঠের স্থাপত্যে নালন্দার তথা গুপ্ত-দ্রাবিড় শিল্পসংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান।

উদ্গত-চৈত্যবাতায়নশীর্ষ প্রবেশদ্বার, গুরুভার আলিসা, লতামণ্ডন এবং ভাস্কর্য্যনিচয় গুপ্ত-দ্রাবিড় শিল্পরীতির সঙ্কেত করিতেছে। চৈত্যবাতায়নমধ্যে ধ্যানাসনে (?) উপবিষ্ট কয়েকটি প্রতিমূর্ত্তি উৎকীর্ণ।

৯৪ চিত্র—শিববুদ্ধ, পূর্ব্ববঙ্গ, খৃঃ একাদশ শতক

(আশুতোষ মিউজিয়ম)

পূর্ব্ববঙ্গের বরিশাল অঞ্চলীয় হাবিবপুর গ্রামে প্রাপ্ত 'ব্রোঞ্জ'-নির্ম্মিত শিবলোকেশ্বর।

৯৫ চিত্র—বিজয়সিংহের সিংহলযাত্রা, খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতক

(পাঠাগার প্রাচীরচিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সৌজন্যে মুদ্রিত)

প্রাগৈতিহাসিক যুগের পশ্চিমবঙ্গের রাজপুত্র বিজয়সিংহ অশ্বমুখী অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া তাম্রলিপ্ত হইতে সিংহলে গমন করিবার প্রাক্কালে অনুচরবর্গসহ নদীতটে আসিয়াছেন। সিংহল বিজয়ান্তে তিনি তথায় একটি হিন্দু উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।

৯৬ চিত্র—গুপ্ত ও শশাঙ্কমুদ্রা

(১) সমুদ্রগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা (৩৩৫—৩৭৫ খৃঃ)

চিত্রের মধ্যভাগে বামপার্শ্বে; পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট, বীণাবাদনরত, সঙ্গীতবিশারদ গুপ্ত-সম্রাট্।

(২) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের স্বর্ণমুদ্রা (৩৭৫—৪১৩ খৃঃ)

চিত্রের মধ্যভাগে দক্ষিণ পার্শ্বে; দক্ষিণ হস্তে ধনুর্ধারী চন্দ্রগুপ্ত বাম হস্তদ্বারা তূণ হইতে বাণ লইতেছেন; বামপার্শ্বে গরুড়ধ্বজ।

চিত্র নিম্নে মধ্যভাগে প্রদর্শিত মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে, দক্ষিণ হস্তে পাশ ও বাম করে কমল-ধারিণী, কমলাসনে উপবিষ্টা শ্রীদেবী।

(৩) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অন্যবিধ মুদ্রা।

চিত্রের উপরে বাম পার্শ্বে; ধনুর্ধারী গুপ্তসম্রাট্ সিংহ সংহার করিতেছেন।

চিত্রের উপরে মধ্যভাগে প্রদর্শিত মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে; সিংহপৃষ্ঠে পদ্মপাণি অম্বিকা।

(৪) প্রথম কুমারগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রা (৪১৪—৪৫৫ খৃঃ)।

চিত্রনিম্নে বাম পার্শ্বে; রণসাজে রথারূঢ় সম্রাট্ কুমারগুপ্ত।

(৫) মহারাজা শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রা (৬০০—৬২০ খৃঃ)।

চিত্রের উপরে দক্ষিণ পার্শ্বে; বৃষোপরি উপবিষ্ট শশাঙ্ক (ভ্রমক্রমে মুদ্রার শীর্ষভাগ নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে)।

চিত্র নিম্নে দক্ষিণ পার্শ্বে প্রদর্শিত মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে; কমলোপরি উপবিষ্টা শ্রীদেবী।

৯৭ চিত্র—গোপালদেবের রাজ্যাভিষেক

(পাঠাগার প্রাচীরচিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রজাপূর্ণ রাজসভামণ্ডপের সুচারু চন্দ্রাতপ নিম্নে স্বর্ণসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, গৌড়-বঙ্গের সর্ব্বপ্রথম পাল নরপতি, গোপালদেবের রাজ্যাভিষেককালে রাজগুরু ব্রহ্মর্ষি তদীয় ললাটে রাজতিলক পরাইতেছেন।

৯৮ চিত্র—শ্রীচৈতন্য ও প্রতাপরুদ্র

(৺দীনেশচন্দ্র সেনের শিল্প-সংগ্রহশালা)

মধ্যযুগীয় বিষ্ণুপুরে (বাঁকুড়া) প্রাপ্ত খৃঃ সপ্তদশ শতকের বহুবর্ণ চিত্র; প্রবল পরাক্রান্ত উৎকল নরপতি প্রতাপরুদ্রদেব এবং তদীয় মহিষী ভক্তিভরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবা করিতেছেন।

৯৯ চিত্র—রাধাকৃষ্ণ, পাহাড়পুর (উত্তরবঙ্গ), খৃঃ অষ্টম শতক

সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষমধ্যে প্রাপ্ত, অগ্নিদগ্ধ মৃৎফলকে উৎকীর্ণ রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি পালভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনসমূহের অন্যতম।

১০০ চিত্র—সশক্তি-হেবজ্র, খৃঃ দশম শতক

(৺বাহাদুরসিং সিংঘীর শিল্প-সংগ্রহশালা, কলিকাতা; তদীয় পুত্র শ্রীনরেন্দ্রসিং সিংঘী, এম.এস-সি., এল.এল-বি., এম.এল.সি. মহোদয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত পালযুগীয় 'ব্রোঞ্জ'-ভাস্কর্য্যের অতুলনীয় নিদর্শন।

১০১ চিত্র—গঙ্গা, রাজসাহী (উত্তরবঙ্গ), খৃঃ একাদশ শতক

(আশুতোষ মিউজিয়ম)

বরেন্দ্রী বঙ্গের রাজসাহী সান্নিধ্যে আবিষ্কৃত প্রস্তরময় গঙ্গামূর্ত্তি।

১০২ চিত্র—শ্রীরামকৃষ্ণদেব

(পাঠাগার প্রাচীর চিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি মনীষিগণ কলিকাতার উপকণ্ঠে ভাগীরথীতীরস্থ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে উপবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শ্রীমুখনিঃসৃত কথামৃত উপভোগ করিতেছেন।

১০৩ চিত্র—শ্রীদুর্গা, মুর্শিদাবাদ (উত্তরবঙ্গ)

একহস্ত উচ্চ হস্তিদন্তে খোদিত দুর্গাপ্রতিমা আধুনিক বঙ্গের সুকুমার শিল্পসমূহের অন্যতম।

১০৪ চিত্র—গৌরীশঙ্কর

[চিত্রশিল্পী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী ডালমিয়া, বি.এ. (অনার্স, সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত), মহোদয়ার সৌজন্যে মুদ্রিত]

শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সাধুসন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রী নরনারীগণ গৌরীশঙ্করের আরাধনা ও আরতি করিতেছেন।

দেব-দেবী ও ঋষি-মহর্ষিগণের লীলা ও সাধনাক্ষেত্র গৌরীশঙ্করশীর্ষ-হিমালয় আর্য্যবৈদিক ব্রাহ্মণগণের বেদ-, বেদাঙ্গ- ও মনোদর্শন-প্রণয়নে প্রেরণা প্রদান করিয়াছিল। ত্রিগুণাত্মা গৌরীশঙ্কর ভারতীয় সভ্যতা, সাহিত্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, সঙ্গীত, নৃত্য ও শিল্পকলার নিয়ন্তা।

১০৫ চিত্র—লেখননিরতা, ভুবনেশ্বর, খৃঃ একাদশ শতক

উড়িষ্যার অন্তর্গত ভুবনেশ্বর ধর্ম্মক্ষেত্রে বিরাজমান প্রস্তরময় রাজরাণী মন্দিরের বহির্গাত্রে উদাত্ত অনুপম ভাস্কর্য্য।

১০৬ চিত্র—সম্বোধিলাভ

(সারনাথে নবনির্ম্মিত মহাবোধি বিহারের অন্তর্ভাগে চিত্রিত; মহাবোধি সোসাইটির প্রধান-কর্ম্মসচিব শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ, বি.এ. মহোদয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

উরুবিল্ব মহারণ্যের বোধিদ্রুম বনস্পতিমূলে ঐন্দ্রজালিক মারের দানবীয় শক্তি এবং তদীয় অপূর্ব্বসুন্দরী, হাস্যলাস্য-নৃত্যরতা, সুতন্বী কন্যার তীব্র প্রলোভনকে অবলীলাক্রমে পরাভূত করিয়া সত্যাশ্রয়ী মহাবুদ্ধের সম্বোধিলাভকালে দ্যুলোক-ভূলোক-বিশ্বচরাচর দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

মহাবিহারের অভ্যন্তরস্থ প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত বহুবর্ণ চিত্রে বুদ্ধলীলার শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকাসমূহ—অজন্টা এবং আধুনিক জাপানী চিত্রাঙ্কনপদ্ধতি-সংশ্লিষ্ট ছন্দালঙ্কার ও বর্ণবিন্যাসের সুসঙ্গত মিশ্রণে—ধ্যানরসিক জাপানী শিল্পী শ্রীকোসেৎসু নোসু কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে। সম্বোধিলাভের উজ্জ্বল চিত্র তন্মধ্যে একটি।

১০৭ চিত্র—অলকাপুরী, হিমালয়

(কেদার-বদরী-অমরনাথ পর্য্যটক শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

বদ্রীনাথ তীর্থপথে তিব্বতপ্রান্তীয় একটি মনোরম দৃশ্যের আলোকচিত্র। হিমালয়ের উত্তুঙ্গ শিখরে বিরাজিত অলকাপুরীর ক্রোড়াঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া কল্লোলিনী অলকানন্দা উদ্দাম নৃত্যভঙ্গে ভারতের সমতল প্রদেশের তথা মহাসাগরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

১০৮ চিত্র—রুদ্রপ্রয়াগ, হিমালয়

(কেদার-বদরী-অমরনাথ পর্য্যটক শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

কেদার যাইবার যাত্রিপথে মন্দাকিনী এবং অলকানন্দার সঙ্গমসান্নিধ্যে রুদ্রপ্রয়াগ অবস্থিত। সতত ঘূর্ণায়মান তরঙ্গসঙ্কুল ভয়াবহ স্রোতঃসঙ্গমের রুদ্র উন্মাদনা চিত্রে প্রতীয়মান হয় না।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে পূর্ব্বমুখী স্বতন্ত্র পথে কর্ণপ্রয়াগ হইয়া, অলকানন্দার চড়াই ও উৎরাই তীরভূমি অবলম্বনে, বদ্রীনাথধামে যাওয়া যায়। রুদ্রপ্রয়াগে রুদ্রেশ্বর শিবমন্দির, অল্পসংখ্যক চটি, ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, বাজার, ডাকবাংলো ও ডাকঘর আছে।

১০৯ চিত্র—বিষ্ণুপ্রয়াগ, হিমালয়

(কেদার-বদরী-অমরনাথ পর্য্যটক শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

বদরী পথে বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গমক্ষেত্রে বিষ্ণুপ্রয়াগ বিরাজমান। তথায় যাত্রিগণের অবস্থানের জন্য কয়টি চটি অর্থাৎ যাত্রিনিবাস আছে। প্রত্যেক চটির অধিকারী মুদীর দোকান হইতে চাউল, ডাউল, ছাতু, গুড়, আটা, ঘৃত, তৈল, লবণ, মশলা, আলু, কুমড়া প্রভৃতি যাত্রিগণ ক্রয় করিয়া থাকেন। দোকানী চাটু, হাঁড়ি, হাতা প্রভৃতি রন্ধনের তৈজস তাঁহাদের ব্যবহারার্থ প্রদান করেন। দগ্ধমৃত্তিকার টালি-আচ্ছাদিত মৃন্ময় কুটীর (চটি) সংলগ্ন দোকানঘর। কুটীর-সন্নিহিত শাখানদী অথবা প্রস্রবণ হইতে জল সংগ্রহ করা হয়।

চিত্রে সঙ্গমোপরি লৌহসেতু দেখা যাইতেছে।

১১০ চিত্র—গৌরীকুণ্ড, হিমালয়

(কেদার-বদরী-প্রত্যাগতা শ্রীমতী বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত তপ্তকুণ্ডে স্নানান্তে চিত্রের মধ্যভাগে দৃশ্যমান গৌরীমন্দিরে যাত্রিগণ পূজা সমাহিত করেন। প্রবাদ এই যে, হিমালয়নন্দিনী গৌরী শিবকে পতিরূপে পাইবার সঙ্কল্প করিয়া তপ্ত গৌরীকুণ্ডে স্নানান্তে যে স্থলে বসিয়া গভীর তপস্যা এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছিলেন তাহারই উপরে গৌরীমন্দির প্রতিষ্ঠিত। কুণ্ডসান্নিধ্যে শঙ্করাচার্য্যপূর্ব্ব যুগের একটি শিবলিঙ্গ দেখা যায়।

গৌরীকুণ্ড সমুদ্রতীর হইতে ৬০০০' উচ্চ পার্ব্বত্য ভূভাগে অবস্থিত। তথা হইতে ৩ ক্রোশ দীর্ঘ সর্পিল পথে ৫৫০০' উচ্চ ভয়াবহ চড়াই উল্লঙ্ঘন করিয়া কেদারধামে উঠিতে হয়।

১১১ চিত্র—ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দির, হিমালয়

(কেদার-বদরী প্রত্যাগতা শ্রীমতী বাসন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

গৌরীকুণ্ড ও কেদারনাথ যাইবার চড়াই পথের বাম অর্থাৎ পশ্চিম দিকে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবতীর্থ ত্রিযুগীনারায়ণ অবস্থিত। গৌরীকুণ্ডের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে ত্রিযুগীনারায়ণ। তথা হইতে একটি স্বতন্ত্র পথ উত্তর-পশ্চিম দিকে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী অভিমুখে এবং অন্য একটি পথ উত্তর মুখে গৌরীকুণ্ড হইয়া কেদারধামে গিয়াছে।

জনশ্রুতি এইরূপ যে, ত্রিযুগীনারায়ণ ক্ষেত্রেই বিষ্ণুনারায়ণ শিবমহেশ্বরের শ্রীকরে গিরিরাজ কুমারী গৌরীকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন।

উত্তরভারতীয় নাগরশিখর মন্দিরশৈলীর হিমালয় প্রকৃতির অনুকূল অভিব্যক্তি হইয়াছে ত্রিযুগীনারায়ণ মন্দিরস্থাপত্যে। শিখরের সুঢালু আচ্ছাদন হিমধামের চিরাচরিত সৌধমন্দিরাচ্ছাদনের অনুরূপ।

১১২ চিত্র—হরগৌরী নৃত্য

(চিত্রশিল্পী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী ডালমিয়া, বি.এ. (অনার্স, সুবর্ণপদকপ্রাপ্ত) মহোদয়ার সৌজন্যে মুদ্রিত)

কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' মহাকাব্যে কৈলাসের ক্রোড়ে নগরাজের বিশাল রাজধানী 'ওষধিপ্রস্থ' উল্লিখিত। 'ওষধিপ্রস্থ' বিচিত্র প্রাসাদসৌধ, পণ্যবীথি, রাজপথ ও গগনচুম্বী তোরণ-সমন্বিত। গিরিরাজ-দুহিতা গৌরী তথায় লালিতা-পালিতা হইয়াছেন। হরগৌরীর মিলনান্তে কৈলাসের ক্রোড়াঙ্কেই উভয়ের নৃত্যলীলা সমাহিত হয়। মানস সরোবরের সান্নিধ্যে গণপতি গণেশ জন্মগ্রহণ করেন। তদীয় জন্মভূমি 'গোরি উদিয়র' নামে আখ্যাত।

কৈলাসের প্রত্যন্ত ভাগে যক্ষপতি কুবেরের রাজধানী অলকাপুরী (১০৭ চিত্র)।

স্বয়ংসিদ্ধা শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী বহুবর্ণ-চিত্রের সুনিপুণ রেখাসম্পাতে এবং ভাবপ্রবণ ছন্দোবিন্যাসে হরগৌরীর আয়ত আননে তিব্বতীয় প্রকৃতির ভাব ও ভাষা, আকৃতি ও সত্তা মধুরভাবে ফুটাইয়াছেন।

১১৩ চিত্র—গৌরীমূর্ত্তি, বেরিলী (উত্তর ভারত), খৃঃ পঞ্চম শতক

বেরিলী প্রদেশীয় অহিচ্ছত্র অঞ্চলে আবিষ্কৃত—গুপ্তশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—অগ্নিদগ্ধ মৃন্ময় প্রতিমা ত্রিনয়না পার্ব্বতীর সুচিক্কণ শিরোভাগ।

১১৪ চিত্র—কেদারনাথ মন্দির, তিব্বত (হিমালয়)

তরঙ্গায়িত তুহিনাদ্রির উত্তুঙ্গ শৃঙ্গশিখরস্থ কঙ্করময় তুষারসরণি অনুসরণে, ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে, ভয়াবহ চড়াই উল্লঙ্ঘনান্তে, কেদারধামে অগ্রসরকালে সারি সারি শুভ্রহচল হিমশৃঙ্গের অবিরাম নৃত্য দর্শন করিতে করিতে, গভীর গিরিসঙ্কট-গাত্রস্থ ঝুলন্ত—ত্রিহস্ত-প্রস্থ দেয়ালগিরির মত—মসৃণ পথাতিক্রমণে বহু নিম্নে সর্পিল জলনালি অবলোকনকালে সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে, কোথাও বিপদসঙ্কুল হিমানীপ্রবাহের জমাট স্তরপৃষ্ঠে যষ্টির সাহায্যে লঙ্ঘনকালে পিছলাইতে পিছলাইতে, কোথাও গিরিগহ্বরে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্ন সৌম্য সাধুর প্রশান্ত আনন দেখিতে দেখিতে, স্থানে স্থানে উপত্যকার খাতে খাতে প্রবহমাণ হিমধারা লঙ্ঘিতে লঙ্ঘিতে, অনুমান দুই ক্রোশ দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ-ক্রোশ প্রস্থ সালতি নৌকার তলভাগের গঠনবিশিষ্ট—উচ্চপ্রান্ত কেদার উপত্যকার ১১৫০০' উচ্চ কেদারধামে উপনীত হওয়া যায়, সুরধুনী মন্দাকিনীর উপরস্থ ক্ষুদ্রকায় পাষাণসেতু অতিক্রম করিয়া। তৎপূর্ব্বে বহু দূর হইতেই বরফাচ্ছন্ন, গগনস্পর্শী, লম্বমান কেদারশৃঙ্গের পাদমূলে বিরাজমান কেদার মন্দিরের নীলাভকান্তি উপলক্ষিত হয়।

নৌকাতুল্য উচ্চপ্রান্ত কেদারধামের উত্তর সীমাস্পর্শী ২২,৫০০′ উচ্চ কেদারশৃঙ্গ। উহার ক্রোড়দেশে ধ্যানরত, আত্মকেন্দ্রিক ভাবদীপ্ত, পাষাণ দেবায়তন মৌন মহিমায় ভাস্বর। কেদারধামের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে, অর্থাৎ উত্তরমুখী সানতি নৌকার উভয়প্রান্ত-সংলগ্ন, শতসংখ্যক উনানের ঝিঁকের মত, ঘনসন্নিবদ্ধ তুষারশৃঙ্গ; যেন তুষারকিরীটধারী শিবানুচরগণ কেদারনাথের উভয় পার্শ্বে সান্নিবদ্ধভাবে সমাসীন। উভয় সারির মধ্যবর্ত্তী, অনুমান অর্দ্ধ-ক্রোশবিস্তৃত, অসমতল উপত্যকায় বিবিধ দেবালয়, লোকালয়, ধর্ম্মশালা, পান্থশালা, সদাব্রত ও বিপণী ব্যতীত শস্যভাণ্ডার, পাঠশালা, পুরাণপীঠ ও ডাকঘর প্রভৃতি।

গলিত তুষার ও কঙ্করময় মৃত্তিকামিশ্রিত লঘুপ্রলেপলিপ্ত রুক্ষ পথের উত্তর ভাগে কেদার দেবায়তন এবং বিরাট্ কেদারশৃঙ্গই চিত্রে দৃশ্যমান। পথের পূর্ব্ব ও পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ও অনতিবৃহৎ, একতল ও দ্বিতল, বাতায়ন-বিরল, শতসংখ্যক প্রস্তরাবাস চিত্রে দেখা যায় না। দোচালা গৃহগুলির শ্লেটপাথরের ঢালু ছাদসমূহ শীর্ণ শরদণ্ডবৎ একপ্রকার সুদীর্ঘ তৃণাবৃত। উহারা সম্বৎসর তুষারমণ্ডিত থাকে। কেদারধাম বেষ্টন করিয়া রাশি রাশি সুগন্ধিপুষ্পোজ্জ্বল প্রিয়ঙ্গুলতা, সোনালি বুটিদারখচিত গাঢ়হরিৎ গালিচাসদৃশ, শোভমান থাকে গ্রীষ্ম হইতে হেমন্ত ঋতু অবধি। হেমন্তান্তে উক্ত দৃঢ় লতা শ্লেটের ছাদের আচ্ছাদনীরূপে ব্যবহৃত হয়।

কেদারনন্দিনী মন্দাকিনী ২২,৫০০′ উচ্চ কেদারশৃঙ্গ হইতে, জলপ্রপাতরূপে, ১১,৫০০′ উচ্চ কেদারধামে অবতরণপূর্ব্বক ধ্যানমগ্ন শ্রীমন্দিরের পাদ প্রক্ষালন করিয়া, লোকালয়-প্রবেশের নিমিত্ত পল্লীপ্রান্তে যে ক্ষুদ্র সেতুবন্ধ আছে তাহার নিম্ন দিয়া, খরবেগে, বিসর্পগতিতে, দক্ষিণ দিকে ছুটিয়াছেন।

মেঘসঙ্কুল হিমাচলের অনুকূল পূর্ত্তনির্ম্মাণ বিধানানুসারে, মধ্যযুগের নাগরশিখর-মন্দিরের অনুপ্রেরণায়, কেদারমন্দিরের অবক্র গঠন পরিকল্পিত হইয়াছিল। গর্ভগৃহে মহালিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মুখমণ্ডপের পাষাণগাত্রে পঞ্চপাণ্ডবের প্রতিমূর্ত্তি সমাসীন। দেবায়তনের পুরোভাগে এবং প্রধান প্রবেশদ্বারের উভয়পার্শ্বস্থ কুলুঙ্গীসমূহের অভ্যন্তরে কয়টি দেবমূর্ত্তি উৎকীর্ণ। চতুরস্র গর্ভমন্দিরশীর্ষস্থ সূচ্যগ্র আচ্ছাদনের ভারবাহী অনুচ্চ স্তম্ভগুলির অন্তরালাবলম্বনে পূজাকালীন যজ্ঞধূমের নির্গমনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ধূম্রনির্গমনের এতাদৃশ ব্যবস্থা হিমালয়-অঞ্চলীয় বহু মন্দির ও গৃহ-নির্ম্মাণে বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে (১৪ চিত্র)।

হরিদ্বার হইতে কেদারধামের দূরত্ব প্রায় ৭৫ ক্রোশ।

১১৫ চিত্র—গঙ্গা-অলকানন্দাবতরণ, হিমালয়

বদরীনারায়ণ মন্দিরের ২ ক্রোশদূরস্থ উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে অলকানন্দা (গঙ্গা) সফেন জলপ্রপাতরূপে নিম্ন দেশে ঝম্পপ্রদানপূর্ব্বক গঙ্গোত্রী হইতে নির্গতা ভাগীরথীর সহিত দেবপ্রয়াগ-সঙ্গমে মিলিত হইয়া গঙ্গারূপে হরিদ্বারের অভিমুখে ছুটিয়াছেন।

25—1872B

১১৬ চিত্র—কৈলাসধাম, হিমালয়

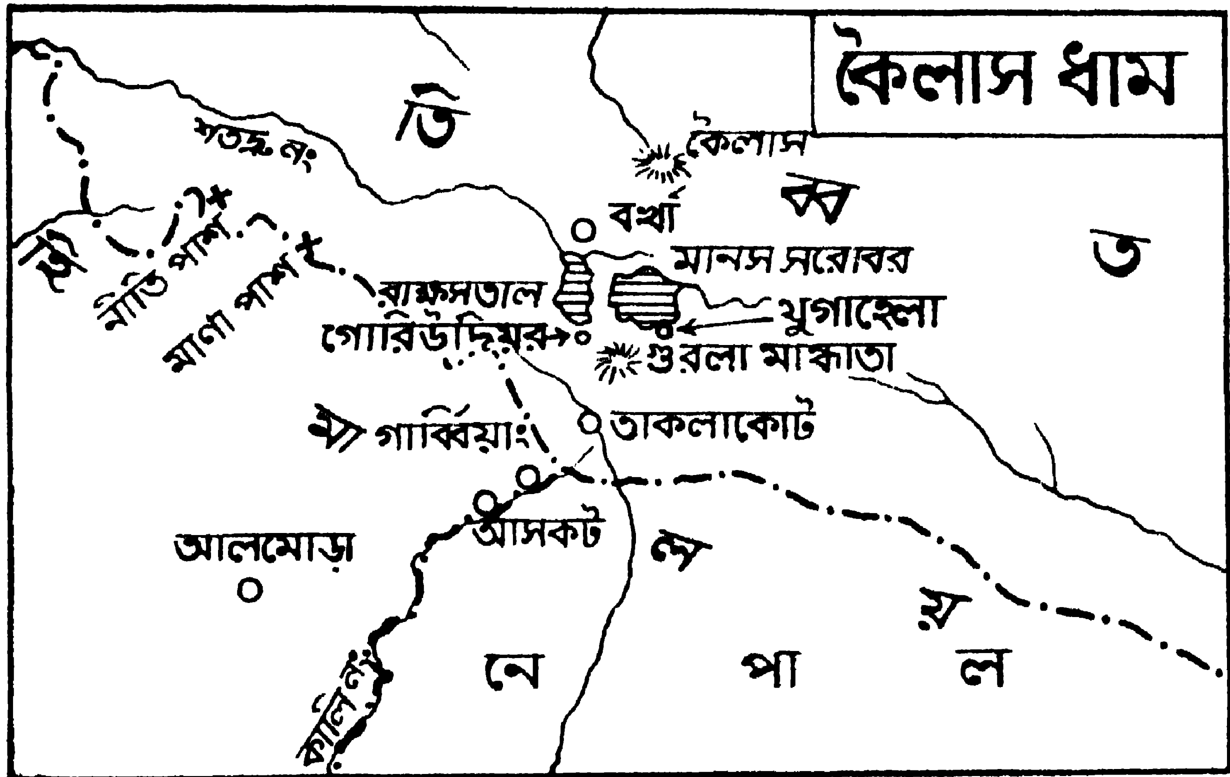
আলমোড়া হইতে ১১০ ক্রোশ উত্তরে, তিব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, কৈলাসশৃঙ্গ উত্থিত। 'মহাহিমবন্ত' শ্রীকৈলাসের রজতনিভ উন্নত মুকুট ভারত সমুদ্র হইতে ২২,০২৮ ফুট উচ্চ। য়্যাক অথবা ঝব্বু (বলদ)-পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া ভীষণ চড়াই-উৎরাই পথে তথায় গমনকালে প্রথমে হিমালয়ের কুমায়ুন স্তরে আম্র, কদলী ও কমলালেবুর উদ্যান, অতঃপর তিব্বতের নিম্নাঞ্চলীয় পিপল, ওক, ঝাউ ও দেবদারুর অরণ্যমধ্যস্থ 'গৌরীগঙ্গা', 'কালিগঙ্গা' প্রভৃতি পার্ব্বত্য নদী, জলপ্রপাত, হিমপ্রবাহ এবং কয়েকসংখ্যক ঝুলন্ত সেতু অতিক্রম করিতে হয়, ষষ্ঠদশ-অষ্টাদশ সহস্র ফুট উচ্চ 'লিপুলেখ', 'গুরলামান্ধাতা' প্রভৃতি গিরিসঙ্কট লঙ্ঘন করিতে হয়। পথিমধ্যে 'আসকোট', 'গার্ব্বিয়ং', 'তাকলাকোট' নামক নগরসমূহ এবং 'শিব্বিলিং', 'খোচরনাথ' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গুম্ফা (মন্দির, মঠ ও ধর্ম্মশালা একত্র) বিদ্যমান আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগরগুলি ১০০-১৫০ সংখ্যক, পশুচর্ম্মাচ্ছাদিত, তাঁবুসমৃদ্ধ প্রশস্ত বাজার (মণ্ডি) এবং রৌদ্রশুষ্ক সুদৃঢ় ইষ্টকের ২০০-২৫০ সংখ্যক বাসগৃহবিশিষ্ট। লোকালয়ের 'প্রধান' মহাশয়ের বাসভবন এবং সরকারি কার্য্যালয়গুলি দারুময় কারুকলা শোভিত। উহাদের তক্ষণস্থাপত্যে ও ধাতুময় ভাস্কর্য্যে নেপালী তথা বঙ্গীয় প্রভাব অনুভূত হয়। উহাদের চিত্রকলা প্রধানতঃ চৈন শিল্পরীতিসম্মত।

কৈলাসের ১৬ ক্রোশ দীর্ঘ পরিক্রমপথ বেষ্টন করিয়া পঞ্চসংখ্যক গুম্ফা বিদ্যমান। কৈলাসের ৮ ক্রোশ দক্ষিণে পৃথিবীর প্রাচীনতম, অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ, সাগর-সমতুল সুনীল জলধি—মানস সরোবর। মানস সরোবরের ৩ ক্রোশ পশ্চিমে, একটি ৩ ক্রোশ প্রস্থ অনুচ্চ শৈলমালার ব্যবধানে, বহুশ্রুত রাক্ষসতাল (রাবণ হ্রদ)। বহু লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে উভয় জলরাশি সংযুক্তভাবে একটি বৃহত্তর হ্রদরূপে প্রসারিত ছিল। প্রবল ভূকম্পনের ফলে উক্ত অনুচ্চ পাষাণশ্রেণী সশব্দে উত্থিত হইয়া উহাদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। কৈলাসের ৫৬ এবং ৬৮ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে যথাক্রমে বদ্রীনাথ ও কেদারনাথ মন্দির দণ্ডায়মান।

সহস্র সহস্র মল্লিকাধবল মরালসেবিত, ব্যাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল, সফেন সমুদ্র-সমতুল, কৃষ্ণনীল জলরাশির আয়তন প্রায় ৫০ বর্গক্রোশ, পরিধি ২৮ ক্রোশ এবং গভীরতা ৩০০ ফুট। মানস সরোবর সমুদ্রতীর হইতে ১৪,৯৫০ ফুট উচ্চ উপত্যকায় অবস্থিত।

দিবসের প্রহরে প্রহরে পর্ব্বত-তরঙ্গবেষ্টিত, দিগন্তবিস্তৃত, বীচিমালার সতত পরিবর্ত্তনশীল বিবিধ বিচিত্র বর্ণসমাবেশ যেরূপ চিত্তাকর্ষক তদ্রূপ বিস্ময়প্রদ। শীতঋতুর কয়মাস মানস সরোবর বরফাবৃত থাকে।

মানস সরোবর ও রাক্ষসতালের অন্তর্ব্বর্ত্তী ৩ ক্রোশ প্রস্থ অনুচ্চ শৈলমূলে এবং উহাদের উত্তরস্থ, 'বর্থা' ভূভাগের দক্ষিণবর্ত্তী, পার্ব্বত্য প্রদেশে একটি স্বর্ণখনি নিহিত আছে। প্রাচীনকাল



কৈলাস ধাম
তি
ব
ব
ত
কৈলাস
বর্খা
মানস সরোবর
রাক্ষসতাল
খুগাহ্লো
গোরিউড়িয়র
গুরলা মান্ধাতা
শতদ্রু নং
নীতি পাশ
মাণা পাশ
গার্ব্বিয়াং
তাকলাকোট
আসকট
আলমোড়া
ল
য়
নে
পা
ল
কালী নং

হইতে তিব্বতবাসিগণ খনিমধ্যস্থ স্বর্ণ আহরণ করতঃ গুম্ফাসংক্রান্ত বোধিসত্ব ও দেবদেবীর বিগ্রহ, রত্নবেদী, স্বর্ণকমল ও দীপস্তম্ভ প্রভৃতি ব্যতীত নিজ নিজ ব্যবহার্য্য গুরুভার অলঙ্কার নির্ম্মাণ করিতেছেন।

মানস সরোবর ৩০ ক্রোশ দীর্ঘ পরিক্রমপথ এবং 'থুগোহ্লো' প্রমুখ অষ্টসংখ্যক গুম্ফাবেষ্টিত। বিশাল জলরাশির উত্তরে কৈলাস; পূর্ব্বে তুষার-কিরীটিনী শৈলশ্রেণী, দক্ষিণে ২৫,৩৫০' উচ্চ গুরলামান্ধাতা ও পশ্চিমে, ৩ ক্রোশ ব্যবধানে, রাবণ হ্রদ বিগুমান।

কৈলাসধামে কৈলাসকেন্দ্রী—বৃত্তাকার পঞ্চসারি—পঞ্চশত হিমশৃঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়। হিন্দু ও বৌদ্ধগণ উক্ত, পঞ্চসারিভুক্ত, পঞ্চশত শৃঙ্গপরিবৃত কৈলাসনাথকে যথাক্রমে দেবগণ ও 'দাবা' (লামা)-গণ পরিবৃত শিবমহেশ্বর ও আদিবুদ্ধজ্ঞানে আরাধনা করেন। এভারেষ্টবিজয়ী তেনজিং নোরগে গৌরীশঙ্করের (এভারেষ্ট) শীর্ষদেশে অভিযানকালে এভারেষ্টবেষ্টনী সারিবদ্ধ শৃঙ্গসমূহকে তদ্রূপ দেব (দাবা)-রূপে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন; সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার বিবৃতি হইতে ইহা জানা যায়।

চার্লস এ. শেরিং প্রণীত *Western Tibet* এবং প্রসিদ্ধ পর্য্যটক স্বামী প্রণবানন্দ প্রণীত *Exploration in Tibet* নামক সচিত্র গ্রন্থদ্বয় কৈলাসপ্রসঙ্গে বহুবিধ তথ্য প্রদান করে। বর্ত্তমান চিত্রখানি স্বামীজীর গ্রন্থ হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি 'থুগোহ্লো' গুম্ফার সান্নিধ্যে একটি যজ্ঞবেদী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন; জন্মাষ্টমী দিবসে তথায় যজ্ঞ সমাহিত হয়। খোচরনাথ গুম্ফার গর্ভমন্দিরে মহাকালীর প্রতিমা সমাসীনা। অমাবস্যা তিথিতে দেবীর সমক্ষে পশুবলি অনুষ্ঠিত হয়। তিব্বতের বহু গুম্ফায় বুদ্ধদেব, শিব ও শক্তি একত্র অধিষ্ঠিত আছেন।

চিত্রে কৈলাস উপত্যকার উত্তর প্রত্যন্ত হইতে দক্ষিণ দিকস্থ শৃঙ্গদ্বয়ের অন্তরালে কৈলাস দৃশ্যমান। মানস সরোবর কৈলাসেরও দক্ষিণে; তৎকারণে চিত্রে দৃষ্ট হয় না।

১৫৯ চিত্রের মধ্যভাগের বাম পার্শ্বে কৈলাসশিখর এবং উহার ২০ ক্রোশ দক্ষিণস্থ গুরলামান্ধাতা পর্ব্বতমালা প্রদর্শিত হইয়াছে। উভয়ের মধ্যবর্ত্তী মানস সরোবর এবং রাক্ষসতাল চিত্রে দৃষ্ট হয় না।

মানস সরোবরের তটভাগে উপনীত হইবার বহু পূর্ব্বে, গুরলামান্ধাতার ক্রোড়াঙ্ক হইতে, ঘননীল জলধি এবং উহার উত্তরে দীপ্তিমান—মেঘমুক্ত দিবসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে অহরহঃ ঝলকমান—শ্বেত ও কৃষ্ণ স্তরবদ্ধ, কমল কোরকোপম, মেঘচুম্বী কৈলাসের রজতমুকুট অদূরে অবস্থিত বলিয়া ভ্রম হয়। শৃঙ্গে শৃঙ্গে প্রত্যাহত ব্যথিত প্রভঞ্জনের বিচিত্র বিক্ষুব্ধ স্বনন দূরাগত সাগরতরঙ্গের লঘু-গম্ভীর গর্জ্জনবৎ শ্রবণগোচর হয়। হিমালয়ের উচ্চ স্তরে অবস্থিত অমরনাথ, গঙ্গোত্রী, কেদার, বদরী ও কৈলাস ভূভাগে দূরত্বের অনুমান করা যায় না এবং তথাকার হিমময় পরিবেশে তুষার

অথবা বরফ স্পর্শকালে অস্বস্তিকর শৈত্য অনুভূত হয় না ; কিন্তু অধিত্যকাবাসীর পক্ষে তত্তৎস্থানীয় অনভ্যস্ত পরিবেশে অধিকক্ষণ অবস্থান অশান্তিপ্রদ। কৈলাস ও অমরনাথ পথের উচ্চ গিরিসঙ্কট অতিক্রমকালে বায়ুমণ্ডলে অম্লজানের অল্পতাবশতঃ নিশ্বাস লইতে কষ্ট হয়, ঘন ঘন বিশ্রাম লইতে হয়।

১১৭ চিত্র—গোপেশ্বর মন্দির, হিমালয়

প্রস্তরনির্ম্মিত চৈত্যমন্দির মধ্যে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার প্রতিভূ চতুরানন শিব-গোপেশ্বরকে বেষ্টন করিয়া শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বকালীন চতুরস্র, অষ্টকোণী এবং তর্জ্জনীর আকৃতিবিশিষ্ট কতিপয় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ভগিনী নিবেদিতা বলেন, শিববুদ্ধ-গোপেশ্বর তান্ত্রিক বৌদ্ধের আরাধ্য।

১১৮ চিত্র—যোশীমঠ, হিমালয়

ওক, আখরোট, বাদাম, হরীতকী, শাল, সেগুন, মেহগিনি, তিন্তিড়ী, পলাশ, পিয়াল, তেজপত্র, ন্যগ্রোধ, জায়ফল, উডুম্বর প্রভৃতি পাদপরাজির গহন কাননমধ্যে ঘনসন্নিবিষ্ট বেতসীলতার নিবিড় জালে দোদুল্যমান ভূমিচম্পক ও দোলনচম্পকসমূহের অন্তরালে অন্তরালে আলোছায়ার লুকাচুরি খেলা দর্শনান্তে, বিবিধবর্ণরঞ্জিত কোমল কিশলয় ও পেলব পল্লবস্তবকের আড়ালে আড়ালে লুক্কায়িত বহু বিচিত্র বনবিহঙ্গের অশ্রান্ত কূজন, বনস্পতির মর্ মর্ ও সজল শৈবালমণ্ডিত উপল-সমূহের অন্তর্ব্বর্ত্তী গিরিনির্ঝরিণীর ঝর্ ঝর্ কাহিনী শ্রবণান্তে, নিবিড়ারণ্যের সঙ্কীর্ণ সর্পিল বীথিকাবলম্বনে জনবিরল কান্তারাতিক্রমান্তে এবং পরিশেষে প্রস্তরখণ্ড-কঙ্কর-মৃত্তিকাময় সুদৃঢ় আল-বিভক্ত শ্যামল, সমতল, রবিকরোজ্জ্বল শস্যক্ষেত্রসমূহের অন্তর্নিহিত সুদীর্ঘ-সরল পথানুসরণে সীসা, শ্লেট, মার্ব্বেল ও রজতশুভ্র অভ্রের বিবিধ আস্তরণাবৃত তথা নির্ব্বাপিত বৃদ্ধ আগ্নেয়গিরির অঙ্গার-ভস্মাচ্ছাদিত—কৃষ্ণবর্ণ, কর্কশ-মসৃণ, ধূসর-স্ফটিকময়, ঝলকপ্রবণ অভ্রময়—বিভিন্ন উপত্যকার প্রসারিত তরঙ্গমালা একে একে লঙ্ঘন করিয়া, 'গরুড় গঙ্গা'র ভয়সঙ্কুল চড়াইপথে প্রাচীন যুগের বিশিষ্ট ধর্ম্মক্ষেত্র যোশীমঠে আরোহণ করিতে হয়।

একটি ৬,১০৭' উচ্চ রমণীয় উপত্যকায় শ্রীশঙ্করাচার্য্য তদীয় প্রাণপ্রিয় 'জ্যোতির্ম্ম'—যোশীমঠ (মতান্তরে যশোমঠ) স্থাপিত করিয়াছিলেন সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে। অধুনা উহা ব্যবসা-বাণিজ্য-সমৃদ্ধ জনবহুল নগরে পরিণত হইয়াছে। প্রস্তরের প্রাচীর, অরণ্যজাত শাল ও সেগুননির্ম্মিত অলিন্দ (বারান্দা), দৃঢ় মৃত্তিকার মসৃণ গৃহতল (মেঝে)—এবং প্রদেশজাত শ্লেট ও ধূসরবর্ণ মার্ব্বেল অথবা অগ্নিপক, রক্তবর্ণ, মৃন্ময় টালির ঢালু আচ্ছাদন (ছাদ)-বিশিষ্ট অনুমান পঞ্চ-ষষ্ঠ শত একতল ও দ্বিতল, ক্ষুদ্র ও অনতিবৃহৎ বাসভবন, ধর্ম্মশালা, পণ্যশালা, সদাব্রত, তণ্ডুল ডাউল গম ঘৃত ছাতু গুড় লবণ লঙ্কা মরিচ মসলা প্রভৃতি খাদ্যোপকরণ ব্যতীত নানাবিধ শাকসব্জী, মূলা-কুমড়া, ফলমূল এবং অশনবসন ও প্রসাধনসংক্রান্ত স্বদেশী ও বিদেশী পণ্যপূর্ণ প্রশস্ত চকমিলানো বাজার, প্রপা

(জলসত্র), প্রমোদগৃহ, সরকারী কার্য্যালয়, চিকিৎসালয়, দাতব্য ঔষধালয়, আরোগ্যভবন, গীতাভবন, শাস্ত্রপীঠ, অবৈতনিক বিদ্যালয়, মুদ্রণশালা, ডাক ও তারঘর এবং ডাকবাংলোসহ শান্তিপূর্ণ পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্ম্মমুখর ধর্ম্মজীবন সক্রিয় রহিয়াছে।

যোশীমঠ তিব্বত ও ভারতসম্পর্কীয় বাণিজ্য-কেন্দ্রসমূহের অন্যতম। তথায় তিব্বতোৎপন্ন শীতবস্ত্র, পশম, চামর, শুকচর্ম্ম, মৃগনাভি, শিলাজতু, স্বর্ণালঙ্কার, স্ফটিকের কণ্ঠাভরণ, শুষ্ক মাখন ও মধু প্রভৃতি বিক্রীত হয়।

তক্ষণ-সম্ভারী-চৈত্যবাতায়নশীর্ষ বিচিত্র সিংহদ্বার-সমন্বিত অনুচ্চ পাষাণ-প্রাকারবেষ্টিত প্রাচীন ধর্ম্মপীঠের প্রশান্ত পরিবেশ মোহময়। উহার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে, চকমিলানো, দ্বিতল অলিন্দসম্বলিত ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রকোষ্ঠসমূহ দারুময় আচ্ছাদনবিশিষ্ট এবং প্রায় পরস্পর-সংলগ্ন। মঠাধ্যক্ষের আবাসভবন, সভামণ্ডপ ও কার্য্যালয় নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপপ্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু পৌষ মাসে বদরীনারায়ণ মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইলে বদরীর মোহন্তমহারাজ 'মহারাওয়ল' যোশীমঠে শুভাগমন করতঃ বদরীনাথের পূজা, যজ্ঞ এবং মঠ পরিচালনা করেন। প্রাঙ্গণমধ্যে কাষ্ঠের আচ্ছাদনতলে সুপেয় সলিলোৎসারী একটি চিরস্থায়ী প্রস্রবণ বর্ত্তমান আছে। যোশীমঠের মন্দির ও গৃহ প্রভৃতির বিন্যাস ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভকালীন বৈদান্তিক ধর্ম্মসংঘ-প্রতিষ্ঠানের বিধিনির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়াছিল, ইহা অনুমিত হয়।

মঠক্ষেত্রের অন্তভাগে, বৃহৎ অঙ্গনমধ্যে, কয়েকসংখ্যক দেবায়তন বিদ্যমান; নন্দীসহ শিব-মন্দির এবং একটি প্রশস্ত বেদীসংলগ্ন চৈত্যাকৃতি মাতৃকামন্দির-সান্নিধ্যে সপ্তসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেউল ব্যতীত নরসিংহ, হরপার্ব্বতী ও 'বিঘ্ননাশন গণপতি'র মন্দির। মন্দিরসংলগ্ন গ্রন্থাগারে শঙ্করযুগীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি, পরবর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ, শিলালেখ এবং তাম্রশাসন প্রভৃতি সুরক্ষিত আছে। যোশীমন্দিরে তথা যোশীনগরে শৈব ও বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সমান অধিকার। তামিলী, তেলগু, পঞ্জাবী, গাড়োয়ালী এবং উত্তরভারতীয় হিন্দুজনগণ একত্র সদ্ভাবে শান্তিপূর্ণ কর্ম্মজীবন যাপন করিতেছেন।

নগরপ্রান্তে বাঁধাকপি, মূলা, গাজর, ওলকপি, আঙ্গুর, কমলালেবু, আপেল, আখরোট, পীচফল, পেঁপে, কলাইশুঁটি প্রভৃতির প্রসারিত উদ্যানমধ্যে বৃহৎ বৃহৎ রক্ত গোলাপের সৌরভময় কুঞ্জসান্নিধ্যে ভারত-ধর্ম্মমহামণ্ডলের সুশোভন প্রতিষ্ঠান—মঠ, শিক্ষামন্দির, সেবাশ্রম প্রভৃতি—সুশৃঙ্খলে পরিচালিত হইতেছে।

গ্রীষ্মের প্রারম্ভে যোশীমঠ হইতে বিপদসঙ্কুল চড়াইপথে 'নীতি'-গিরিবর্ত্ম লঙ্ঘন করিয়া মানস সরোবর ও কৈলাসে যাওয়া যায়। উভয় তীর্থের ব্যবধান প্রায় ৬০ ক্রোশ।

১১৯ চিত্র—বদরীনাথ মন্দির, হিমালয়

যোশীমঠ হইতে ভীষণ উৎরাইপথে এক ক্রোশ অবতরণে, অনতিবৃহৎ লৌহসেতুর সাহায্যে বিষ্ণুপ্রয়াগ-সংলগ্ন অলকানন্দাগঙ্গা ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গম অতিক্রমান্তে, প্রায় ১০ ক্রোশ বদরিকায় গমন করিতে হয়।

নীলাভধূসর পর্ব্বতমালার ক্রোড়াঙ্কে প্রবহমাণা নীলবরণা অলকানন্দার প্রসারিত পুলিনে ঘনসন্নিবদ্ধ মহীরুহরাজির শীতল ছায়াস্নিগ্ধ শ্যামল কাননমাঝারে বনমল্লিকা, শ্বেত গোলাপ, কামিনী ও চামেলী কুসুমের মৃদুমন্দ সৌরভামোদিত, আলোক-আঁধারের ইন্দ্রজালবেষ্টিত 'গন্ধমাদন চটি' বিদ্যমান। অতঃপর উত্তুঙ্গ চড়াই অবলম্বনে উপরে আরোহণ করিলে শোভাময়ী প্রকৃতিদেবীর শান্তিপূর্ণ আবেষ্টনে 'হনুমান চটি'-সংলগ্ন 'হনুমান মন্দির'।

অবশেষে অলকানন্দা স্পর্শ করিয়া প্রায় লম্বভাবে দণ্ডায়মান একটি বিরাট্ শিখর-গাত্র-খোদিত একটি সঙ্কীর্ণ, ঘুরন্ত, চড়াইপথে চক্রাকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া পর্ব্বতশীর্ষে আরোহণ করিবার কালে দেখা যায় ঊর্দ্ধগামী পথের একস্থান হিমালয়ের উদ্গত প্রান্তভাগ দ্বারা আচ্ছাদিত—নাগরাজ বাসুকি যেন সেই দেয়ালগিরিসদৃশ খোদিত-পথোপরি স্বীয় বিশাল ফণা বিস্তারিত করিয়া উপবিষ্ট। পথের ৫০০' নিম্নে নীলবসনা অলকানন্দা।........পরিশেষে শীর্ষদেশে পদার্পণ করিলেই সহসা—বহুদূরবিস্তৃত সমতল উপত্যকার উপরিস্থিত নিস্তরঙ্গ তুষারসমুদ্রের বিশালতা উপলব্ধ হয়। ....দুই ঘণ্টা পরে অলকানন্দার অনতিবৃহৎ সেতু অতিক্রমকালে, নিম্নমুখে, বদরিধামের সারিবদ্ধ গৃহসমূহের পশ্চাদ্বর্ত্তী স্বর্ণচক্রশীর্ষ বিষ্ণুমন্দিরের অপরূপ গঠনসৌষ্ঠব পরিশ্রান্ত পর্য্যটকের নয়নমন চরিতার্থ করিয়া দেয়। বদরিকা সমুদ্র হইতে ১০,৪০০' উপরে।

নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে—অনুমান এক মাইল দীর্ঘ ও অর্দ্ধ মাইল প্রস্থ অসমতল তটভূমির উপরে—শ্লেটাচ্ছাদিত, বারান্দাবিহীন, পঞ্চশত, দোচালা প্রস্তরাবাস, ধর্ম্মশালা, সদাব্রত, বাজার, বিপণিশ্রেণী, আয়ুর্ব্বেদভাণ্ডার, বিদ্যালয়, প্রমোদগৃহ এবং ডাক- ও তার-ঘরবিশিষ্ট শ্রীক্ষেত্র বদরিধাম। উহার তিন পার্শ্বে পঞ্চ-ষষ্ঠ-সহস্র ফুট উন্নত, সততবরফাবৃত, ঘনসন্নিবদ্ধ সুচল শৃঙ্গসমূহ।

নারায়ণের গর্ভমন্দির নেপালী স্থাপত্যে গঠিত। উহার দারুময় বিমানোপরি সুবর্ণমণ্ডিত কলস। প্রস্তরময় জগমোহন মণ্ডপের অনুচ্চ চূড়া কিন্তু মুঘল-গম্বুজ প্রভাবিত। প্রাচীন দেবায়তনের জীর্ণসংস্কার কালেই, হয়ত, হিন্দু-মুঘল স্থাপত্যের অনুসরণে, সিংহদ্বার ও জগমোহন গঠিত হইয়াছিল।

মন্দিরের গর্ভগৃহে, কৃষ্ণবর্ণ মর্ম্মরপ্রস্তর খোদিত, চতুর্ভুজ নারায়ণ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সুচিক্কণ শ্রীঅঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার; বিচিত্র স্বর্ণমুকুট শ্রেষ্ঠ হীরকখচিত। মন্দিররক্ষী ঘণ্টাকর্ণের অনুচ্চ মণ্ডপ মন্দিরপ্রাঙ্গণমধ্যে প্রতিষ্ঠিত।

মন্দির ও অলকানন্দার মধ্যভাগে একটি চিরস্থায়ী উষ্ণ প্রস্রবণ বিদ্যমান থাকায় স্থানীয় অধিবাসী ও যাত্রিগণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বদরীধাম হইতে 'মানা' গিরিসঙ্কটের দুর্গম পথে মানস সরোবর ও কৈলাসে যাওয়া যায়। যাত্রিপথে কেদারনাথ হইতে বদরীনাথের দূরত্ব প্রায় ৫০ ক্রোশ। বদরীনাথ হইতে রেলষ্টেশন রামনগর প্রায় ১২৫ ক্রোশ।

১২০ চিত্র—সিংহদ্বার, বদরীনাথ মন্দির, হিমালয়

চিত্রপরিচয় ১১৯ চিত্রের বিবরণী হইতে দ্রষ্টব্য।

১২১ চিত্র—শ্রীরাসলীলা, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ অষ্টম শতক

(আশুতোষ মিউজিয়ম)

হুগলি অঞ্চলে প্রাপ্ত অগ্নিদগ্ধ মৃন্ময় ফলকে উৎকীর্ণ রাসচক্র।

১২২ চিত্র—পার্থসারথি

(পাঠাগার-প্রাচীরচিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে মুদ্রিত।)

কুরুক্ষেত্র রণপ্রাঙ্গণে ভগবদ্‌গীতার কথক পার্থসারথি (কৃষ্ণ)—আত্মীয়নিধনে নিঃস্পৃহ, বিষণ্ণ ও চিন্তামগ্ন পার্থ (অর্জ্জুন)কে ক্লীবতা পরিহার করতঃ কৌরবের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিতেছেন।

১২৩ চিত্র—অশোকের রাজসভা

(পাঠাগার-প্রাচীরচিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ; ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সৌজন্যে মুদ্রিত।)

মৌর্য্য রাজধানী পাটলিপুত্রের দারুময় স্থাপত্যশোভিত বিচিত্র রাজসভায় মহাসম্রাট্ ধর্ম্মাশোক মিশর, ইরাণ, গ্রীস প্রভৃতি রাজ্য হইতে সমাগত রাজদূতগণের সহিত আলোচনা করিতেছেন। অশোক ঐতিহাসিক-ভারতীয় ধর্ম্মরাষ্ট্রের প্রবর্ত্তক।

৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ সালে 'যুগান্তর' পত্রিকায় অশোকসম্পৃক্ত যে মূল্যবান্ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম :

"বৈদিক আর্য্যগণ উত্তর-পশ্চিম ভারতে আগমন করিয়া তাঁহাদের ক্রমবর্দ্ধমান বসতি স্থাপন-কালে স্থানীয় শৈব-শাক্ত মতাবলম্বী সুসভ্য দ্রাবিড়জাতি আত্মরক্ষাকরণে অসমর্থ হইয়া উত্তর ভারত হইতে পূর্ব্ব ও দক্ষিণে পলায়ন করেন। যাঁহারা পলায়ন করিতে পারেন নাই তাঁহারা পরাক্রান্ত আর্য্যজাতির অধীনে দাস অর্থাৎ শূদ্ররূপে আর্য্যসমাজভুক্ত হইয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কপিল, কণাদ, চার্ব্বাক ও কেশকম্বলী প্রভৃতি বস্তুবাদিগণের নেতৃত্বে তাঁহারা দর্শনবাদী আর্য্যপ্রভুত্বের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। বহু শতাব্দী পরে বেদ, ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞ-

বিরোধী বুদ্ধ ও মহাবীর পার্শ্বনাথ তদানীন্তন নিগৃহীত মানবসমাজসমূহকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। অবশেষে রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের অপরিমিত পোষকতা-পরিপুষ্ট বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ আত্মবিকাশের সুযোগ পাইয়া প্রায় সারা ভারতবর্ষে প্রসারিত হয়, জৈনধর্ম্ম তদ্রূপ বিত্তশালী কোনও রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতার অভাবে নির্দ্দিষ্ট সীমানামধ্যে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। অশোকের যুগ হইতে হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বকাল অবধি ৯০০ বৎসর বৌদ্ধধর্ম্মদর্শন ভারত সভ্যতার সর্ব্ব অঙ্গ বিকশিত করতঃ সমগ্র এশিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র প্রসারিত করিয়াছিল সাম্যমৈত্রীর অভেদ অস্ত্র। চীন, জাপান, সুমাত্রা ও কাশগড় হইতে হুণ, তাতার, ম্যালিনেশীয়-পলিনেশীয় ভূভাগ পর্য্যন্ত বৌদ্ধসংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছিল।

সম্রাট্ হর্ষবর্দ্ধনের জীবনাবসানান্তে, অষ্টম-নবম শতাব্দীতে, দক্ষিণ ভারতের কুমারিলভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য ভারতভূমি হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রায় উন্মূলিত করিয়া সনাতন হিন্দুধর্ম্মের নব-অভ্যুদয় সহজ-সাধ্য করিলেন। ক্রমশঃ সনাতন ধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম্মমত ও দর্শনধারার মিশ্রণে মহাযানীয় বৌদ্ধ, সিদ্ধাইনাথ পন্থী ও সহজিয়া প্রভৃতি ধর্ম্মসম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়া নিরঞ্জন, ধর্ম্মঠাকুর প্রভৃতির ছদ্মবেশে বুদ্ধকেই পূজা করিতে থাকেন। শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত আচারানুষ্ঠান অপিচ আউল, বাউল, দরবেশ, অবধূত প্রভৃতি সম্প্রদায়ী ধর্ম্মাচরণ বুদ্ধেরই প্রেম ও বৈরাগ্যসাধন, বিনয় ও দৈন্যবরণ প্রতিভাত করে।"

সনাতন হিন্দুসংস্কৃতি অতঃপর অশোকের অপরিসীম পোষকতা-পরিপুষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় হিন্দুর আরাধ্য দশাবতারের একতম বুদ্ধাবতার প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। অবশেষে ভাগবতপ্রাণ গুপ্ত-সম্রাট্গণের অসাধারণ বদান্যতাই ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষ সাধন এবং বস্তুবাদের ঐহিক আদর্শ স্থাপন করে। বস্তুবাদী ব্যবসাবাণিজ্য-লব্ধ সুবর্ণরাশি-পরিপুষ্ট গুপ্ত রাজন্যবর্গ ও বৈশ্য শ্রেষ্ঠিগণ বৈদান্তিক ভারতের সংস্কৃতি ও শিল্পসংক্রান্ত বিরাট্ অভ্যুদয়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অজণ্টার পার্শ্বে এলোরা এবং বরবুদুরের পার্শ্বে চাণ্ডিলোরো জোভ্ গ্রাণ্ড্ সৃষ্ট হইয়াছিল। অশোক-বিকশিত ভারতীয় স্থাপত্যের পরম পরিণতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন—মুধেরা ও কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরদ্বয়, দিলবারার পার্শ্বনাথ মন্দির, গোয়ালিয়রের উদয়েশ্বর, তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর, আঙ্করভাটের বিষ্ণুসূর্য্য দেবায়তন, চিতোরের জয়স্তম্ভ এবং আগ্রার তাজমহল। অশোকের পরবর্ত্তী যুগে যুগে, এইরূপে, ভারতের সনাতন শিল্প ও সংস্কৃতি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১২৪ চিত্র—শ্রীরামচন্দ্র সমীপে গুহক

(পাঠাগার-প্রাচীরচিত্র, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

আর্য্যপতি রামচন্দ্র অনার্য্যপতি গুহক চণ্ডালকে সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছেন।

১২৫ চিত্র—যমপট, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ ঊনবিংশ শতক

(আশুতোষ মিউজিয়ম)

পশ্চিমবঙ্গীয় বৰ্দ্ধমান জেলার কাটোয়া অঞ্চলে প্রাপ্ত প্রায় বিংশতি হস্ত দীর্ঘ এবং ত্রিহস্ত প্রস্থ, বহুবর্ণরঞ্জিত, কৃষ্ণলীলা চিত্রপটের একাংশ ; নরকে পাপীর নিগ্রহের দৃশ্য।

১২৬ চিত্র—গাজীপট, ত্রিপুরা (আসাম), খৃঃ ঊনবিংশ শতক

ত্রিপুরা অঞ্চলে প্রাপ্ত ; বহুবর্ণ যমপটের মুসলমানী সংস্করণ।

১২৭ চিত্র—ব্রহ্মা, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ দশম শতক

(আশুতোষ মিউজিয়ম)

কলিকাতার অদূরে উত্তরপাড়ায় আবিষ্কৃত প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রস্তরময় মূর্ত্তি।

১২৮ চিত্র—তাজমহল, খৃঃ সপ্তদশ শতক

হিন্দু ও মুস্‌লিম সংস্কৃতির সমবেত অবদানপুষ্ট সৌন্দর্য্যনিলয় তাজমহল ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের স্ফূর্ত্ত বিকাশ। পঞ্চরত্ন মন্দিরের আদর্শে তাজের আসন বিন্যস্ত। তাজের কমলকোরকপ্রতিম সুডৌল গম্বুজ অজণ্টার পাষাণফলকোদ্গত একটি স্তূপিকার এবং অজণ্টার ১৯ নং ও ২৬ নং চৈত্য-গুহামধ্যস্থিত স্তূপিকাদ্বয়ের গোল-ভিত্তি-শিখর স্মরণ করাইয়া দেয়।

মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পশ্চিম এশিয়ার প্রায় সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধস্থাপত্য বিস্তারিত হইয়াছিল। তৎপ্রবর্ত্তিত পরমেশ্বর আল্লার সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান উপাসনাগৃহ, মক্কা তীর্থের চতুষ্কোণ 'কাবা', ভারতীয় চৈত্যেরই অনুরূপ। অজণ্টার স্তূপিকাই পারস্যদেশীয় গোল-ভিত্তি-গম্বুজের পরিকল্পনা অনুপ্রাণিত করিয়াছিল।

বীজাপুরের সুলতান ইব্রাহিমনির্ম্মিত একটি নয়নশোভন সমাধিভবন আছে ; উহার গম্বুজ তাজমহলের গম্বুজের সমতুল্য। উভয় গম্বুজেরই গঠন কমলকোরকসদৃশ, শিখরভাগ মহাপদ্ম, আমলক ও কলস-সমৃদ্ধ। তাজমহলের এবং ইব্রাহিমের সমাধিভবনের চতুষ্পার্শ্বস্থ, পদ্মদলাকৃতি-খিলানশীর্ষ, কুলুঙ্গীনিচয় হিন্দু দেবায়তন-সংশ্লিষ্ট ইন্দ্রকোষ সন্নিবেশের সনাতন প্রথার অনুসরণ করিয়াছিল। ভারতীয় দেব-দেউলের কুলুঙ্গী (ইন্দ্রকোষ)-গুলিতে বুদ্ধমূর্ত্তি অথবা ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর বিগ্রহ অধিষ্ঠিত থাকিত। কিন্তু ভারতের মসজিদ ও হিন্দু-মুস্‌লিম সৌধাবলীর শূন্য কুলুঙ্গীসমূহ সাধারণতঃ 'জালি' অথবা দ্বারবিশিষ্ট হইত। উক্ত কুলুঙ্গীই অতঃপর অভিজাত ব্যক্তিবর্গের আবাস-ভবনের 'ঝরোকা'য় পরিণত হইয়াছে। আলমগীর ঔরঙ্গজেবের সম্রাজ্ঞী রাবিয়া দৌরানির ঔরঙ্গাবাদস্থিত সমাধিসৌধ তাজেরই অনুকৃতি। হ্যাভেল প্রমাণ করিয়াছেন যে, অজণ্টার স্তূপিকা-নির্ম্মাণের সরল পদ্ধতির প্রয়োগে তাজের গম্বুজ গঠিত। পক্ষান্তরে, ইরাণ, আরব, তুর্কীস্তান প্রভৃতি

মুস্‌লিমস্থানের গম্বুজগুলি রোমান-বাইজান্টাইন গম্বুজনির্ম্মাণের জটিল, বহুব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতি অবলম্বনে গঠিত হইয়াছে।

তাজের সমকক্ষ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সমাধিপ্রাসাদ ভারতের অন্যত্র অথবা মুস্‌লিম জগতের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয় না। স্বচ্ছন্দ-প্রবাহিনী অচ্ছোদ যমুনার সমতল তটভাগে প্রিয়তমা সম্রাজ্ঞীর অমর স্মৃতিবিজড়িত অমলিন মর্ম্মরনিকেতন প্রেমপ্রবণ প্রণয়ী সম্রাটের চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতায় অভিষিক্ত। তাজমহল—সুশ্যামল কিশলয়সমাবৃত পাদপরাজি-পরিবেষ্টিত, চিরহরিৎ ঝাউবীথির সুলম্বিত অন্তরালে সারিবদ্ধ কৃত্রিম কেতক-উৎসসমন্বিত তথা পীত-লোহিত-কুমুদ-কমল-পরিবৃত প্রশস্ত পয়ঃপ্রণালী পরিশোভিত—প্রসারিত পুষ্পোদ্যানের স্নিগ্ধ, নিস্তব্ধ, পরিবেশে বিরহবিধুর শাহানশাহের পুঞ্জীভূত শোকাশ্রু।

জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রফুল্ল নিশীথে নির্ম্মেঘ নীলাম্বরের নিঃসীম চন্দ্রাতপতলে, কুমুদিনী-কান্তের কর্পূর-কিরণ-বিচ্ছুরিত তরুণী দেহের ললামলাবণীলিপ্ত, মৌনমহিম তাজমহল প্রণয়িণী মমতাজের প্রাণময়ী প্রতিমারূপে উদ্ভাসিত হইয়া থাকে।

শিল্প- ও সংস্কৃতি-পর্য্যায়ে মুস্‌লিম ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব—হিন্দু-পাঠান এবং হিন্দু-মুঘল স্থাপত্যে গঠিত প্রাসাদ, হর্ম্ম্য, মসজিদ প্রভৃতি। কিন্তু বস্তুসর্ব্বস্ব স্থাপত্যের নির্দ্দোষ মাত্রা ও নির্ভুল ছন্দসম্মত প্রকৃষ্ট রূপায়ণে মুসলমান ভাবধারা একটি অভিনব, স্বতন্ত্র, প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছিল। তাহার আরোপে হিন্দু-মুঘল সৌধসদনের অপূর্ব্ব ছন্দোগ্রন্থন, অতুলনীয় অলঙ্করণ এবং অঙ্গবিন্যাসের পরিমিত প্রযোজন তদানীন্তন মুস্‌লিম ভারতীয় স্থাপত্যকে অতি মনোরম ও মহিমান্বিত করিয়াছিল। সুসমঞ্জস মাত্রার (proportion) যথাযথ প্রয়োগে মুস্‌লিম-ভারতীয় মন্দির এবং প্রাসাদের সুকুমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিরচিত হওয়ায় উহারা অতীব চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সাসারামে শেরশাহের সমাধিমসজিদ, ফতেপুর শিক্রীতে বীরবলের বাসভবন, আগ্রার তাজমহল ও ইতামৎদৌলা, দিল্লীর জুম্মা ও মতি মসজিদ এবং দেওয়ানিখাস, জয়পুরের অম্বর প্রাসাদ ও হাওয়ামহল এবং দাতিয়ার রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি তাদৃশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর স্থাপত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সমগ্র জয়পুর মহানগরী হিন্দু-মুঘল স্থাপত্য-সংস্কৃতির মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে।

সনাতন ভারতস্থাপত্যের পারম্পরীণ বিকাশনে এবং মধ্যযুগীয় বাস্তুবিদ্যার বস্তুতান্ত্রিক সমৃদ্ধি-সাধনে মুসলমান চিন্তাধারা বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিল। রাজস্থান ও পঞ্চনদের সুশোভন প্রাসাদভবনসমূহ এবং বরোদা ও মহীশূরের সুচারু রাজপ্রাসাদদ্বয় ইহা প্রমাণিত করিতেছে।

হীনযানীয় এবং মহাযানীয় মহাশ্রমণগণ যেরূপ তাঁহাদের চৈত্যবিহার-নির্মাণে বুদ্ধমূর্ত্তি ও ধর্ম্মমূলক চিত্রের যথাক্রমে বর্জ্জন এবং আরোপণ করিয়াছিলেন, সুন্নী- এবং শিয়া-সম্প্রদায়ভুক্ত ভারতবাসী পাঠান ও মুঘল ধর্ম্মযাজকগণও তাঁহাদের স্ব স্ব স্থাপত্যে জীবমূর্ত্তি ও চিত্রের ব্যবহার অনুরূপভাবেই নিষিদ্ধ এবং অনুমোদিত করিয়াছিলেন।

লণ্ডন আর্ট সোসাইটির প্রাক্তন সভাপতি উইলিয়ম রোথিনষ্টিন কে. বি. কডরিংটন সঙ্কলিত সচিত্র *Ancient India* গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছিলেন—

"……একটি ভ্রমাত্মক ধারণা দুর্ভাগ্যক্রমে সাধারণের চিত্তে বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, মর্ম্মরশুভ্র সমাধিসৌধ তাজমহলই ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুরম্য নিকেতন।……… দিল্লী- এবং আগ্রা-পর্য্যটকগণের প্রতি দশ সহস্রের মধ্যে দশজনও এলোরা, কোণার্ক, ভুবনেশ্বর এবং খাজুরাহো দর্শনে গমন করেন না। তত্তৎস্থানীয় বিরাট্ স্থাপত্যের বিপুল সৌন্দর্য্য-গরিমা নির্ণয়নে অথবা ঐতিহ্য নির্দ্ধারণে ভারতবাসিগণ নিজেরাই অক্ষম ও উদাসীন।……"

১২৯ চিত্র—মহারাণাপ্রাসাদ, উদয়পুর (রাজস্থান), খৃঃ ষোড়শ শতক

চিত্রসম্মুখে সূর্য্যমূর্ত্তি-বিচিহ্নিত বিপুল রাজপ্রাসাদের প্রশস্ত প্রাঙ্গণসংলগ্ন, ত্রিধাবিভক্ত, উত্তর তোরণ। সারিবদ্ধসৌধসমন্বিত সুদীর্ঘ রাজপথ দক্ষিণ মুখে ওই উত্তর তোরণ অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বমুখী ত্রিতল প্রাসাদের বিরাট্ সিংহদ্বারে মিলিত হইয়াছে। প্রাসাদপ্রাকারের দক্ষিণ তোরণের সম্মুখেই বহুসহস্র বিঘাপরিমিত স্থান আচ্ছাদিত করিয়া 'সর্ব্বঋতু-সজ্জন-বিলাস' রাজোদ্যান। দুর্গপ্রতিম প্রাসাদের পশ্চিমপার্শ্বস্থ মহারাণীমহলের পাষাণভিত্তি স্পর্শ করিয়া সুবিশাল 'পেশোলা' হ্রদ। চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে 'পেশোলা' অবস্থিত থাকায় উহা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয় না। প্রাসাদের পূর্ব্ব পার্শ্বে, প্রায় একশত ফুট নিম্নে, রাজধানীর একাংশ বিদ্যমান।

লঘুনীল হ্রদবক্ষে ভাসমান—তুষারশুভ্র মর্ম্মরসৌধ, ফলবৃক্ষের উদ্যান এবং বিবিধ কুসুমের বহুবর্ণোজ্জ্বল আস্তরণশোভিত দ্বিসংখ্যক, প্রায়-পরস্পরসংলগ্ন ক্ষুদ্রকায়, দ্বীপ প্রফুল্ল দর্শকের সোৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ণিমা নিশীথে প্রাসাদের 'আশমান চবুত্রা' (আকাশমণ্ডপ) হইতে উহারা স্বপ্নপরীর ক্রীড়াকাননরূপে প্রতীয়মান হয়।

উভয় দ্বীপোদ্যানমধ্যে এক একটি সুরম্য সৌধ বিদ্যমান। শাহ্জাদা খুরম (অতঃপর সম্রাট্ শাহ্জাহান) তদীয় পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া মেবারপতির আশ্রয়ে দ্বীপদ্বয়ের একটিতে, দ্বিতল সৌধভবনে, অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই ভবনের প্রধান কক্ষটি অনাড়ম্বর ফুলকারী কারুখচিত। সেই কারুকলাই হয়ত শাহ্জাহান-সৃষ্ট তাজমহলের নানাবর্ণের প্রস্তরখণ্ড-খচিত সূক্ষ্ম অলঙ্করণ অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। উহা, ভ্রমবশতঃ, ইতালীয় শিল্পীর 'Pietra dura' অলঙ্করণ বলিয়া অভিহিত। পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতীয় দ্বীপের মর্ম্মরময় জলপ্রাসাদে প্রাসাদনির্ম্মাতা জগৎসিংহ এবং পরবর্ত্তী মহারাণাগণ গ্রীষ্মকালে অবস্থান করিতেন। অদ্যাপি উহা মহারাণার বিশ্রামভবনরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পেশোলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও পশ্চিম পার্শ্বস্থ দুইটি শৃঙ্গোপরি সুজনগড় এবং একলিঙ্গগড় উপদুর্গদ্বয় অবস্থিত। উহারা রাজধানী উদয়পুর হইতে দৃষ্ট হয়। উদয়পুর হইতে একটি অগভীর গিরিবর্ত্ম একলিঙ্গগড় অতিক্রম করিয়া সুদূর কুম্ভলগড় দুর্গাভিমুখে গমন করিয়াছে।

মহারাণা প্রাসাদের উত্তর তোরণ হইতে একটি শাখাপথ, পশ্চিম দিকে সুবৃহৎ জগদীশ মন্দিরের উত্তর প্রাকারের সমান্তরালে অগ্রসর হইয়া, প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণাংশ 'বাগোর কি হাবেলী' মহলের পশ্চিমভিত্তি-চুম্বী পেশোলা হ্রদের গঙ্গোড় (গঙ্গা) ঘাটে শেষ হইয়াছে। 'গঙ্গোড়' শত শত কূর্ম্ম ও মৎস্যপূর্ণ। ত্রিতলসৌধসংলগ্ন, প্রসারিত চত্বরবিশিষ্ট, সেই প্রস্তরময় গঙ্গোড় ঘাট পেশোলার উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বিদ্যমান আছে। ত্রিতল ঘাটসৌধের নিম্নতল ত্রিসংখ্যক 'বুংড়িদার' (অর্দ্ধ-পদ্মাকৃতি) খিলান শোভিত; দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলে যথাক্রমে বিবিধ বর্ণের পুরুকাচখচিত জালি-বাতায়নবিশিষ্ট নৃত্যকক্ষ এবং সু-উচ্চ 'আশমান চবুত্রা'।

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণা উদয়সিংহ আরাবল্লী শীর্ষস্থ ওই মনোমুগ্ধকর উপত্যকায় তদীয় 'স্বপ্নপুরী'-রাজধানী উদয়পুরের প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বহু-উদ্যানসমৃদ্ধ উদয়পুর 'পেশোলা', 'ফতেসাগর', 'সুরসাগর' প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জলাশয়বেষ্টিত। সূর্য্যরথাকৃতি প্রাসাদসৌধ মধ্যযুগীয় শ্রেষ্ঠ হিন্দুস্থাপত্যে গঠিত।

'সজ্জনবিলাস' উদ্যানমধ্যস্থ দ্বিতল শিল্পসংগ্রহশালায় অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া মিউজিয়মে উন্নত মেবারী শিল্পের বিবিধ নিদর্শন প্রদর্শিত হইয়াছে। হলদিঘাটের উন্নত মানচিত্র এবং 'চৈতক'পৃষ্ঠে রণসজ্জায় মহাবীর প্রতাপসিংহের প্রমাণাকার প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত তদীয় গুরুভার তরবারি, লৌহবর্ম্ম, চর্ম্মপাদুকা ও ধাতুময় শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি তাহাদের অন্তর্ভুক্ত।

১৩০ চিত্র—পার্শ্বনাথ মন্দিরমণ্ডপ, আবু পর্ব্বত, ১০৩১ খৃঃ

সোলাঙ্কি রাষ্ট্রশাসিত উত্তর গুর্জ্জর (গুজরাট) প্রদেশীয়, গুপ্তসংস্কৃতিসম্ভূত, যে সুষ্ঠু স্থাপত্যে মুধেরার অপূর্ব্ব মন্দিরের সৃষ্টি হয়, তাহার চরম অভিব্যক্তি হইয়াছিল অর্ব্বুদ শৈলের আবু উপত্যকায় শ্রেষ্ঠিশ্রেষ্ঠ বিমল শা-প্রতিষ্ঠিত জৈন দেবায়তনের অতুলনীয় কারুকলায় তথা পশ্চিম গুর্জ্জরের কাথিবার-অঞ্চলীয় কয়েকসংখ্যক দেব-দেউলের রূপায়ণে।

নালন্দা মহাবিহারের অভ্যন্তরস্থিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বারান্দাসংলগ্ন সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠসদৃশ, বিমল শা-র —১৪৫' দীর্ঘ ও ৯৫' প্রস্থ—দেবায়তনের মধ্যবর্ত্তী প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া দুই সারি অনুচ্চ স্তম্ভসমন্বিত প্রশস্ত অলিন্দসংলগ্ন ৫৫ সংখ্যক সারিবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক মন্দিরের বেদীপীঠে এক একটি তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি বিরাজমান।

প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ভগবান্ পার্শ্বনাথের মূল মন্দিরের আয়তন ৯৮'×৪২'। উদাত্ত মূর্ত্তিমহিম সেই মন্দিরের সম্মুখস্থিত ২৫'×২৫' পরিমিত অষ্টকোণী সভামণ্ডপের অষ্টকোণে অষ্টসংখ্যক মর্ম্মরময় স্তম্ভোপরি, পূর্ণপ্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমলপ্রতিম, অনুপম চন্দ্রাতপ (শিলাচ্ছাদন)। চিত্রে সেই চন্দ্রাতপ দৃশ্যমান। উহার অন্তর্ব্বর্ত্তী একাদশসংখ্যক স্তবকচক্রের গুচ্ছে গুচ্ছে, দলে দলে, শ্রেণীবদ্ধ দেবদেবী, পুষ্পলতা ও পশুপক্ষীর কমনীয় ভাস্কর্য্য।

পূর্ণপ্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুকুমার শিল্পের ছন্দে ছন্দে সৃজনময়ী প্রকৃতিদেবীর আনন্দময় সৃষ্টির গভীর রহস্য প্রকটিত হইয়াছে। ষোড়শসংখ্যক সুতনু সুভঙ্গী বিদ্যাধরীগণ স্ব স্ব শিরোপরি শিলাচ্ছাদন (সৃষ্টিচক্র) ধারণ করিয়া প্রশান্ত পুলকে দণ্ডায়মানা।

সুদূর যোধপুর (২০০ ক্রোশ) হইতে আনীত রাশি রাশি 'মার্ব্বেল' প্রস্তর অর্ব্বুদ শৈলের ৪০০০' উচ্চ আবু উপত্যকায় উত্তোলিত করিতে হইয়াছিল বৈশ্যপতি বিমল শা, বস্তুপাল ও তেজপালের মন্দিরগুলি নির্ম্মাণের জন্য।

দিল্লী-আহমেদাবাদ রেলপথের 'আবু রোড' ষ্টেসন হইতে ৯ ক্রোশ চড়াইপথে ৪০০০' উপরে আবু নগরে উঠিতে হয়। অনুমান ২ ক্রোশ দীর্ঘ ও ১ ক্রোশ প্রস্থ বর্ণাঢ্য উপত্যকায় ঘনপীত ও হরিৎবর্ণ শস্যক্ষেত্রের সুকোমল আস্তরণমণ্ডিত, সুশ্যামল পাদপতরু-সমাচ্ছন্ন শান্তিময়ী আবু নগরী শোভমান রহিয়াছে।

নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে 'নকীতলাও' জলাশয়। উহা উদয়পুর, জয়পুর, যোধপুর, সিরোহী, টঙ্ক প্রভৃতি রাজ্যের নৃপতিবর্গের প্রাসাদমালার মেখলাবেষ্টিত। সুবিশাল জলরাশির দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে সুনিবিড় বৃক্ষপুঞ্জের প্রসারিত শাখাপ্রশাখানিচয় দলে দলে, নতশিরে, ঘননীল সলিলমুকুরে নিজ নিজ অঙ্গসৌষ্ঠবের প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছে।

নগরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে দিলবারার জৈনমন্দিরসমূহ। উহাদের অর্দ্ধ-ক্রোশ দক্ষিণে বীকানীর মহারাজার প্রাসাদোদ্যান। বিহগসেবিত পুষ্পোদ্যানমধ্যে লঘুলোহিতাভ বালুপ্রস্তরের দ্বিতল প্রাসাদ। মধ্যযুগীয় রাজস্থানী রাজোদ্যানের রমণীয় আলেখ্য উক্ত উদ্যানে প্রতিফলিত। বীকানীর প্রাসাদের ৪ ক্রোশ উত্তরে জঙ্গলাকীর্ণ পর্ব্বততরঙ্গের সান্নিধ্যে অচলগড় মহাতীর্থ। তথায় জৈন ধর্ম্মবীর অচলনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত।

পূর্ব্বোক্ত 'নকীতলাও' হ্রদের অদূরস্থ আবুপ্রান্ত হইতে একটি সুচল শৃঙ্গ উত্থিত হইয়া আরাবল্লীর বহুদূর বিস্তৃত বিশাল প্রান্তর অবলোকন করিতেছে। সেই শৃঙ্গশীর্ষস্থ 'সূর্য্যাস্ত দর্শন' (Sunset Point) বেদী হইতে, সূর্য্যাস্তকালে, রাজওয়াড়ার দিক্‌চক্রবালে রাজপুতরক্তরঞ্জিত 'মেবার পাহাড়' গলিত লৌহতরঙ্গবৎ প্রতীয়মান হয়।

১৩১ চিত্র—মনিকর্ণিকাঘাট, বারাণসী

বিবিধ ধর্ম্মমত ও বহু বিচিত্র সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র বারাণসীতীর্থের সত্যমন্দির-কেন্দ্রী 'ধর্ম্মারণ্যে'ই বেদান্তপ্রাণ ভারতের সনাতন ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সভ্যতার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। ৫৫০ সংখ্যক বুদ্ধজাতক কাহিনীর প্রায় প্রত্যেকটি মহাভারত-সম্পৃক্ত কাশীরাজের রাজধানী কাশীধামের (বারাণসী) সহিত সংশ্লিষ্ট।

বারাণসীর শত শত দেবায়তন, মঠ ও শিক্ষাভবন, চতুষ্পাঠী ও সদাব্রত মহেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে। বিরাট্ ধনুরাকৃতি উত্তরবাহিনী ভাগীরথীর দুই ক্রোশ দীর্ঘ উচ্চতটপ্রান্ত হইতে

উচ্চ সোপানশ্রেণী শত শত পাষাণচত্বরের অন্তস্থল ভেদ করিয়া গঙ্গাগর্ভে নামিয়াছে। কল্লোলিনী সুরধুনীর অশ্রান্ত অনন্ত সঙ্গীত—"প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং"—সুবর্ণচূড় বিশ্বনাথ দেবায়তনের পাষাণগাত্রে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুনরনারী তাঁহাদের ঐহিক জীবনের শেষ অধ্যায় কৈবল্যধাম কাশীর পুণ্যতীর্থে পরমেশ্বরের আরাধনায় অতিবাহিত করেন; মণিকর্ণিকার গঙ্গাজলে, দেহত্যাগের প্রাক্কালে, ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে হাসিমুখে মরণকে বরণ করেন। ত্রিগুণাত্মক ত্রিশূলধারী গুণাতীত শিব বিশ্বনাথ স্বয়ং তাঁহাদের নয়নসমক্ষে মোক্ষধামের মুক্তিতোরণ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেন।

১৩২ চিত্র—জয়স্তম্ভ, চিতোরগড় (রাজস্থান), ১৪৫০ খৃঃ

মহারাণা কুম্ভ চিতোরদুর্গশীর্ষে, তদীয় মালবরাজ্য-জয়ের স্মারক, একটি পরিপূর্ণসুন্দর 'জয়স্তম্ভ' নির্ম্মাণ করেন। গুপ্ত-জৈন স্থাপত্যে গঠিত, ৩৫' চতুরস্র ও ১২২' উচ্চ, নবতল, প্রস্তরময় স্তম্ভের সর্ব্ব অঙ্গ পুরাণকাহিনীসম্পৃক্ত সুন্দর সুন্দর ভাস্কর্য্যাবলী ও পুষ্পলতার কারুমণ্ডিত। মেবার গৌরবের অবিনশ্বর স্মৃতিসংবাহক উক্ত জয়স্তম্ভনির্ম্মাণে মুধেরার ব্রাহ্মণ্য সূর্য্যমন্দির এবং দিলবারার জৈন পার্শ্বনাথ মন্দিরশিল্পের রচনারীতির যৌথ বিকাশ সংসাধিত হইয়াছিল।

খৃঃ অষ্টম হইতে দশম শতক অবধি যোধপুর-অঞ্চলীয় ওশিয়ার 'মহাবীর' জৈনমন্দিরে এবং নবগ্রহচিহ্নিত ব্রাহ্মণ্য 'সূর্য্য'মন্দিরে গুপ্তস্থাপত্যের সনাতন ধারা সংরক্ষিত তথা পরিপুষ্ট হইয়াছিল। সমসাময়িক ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লী) ও গিয়াসপুরের (গোয়ালিয়র) দেবায়তনগুলি ব্যতীত চিতোরগড়ে দশম শতকে প্রতিষ্ঠিত প্রসিদ্ধ কালিকামন্দিরও গুপ্তস্থাপত্যকলাকে কমনীয়ভাবে বিকশিত করিয়াছিল। হিন্দু- ও জৈন-সংস্কৃতিসম্ভূত সেই অভিনব পূর্ত্ত-শিল্পবিকাশের অনুপ্রেরণায় মুধেরা ও দিলবারার শ্রেষ্ঠ দেবায়তনসমূহের সৃষ্টি। চিতোরের অতুলনীয় স্মৃতিস্তম্ভ উহাদের সকলের সম্মিলিত অবদানপুষ্ট।

সত্যনিষ্ঠ গুপ্তসম্রাট্‌গণের ধর্ম্মমূলক কর্ম্মজীবনের অত্যুদার আদর্শানুসরণে সোলাঙ্কি রাজন্যবর্গ-প্রমুখ বস্তুপাল ও তেজপাল প্রভৃতি বৈশ্যকুলতিলকগণ হিন্দু ও জৈন দেবায়তননির্ম্মাণে অপিচ হিন্দু ও জৈন পণ্ডিতবর্গের ও শিল্পিসঙ্ঘের পোষণে অকুণ্ঠিতভাবে সহযোগিতা ও অর্থব্যয় করিতেন। হিন্দু ও জৈন মন্দিরে জৈন ও হিন্দু দর্শনাচার্য্যগণ ধর্ম্মসূত্রের ও বেদান্তের ব্যাখ্যা করিতেন। মেবারপতি কুম্ভও, তাঁহাদের অনুরূপ, ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মমতের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। ত্রিবিধ মহতী সংস্কৃতিসম্ভূত অবিনশ্বর 'জয়স্তম্ভ' তাঁহার উদার আকাঙ্ক্ষার মূর্ত্ত নিদর্শন।

১৩৩ চিত্র—জয়সমুদ্র, মেবার (রাজস্থান), খৃঃ সপ্তদশ শতক।

আরাবল্লী হইতে নির্গত একটি অফুরন্ত জলপ্রবাহের গতিরোধকল্পে মহারাণা জয়সিংহ একটি সহস্র ফুট দীর্ঘ, সুদৃঢ় ও সু-উচ্চ বাঁধ নির্ম্মাণ করেন। রুদ্ধগতি সলিলপ্রবাহ প্রায় বিংশতি ক্রোশ

পরিধিবিশিষ্ট একটি কৃত্রিম হ্রদের সৃষ্টি করতঃ কয়েকসংখ্যক কৃত্রিম জলনালির মাধ্যমে শত সহস্র কৃষিক্ষেত্র আর্দ্র ও উর্ব্বর রাখিয়াছে। জয়সমুদ্র উদয়পুর হইতে বিংশতি ক্রোশ দূরে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। চিত্রে উহার উত্তর-পশ্চিম কোণাংশ মাত্র দৃশ্যমান।

বিশাল জলবন্ধসংলগ্ন, শ্বেতমর্ম্মরের সোপানপথশ্রেণী—সুন্দর সুন্দর 'ছত্রি'-শোভিত মর্ম্মর-চত্বরসমূহের অন্তরালে অন্তরালে, ত্রিশ ফুট নিম্নে, হ্রদমধ্যে নামিয়াছে। চিত্রের উভয় পার্শ্বে মহারাণার এবং মহামন্ত্রীর গ্রীষ্মকালীন সৌধাবাসদ্বয় পরিদৃষ্ট হইতেছে।

সাগরসমতুল জলরাশির স্বচ্ছ সলিলস্পর্শী, প্রায় ৮০০' উচ্চ, একটি শৈলের উপরিভাগে দণ্ডায়মান একটি প্রস্তরময় প্রাসাদের ত্রিতলে—শ্রেষ্ঠ কারুকলাখচিত স্তম্ভাবলীসম্বলিত, বিচিত্রজালি ও মর্ম্মরময় কিরীট ('রাওটি')-সমৃদ্ধ বারান্দা ('বাদল বিলাস') ব্যতীত প্রাসাদশীর্ষে কয়েকসংখ্যক 'আশমান চবুত্রা' অর্থাৎ 'হাওয়া মহল'-মণ্ডপ বিদ্যমান আছে। চিত্রের বাম পার্শ্বে শৈলশৃঙ্গোপরি মহারাণার দুর্গপ্রাসাদ দৃশ্যমান।

ত্রিতল প্রাসাদের সুবৃহৎ ছাদের এককোণে একটি দ্বিতল অংশ দ্রষ্টব্য। উহার আচ্ছাদন-সংলগ্ন সারিবদ্ধ 'হাওয়া মহল' হইতে—দিগন্তবিস্তৃত জয়সমুদ্রের কৃষ্ণনীল জলরাশির গর্ভে দিনমণির নিমজ্জনদৃশ্য অবিস্মরণীয়। দক্ষিণ ভারতের বিশাখপত্তনের (Vizagapatam) সমুদ্রতীরস্থ পর্ব্বত-শিখর (Dolphin Nose) হইতে অনুরূপ সূর্য্যাস্ত উপভোগ করা যায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তদীয় মর্ম্মস্পর্শী কবিতা 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র আবেগময় ভাবের অমৃতময়ী ভাষার মাধ্যমে সাগরপারে সূর্য্যাস্তের অনাবিল সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। অংশুমালীর অস্তাচলে অবরোহণকালে 'হাওয়া মহল' হইতে ঝলকমান-সোনালি-রঞ্জিত জয়সমুদ্র তাঁহার অমর কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দুর্গপ্রাসাদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণাংশে, দুইটি সমান্তরাল প্রাচীরমধ্যস্থ মাত্র ৪' প্রশস্ত স্থানে, উপরে উঠিবার উচ্চধাপ সোপানপথ বর্ত্তমান। সোপানকক্ষ প্রবেশের লৌহদ্বার সাহায্যে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলের মেঝে-সংলগ্ন প্রস্তরের আচ্ছাদন দুইটির দ্বারা উপরগামী অপ্রশস্ত পথ অবরুদ্ধ করিয়া শত্রুসৈন্যের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হইত।

জয়সিংহের জনক মহারাণা রাজসিংহ বহুসহস্র শ্রমিকের দশবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের বিনিময়ে একটি দেড়ক্রোশ দীর্ঘ জলবন্ধ নির্ম্মাণ করতঃ ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, 'রাজসমুদ্র' হ্রদ প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজসমুদ্র হইতে উদয়পুরের ব্যবধান ১২ ক্রোশ। মহামারীজনিত দুর্ভিক্ষের কবলে মেবার রাজ্য ধ্বংস হইবার উপক্রম হইলে বর্ত্তমানকালীন হিসাবে প্রায় ২০ ক্রোড় টাকা ব্যয়ে, রাজসমুদ্র নির্ম্মাণ-কার্য্যে, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজাদের নিয়োজিত করিয়া প্রজাবৎসল রাজসিংহ যে কেবলমাত্র বিপন্ন প্রজাবর্গের জীবন রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা নহে, যাহাতে মেবার পুনরায় দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট না হয় তাহারও সুব্যবস্থা হইয়াছিল রাজসমুদ্রের মাধ্যমে। জয়সমুদ্র- এবং রাজসমুদ্র-সংলগ্ন কৃত্রিম

জলনালিসমূহ মেবারের শস্যোৎপাদনে, উদ্যানপোষণে এবং সহস্র সহস্র অধিবাসিগণের জীবনরক্ষণে সহায়তা করিয়াছিল এবং করিতেছে।

প্রসিদ্ধ বল্লভাচারী বৈষ্ণবতীর্থ 'নাথদ্বার' রাজসমুদ্রের সন্নিকটে অবস্থিত।

১৩৪ চিত্র—যশল্মীর নগরী, রাজস্থান, খৃঃ দ্বাদশ শতক।

মাড়বার-সন্নিহিত 'লুনিজংসন'-সংলগ্ন সিন্ধ-হায়দ্রাবাদ রেলপথের অন্তর্বর্ত্তী ষ্টেসন 'বারমীর' হইতে ৫০ ক্রোশ উত্তরে উত্তর-পশ্চিম রাজোয়াড়া-সংশ্লিষ্ট যশল্মীর রাজ্যের রাজধানী যশল্মীর নগর অবস্থিত। অতীতে উষ্ট্রপৃষ্ঠে অথবা পদব্রজে প্রচণ্ড 'থর' মরুভূমি লঙ্ঘন করিয়া তথায় গমন করিতে হইত। এক্ষণে মোটরযানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দিগন্তবিস্তৃত প্রখর মরুভূমির সীমাহীন পথপার্শ্বে, বালুময় পরিবেশে, সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাকীর্ণ 'বন' (উষ্ট্রের প্রধান আহার্য্য 'দেবজটা') ঝোপের অন্তরালে অন্তরালে, ৫-৬ ক্রোশ ব্যবধানে, ২০-২৫ খানি 'বন'-লতাচ্ছাদিত ঘনসন্নিবদ্ধ মৃন্ময় কুটীরবিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক (পশুপালক) পল্লী স্বপ্নেদৃষ্ট অর্দ্ধস্ফুট লোকালয়সদৃশ যাত্রীর নয়নপথে নিপতিত হয়। বালুময় ধূসর প্রান্তরের সংখ্যাতীত বিবর হইতে নির্গত পাংশুবর্ণ মূষিককুল দিবাভাগে ইতস্ততঃ বিচরণ করে। 'বন'লতার শিকড়ই উহাদের খাদ্য। জলপথে অতলান্তিক মহাসাগর অতিক্রমকালে স্থানে স্থানে সেইরূপ অর্ণবপোতের সমান্তরালে ধাবমান শ্রেণীবদ্ধ হাঙ্গরকুল দৃষ্ট হয়।

মধ্যে মধ্যে, প্রস্তরময় প্রাকার ও দৃঢ়দ্বারবেষ্টিত, পঞ্চ-ষষ্ঠ শতসংখ্যক লঘু প্রস্তর- ও মৃত্তিকা-নির্ম্মিত একতল ও দ্বিতল পাকাগৃহ, কুটীর, কার্য্যালয়, ঔষধালয়, চক ও বাজার প্রভৃতি সহ 'দেবীকোট', 'ফতেগড়' প্রভৃতি 'গড়' অর্থাৎ মরুদুর্গ বিদ্যমান। উহাদের প্রত্যেকের মধ্যে গিরিধর ও শিওজী প্রভৃতি দেবগণের, অনাড়ম্বর স্থাপত্যশিল্পভূষিত একাধিক দেবায়তন।

মরুকান্তারের বহুদূর হইতে নিস্তরঙ্গ বালু সমুদ্রোত্থিত অনুচ্চ শৈলশিরে বিরাজমান হরিদ্রাভ বালুপ্রস্তরের মহারাওয়ল প্রাসাদটি অস্পষ্ট অর্ণবপোতের আকারে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রাসাদশিখরস্থিত চন্দ্রচিহ্নিত রাজপতাকা-স্তম্ভ অর্ণবপোতের মাস্তুলবৎ প্রতীয়মান হয়।

প্রাসাদ, রাজকীয় কার্য্যভবন ও দেবায়তন-সমৃদ্ধ শৈলদুর্গটিকে বামপার্শ্বে রাখিয়া—চিত্রের বাম হইতে দক্ষিণ দিকে—'গড়িসর' জলাশয়ের বালুময় তীরপথাবলম্বনে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা-শোভিত রাজনগরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। প্রস্তরাচ্ছাদিত রাজবর্ত্ম এবং মৃত্তিকা, প্রস্তরখণ্ড ও বালুকানির্ম্মিত শাখাপথ-সংলগ্ন একতল, দ্বিতল গৃহস্থভবন এবং ত্রিতল, চৌতল শ্রেষ্ঠিসদনসমূহের ফাঁকে ফাঁকে চক, বাজার, কার্য্যালয়, অবৈতনিক বিদ্যালয়, ব্যায়ামশালা, মল্লভূমি, উদ্যান, প্রমোদ-ভবন, সঙ্গীতশালা, শিল্পভবন, আয়ুর্বেদভাণ্ডার, হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়, মনোহারী দ্রব্যভাণ্ডার, গোশালা এবং পশু চিকিৎসাকেন্দ্র ব্যতীত লছমীনাথ ও গোপাল মন্দির, মহাদেও ও আদিনাথ

মন্দির, জৈন পাঠশালা, প্রাচীন পাণ্ডুলিপিসম্পন্ন জৈন 'পুস্তকভাণ্ডার', পৌরসভামণ্ডপ ও মসজিদ প্রভৃতি বিন্যস্ত আছে।

চিত্রে 'গড়িসর' জলাশয়তীরে নগরের একাংশ দৃশ্যমান। দুর্গশিরে মহারাওয়লের প্রস্তরময় প্রাসাদ এবং তৎসংলগ্ন শান্তিনাথ (৭০ চিত্র), পার্শ্বনাথ এবং বিশ্বনাথ মন্দিরের চূড়াগুলি দেখা যাইতেছে। রাজোদ্যানসংলগ্ন 'রাজগ্রন্থ'ভাণ্ডার ও বিবিধ সৌধসদন চিত্রে দৃষ্ট হয় না। প্রাসাদশিরে 'বাদল বিলাস' মিনারটি বহু উচ্চ এবং সুকুমার কারুকার্য্যমণ্ডিত। উহা হিন্দুমুঘল স্থাপত্যশিল্পের বিশিষ্ট নিদর্শন।

বিংশতি সহস্র নাগরিক-অধ্যুষিত অনতিবৃহৎ রাজধানী মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শিলাবৎ, ধাতুশিল্পী, লোহার, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, তৈলিক, তন্তুবায়, সম্মার্জক ও মেথর গোষ্ঠীগণের অবস্থানের জন্য শিল্পশাস্ত্রনির্দ্দেশিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মহল্লা (পল্লী) বিন্যস্ত আছে। ব্রাহ্মণগণ প্রধানতঃ প্রাকার ও সিংহদ্বারবেষ্টিত শৈলদুর্গমধ্যে, প্রাসাদের সান্নিধ্যে, অবস্থান করেন। নগরমধ্যে মুস্‌লিম রাজপুতগণ বংশানুক্রমে হিন্দুর সহিত সদ্ভাবে বসবাস করিতেছেন। তাঁহারা গো হত্যা করেন না এবং হিন্দুর সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তাঁহারা সাধারণতঃ পশুপালনজীবী; পশুচর্ম্ম, উষ্ট্রলোমের কম্বল ও শীতবস্ত্র এবং ঘৃত প্রভৃতির ব্যবসাবাণিজ্য পুরুষানুক্রমে পরিচালিত করিতেছেন।

গড়িসর, মূলতলাও প্রভৃতি কয়েকটি জলাশয় নগরে ইতস্ততঃ বিদ্যমান। কিন্তু গড়িসর ভিন্ন অন্য সরোবরগুলি গ্রীষ্মকালে শুষ্ক হইয়া যায়। ১৫′ হইতে ২৫′ পরিধিবিশিষ্ট, ৩০০′-৩৫০′ গভীর, বহু জলকূপ আছে। উহারা প্রস্তরমণ্ডিত। শীত এবং গ্রীষ্মকালে, উষ্ট্রচালিত 'চরস'যন্ত্র সাহায্যে কূপ হইতে গরম এবং শীতল জল উত্তোলিত হয়।

মধ্যযুগের ভারতীয় নগরের এবং শিল্পানুরাগী নাগরিকবৃন্দের ধর্ম্মময় কর্ম্মজীবনের তথা শান্তিপূর্ণ গণসমাজের প্রত্যক্ষ পরিচয় স্বদেশী স্থাপত্যসমৃদ্ধ যশল্মীরে উপলব্ধ হয়। শীত ও গ্রীষ্মের তীব্রতা খর্ব্ব করিবার জন্য ঘনসন্নিবদ্ধ গৃহকক্ষ ও কুটীরগুলিতে অল্পসংখ্যক গবাক্ষ (বাতায়ন) সন্নিবেশিত হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যভূষিত বিস্ময়কর গোপাল মন্দির নগরীর মধ্যস্থলে বিরাজমান। উহা সনাতন ধর্ম্মশিক্ষার তথা দর্শনানুশীলনের পীঠস্থানরূপে সক্রিয় রহিয়াছে। সাধুজন তথায় সমবেত হইয়া 'মোহন্তজীর' সকাশে শাস্ত্রশিক্ষা ও ধর্ম্মচর্চ্চা করেন। মধ্য কলিকাতার Nahar Museum প্রতিষ্ঠাতা শিল্পরসিক স্বর্গীয় পুরণচাঁদ নাহার এম.এ., বি.এল. যশল্মীরপ্রসঙ্গে, হিন্দীভাষায়, 'জৈসলমের' নামক বহুতথ্যপূর্ণ সচিত্র একখনি গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছেন।

অধিকাংশ নরনারীর অশনবসন, আচারব্যবহার, উৎসব-অনুষ্ঠান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (মঠ ও উপাশ্রয়) প্রাচীন প্রথার বহুধা অনুসরণ করিতেছে। কর্ণেল জেমস্ টডের *Annals of Rajasthan*-এ বিবৃত রাজপুত জীবনধারা যশল্মীরে অদ্যাবধি প্রবাহিত হইতেছে। কর্ণে কুণ্ডল ও

গলদেশে কণ্ঠাভরণভূষিত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অভিজাতবর্গ এবং মণিবন্ধে বলয়পরিহিত, বীণাবাদনরত, ভাট ও চারণ তথায় অদ্যাপি পরিদৃষ্ট হয়। শ্রেষ্ঠিপত্নীর গুরুভার স্বর্ণালঙ্কারগুলি প্রায়শঃ দুর্গা প্রতিমার আভরণসদৃশ। ক্রয়বিক্রয়কালে 'অকেসাঈ' ও 'ডোঢ়িয়া' রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা ব্যবহৃত হয়। 'ডোঢ়িয়া' ভারতের অন্যত্র 'টেংপুয়া' রূপে প্রচলিত ছিল।

চকে, বাজারে, পল্লীতে পল্লীতে, ঘোষকগণ ঢক্কাবাদনসহ নাগরিকবৃন্দকে জানাইয়া দেন কোথায় কখন কোন্ শ্রেষ্ঠী কিরূপ জনহিতকর কার্য্য করিবেন এবং সেই অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলমান সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি ও ইষ্টকামনা প্রার্থনীয়। অনুষ্ঠানপ্রসঙ্গে শ্রেষ্ঠিবর 'প্রপা' (জলসত্র) এবং আটার পুরী, গমের লাড্ডু ও শিরা (হালুয়া), দধি, শর্করাসহ ঘৃতপক্ক ছোলার বরফি, ছোলার ডাল, পাপর এবং পলাণ্ডু, মূলা ও বরবটির পৃথক পৃথক শাক (ব্যঞ্জন) প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন। উৎসবদিবসের প্রত্যূষে শ্রেষ্ঠিগৃহিণীপ্রমুখা পুরললনাগণ সমবায়-সমিতি-প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীকৃষ্ণ গোশালা' হইতে স্বহস্তে গো দোহন করিয়া সাধারণের সেবার নিমিত্ত অনুষ্ঠানকেন্দ্রে দুগ্ধ প্রেরণ করেন।

বর্ষার শেষভাগে এবং হেমন্তের অন্তে মরুভূমির স্থানে স্থানে বাজরী ও যোয়ার এবং গম ও ছোলা উৎপন্ন হয়। আহার্য্যের অন্যবিধ শস্য প্রভৃতি রাজ্যের বাহির হইতে আমদানি করা হয়।

১৩৫ চিত্র—কমলমীর দুর্গ, রাজস্থান, খৃঃ পঞ্চদশ শতক

উদয়পুরের ৪৫ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে, আরাবল্লী (অর্ব্বুদ) পর্ব্বতের ৪০০০' উচ্চ উপত্যকায়, কুম্ভলগড় (কমলমীর) দুর্গ অবস্থিত। উদয়পুর হইতে ১০ ক্রোশ দূরে, অপ্রশস্ত অগভীর গিরি-সঙ্কটের কমলমীরগামী চড়াইপথপার্শ্বস্থ একলিঙ্গগড়ে, মীরাবাঈ-প্রতিষ্ঠিত রমণীয় স্থাপত্যভূষিত গোপালমন্দির এবং শিশোদীয় মহারাণার কুলদেবতা চতুর্ম্মুখ শিবের নয়নাভিরাম পাষাণমন্দির বিরাজমান। মধ্যপথে, প্রায় ২০ ক্রোশ দূরে 'গোগণ্ডা' নগরী বিদ্যমান আছে। প্রাচীন হিন্দু-স্থানের গণতান্ত্রিক (সমবায়ী) পৌরজীবন শান্তিপূর্ণভাবে তথায় পরিচালিত হইত বিংশতি বৎসর পূর্ব্বেও। গোগণ্ডার উপকণ্ঠস্থিত অনুচ্চ শৈলশিরে একটি জঙ্গলে, হলদিঘাট-যুদ্ধান্তে প্রতাপসিংহের অবস্থানকালে, তদীয় দুহিতার জন্য রক্ষিত একখানি রুটি বনবিড়াল লইয়া পলায়ন করিয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। জঙ্গলমধ্যে প্রতাপসিংহ ব্যবহৃত পাষাণময় কুটীরের ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়। আকবরের বিরুদ্ধে প্রতাপের যুদ্ধকালে মহারাণার যে পরমবন্ধু কৈলবারার সর্দ্দার চিতোরের দুর্গপ্রাকারের উপর প্রাণোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার দুর্গনগরী (৪১ চিত্র) কৈলবারাকে অতঃপর অতিক্রম করিয়া মধ্যযুগীয় রণপুরার সৌন্দর্য্যগরিমাদীপ্ত শ্বেতাম্বরী জৈনমন্দিরে যাওয়া যায়। রণপুরা হইতে পূর্ব্বমুখে ৫ ক্রোশ চড়াইপথ লঙ্ঘনান্তে আরাবল্লীশীর্ষস্থিত অগভীর অরণ্যে অবস্থিত, সুদৃঢ় প্রস্তরময় সুদীর্ঘ প্রাকার ও দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বার-পরিবেষ্টিত, মহারাণাকুম্ভ প্রতিষ্ঠিত—চিতোরপ্রমুখ ৩২ সংখ্যক মেবারী গিরিদুর্গের অন্যতম—কুম্ভলগড়ে যাইতে হয়।

মেবাররাজ্যের অন্যান্য স্থানগুলির মত তথাকার অধিবাসিগণও প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কতিপয় ভগ্ন ও অর্দ্ধছিন্ন দেবায়তন, সুড়ঙ্গমধ্যে গুপ্তকক্ষ ও মন্ত্রণাচত্বর ব্যতীত তরঙ্গায়িত উপত্যকার পাটে পাটে উপজাত—ক্ষুদ্র ও অনতিবৃহৎ সরোবরের অনুরূপ—স্বচ্ছ শীতল সুপেয় জলকুণ্ডনিচয়ের প্রায় প্রত্যেকটি এক্ষণে জনবিরল, জঙ্গলাবৃত এবং পরিত্যক্ত। মাত্র ২০।২৫ জন সৈন্য, ১০।১২ জন প্রহরী ও পরিচারক এবং অল্পসংখ্যক সম্মার্জক প্রভৃতি এক্ষণে দুর্গপ্রাসাদের মহাশূন্য কক্ষগুলির সংরক্ষণ- ও পর্য্যবেক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

যব ও গমের কৃষিক্ষেত্র এবং জঙ্গলাকীর্ণ ফলোদ্যান কুম্ভলগড়ের ইতস্ততঃ পরিলক্ষিত হয়। তাহাদের অধিকারী ভীল কৃষকগণ। ভীল জনপদের প্রান্তভাগে মর্ম্মরময় 'গোলেরা' মন্দিরের ধ্বংসাবশেষমধ্যে বিস্ময়প্রদ কারুকলাখচিত বিচিত্র স্তম্ভাবলী-সমন্বিত সঙ্কীর্ণ অলিন্দে অলিন্দে সারিবদ্ধ বিদ্যাধরীর সুঠাম সুহাস প্রতিমাসমূহ সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয় (১৩৬ চিত্র)। মন্দিরের ভগ্নস্তূপ হইতে বর্ত্তমান লেখক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত একটি শিলালেখে উৎকীর্ণ আছে যে, গোলেরা ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। গোলেরার সান্নিধ্যে 'পিত্তলদেও' মন্দিরের ভগ্নাবশেষমধ্যে নিহিত অন্য একটি শিলালিপিও লেখক আবিষ্কার করিয়াছিলেন; তাহাতে উৎকীর্ণ আছে যে, পিত্তলদেও প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে।

বর্ত্তমান চিত্রের উপরিভাগে মহারাণার জনবিরল দুর্গপ্রাসাদ দ্রষ্টব্য। অসমতল উপত্যকা হইতে উত্থিত অনুমান ৮০০' উচ্চ শৃঙ্গোপরি উহা গঠিত। চিত্রের মধ্যভাগে—তাঁবুর দক্ষিণপার্শ্বস্থ দেবায়তনের পশ্চাতে—সুবৃহৎ রাজচ্ছত্রসদৃশ একটি মর্ম্মরময় মণ্ডপ দৃশ্যমান। কমলমীর প্রতিষ্ঠাকালে কুম্ভরাণা সমারোহসহকারে তথায় যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত যজ্ঞমণ্ডপে মর্ম্মরমণ্ডিত যজ্ঞবেদী বর্ত্তমান আছে। চিত্রের দক্ষিণপ্রান্তে দৃষ্ট ষষ্ঠসংখ্যক সুন্দর স্তম্ভবিশিষ্ট সভামণ্ডপে মেবারপতির মন্ত্রণাসভা পরিচালিত হইত। এক্ষণে উহা পরিত্যক্ত। কুম্ভলগড় এক্ষণে নীরব, নিস্পন্দ। সভামণ্ডপের দক্ষিণপার্শ্বস্থ সর্পিল পথাবলম্বনে একটি বৃহৎ জলকুণ্ডকে দক্ষিণপার্শ্বে রাখিয়া, মসৃণ উৎরাইপথে অর্দ্ধক্রোশ অগ্রসর হইলে, নিম্নমুখে, বৃক্ষমেখলা ভীলপল্লীর সরল সবল ছন্দোবদ্ধ কুটীরগুচ্ছ মনোহর চিত্রবৎ প্রতীয়মান হয়। পল্লীর প্রত্যন্তে গোলেরার অবশেষ বিদ্যমান আছে।

উন্নত শিল্পসমৃদ্ধ গোলভিত্তি গোলেরা মন্দির একদা দিব্যদেহী পার্শ্বনাথের মঙ্গলময় আভালোকে দীপ্যমান রহিত। দীপ্তিহীন গর্ভগৃহের মর্ম্মরবেদী অধুনা বিগ্রহশূন্য—বহুধাভগ্ন। বেদীনিম্নে প্রোথিত ধনরত্নলুণ্ঠনকালে হয়ত আততায়ী কর্ত্তৃক মন্দিরের বর্ত্তমান দশা সম্ভাবিত হইয়াছিল। ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি গর্ভমন্দিরের দ্বারদেশে এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় শায়িত। এক্ষণে সমগ্র কুম্ভলগড়, গোলেরার পাষাণময়ী বিদ্যাধরীর তুল্য, শ্রীহীন, চেতনাহীন, স্পন্দনহীন।

১৩৬ চিত্র—গোলেরা মন্দিরের অলিন্দ, কমলমীর, খৃঃ পঞ্চদশ শতক

বিস্ময়প্রদ কারুকলামণ্ডিত, মর্ম্মরময় স্তম্ভাবলীসমন্বিত, সঙ্কীর্ণ অলিন্দে সারিবদ্ধ বিদ্যাধরীর সুঠাম সবল সহাস ভঙ্গিমা দ্রষ্টব্য।

১৩৭ চিত্র—শের শাহের সমাধি মসজিদ, সাসারাম (বিহার), খৃঃ ষষ্ঠদশ শতক

পাঠান সুলতান শের শাহ্ হিন্দু ও মুস্‌লিম স্থাপত্যের মিশ্রণে স্বীয় সমাধিসৌধ স্বয়ং নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বৃহৎ জলাশয়মধ্যে ৩০০'×৩০০' চত্বরোপরি গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত সবল সৌধটি ১৫০' উচ্চ। উহার প্রায় শতফুট পরিধিবিশিষ্ট, স্তূপাকৃতি, গম্বুজের শীর্ষভাগে হিন্দুমন্দিরসুলভ আমলক ও কলস দ্রষ্টব্য।

অনাড়ম্বর অলঙ্কারমণ্ডিত সুঠাম সুডৌল সমাধিভবনের সুষ্ঠু স্থাপত্য প্রখ্যাত 'পদ্মাবতী' কাব্যগ্রন্থ রচয়িতার পরম পোষক—হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পৃক্ত সাম্য-মৈত্রীর প্রবর্ত্তক—সম্রাট্ শের শাহের অকপট উদারতার পরিচায়ক।

১৩৮ চিত্র—রাজা রামমোহন রায়

শ্রেষ্ঠ সমাজসংস্কারক রাজা রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ১১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৩৯ চিত্র—পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু

মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় শিষ্য, বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু যুদ্ধমত্ত বিশ্বসমাজে অহিংসা, মৈত্রী ও শান্তিস্থাপনে আপ্রাণ প্রচেষ্টা করিতেছেন।

ভবিষ্যৎ ভারতের উন্নত গ্রাম, নগর ও নব্য স্থাপত্য

স্বাধীন ভারতে স্বদেশী স্থাপত্যের সুষ্ঠু বিকাশ বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনতা পাইবার পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিশ বৎসর যাবৎ—মৃতপ্রায় দেশীয় স্থাপত্যের নবজীবনকল্পে—সারাভারতব্যাপী অবিরাম আন্দোলন-বশতঃ, বিগত বিংশতি বৎসরের মধ্যে রাজধানী দিল্লীতে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে, বহুসংখ্যক আবাসভবন এবং দেবায়তন দেশীয় স্থাপত্যে গঠিত হইয়াছে। উহাদের কতকগুলি বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। ভারতীয় স্থাপত্যের নব-অভ্যুদয়ের অগ্রদূতরূপে উহারা বিবেচনাযোগ্য। কিন্তু আমেরিকান স্থাপত্যের অনুকরণে, উক্ত বিশ বৎসরে যে শত সহস্র অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে উহাদের অনুপাতে দেশীয় স্থাপত্যে গঠিত মন্দির, গৃহ, শিক্ষায়তন ও স্মৃতিভবন প্রভৃতির সংখ্যা হয়ত শতকরা একটি অথবা দুইটির অধিক হইবে না। ইহার কারণ—

(১) দেশে এরূপ কোনও প্রতিষ্ঠান নাই যাহা হইতে ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রসঙ্গত পরম্পরাগত স্থাপত্যবিদ্যায় এবং উহার ব্যবহারিক প্রয়োগবিষয়ে প্রচুরসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ও কারিগরকে শিক্ষিত

করিয়া তাঁহাদের সহযোগিতায় ভারতের নব নব গ্রাম নগরের রূপায়ণ সুসাধ্য হয় তথা পুরাতন গ্রামে নগরে জাতীয় শিল্পসমৃদ্ধ নব নব দেবায়তন, সৌধসদন ও বাসভবন নির্ম্মিত করা যায়;

(২) অজ্ঞ ও উদাসীন জনসাধারণের জাতীয় স্থাপত্যে জ্ঞান ও অনুরাগ উদ্বুদ্ধ করিবার ব্যাপক ব্যবস্থার অভাব;

(৩) দেশীয় স্থাপত্যে গৃহনির্ম্মাণ বহুব্যয়সাপেক্ষ এবং সেই গৃহে অবস্থান অস্বস্তিকর, স্বাস্থ্যনাশক ও অসুবিধাজনক—এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা সাধারণের চিত্ত হইতে বিদূরিত করিবার বন্দোবস্ত হয় নাই আলোক ও বাতাস প্লাবিত, স্বাস্থ্যসঙ্গত, বহু আবাস মন্দির স্বদেশী সুশোভন স্থাপত্যে পরিমিত অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হওয়া সত্ত্বেও।

বাটি নির্ম্মাণের পূর্ব্বে বাটির কল্পচিত্রাঙ্কণের কার্য্যে সাধারণতঃ যে সকল স্থপতি নিয়োজিত হয়েন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই বিদেশীয় ধরণের বাটি-পরিকল্পনায় শিক্ষিত। সেই হেতু দেশীয় শৈলীর বাটি অঙ্কনে কদাচিৎ অনুরুদ্ধ হইলেও, উপরোক্ত ভ্রান্ত যুক্তি সহকারে, তাঁহারা অধিকারিগণকে বুঝাইয়া থাকেন তাঁহাদের বাসনা পরিত্যাগ করিতে। শুধু তাহাই নহে; সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শক্তি ও বিত্তশালী সঙ্ঘবদ্ধ তাঁহারা বিবিধ কৌশলে জাতীয় স্থাপত্যের নবজাগরণের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত সর্ব্ববিধ আন্দোলন ও অনুষ্ঠান বিফল করিতে সহজেই সক্ষম হয়েন।

অধুনাতন ভারতের পাশ্চাত্ত্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন বহু ব্যক্তিই স্বদেশজাত শিল্প ও সংস্কৃতির উচ্ছেদের পক্ষপাতী। সংখ্যাগরিষ্ঠ তাঁহাদের দাবীকে উপেক্ষা করিতে গণতন্ত্রী গভর্ণমেণ্ট অক্ষম। এরূপ অবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠ তপশিলী উপজাতীয় গোষ্ঠীর দাবী-দাওয়া রক্ষা করার অনুরূপ সংখ্যালঘুজনগণপ্রার্থিত স্বদেশী শিল্পসংস্কৃতির ন্যায়সঙ্গত স্বত্বাধিকাররক্ষণে সদাশয় গভর্ণমেণ্ট উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন।

ভারতরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় স্থাপত্য শিক্ষায়তনের স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত অধুনা প্রচলিত 'অপরিণত' নব্য-ভারতীয়-স্থাপত্যেই গৃহগঠন এবং তৎকল্পে ব্যাপক আন্দোলন পরিহার করা সমীচীন হইবে না। মহাভারতীয় স্থাপত্যের পুনরুত্থানের যে বাসনাবহ্নি মুহ্যমান সুধীজনের তথা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের চিত্তে উদ্দীপিত রহিয়াছে, উহাকে নির্ব্বাপিত হইতে দেওয়া মহাজাতির সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের পক্ষে মহা অনিষ্টকর হইবে। স্বদেশী স্থাপত্য-সমৃদ্ধ সুশোভন গ্রাম নগরের প্রাথমিক (অপরিণত) কল্পনার আভাস নিম্নবর্ত্তী চিত্র ও চিত্রবিবরণীসমূহ হইতে পাওয়া সম্ভব। চিত্রে প্রদর্শিত, বিভিন্ন পর্য্যায়ী, বিবিধ পরিকল্পনার প্রায় প্রত্যেকটিই স্বল্পমেয়াদী, পরীক্ষামূলক ও সংস্কারসাপেক্ষ। দীর্ঘকালব্যাপী ব্যবহারিক প্রয়োগপ্রসূত ক্রমসঞ্চিত অভিজ্ঞতাই আপাত-অপরিণত পরিকল্পনাকে অতঃপর উন্নত করিতে পারিবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সর্ব্ববিধ গ্রাম, নগর ও স্থাপত্যশিল্প এইরূপভাবেই ক্রমশঃ পরিণত হইয়াছে। আদর্শমূলক গ্রাম ও নগরের স্থূল

পরিচয় বর্তমান লেখকপ্রণীত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *India and New Order* নামক সচিত্র গ্রন্থে পাওয়া যাইতে পারে।

১৪০ চিত্র—উন্নত গ্রাম

২০০০ সংখ্যক যন্ত্রশিল্পী ও শ্রমিক এবং ২০০০ সংখ্যক কৃষিজীবী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য গোষ্ঠীভুক্ত নরনারীর বাসোপযোগী 'প্রস্তর'-পর্য্যায়ী কল্পচিত্রের ঊর্দ্ধভাগে স্রোতস্বিনী, দক্ষিণপার্শ্বে বেষ্টনীসংলগ্ন প্রবেশতোরণ এবং মধ্যভাগে দেবায়তনশীর্ষ জাতীয় ভবন। নিম্ন- ও উচ্চ-প্রাথমিক বিদ্যালয়, চিকিৎসাগার, আরোগ্যনিকেতন, অগ্নিনিবারক যন্ত্রপাতির ভাণ্ডার ও শান্তিসেনার প্রতিষ্ঠান জাতীয় ভবনের উদ্যান-আবেষ্টনের চতুর্দ্দিকে দৃশ্যমান। 'কংক্রিট'ময় উচ্চ স্তম্ভাবলীর উপরস্থ বৃহৎ বৃহৎ জলাধার, জলাধারসমূহের নিম্নে জলোত্তোলন যন্ত্রসহ নলকূপনিচয়, যন্ত্র ও কুটীরশিল্পের তথা তাঁতঘরের কর্ম্মশালাসংলগ্ন মালখানা, চকমিলান প্রশস্ত বাজার, খনিজ তৈলভাণ্ডার এবং যাবতীয় ব্যাঙ্ক, সমবায়সমিতি, এবং আমদানি-রপ্তানির কার্য্যালয় ব্যতীত গ্রামীণ শিল্পশালা, পৌরসভা-ভবন, ভোজনশালা, প্রমোদশালা, শকটযান ও মোটরযানের অবস্থিতিপ্রাঙ্গণ এবং মৎস্যপূর্ণ (সংরক্ষিত) পুষ্করিণী প্রভৃতি উন্নত জীবনোপযোগী বহুবিধ সংস্থার ব্যবস্থা—ক্রীড়াভূমি-, পুষ্পকুঞ্জ- ও ফলোদ্যান-পূর্ণ সমৃদ্ধ গ্রামের ইতস্ততঃ বিদ্যমান। নদীতীরে স্নানমণ্ডপ, খেয়াঘাট, ধান্যগোলা ও বিবিধ শস্যভাণ্ডার, গোচারণ-ভূমি, মন্দির ও মসজিদ, ছায়াপ্রসারী বৃক্ষমূলে 'পঞ্চায়ৎ' বেদী ও বৃহৎ অতিথিশালা প্রভৃতি বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত কল্পচিত্রে পরিদৃষ্ট হয় না।

পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামসমূহের বহুবিধ অভাব আলোচ্য মহাগ্রাম হইতেই পূরণ করা সম্ভব।

১৪১ চিত্র—গ্রামপ্রবেশের প্রধান তোরণ

পরিণত শাল ও পরিপক্ক বংশদণ্ডের আবেষ্টনী (কাঠামো)-গাত্রে সন্নিবদ্ধ কঞ্চিনির্ম্মিত জাফরির উপরে পাটের কুচি, তুষ ও গোময়মিশ্রিত এঁটেল মৃত্তিকার দৃঢ় প্রাচীরবিশিষ্ট তোরণবাটিকার উপরিভাগে শাল, খড় ও গামলার সহজপ্রাপ্য 'উপকরণে গঠিত অষ্টকোণ 'নহবৎখানা'। এরূপ কুটীরগৃহনির্ম্মাণে লৌহকীলক এবং লৌহের অন্যবিধ সরঞ্জাম পরিহার করা যায়। বন্ধনীর জন্য শালের ও বাঁশের 'পেনা' ব্যবহৃত হইতে পারে। ঝাঁপ-বাতায়নের 'গরাদের' নিমিত্ত লৌহদণ্ডের পরিবর্ত্তে বেউড় বাঁশ অথবা পাকা বেত এবং তোরণের পার্শ্ববর্ত্তী গৃহের খড়ের চালের জোড়ে জোড়ে টিনের জুলির (gutter) পরিবর্ত্তে লম্বভাবে দ্বিখণ্ডিত স্থূলবংশের একখণ্ড, অথবা লম্বভাবে দ্বিখণ্ডিত খর্জ্জুর বৃক্ষকাণ্ডের একখণ্ড, দ্রোণীরূপে ব্যবহার করা যায়। সূত্রধার সহযোগে খড়িটি-করা গৃহপ্রাচীরগুলির বহির্ভাগ আতপতণ্ডুল ও বিবিধবর্ণের গিরিমাটিচূর্ণের উপাদানে মাঙ্গলিক আলিপনে

চিত্রিত হইতে পারে। তোরণের উভয় পার্শ্বস্থ প্রাচীরগাত্রে, 'কুম্ভপঞ্জর' কুলুঙ্গি দুইটির মধ্যে, দগ্ধ মৃত্তিকার দ্বারপালদ্বয় সন্নিবেশিত করা যায়।

১৪২ চিত্র—গ্রামীণ জাতীয় ভবন

বঙ্গীয় কুটীরশৈলী প্রভাবিত নববিকশিত গ্রামস্থাপত্যে পরিকল্পিত জাতীয় ভবনের নিম্নতলের মধ্যস্থলে গ্রামীণ সমাজ- ও স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাবিধায়ক এবং বেকারসমস্যা-নিবারক মন্ত্রণাকক্ষ এবং দুই পার্শ্বে 'জনকল্যাণ'- ও 'গ্রামরক্ষী'-যুবসঙ্ঘের কার্য্যালয় ব্যতীত উপরতলে গ্রামদেবতা সত্যনারায়ণের অষ্টচাল মন্দির। তন্মধ্যে নিয়মিতভাবে শাস্ত্র, বিশ্বমানবধর্ম্ম ও সাহিত্যানুশীলন পরিচালিত হইতে পারে। অট্টালিকার প্রত্যেক কোণে এক-একটি দীপস্তম্ভ। মন্ত্রণাকক্ষের অভ্যন্তর গাত্র আদর্শমূলক পল্লীজীবন- অথবা ধর্ম্মপ্রবণ ঐতিহাসিক-চিত্রে শিল্পায়িত করা যায়।

আঠাযুক্ত মৃত্তিকা, ইষ্টক, 'কংক্রিট' অথবা প্রস্তরের প্রধান উপকরণে জাতীয় ভবন নির্ম্মাণসাধ্য। দ্বিতল মৃন্ময় ভবন দেশের নানা স্থানে বিদ্যমান আছে। উহাদের অনেকগুলি ৭০-৮০ বৎসরের অধিক পুরাতন। জব্বলপুর নগরীর অদূরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশন যথায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল—সেই ত্রিপুরী গ্রামের সান্নিধ্যে, নর্ম্মদা নদীর ওপারে, মৃত্তিকা এবং শালকাষ্ঠ-নির্ম্মিত উক্তপ্রকার একটি বাসগৃহ দণ্ডায়মান আছে। স্থানীয় ক্ষেত্রপাল সযত্নপালিত গাভীবৃন্দ-সহ সপরিবারে বাস করেন তথায়। সেই ত্রিমহল কুটীরগৃহের প্রশস্ত প্রাঙ্গণত্রয় এবং চকবন্দী দাওয়াগুলি গোময়মিশ্রিত এঁটেল মাটির আস্তরণমণ্ডিত। উহা ৮০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং অদ্যাবধি সুদৃঢ় রহিয়াছে।

১৫১ চিত্রে দৃশ্যমান শিবগঙ্গাশীর্ষ কৃত্রিম উৎস জাতীয়ভবনসংলগ্ন পুষ্পোদ্যানের মধ্যে স্থাপিত করিলে অসঙ্গত হইবে না।

১৪৩ চিত্র—গ্রামীণ সংস্কৃতিকেন্দ্র

*-চিহ্নিত উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণের বিপরীত প্রান্তে একাধিক শিক্ষক পরিবারের যৌথভাবে ব্যবহার্য্য দ্বিতল বাটির পার্শ্বে একতল গ্রন্থাগার। প্রধানশিক্ষক ও কর্ম্মচারী কয়েকজনের জন্য নির্দ্ধারিত পৃথক পৃথক একতল কুটীরগুলি চিত্রে দেখা যায়। ভ্রাম্যমাণ পুস্তক-ভাণ্ডারবাহী মোটরযান দ্বিতল শিক্ষকসদন এবং গ্রন্থাগারের অন্তর্ব্বর্ত্তী উন্মুক্ত স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলে ছাত্রমণ্ডলী এবং শিক্ষকগণ তথায় সমবেত হয়েন।

∆-চিহ্নিত দর্শনাগার হইতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্মুখস্থ ক্রীড়াভূমির উপরে অনুষ্ঠিত ব্যায়াম প্রদর্শনী, মল্লপ্রতিযোগিতা, ফুটবল, কপাটি অথবা হা-ডু-ডু-ডু খেলা উপভোগ করেন।

চিত্রোপরি বামদিকে □-চিহ্নিত সমবায় সমিতি-অধিকৃত পাকা বাটিতে অল্পব্যয়ে আহার ও অবস্থানের ব্যবস্থা আছে। দূরাগত আগন্তুকগণ তথায় থাকিতে পারেন। উহার সান্নিধ্যে গভীর জলকূপ। পশ্চাদ্বর্ত্তী আম্রকাননমধ্যে অগ্নিদগ্ধ ইষ্টকনির্ম্মিত শিবালয়। ○-চিহ্নিত 'কলানিকেতন' চিত্রের বামপ্রান্তের নিম্নভাগে দৃশ্যমান। উহার পার্শ্ববর্ত্তী দ্বিতল সৌধে 'মিলনী গেহ'। মিলনী গৃহের অদূর দক্ষিণে একটি দ্বিমহল কুটীরে গ্রামের প্রধান 'গ্রামণী' মহাশয় সপরিবারে বাস করেন।

সুশোভন কুটীরগৃহ-সংলগ্ন বিহঙ্গকাকলী-মুখরিত পুষ্পোদ্যানের সুরভিত কুসুমকুঞ্জনিচয়ের সমীপবর্ত্তী 'কংক্রিটের' জলকুণ্ড অথবা কৃত্রিম ক্রীড়াশৈলপার্শ্বে ৮-১০ ফুট দীর্ঘ কাষ্ঠাসনসহ মাধবী, যূথিকা অথবা হেনার লতামণ্ডপমধ্যস্থ অষ্টকোণ মসৃণ বেদী এবং কৃত্রিম-উৎস ও কৃত্রিম-জলপ্রপাত ভিন্ন গ্রামের ইতস্ততঃ শোভমান প্রসারিত ফলোদ্যানের ফলভারাবনত বৃক্ষপুঞ্জের অন্তরালে অন্তরালে চিত্রীয়মাণ চিরহরিৎ ঝাউবীথি, কদলীকুঞ্জ তথা সুচিরযৌবন তালগুচ্ছ এবং সুকোমল তৃণাস্তরণোপরি ক্রীড়মান বালকবালিকার উৎফুল্ল আনন আনন্দসম্ভারি মহাগ্রামের শৃঙ্খলা, শান্তি ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

১৪৪ চিত্র—উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়

১৪০ চিত্রের দক্ষিণভাগে—জাতীয় ভবনের ঋজু ঋজু বৃক্ষপুঞ্জের বামপার্শ্বে দৃশ্যমান দ্বিতল নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনুরূপ, ১৪৩ চিত্রে *-চিহ্নিত দ্বিতল উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেদিত পরিপ্রেক্ষিত দৃশ্য। সায়ংকালে কুটীরশিল্প এবং বুনিয়াদি শিক্ষাদানেও উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২০০০ বৎসরের প্রাচীন মৌর্য্য সংঘারামের স্থাপত্যের প্রেরণাপ্রসূত বর্ত্তমান বিদ্যালয় দেবায়তন-কেন্দ্রী উন্নত গ্রামের শান্তিপূর্ণ ধর্ম্মজীবনে সমাজসেবী মননশক্তি সঞ্চারিত করিবে।

১৪৫ চিত্র—প্রমোদশালা

এলোরার 'বিশ্বকর্ম্মা' চৈত্যমন্দিরের গুপ্ত-দ্রাবিড় স্থাপত্য অনুসৃত নব্য-ভারতীয় স্থাপত্যে পরিকল্পিত প্রমোদভবন, সঙ্গীতসম্মেলন, জলসা, নাট্যাভিনয় এবং ছায়াচিত্র-প্রদর্শনের উপযোগিভাবে বিরচিত।

১৪৬ চিত্র—উন্নত নগর

৬০০০০ সংখ্যক নাগরিক-অধ্যুষিত স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্যাননগরীর একাংশ। রমণীয় সৌধমালা-সমন্বিত অপ্রশস্ত ফলোদ্যানের আবেষ্টনে—কিশোরকিশোরীর ক্রীড়া-প্রাঙ্গণরূপে পরিচিত প্রসারিত তৃণক্ষেত্রের মধ্যভাগে—সু-উচ্চ জগদীশ মন্দির। মন্দিরের সভামণ্ডপে, নির্দ্দিষ্ট অপরাহ্ণে, সর্ব্বশ্রেণীয় পুরললনাগণ সমবেত হইয়া মহামানব ধর্ম্ম, সাহিত্য ও বিশ্বজনীন সমাজতন্ত্রের আলোচনা করেন।

মন্দিরের বাম দিকে—কমলদলাকৃতি উন্নত খিলানবিশিষ্ট চৌতল বাণীনিকেতনে ছাত্রীগণ উপাধির মান পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষার্জ্জন করেন। স্থানান্তরে মহিলাদের শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্যরক্ষা, সমাজনীতি এবং বুনিয়াদী শিক্ষার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

উপরের বাম কোণে অতিকায় ছত্রসদৃশ-শিখরশীর্ষ চৌতল ভবনটি বৃক্ষমেখলা উদ্যাননগরীর পৌরপ্রতিষ্ঠান। তথায় বেকারসমস্যামুক্ত নাগরিকগণের স্বাস্থ্যরক্ষা- ও সমাজতন্ত্র-শিক্ষাসংক্রান্ত, তাঁহাদের অর্থকরী জীবনবৃত্তি-সম্পৃক্ত, বিধিব্যবস্থা ও রীতিনীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

চিত্রের উপর প্রান্তের মধ্যভাগে—নদীতীরস্থ স্নানঘাটের বিস্তৃত মণ্ডপ। উহার শীর্ষভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠাকৃতি। উহার চারিপার্শ্বে 'বিষ্ণুকাণ্ড' স্তম্ভশ্রেণী-সম্বলিত প্রশস্ত অলিন্দ। নদীতীরে ভ্রমণোপযোগী সুদীর্ঘ চত্বর (promenade) এবং বসিবার আসনগুলি চিত্রে দৃষ্ট হয় না।

চিত্র-নিম্নে—চৌরাস্তার কেন্দ্রস্থলে ৭০' উচ্চ ঘড়ি-ঘর। উহার সম্মুখে শ্রীদেবীর ধনভাণ্ডারের প্রতীকতুল্য বিচিত্র-শিখরসমৃদ্ধ ত্রিতল শ্রেষ্ঠিসদন (১৪৭ চিত্র)। ঘড়িঘর-সংলগ্ন চতুঃসংখ্যক, ৫০' প্রস্থ রাজপথের প্রত্যেকটির উভয়পার্শ্ব নব্য-ভারতীয় স্থাপত্যে পরিকল্পিত সরল সবল সৌধাবলী এবং উদ্যান-পরিশোভিত।

১৪৭ চিত্র—শ্রেষ্ঠিসদন

জগৎমাতা মহাশক্তির প্রভাতোরণ-অনুপ্রাণিত সুরম্য খিলান নিম্নে বলিষ্ঠ সিংহস্তম্ভ-সমন্বিত প্রশস্ত সিংহদ্বার এবং তদুপরি ইন্দ্রকোষ (বারান্দা)। সৌধশিরে মহালক্ষ্মী শ্রীদেবীর অক্ষয় ঐশ্বর্য্য ভাণ্ডারের প্রতীক উন্নত কিরীট। অমিতশক্তিদীপ্ত শ্রেষ্ঠিসদনের সমতল আচ্ছাদনের কোণে কোণে এক-একটি দীপস্তম্ভ। অমাবস্যানিশীথে, দূর হইতে, বৈদ্যুতিক আলোকদামখচিত শ্রেষ্ঠিভবন নক্ষত্রপুঞ্জবেষ্টিত ইন্দ্রপুরীরূপে প্রতীয়মান হইবে।

বর্ত্তমান কল্পচিত্র স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও অর্থনীতিসম্মত। উহার মাধ্যমে গুপ্ত-পহ্লব স্থাপত্যশৈলীর নববিকাশসাধনে মৌলিক প্রচেষ্টা হইয়াছে।

১৪৮ চিত্র—গৃহস্থভবন

আধুনিক উপাদানে, অধুনাতন নির্ম্মিতি কৌশলে, ভারতীয় স্থাপত্যের অনধিক অর্থব্যয়ী সুচারু বিকাশ সম্ভবপর কি-না বর্ত্তমান এবং ১৪৫ চিত্র হইতে বিবেচ্য।

১৪৯ চিত্র—শিক্ষামন্দির

বর্ত্তমান যুগোপযোগী বিকশিত নব্য-ভারতীয় চালুক্য স্থাপত্যের নিদর্শনচিত্রে দৃষ্ট এই শিক্ষায়তন। ইহার পঞ্চসংখ্যক শিখর, অবক্র স্তম্ভশ্রেণী ও হংসপদ্মের কারুখচিত বিচিত্র জালি বাতায়নগুলি মৌলিকত্বের দাবী করিতে পারে।

28—1872B.

নিম্নতলের ১২০'×৫০' সম্মিলনকক্ষের অভ্যন্তরগাত্র জাতীয় ইতিহাসের বিশিষ্ট বিশিষ্ট আখ্যায়িকাবলম্বনে চিত্রিত করা যায়।

১৫০ চিত্র—জাতীয় ভবন

মাগধী (গুপ্ত) স্থাপত্যের সহিত হিন্দু-পাঠান স্থাপত্যের সমন্বয়প্রসূত মহাজাতিসদনের এই কল্পচিত্র সর্ব্বতোভাবে আধুনিক যুগের উপযোগী।

১৫১ চিত্র—কৃত্রিম উৎস (শিব-গঙ্গা)

স্থপতিপ্রদত্ত শিবগঙ্গা উৎসের একটি কল্পচিত্রাবলম্বনে উড়িষ্যার উদীয়মান ভাস্কর শ্রীধর মহাপাত্র-সৃষ্ট মৃন্ময় মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি। একটি ১২' উচ্চ কৃত্রিম হিমালয়ের 'নন্দাদেবী' শৃঙ্গের শিরে উহার অনুকৃতি ঢালাই মূর্ত্তি গ্রথিত করিয়া তদুপরি সবেগে বারিধারা উৎসারণের ব্যবস্থা হইয়াছে উত্তর কলিকাতার এক বাটিতে।

১৫১ক চিত্র—নৃত্যরত গণপতি

(ভুবনেশ্বরের একটি অনুরূপ ভাস্কর্য্যের আদর্শে 'কংক্রিটের' উপকরণে গঠিত)

জননী শ্রীদুর্গাপ্রদত্ত মোদকভক্ষণরত ভোজনপটু সিদ্ধিদাতার আনন্দনৃত্য। গণপতির শির-বেষ্টনকারী সর্পরাজের সর্ব্ব-অঙ্গে আনন্দনৃত্যের স্পন্দন স্ফুরিত।

১৫২ চিত্র—তক্ষণ ও মৃৎশিল্প

পাল-সেন শিল্পের গুরুছন্দে রচিত আধুনিক বঙ্গীয় শিল্পের নমুনা।

ভারত স্থাপত্যের নববিকাশে প্রতিরোধমূলক পরিস্থিতি

সঙ্গীত-, নৃত্য-, চিত্র- ও ভাস্কর্য্য-প্রকাশে শিল্পিগণ অপরের সহযোগিতা ব্যতিরেকে, স্ব স্ব শক্তি-প্রভাবে, স্বয়ং সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। কিন্তু, স্থপতির পক্ষে শাখাশিল্পির ও সুদক্ষ অট্টালিকাদি নির্ম্মাতার আন্তরিক সহযোগিতা অপরিহার্য্য। বিচক্ষণ সহকারীদের আন্তরিক সহযোগিতা ভিন্ন তদীয় কল্পচিত্র বাস্তবে পরিণত হইতে পারে না।

বহুক্ষেত্রে মন্দির ও গৃহভবনের অধিকারী অথবা অধ্যক্ষগণ স্থপতিদিগকে অযথা বাধ্য করিয়া থাকেন তাঁহাদের প্রভুত্বপূর্ণ নির্দ্দেশপালনে। বহুক্ষেত্রে ঠিকাদার এবং কারিগরগণ স্থপতিপ্রদত্ত কল্পচিত্রকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ না করিয়া স্থানে স্থানে, নিজ নিজ সুবিধা ও কল্পনামত, উহার পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। অসঙ্গত খেয়ালপ্রসূত এবম্বিধ প্রতিরোধের পরিণাম ইষ্টকর হয় না।

যদবধি জাতীয় ঐতিহ্যে শ্রদ্ধা- ও আস্থা-শীল, বিচক্ষণ, ব্যবহারিক স্থাপত্যজ্ঞানসম্পন্ন, নিয়ন্তা-মণ্ডলী এবং উপযুক্ত শিক্ষকবর্গদ্বারা সুপরিচালিত জাতীয় স্থাপত্যবিদ্যালয়ের মাধ্যমে, ব্যবহারিক প্রয়োগমূলক শিক্ষাদানে, প্রচুর সংখ্যক কর্ম্মকুশল-স্থপতি, সহকারী শিল্পী এবং সুদক্ষ কারিগর উদ্ভূত না হইবে, যতদিন পর্য্যন্ত সুনিয়ন্ত্রিত অনুষ্ঠানের মধ্যবর্ত্তিতায় নিরীহ জনসাধারণ ভারতীয় স্থাপত্যের স্বরূপনির্ণয়নে ও মহিমানির্দ্ধারণে সক্ষম না হয়েন, তদবধি ভারত স্থাপত্যের নবাভ্যুদয়ের প্রতিরোধক জটিল সমস্যার সমাধান অসম্ভব।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশীয় স্থাপত্যসংক্রান্ত শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে একটি শক্তিশালী শিক্ষাকেন্দ্রের পরিকল্পনা এবং কর্ম্মসূচী প্রকাশিত করিয়াছিলেন। দিল্লী হইতে কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ উহা অনুমোদিত করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে বঙ্গীয় রাজসরকারের ঔদাসীন্য-বশতঃ উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

কেহ কেহ এরূপ আশা পোষণ করেন যে—আরব্য উপন্যাসবর্ণিত দৈত্যপতি দানহাস কাশকাশের যাদুদণ্ড প্রভাবে একরাত্রি মধ্যে গুলিস্তানের সুষমামণ্ডিত প্রাসাদসৃষ্টির মত—ভারতীয় স্থপতি অবলীলাক্রমে প্রথম হইতেই ত্রুটিহীন দেবায়তন ও বাসভবনের সৃষ্টি করিবেন। পূর্ত্ত ও নির্ম্মাণ-বিজ্ঞানমূলক স্থপতিবিদ্যায় অনভিজ্ঞ, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার সমালোচকগণও তদ্রূপ অভিলাষ পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছেন যে, অতীত ভারতের ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ, গুপ্ত ও চালুক্য পর্য্যায়ী এবং হিন্দু-মুস্লিম স্থাপত্য শৈলীনিচয়ের প্রত্যেকটিই শতাধিক বৎসর পরে পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইয়াছিল। নরপতি ও শ্রেষ্ঠিবর্গের অকুণ্ঠিত পোষকতা সত্ত্বেও তৎপূর্ব্বে উহাদের পরিণত বিকাশ হইতে পারে নাই। অজ্ঞতা, বিরোধিতা ও অর্থসমস্যার এই দারুণ যুগে কি প্রকারে অতি সত্বর অনিন্দ্যসুন্দর দ্বিতীয় ভুবনেশ্বর সৃষ্ট হইতে পারে—উপযুক্ত সহকারী ও কারিগরের অভাবে—তাঁহারা ভাবিয়া দেখিবেন।

গ্রীক Doric, Ionic ও Corinthian এবং Gothic, Renaissance ও Byzantine শ্রেণীয় স্থাপত্যশৈলীর প্রত্যেকটিই এক এক শত বৎসরেও চরম উৎকর্ষলাভ করিতে পারে নাই শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির কার্য্যকরী সহযোগিতা সত্ত্বেও। প্রস্তাবিত সর্ব্বভারতীয় স্থাপত্যশিক্ষাকেন্দ্র সুচারুরূপে প্রতিষ্ঠিত তথা ক্রিয়াশীল হইলে পঞ্চবিংশতি বৎসরের মধ্যে আশানুরূপ জাতীয় স্থাপত্য বিকশিত হওয়া সম্ভব। ততদিনে শিক্ষিত দেশবাসীর মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তনও সাধিত হইবে যদি সহৃদয় গভর্ণমেণ্ট সহায়তা করেন।

পরিকল্পনাপ্রসঙ্গে অধিকারী অথবা অধ্যক্ষের সহিত স্থপতির মনোমিলন না হইলে প্রকৃষ্ট স্থাপত্যবিকাশের প্রতিরোধক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তাঁহাদের ঐকান্তিক মিলনের উপরেই সুচারু স্থাপত্য গঠিত হওয়া সম্ভব, তাঁহাদের শিল্পজ্ঞান, আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা যদি সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ না হয়।

নিউ ইয়র্কের Roerich Museum-সদন উক্তরূপ মিলনপ্রসূত। দার্শনিক চিত্রশিল্পী আচার্য্য Nicholas Roerich-এর চিন্তাধারার সহিত দিব্যদৃষ্টি স্থপতিশ্রেষ্ঠ আচার্য্য Harvey Wily Corbet মহাশয়ের আত্মিক সংযোগবশতঃ রোয়েরিক কলাভবনের বিরাট্ স্থাপত্য সৃষ্ট হইয়াছে। মধ্যযুগীয় ভারত এবং বৃহত্তর ভারতের মর্ম্মস্পর্শী রাজধানী ও মন্দিরগুলিও রাজর্ষি নরপতি ও ধ্যানসিদ্ধ স্থাপত্যবিশারদের মহতী মনোবৃত্তির সম্যক সমন্বয়সম্ভূত।

বিংশ শতাব্দীর ভারতেও শিল্পরসিক ধনপতি এবং ভাবপ্রবণ স্থপতি বিদ্যমান আছেন। পুষ্করে (অজমীর) হ্রদের তীরে, ব্রহ্মা মন্দিরের সান্নিধ্যে, যে অপূর্ব্বশোভন শিবমন্দির বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল উহা উভয়বিধ সত্যাশ্রয়ীর সমবেত অবদান। পক্ষান্তরে বহুসংখ্যক সহৃদয়, ভারতীয় শিল্পানুরাগী, লক্ষ্মীর বরপুত্রও বর্ত্তমান আছেন যাঁহাদের অবিশ্রান্ত প্রতিবন্ধের ঘূর্ণিকা প্রতিরোধ করতঃ সবল, সুন্দর, কৌলীন্যমণ্ডিত মন্দিরসৌধ গঠিত হইতে পারে না। ১৫৩ চিত্রে প্রদর্শিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির উহার একতম উদাহরণ।

বিকৃত (অহিন্দু) স্থাপত্যে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের প্রথমতল নির্ম্মিত হইবার পরে বর্ত্তমান নব্য-গুপ্ত-স্থাপত্যে গঠিত দেবায়তনের পরিকল্পয়িতা পূর্ব্বনির্ম্মিত প্রথমতলের বহুল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কেবলমাত্র হিন্দু-মুস্লিম স্থাপত্যগঠনে অভিজ্ঞ স্থানীয় কারিগরের স্থলে সুদূর যশল্মীর হইতে জৈনমন্দির রচনায় বিশেষজ্ঞ মুখ্য কারিগর আনাইয়া, গুপ্ত স্থাপত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি তাঁহাকে বিশদভাবে বুঝাইয়া মন্দিরনির্ম্মাণে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শেঠজীর অভিলাষ অনুসারে মন্দিরের অধিকভাগ অঙ্গের নমুনা (model) স্থপতির নির্দ্দেশানুসারে তদীয় সমক্ষে মন্দির-প্রাঙ্গণেই গঠিত হইয়াছিল। নমুনানুযায়ী গঠিত মন্দিরের বহির্ভাগের আকার এবং অন্তর্ভাগের বহুলাংশ উক্ত বিচক্ষণ নির্ম্মাণশিল্পী শ্রীভদ্রসিং-এর একনিষ্ঠ সহযোগিতার নিদর্শন।

নির্ম্মাণের শেষ পর্ব্বে, অভ্যন্তরভাগ কারুমণ্ডিত ও চিত্রিতকরণে, স্থপতির অজ্ঞাতসারে, জয়পুর হইতে ভিন্ন শ্রেণীয় স্থাপত্যরূপায়ণে অভিজ্ঞ বিচক্ষণ কারিগর আনাইয়া—অত্যধিক আড়ম্বর-ঝলকিত অসমঞ্জস অলঙ্কারমণ্ডনে—গুপ্ত স্থাপত্যের দেবভাষার উদাত্ত-ভাব-বিরুদ্ধ স্বতন্ত্র ভাষ্যে—সুরহীন, লয়হীন, ছন্দহীন তানে—দেবালয়ের সাত্ত্বিক পরিবেশ কলুষিত করা হইয়াছিল।

এতাদৃশ প্রতিরোধমূলক পরিস্থিতির আবর্ত্তে সনাতন স্থাপত্যের সুসঙ্গত বিকাশ অসম্ভব নহে কি? স্থপতি এক্ষেত্রে কি করিতে পারেন?

১৫৩ চিত্র—লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, নয়াদিল্লী

সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে (দিল্লী) গুপ্ত স্থাপত্য প্রবল ছিল; উহার প্রমাণ কুতব মিনারের পার্শ্ববর্ত্তী কুতব মসজিদ। ইন্দ্রপ্রস্থধামে খৃঃ অষ্টম ও নবম শতকে প্রতিষ্ঠিত ২৬ সংখ্যক গুপ্ত দেবায়তন

ধ্বংস করিয়া বিচ্যুত উপকরণে কুতব মসজিদের ২৪০ সংখ্যক শ্রেষ্ঠ গুপ্ত-স্তম্ভবিশিষ্ট বৃহৎ উপাসনা কক্ষ বিনির্ম্মিত হয়। অতঃপর হিন্দু-মুস্‌লিম স্থাপত্য ক্রমশঃ দিল্লী অধিকার করে। বহুকাল পরে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের মাধ্যমে ইন্দ্রপ্রস্থে গুপ্ত স্থাপত্য পুনঃপ্রচলিত হইয়াছে।

বিষ্ণু-সূর্য্যরথের আদর্শে বর্ত্তমান মন্দিরের আসল আকৃতি পরিকল্পিত হইয়াছিল। পূর্ব্বমুখী মন্দিরের বিমানের সম্মুখগাত্রে, বিমানের প্রথম ভূমিসংলগ্ন, সূর্য্যতোরণশীর্ষ ইন্দ্রকোষের মধ্যে সমভঙ্গ দণ্ডায়মান বিষ্ণু-সূর্য্য-নারায়ণ, তৎনিম্নে গতিশীল সপ্তাশ্বখোদিত পাষাণফলক এবং দেবায়তনের পাদপীঠগাত্রে ষষ্ঠদশ সংখ্যক প্রস্তরময় রথচক্র সন্নিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু, নির্ম্মাণকালে, স্থপতি মহাশয়ের অজ্ঞাত কারণে, উক্ত কল্পনা পরিত্যক্ত হয়।

শিল্প-সমালোচকগণের এবং বহু শিক্ষিত ব্যক্তির বিচারে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির আকর্ষণীয় হয় নাই। কিন্তু সাধারণ দর্শকগণের অনেকেই উহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। যাহা হৌক নব্য-ভারতীয় অমিশ্র স্থাপত্যসৃজনে উহার অনুপ্রেরণা সম্ভবতঃ উপেক্ষিত হইবে না। উত্তর-ভারতের বহু স্থানে উহার অনুকল্প মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে এবং হইতেছে। বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্ম্মীয়মাণ বিশ্বনাথ মন্দিরেও লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের শৈলী অনুসৃত হইতেছে। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের স্থপতি, বিশ বৎসর পূর্ব্বে, ইন্দ্রপ্রস্থে গুপ্ত স্থাপত্যের নব অভ্যুদয়ের যে কামনা করিয়াছিলেন তাহা সার্থক হইয়াছে।

পূর্ব্ব- এবং পশ্চিম-বঙ্গেও গুপ্ত স্থাপত্যের অভ্যুদয় অনুভূত হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, মন্দির ও বাসগৃহ গুপ্ত স্থাপত্যের আদর্শে গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কয়েকটি ব্যতীত উহারা আশানুরূপ হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ প্রতিকূল পরিস্থিতি। নবনির্ম্মিত শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতিসৌধ সনাতন-মন্দিরস্থাপত্যের কমনীয় বিকাশের বিশিষ্ট নিদর্শন।

১৫৪ চিত্র—শিবমন্দির, রতনগড় (বিকানীর)

প্রাম্বাণমের চাণ্ডিশেবু মন্দিরের অবক্র গঠনের অনুপ্রেরণায় রতনগড়ের অবক্র শিবমন্দির গঠিত। শ্রীনগরের শঙ্করাচার্য্য মন্দিরের অনুরূপ ঈষৎ বক্র স্কন্ধোপরি উহার শিবলিঙ্গাকৃতি উন্নত শিখর পরিকল্পিত। বিমানবেষ্টনী সমতল আচ্ছাদনের চতুষ্কোণে দৃশ্যমান ছত্রাকৃতি চতুঃশিখর, আচ্ছাদনের ভারবাহী সরল, সবল, অবক্র স্তম্ভাবলী এবং চতুরস্র-গুপ্ত-পদ্মালঙ্কৃত অবক্র-জালি-বাতায়ন সর্ব্বতোভাবে মৌলিক বলিলে হয়ত অত্যুক্তি হইবে না। প্রত্যেক স্তম্ভ মূল দেবায়তনের সরল অবক্র গঠনের অনুসরণ করিয়াছে। এইরূপ শিবলিঙ্গাকৃতি শিখরবিশিষ্ট অভিনব শিবায়তন অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। এবম্বিধ মন্দিরশৈলীর উন্নততর সংস্করণ ক্রমশঃ সম্ভাবিত হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।

দেবায়তনের বর্ত্তমান রূপায়ণে বিকৃত স্থাপত্যে পরিকল্পিত, প্রথমতল পর্য্যন্ত গঠিত, পূর্ব্ববর্ত্তী অংশের বহুল পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য সনাতন শিল্পানুরাগী শেঠজীকে বুঝান কষ্টকর হইয়াছিল। তবে স্থানে স্থানে তাঁহার অসঙ্গত নির্দ্দেশপালনে স্থপতি মহাশয় বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৫৫ চিত্র—নব্য-ভারতীয় রাজপ্রাসাদ, যোধপুর

(যোধপুর সর্দ্দার মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়ক শ্রীদুর্গালাল মাথুর, এম.এ. মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত।)

রাজস্থানী এবং ultra-modern স্থাপত্যরীতির সমন্বয়ে যোধপুর মহারাজা বাহাদুরের নবনির্ম্মিত 'চিত্তর প্রাসাদ (উমেদভবন)'-গঠনে নব্য-ভারতীয় স্থাপত্যকলার একটি অভিনব ধারা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতীয় স্থাপত্যের মিশ্র (composite) পর্য্যায়ের একতমরূপে উহা বিবেচনাযোগ্য।

উমেদভবনের স্থাপত্য নয়াদিল্লীর রাজভবনের স্থাপত্যশৈলীর উন্নততর সংস্করণ। নয়াদিল্লীর বিধানসভাসৌধ সামঞ্জস্যহীন হিন্দু-মুঘল-রোমান স্থাপত্যে বিরচিত। কলিকাতা নগরীর ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসদন উক্ত প্রকার স্থাপত্যের অন্যতম উদাহরণ। প্রথম দৃষ্টিপাতে উহার সুঠাম সুডৌল অবয়ব আনন্দদায়ক হইলেও উগ্র ইতালিয়ন-রেণেসাঁস্ অলঙ্করণের বিসদৃশ কারুবন্ধে উহার শিল্পাত্মা কলুষিত। বরঞ্চ আমেরিকান Ultra-modern স্থাপত্যসুলভ সহজ সরল সবলতার মিশ্রণে উমেদভবনের হিন্দু-মুস্লিমশৈলী মহান্ ভাবের উদ্দীপনা করে।

উদীয়মান নব্য-ভারতের ভবিষ্য বিশ্বকর্ম্মা জাতীয় স্থাপত্যের সরলতর, সুন্দরতর এবং অধিকতর আভিজাত্যসমৃদ্ধ অভিনব সংস্করণ প্রকাশে সক্ষম হইবেন। বোম্বাই নগরীর 'টেলিগ্রাফ অফিস,' মাদ্রাজের 'হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স সোসাইটি'র কার্য্যালয় এবং কলম্বোর 'ডেলি নিউজ অফিস'-ভবন ভারতীয় স্থাপত্যের অবিমিশ্র শ্রেষ্ঠ (classical) বিকাশের নিদর্শন। বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে বর্ত্তমান কালোপযোগী সুষ্ঠু স্থাপত্যের একটি বিশিষ্ট ধারা উদ্ভাবনে প্রয়াস হইতেছে। সম্প্রতি রাজধানী দিল্লীতে UNESCO-ভবন প্রভৃতি কয়েকটি সরকারী সৌধ হিন্দু-মুঘল স্থাপত্যে গঠিত হইয়াছে। তৎকরণে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধের পরিবর্ত্তে সৌভাগ্যবান্ স্থপতি রাষ্ট্রীয় পোষকতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ বিবিধ পর্য্যায়ী সুচারু স্থাপত্য বিকশিত করিতে সক্ষম হইবে। সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষায়তনের মাধ্যমে উহা ব্যবস্থিত হইলে শত শত **ভারতীয়** স্থপতি ও শাখাশিল্পী শিক্ষিত হইয়া ভারতবর্ষকে শিল্পসংস্কৃতির নব সৌন্দর্য্যে রূপায়িত করিতে পারিবেন।

১৫৬ চিত্র—বর্ত্তমান ভারতীয় পুষ্পোদ্যান

(শ্রীনরেন্দ্র সিংহ সিংঘী এম.এস-সি., এল-এল.বি., এম.এল.এ. মহোদয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

দক্ষিণ কলিকাতার 'সিংঘী-পার্ক'-এ শিল্পপ্রাণ বাহাদুর সিংহ সিংঘী মহোদয়ের পরিকল্পনানুসারে বিন্যস্ত মনোহর পুষ্পোদ্যানের মধ্যাংশ।

শুভ্র মর্ম্মরের কৃত্রিম-উৎস-বেষ্টনী অতিকায় মর্ম্মর চত্বরোপরি কয়েকসংখ্যক মর্ম্মরময় বেদী এবং শ্রেষ্ঠ কারুকলাখচিত বহুমূল্য শিলাসন। চত্বর নিম্নে সুকোমল তৃণক্ষেত্রোপরি বর্ণাঢ্য পুষ্পাস্তরণের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত, ১৫৬ক চিত্রে প্রদর্শিত, পূর্ণপ্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমলের অনুকল্প অনুপম প্রস্রবণসমূহ। হিন্দু-মুঘল উদ্যানের, হিন্দু-মুঘল সুকুমার শিল্পের, মধুর অভিব্যক্তি প্রকটিত হইয়াছে ঋষিতুল্য শ্রেষ্ঠিবরের প্রখর কল্পনাসম্পাতে।

উদ্যানের উত্তরপ্রান্তে স্বর্গীয় শ্রেষ্ঠিমহাশয়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পসংগ্রহশালা বিরাজমান। বিশ্রুত সংগ্রহশালার বহুমূল্য শিল্পভাণ্ডার পর্য্যবেক্ষণ করিতে দেশবিদেশের সুদূর প্রান্ত হইতে পণ্ডিত এবং শিল্পরসিকগণ সিংঘী-পার্কে আগমন করিয়া থাকেন।

১৫৬ক চিত্র—কৃত্রিম কেতক-প্রস্রবণ

(শ্রীনরেন্দ্র সিংহ সিংঘী এম.এস-সি., এল-এল.বি., এম.এল.এ. মহোদয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

পূর্ণপ্রস্ফুটিত শুভ্র কমলের অনুকৃতি মর্ম্মরময় কেতক-উৎস হইতে সবেগে উৎক্ষিপ্ত স্বচ্ছ বারিধারা সন্দর্শনকালে উদ্যানভ্রমণে আগত বালকবালিকাগণের হর্ষোৎফুল্ল সহাস আননে দেবশিশুর সরল মাধুরিমা বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে।

১৫৭ চিত্র—'নয়নতারা' উদ্যানবাটিকা, মধুপুর (বিহার)

(শ্রীহরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

কলিকাতা মহানগরীর বর্ত্তমান 'মেয়র' এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ, জনপ্রিয় অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উদ্যানবাটিকা-নির্ম্মাণে সুদক্ষ কারিগরের অভাবে স্থপতিপ্রদত্ত কল্পচিত্রের কিয়দংশ, বিশেষতঃ প্রবেশদ্বারের স্তম্ভদ্বয়ের উপরিভাগ, অনভিজ্ঞ কারিগরের অভ্যাস এবং কল্পনানুসারে—স্থপতি এবং অধ্যাপক মহাশয়ের অজ্ঞাতসারে—গঠিত হইয়াছে। তথাপি, শক্তিমন্ত 'রুদ্রকাণ্ড'-কুম্ভক-স্তম্ভবিশিষ্ট, নব্য-গুপ্ত স্থাপত্যসমৃদ্ধ, তেজোদীপ্ত অট্টালিকার অম্লান সৌন্দর্য্য মধুপুর ও দেওঘরবাসীর সোৎসুক দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

১৫৮ চিত্র—উদ্যানবাটিকার প্রবেশদ্বার

(শ্রীহরেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে মুদ্রিত)

'নয়নতারা' শান্তিসদনের প্রধান প্রবেশদ্বারের 'ব্রহ্মচ্ছন্দ' মঙ্গলস্তম্ভদ্বয়ের কোণে কোণে উদ্গত অষ্টসংখ্যক স্তম্ভিকা বিম্বিসারের রাজধানী রাজগৃহের মঙ্গলতোরণ-সংলগ্ন কুম্ভকস্তম্ভের (১৮ চিত্র) আদর্শে পরিকল্পিত। রাজগৃহের কমলশীর্ষ তালবৃক্ষসদৃশ স্তম্ভযুগল অমৃতকুম্ভকের উপরে বিরাজমান ছিল। ভারত-সভ্যতার যুগে যুগে ভারতীয় স্থাপত্যের বিবিধ পর্য্যায় রাজগৃহের মঙ্গলস্তম্ভদ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। কমলশীর্ষ তালবৃক্ষের (মতান্তরে মৃণালের) প্রতীক ধর্ম্মচক্রশীর্ষ অশোকস্তম্ভ, নাসিকের 'গোতমীপুত্র' গুহামন্দিরসম্মুখস্থ সকুম্ভক স্তম্ভশ্রেণী, সমুদ্রগুপ্তের গরুড়স্তম্ভ এবং শতবর্ষপূর্ব্বকালীন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণবাটিকার বহিরাঙ্গনে বিরাজমান মৃন্ময়কুট্টিম-চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন—পূর্ণকুম্ভোপরি প্রোথিত কদলীতরুর সমতুল—কমনীয় স্তম্ভনিচয় রাজগৃহ স্তম্ভেরই সনাতন আদর্শ অনুসরণ করিয়াছিল। মহাভারতীয় সংস্কৃতির অবিনশ্বর স্থাপত্যশিল্পধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে 'নয়নতারা' উদ্যানভবন।

'নয়নতারা'-লক্ষ্মীনিকেতন সংলগ্ন মঙ্গলস্তম্ভ মহাসৃষ্টির প্রতীক মহাপদ্ম চিহ্নিত। নটশেখরের আনন্দনৃত্যের তালচ্ছন্দ-নির্দ্দেশক দেবঘণ্টা স্তম্ভগাত্রে অর্দ্ধোদ্গত। স্বর্গগতা ধর্ম্মপ্রাণার অমরস্মৃতি-বিজড়িত শান্তিসদনের স্নিগ্ধ পরিবেশ তদীয় স্নেহসিঞ্চিত কোমল অন্তরের মৌনমহিমায় ভাস্বর।

১৫৯ চিত্র—গৌরীশঙ্করশীর্ষ ভারতবর্ষ

হিমালয়ের পাদমূলে যজ্ঞরত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মণ্যদেবের উদ্দেশে বায়ু, সিন্ধু, দিবা, নিশা, ওষধি, অন্ন, বনস্পতি, সূর্য্য ও গোমাতা প্রভৃতি চরাচর বিশ্বকে মধুময় করার প্রার্থনান্তে শান্তিমন্ত্র গান করিতেছেন :

দ্যৌঃ শান্তিরন্তরিক্ষ ঙ্শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ
শান্তিরোষধয়ঃ শান্তির্বনস্পতয়ঃ শান্তির্বিশ্বেদেবাঃ শান্তিঃ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ব্রহ্মণ্যদেবের প্রতিভূ দেবতাত্মা হিমালয়ের গৌরীশঙ্কররূপী হীরকমুকুটে ত্রিগুণাত্মা প্রতিবিম্বিত।

শিব-মহেশ্বরের প্রতীক উত্তুঙ্গ কৈলাসশৃঙ্গের ব্রহ্মকমল-কোরকপ্রতিম শিখর—ইলাপুরীর (এলোরা) কৈলাস মন্দিরের উন্নত শিখরসৃজনে প্রেরণা প্রদান করিয়াছে।

এলোরার শান্তিনিকেতন শিবায়তন—বৈদিক ব্রাহ্মণের কণ্ঠনিঃসৃত ব্রহ্মণ্যদেবের স্বস্তিবাচন তথা শান্তিমন্ত্র প্রতিঘোষিত করিতেছে।

অবতরণিকা

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে পঞ্চবিংশতি বৎসর যাবৎ বাঙ্গালীর মেধা ও সংস্কৃতি প্রগতির পথে সুস্পষ্টভাবে অগ্রসর হইয়াছিল। তখন প্রতীচ্য-প্রবর্ত্তিত ব্যাপক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত বঙ্গসমাজ অগ্রগামী য়ুরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেচনা, সমাজতন্ত্র ও সংস্কৃতির সম্যক্ পরিচয়লাভের জন্য তৎপর হওয়ার ফলে বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে মনন- ও সৃজন-সম্পৃক্ত নব নব চিন্তাধারা উৎসারিত হইয়া ভারতীয় সভ্যতার অভিনব অভ্যুদয়ের সূচনা করিয়াছিল। ঠিক সেই সময়ে বর্ত্তমান প্রবন্ধকার, কল্পনা- ও কর্ম্ম-কুশল স্থপতিপ্রবর শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বদেশী স্থাপত্যের নব-বিকাশনে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। আমার মনে পড়ে কিরূপ আশা ও উৎসাহের সহিত আমরা তাঁহার বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী উপভোগ করিতাম, তদীয় পরিকল্পনানুসারে ভারতের বিভিন্ন স্থানে গঠিত কয়েকটি সৌধমন্দিরে সনাতন সংস্কৃতির জীবনস্পন্দন অনুভব করিয়াছিলাম।

সুকুমার শিল্পকলাসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শিল্পিগণের মধ্যে একমাত্র স্থপতিকেই শাখা-শিল্পসংক্রান্ত বিচক্ষণ কারিগর এবং মিস্ত্রীদের আন্তরিক সহযোগিতার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিতে হয়; মন্দিরভবনের অধিকারিগণের সুবিবেচনার উপরেও তদীয় সাফল্য আংশিকভাবে নির্ভর করে। শ্রীশচন্দ্র, স্বীয় কল্পনাপ্রসূত বাটিনির্ম্মাণের প্রথম পর্ব্বে, সুদক্ষ সহকারী ও কৃতবিদ্য কারিগরের সহযোগিতা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হয়েন নাই। একটি সর্ব্বভারতীয় জাতীয় স্থাপত্য শিক্ষায়তন স্বতন্ত্রভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার মাধ্যমে, ছাত্রদের কার্য্যকরী শিক্ষাদানে, ক্রমশঃ প্রচুরসংখ্যক বিচক্ষণ স্থপতি ও শাখাশিল্পী উদ্ভাবিত করা তাঁহার কামনা ছিল। ব্রিটিশ আমলে তাহা সম্ভব হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতেও তাঁহার মহৎ আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে উহা কিয়ৎকাল অপূর্ণ থাকিলেও ভবিষ্যতে সফল হইবে। তাঁহার প্রেরণায় দেশপ্রেমী কর্ম্মিগণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া তদীয় স্বপ্নকে মূর্ত্তিমন্ত করিবেন।

'দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা' গ্রন্থে ভূমার মহিমা পরিস্ফুট হইয়াছে ; ভারতের দেবায়তন ভারতীয় সভ্যতার পরমাত্মারূপে প্রতিভাত হইয়াছে। উদাত্তভাবদীপ্ত মৌলিক রচনার অপূর্ব্ব ভাষা সুললিত, গুরুগম্ভীর ও মর্ম্মস্পর্শী। কি প্রকারে আভিজাত্য-মর্য্যাদাসম্পন্ন-স্থাপত্য-সমৃদ্ধ ভবিষ্যভারতে শিল্পসম্ভারী গ্রামনগরের সৃষ্টি করিয়া সমাজজীবন উন্নত, প্রাচুর্য্য-পরিপূরিত, শান্তিময় ও সুখময় করা যাইতে পারে চিন্তাশীল গ্রন্থকার তাহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি শুধু পুরাতত্ত্ব- ও সংস্কৃতি-বিষয়ে ব্যুৎপন্ন এবং ভাবাবিষ্ট সাহিত্যসেবক নহেন, তিনি একজন করিতকর্ম্মা খ্যাতনামা স্থপতি। সনাতন স্থাপত্যের সমস্যাসমাধানে এবং গতিনিয়ন্ত্রণে তাঁহার অধিকার অবিসম্বাদী। উদীয়মান নব্যভারত নূতন আলোকে জাতীয় স্থাপত্যের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ নেত্রপাত করিলে গ্রন্থপ্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, তবে তদ্রূপ লক্ষণ আপাততঃ দৃষ্টিগোচর হয় না।

শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

গ্রন্থকারের পরিচয়

স্থাপত্যবিশারদ শ্রীশচন্দ্র তরুণ জীবনে মঠমন্দিরাদি সংরক্ষণ ও নির্ম্মাণব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরিণত যৌবনে মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে বঙ্গীয় সরকারের পূর্ত্তবিভাগের স্থায়ী চাকরি বর্জ্জন করিয়াছিলেন। দেশমাতৃকার সাধনা ও সেবায় তিনি শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশের অধিককাল অতিবাহিত করিয়াছেন। সত্যাশ্রয়ী ব্রতচারীর মত আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ এবং বৃহত্তর ভারত, মিশর ও প্রতীচ্যের কিয়দংশ পর্য্যটনকালে তত্তদ্দেশীয় স্থাপত্য, শিল্প এবং সাংস্কৃতিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করার ফলে মূল্যবান্ প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি প্রকাশিত করিয়াছেন; দেশবিদেশের বহু স্থানে, বিবিধ সংস্কৃতিকেন্দ্রে এবং ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাপ্রদানে দেশবাসী ও বিদেশীগণকে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য- এবং মহিমা-নির্দ্ধারণে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করিতে অক্লান্তভাবে অবিরাম পরিশ্রম করিয়াছেন। অদম্য অধ্যবসায়সহকারে, বহুবর্ষযাবৎ, তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য স্থপতিবিদ্যা ও সংস্কৃতির অনুশীলন করিয়াছেন। কয়েক বৎসর বিকানীর রাজ্যে ইঞ্জিনীয়রের পদে আসীন থাকাকালে ভারতীয় স্থাপত্যসম্পৃক্ত মন্দির এবং বাসভবনের পরিকল্পনা- ও নির্ম্মাণ-বিধানের ব্যবহারিক প্রয়োগে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভান্তে কলিকাতায় আসিয়া, ভারতীয় স্থাপত্যবিদ্যায় কার্য্যকরী ও অর্থকরী শিক্ষাদানের জন্য, স্বীয় অর্থব্যয়ে, একটি ক্ষুদ্রায়তন শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ছাত্রদের বিনা বেতনে শিক্ষার্জ্জনে সুযোগ দান করিয়াছিলেন। সেই পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিকল্পিত ও পরিগঠিত মন্দির, সৌধ এবং সাধারণ বাসভবনের বিশিষ্ট বিশিষ্ট অঙ্কন ও আলোকচিত্রসমূহ য়ুরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ স্থপতি- ও শিল্প-সমালোচকবৃন্দের প্রশংসার্জ্জন করিয়াছিল। কয়েকখানি চিত্র প্রতীচ্যের স্থাপত্য-বিষয়ক প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকাগুলিতে প্রশস্তিমূলক মন্তব্যসহ প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান গ্রন্থে প্রকাশিত, আধুনিক যুগোপযোগী নব্যভারতীয় স্থাপত্যে পরিকল্পিত, কয়েকসংখ্যক মন্দির, শিক্ষানিকেতন ও বাসভবন, গ্রাম ও নগর

এবং কারুশিল্পের নিদর্শন গ্রন্থকারের পরিকল্পনা ও নির্দ্দেশানুসারে তদীয় ছাত্রগণের সহযোগিতায় প্রস্তুত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, উপ-রাষ্ট্রপতি সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়, অধ্যাপক সি. ভি. রমন, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রধানমন্ত্রী স্যর আকবর হায়দারি, শিল্পাচার্য্য নিকোলস রোয়েরিক, শিল্প-সমালোচক ঈ. বি. হ্যাভেল, শ্রেষ্ঠ স্থপতি হার্ভে উইলি করবেট, ডক্টর জি. টুচ্চী, ডক্টর আনন্দকুমার কুমারস্বামী, ডক্টর ভগবান দাস, স্যর এম. বিশ্বেশ্বরাইয়া, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আংকারা (তুর্ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট-সদস্য সংস্কৃতজ্ঞ ডক্টর রশি' গুর্ভেঁ, নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত জে. ওয়ালস এবং শ্রীমতী এলিনর রুজভেল্ট প্রভৃতি মনীষিগণ শ্রীশচন্দ্রের প্রসঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ বিবৃতি প্রকাশিত করিয়াছেন।

১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য্য ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে, সেনেট ভবনে অনুষ্ঠিত, সর্ব্বপ্রথম, সর্ব্বভারতীয় বিরাট্ স্থাপত্যপ্রদর্শনী শ্রীশবাবুর প্রচেষ্টায় সর্ব্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ব্রিটিশ রাষ্ট্রের শাসনকালে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে জাতীয় স্থাপত্যশিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য স্থাপত্যশিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের উদ্যোগে,—কয়েকসংখ্যক বিশিষ্ট স্থপতি ও পূর্ত্তবিদ্, শিক্ষাব্রতী ও ভারতীয় শিল্প-শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতের সহযোগে—শ্রীশচন্দ্রই সর্ব্বপ্রথম 'ভারতীয় স্থাপত্য ও নগরনির্ম্মাণ-বিজ্ঞান'-শিক্ষার এম.এ. কোর্স বিরচিত করিয়া, বঙ্গীয় এবং কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের অনুমোদন লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় বহু-উপেক্ষিত ভারতীয় স্থাপত্যে শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের অগ্রদূতরূপে তিনি League of Nations ব্যতীত পৃথিবীর বিশিষ্ট বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের এবং সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানের শুভেচ্ছা লাভ করিয়াছিলেন। শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত জনসাধারণের পাঠোপযোগী স্থাপত্য, নগরনির্ম্মাণ এবং সংস্কৃতি-বিষয়ক ত্রিসংখ্যক সচিত্র গ্রন্থ তৎকর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত হইয়াছে। অধুনাতন ভারতে তিনিই জাতীয় স্থাপত্যবিদ্যাশিক্ষার প্রবর্ত্তক।

স্থাপত্যবিশারদ্ শ্রীশচন্দ্র ভারতীয় কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির, অ-বিভক্ত বঙ্গের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন কমিটির এবং বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের অন্তর্গত স্থাপত্যকলা ও নগরনির্ম্মাণ শিক্ষাসংক্রান্ত সর্ব্বভারতীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। এক্ষণে তিনি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পশিক্ষানিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্য। দশ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ (Eastern States Union) কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া সমগ্র উড়িষ্যার করদ রাজ্যগুলির যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন-পরিকল্পনায় তিনি নরপতিদের সাহায্য ব্যতীত রাজপ্রাসাদ, কলেজ, মিউজিয়ম, সৌধভবন ও স্মৃতিসদন প্রভৃতির পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সম্বলপুরের প্রত্যন্তে উক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবিত নব-রাজধানীর পরিকল্পনা-প্রসঙ্গে এবং রূপায়ণে শ্রীশবাবুকে নিয়োজিত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

জীবনের অপরাহ্নে সাধক স্থপতি অনুভব করিলেন যে, বেদান্ত দর্শনের প্রেরণায় নব্যভারতীয় জীবন ও সমাজ পুনর্গঠিত না হইলে জাতীয় স্থাপত্যের ও সনাতন-সংস্কৃতির নববিকাশ অসম্ভব। তদ্রূপ সমাজ ও কর্ম্মিসঙ্ঘ-সংগঠনের আন্দোলনে বিগত বিংশতি বৎসর কাল তিনি প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

শিল্প ও সংস্কৃতি সুগভীর জাতীয় চৈতন্যের বাহিক প্রকাশ মাত্র। পাতাল-গঙ্গার অমৃতধারা উৎসারিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করার ফলে ভারতবর্ষ বিরাট্ মহাভারতের পরিকল্পনা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই মহাভারতের মর্ম্মস্থলে ধ্বনিত হইয়াছিল ভগবৎগীতা। শঙ্করাচার্য্য হইতে মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত ভারতীয় জনগণের নেতৃস্থানীয় মহাপুরুষগণ ভারতসভ্যতার চিরন্তন রূপ এইভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। ভারতের দেবায়তনেই, "তপোবন মন্দিরকেন্দ্রী" জনপদেই, ভারতের সভ্যতা ও আধ্যাত্মিক পরিণতির চরম আত্মপ্রকাশ। সুতরাং "আভিজাত্যের গরিমাদীপ্ত সৌধমন্দিরশোভিত সুবিন্যস্ত গ্রাম-নগরের" মাধ্যমে সদ্যঃশৃঙ্খলমুক্ত বর্ত্তমান ভারতবাসীর দেহ, মন ও আত্মার পরিপূর্ণবিকাশে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে স্বাধীন ভারতের নেতৃস্থানীয় প্রত্যেক মানবকে। এতাদৃশ বৃহৎকর্ম্ম কোনও একব্যক্তি অথবা সঙ্ঘবিশেষের দ্বারা সম্ভাব্য নহে। তজ্জন্য আমাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের পূর্ণ সাহচর্য্যের আশু প্রয়োজন। "স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও প্রাচুর্য্য-পরিপূরিত গ্রাম, বৃক্ষমেখলা নগর ও জনপদের প্রশান্তিময় পরিবেশে শিল্পসম্ভারী আনন্দমাঝার" হইতেই ভারতীয়

শিল্পসাধনা, পুনরায় বিশ্বদরবারে শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা অর্জ্জন করিবে। প্রাচীন ঐতিহ্যের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের অনুমোদিত পরিকল্পনা ও কর্ম্মপ্রণালীর সমন্বয় করিতে হইবে। অর্থনৈতিক দুর্দ্দশা ও দারিদ্র্যকে জয় করিয়া জনগণকে আনন্দলোকে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবার জন্য আহ্বান করিতে হইবে। স্বাধীন ভারতের আবাল-বৃদ্ধবণিতা নরনারীসমূহের সম্মিলিত সাধনায় "ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন" লাভ করিবে।

বহু জাতি ও বিবিধ বিচিত্র সংস্কৃতির সমন্বয়ে গঠিত হইয়াছিল মহাভারতীয় সভ্যতা। তাহার পরিপূর্ণ রূপ ধ্যানরসিক রবীন্দ্রনাথ "ভারততীর্থে" পরিস্ফুট করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ধ্যানরূপকে বাস্তবজীবনে রূপান্তরিত করিবে ভারত-বাসীরাই। সেই মহান্ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, বিশ্বপ্রেমী, শ্রীশচন্দ্র "বিভেদ-বিরোধ-বিক্ষুব্ধ" জনসঙ্ঘকে "মহামানবের মিলনতীর্থে" সমবেত করার প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহার নীরব প্রার্থনা ভারতভূমির প্রত্যেক নরনারীর প্রাণে সঞ্চারিত ও সক্রিয় হউক ;—ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

শ্রীকালিদাস নাগ

এম.এ., ডি.লিট. (প্যারিস), এফ.এ.এস্.

গ্রন্থকারের নিবেদন

ভারতবর্ষের একটি সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ নির্ভুল নিরপেক্ষ ইতিহাস-প্রকাশের আশুপ্রয়োজন। ব্রিটিশরাষ্ট্রের ভারতশাসনকালে ভারতের ইতিবৃত্ত অসত্য এবং অর্দ্ধ-সত্য উপাদানমিশ্রণে বিকৃত করা হইয়াছিল। ম্যাকলে প্রমুখ কূটতন্ত্রী ইংরাজ পণ্ডিতগণের এবং পরবর্ত্তী যুগের মিস মেয়ো প্রভৃতির চক্রান্তের মাধ্যমে, অর্দ্ধ-শত বৎসর পূর্ব্বেও, ভারতবাসীরা অর্দ্ধ-সভ্য ও অনুন্নতরূপে পাশ্চাত্যসমাজে পরিচিত ছিলেন।

উহার ফলে, জাতীয় আভিজাত্যের মহিমানির্দ্ধারণে অসমর্থ বিভ্রান্ত ভারতবাসীর চিত্তে এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়াছে যে, ইংরাজ আগমণের পূর্ব্বে এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল নিতান্ত অপরিণত। দেশে সামাজিক ও অর্থনৈতিক শান্তিশৃঙ্খলা দুর্লভ ছিল। লোকশিক্ষার নিয়ন্তা ঋষি-মহর্ষিগণ অতিপ্রাকৃত আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণায় বিভোর থাকা বশতঃ ভারতে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার তথা ব্যবহারিক জ্ঞানবিজ্ঞানের কল্যাণকর বিকাশ হয় নাই। অধুনাতন শিক্ষিত ভারতসন্তানদের মধ্যে অনেকেই বিবেচনা করেন যে, পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অত্যুন্নত আদর্শ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ না করিলে অবনত ভারতের উন্নয়ন অসম্ভব।

সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান ভারতের রাষ্ট্রপতি মহামান্য ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ মহোদয়ের উদ্যোগে স্বদেশের প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সঙ্কলিত হইতেছে। উহা প্রকাশিত এবং দেশে বিদেশে প্রচারিত হইলে মোহাবিষ্ট দেশবাসীর দেশাত্মবোধ, নবচেতনা ও নবশক্তি উদ্দীপিত হইবে এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের নরনারীগণ ভারতের আসল রূপ ও কৌলীন্যমর্য্যাদা সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন।

বিদেশী পণ্ডিতসমাজ-সঙ্কলিত ভারতীয় সংস্কৃতিসম্পৃক্ত বিবিধ নিবন্ধে ও প্রবন্ধে ভারতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ও প্রকৃত সত্তা প্রকাশিত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাদেরই প্রণীত কয়েকসংখ্যক বহুমূল্য রচনায় এবং স্বদেশের প্রাচীন গ্রন্থ ও লোকসাহিত্য, ইতিহাস ও

প্রত্নতত্ত্ব, শিলালেখ ও তাম্রশাসন, শীলমোহর ও মুদ্রা, অর্থশাস্ত্র, শিল্পশাস্ত্র ও বিজ্ঞান-শাস্ত্র ব্যতীত বহিরাগত প্রখ্যাত পর্যটকগণের নিরপেক্ষ বিবৃতির মধ্যবর্ত্তিতায় ভারত-সভ্যতার পরিচায়ক বহুবিধ তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা পূর্ব্বের ভ্রমপূর্ণ অভিমত-সমূহের খণ্ডন করিয়া মহামানবতার শাশ্বত মহিমাসমৃদ্ধ প্রাচীন ভারতখণ্ডের বর্ণাশ্রমী সমাজনীতি, ধর্ম্মরাষ্ট্র, জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্যশিল্প এবং অর্দ্ধ-জগৎপ্রসারী সুপরিচালিত ব্যবসাবাণিজ্যের অতুলনীয় পরিণতি ও সারবত্তা প্রতিপাদিত হইতে পারে। সেইসকল তত্ত্বতথ্যের উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের সারভাগ সঙ্কলিত হইল। বিনীত প্রবন্ধকারের স্বাধীন কল্পনা এবং অভিমতকে অনাহত রাখিয়া রচনাটি যথাসম্ভব নির্ভুল করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু কয়েক বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্যসাধনে ঐতিহাসিক, দার্শনিক ও সমাজতান্ত্রিক যাথার্থকে উদ্ঘাটিত করা সীমাবদ্ধজ্ঞান-সম্পন্ন দীন লেখকের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই। তজ্জন্য, আখ্যায়িকার ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়প্রসঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচিত বিশিষ্ট বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের সকাশে রচনার পাণ্ডুলিপির মূলভাগ প্রেরণ করতঃ তিনি তাঁহাদের নিরপেক্ষ অভিমত এবং সুচিন্তিত নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়াছেন অপিচ দুইজনের নির্দ্দেশানুসারে উহার স্থানে স্থানে কিয়ৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন। তথাপি সমস্যাসঙ্কুল জটিল রচনায় ভ্রমত্রুটি বিদ্যমান থাকা সম্ভব। গ্রন্থসম্পর্কে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও উদার সমালোচকগণের মূল্যবান্ মন্তব্য অথবা সংশোধনের নির্দ্দেশ পাইলে, কৃতজ্ঞচিত্তে, গ্রন্থের পরবর্ত্তী সংস্করণকে উন্নততর করিবার বাসনা রহিল।

চিত্র ও চিত্রবিবরণীসহ আখ্যানবস্তু একযোগে অধ্যয়ন প্রার্থনীয়। উহাদের মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞান-ঐশ্বর্য্যদীপ্ত অতীত ভারতের ধর্ম্মময় কর্ম্মজীবনের যাবতীয় অধ্যায় পাঠক-পাঠিকার মানসপটে চলন্ত ছায়াচিত্রের গতিমন্ত আকারে প্রতিভাত করিবার প্রয়াস হইয়াছে। জড়বাদী বস্তুতান্ত্রিকতার কবল হইতে ভূমার আদর্শকে এবং অধ্যাত্মবাদী মহাজাতির ধর্ম্মজীবনকে মুক্ত, শক্তিমন্ত এবং পুনঃক্রিয়াশীল করণার্থে গ্রন্থখানি সামান্যমাত্রও সহায়তা করিতে পারিলে— প্রশান্তি-পরিপূরিত, প্রাচুর্য্যময়, নব নব নগর-পল্লীস্থাপনে সুস্থসবল অধিবাসিগণকে সাম্যমৈত্রী মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া গণতন্ত্রী সমাজজীবনে স্থায়ী সুখসাচ্ছন্দ্য নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে—আবাল্যতীর্থপর্য্যটক দীন-দরিদ্র গ্রন্থকারের সকল শ্রম সার্থক হইবে। অধুনাতন ছাত্রছাত্রীগণের শিক্ষাজীবনে,

তাঁহাদের চিত্ত- ও চরিত্র-গঠনে, গ্রন্থখানি কার্য্যকরী হউক, ইহাও গ্রন্থরচয়িতার অন্যতম কামনা।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ প্রবন্ধকারের বহুবর্ষব্যাপী অধ্যয়ন, পর্য্যটন, টীকাটিপ্পনী ও বিবরণী প্রভৃতির সংরক্ষণ এবং পঞ্চাশ বৎসরব্যাপী একনিষ্ঠ চিন্তার নিদর্শন। ইহার বিশেষ বিশেষ অংশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিবিধ শিল্প- ও সংস্কৃতি-সম্মিলনে পঠিত এবং পণ্ডিত-মহলে আলোচিত হইয়াছিল। ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার স্বর্গীয় ডক্টর স্নেহময় দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় উহাকে প্রকাশিত করিবার জন্য, প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি তাঁহাকে প্রদত্ত হয়। অতঃপর তাঁহারই নির্দ্দেশানুসারে উহাকে পরীক্ষা করাইবার জন্য দেশবরেণ্য ব্যবহারাজীব ডক্টর অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহোদয়ের সমীপে প্রেরিত হয়। রচনাপাঠান্তে শ্রদ্ধেয় ডক্টর অতুলচন্দ্র অভিমত প্রকাশ করেন প্রবন্ধকারকে ভারতের স্থাপত্য- ও সংস্কৃতি-প্রসঙ্গে বক্তৃতাদানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রণ করিতে। তদনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দ্বারভাঙ্গা হলে' উক্ত বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। ধারাবাহিক বক্তৃতার বিবিধ পর্ব্বে অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ, অধ্যাপক ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রসিদ্ধ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তৎপরে বক্তৃতাগুলির সারাংশ অবলম্বনে সঙ্কলিত বর্ত্তমান 'দেবায়তন ও ভারত সভ্যতা' বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত করিবার সিদ্ধান্ত হয়। সঙ্কলনের পূর্ব্বে, শ্রদ্ধেয় ডক্টর অতুলচন্দ্রের উপদেশানুযায়ী, রচনা স্থানে স্থানে লেখক কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ভারতের দেবায়তনই ভারতীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম অভিব্যক্তির নিদর্শন। বিশ্বসভ্যতার দরবারে ভারতের পক্ষে একদা উহা শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছিল। বেদান্তের ভিত্তি অবলম্বনে একাদিক্রমে দ্বিসহস্রবর্ষকাল ক্রমবিকশিত হইয়া ভারত স্থাপত্য অজণ্টা ও এলোরা, ভুবনেশ্বর, আঙ্কর ও তাজমহলের সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু কূটতন্ত্রী ইংরাজের ভারতাধিকারের পরে বিবিধ কৌশলে উহা অবনতির পথে নীত হইয়া অবশেষে ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। জাতীয় স্থাপত্যের বিনাশে ভারত সভ্যতার বিনাশ যে অবশ্যম্ভাবী দেশবাসিগণ ইহা বুঝিতে পারেন নাই।

ভারতীয় সংস্কৃতির অমূল্য অবদান সেই জাতীয় স্থাপত্যের রক্ষাকল্পে সর্ব্বপ্রথম আন্দোলন সূচিত হইয়াছিল কলিকাতায় প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে। তৎপূর্ব্বে সুকুমার

কলার অনুরাগী এবং উহার গঠনকার্য্যব্রতী শিল্পিগণ দেশীয় শিল্পপ্রসঙ্গে চিত্র ও ভাস্কর্য্যের অনুশীলন ও বিকাশে তৎপর ছিলেন। 'আর্ট স্কুল'গুলি ভাস্কর্য্যনির্ম্মাণে এবং চিত্রাঙ্কনেই শিক্ষাদান করিত। জাতীয় স্থাপত্যের—প্রাচীন মন্দিরের ও মসজিদের বিচ্যুত অঙ্গবিশেষের এবং তৎসম্পর্কীয় আলোকচিত্রের—স্থান নির্দ্ধারিত ছিল সাধারণ শিল্পসংগ্রহশালায়। উহার অনুশীলন হইত প্রত্নতাত্ত্বিক প্রবন্ধরচনায়। কানিংহাম, ফার্গুসন, রাজেন্দ্রলাল, হ্যাভেল, মার্শাল এবং কুমারস্বামী প্রভৃতি সুপণ্ডিতগণ ভারতীয় স্থাপত্যের ঐতিহ্য-, রূপ- ও মহিমা-নির্ণায়ক কয়েকখানি বহুমূল্য সচিত্রগ্রন্থ সঙ্কলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু প্রাচীনকাল হইতেই বংশপরম্পরা প্রচলিত সনাতন স্থাপত্যের পুনঃপ্রচলনের প্রয়োজন বিষয়ে তাঁহারা কোনও উল্লেখ করেন নাই। নয়াদিল্লী নির্ম্মাণের পূর্ব্বে মহামতি হ্যাভেল বৃথাই চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে বিশুদ্ধ ভারতীয় স্থাপত্যে উহার রূপায়ণ হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় স্বদেশী স্থাপত্যবিষয়ক সুসঙ্গত শিক্ষাদানে এবং স্বদেশী স্থাপত্যে গ্রাম-নগরের আবাসগৃহ ও সৌধসদন-নির্ম্মাণে শাশ্বত সংস্কৃতিপ্রসূত মহান্ স্থাপত্যের অমূল্য ঐতিহ্যকে সংরক্ষিত ও বিকশিত করিবার প্রকর্ষ প্রয়োজনীয়তা তাঁহার এবং অন্য কোনও মনীষীর চিত্তপটে রেখাপাত করে নাই। ব্রিটিশ-শাসিত ভারতে ভারত-স্থাপত্যের উচ্ছেদনে ভারতীয় সভ্যতার অন্তরাত্মার বিনাশনের ব্যবস্থা হইয়াছিল। ভুবনেশ্বর, বিজয়নগর ও তাজমহলনির্ম্মাতা শিল্পিগণের কৃতি বংশধরদিগকে অর্দ্ধাহারী অভাবগ্রস্ত রাখিয়া পাশ্চাত্ত্য স্থাপত্যরচনায় অভ্যস্ত স্থপতি- ও শিল্পি-সঙ্ঘকে পোষণ করা হইত। ইংলণ্ড আমেরিকার পরীক্ষোত্তীর্ণ অ-ভারতীয় স্থপতি অথবা পাশ্চাত্ত্য স্থপতি-বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন দেশীয় স্থপতি ভিন্ন ভারতের দেবমন্দিরগঠনেও অন্য কাহারও অধিকার ছিল না। বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে নয়াদিল্লীর বর্ত্তমান লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির নির্ম্মাণ-সংক্রান্ত একপ্রস্থ কল্পচিত্র স্থানীয় ম্যুনিসিপালিটি প্রথমে মঞ্জুর করেন নাই, যেহেতু উহার পরিকল্পয়িতা গভর্ণমেণ্ট-অনুমোদিত কোনও স্থাপত্য-প্রতিষ্ঠানপ্রদত্ত 'ডিপ্লোমা'র অধিকারী ছিলেন না—যদিও য়ুরোপ-আমেরিকার শ্রেষ্ঠ স্থপতিবৃন্দ তাঁহাকে প্রতিভা-শালী স্থপতির সমযোগ্য মর্য্যাদা দান করিয়াছিলেন তাঁহার মৌলিক পরিকল্পনাসমূহ পরীক্ষা করিয়া। [বর্ত্তমান স্বাধীন ভারতেও ব্রিটিশ-প্রবর্ত্তিত উক্ত বিধান বলবৎ রহিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য কর্ত্তৃক ভারতের সাংস্কৃতিক বিজয়ের (cultural conquest)

পরিণাম হইয়াছে হতভাগ্য ভারতের অপরিসীম আত্মবিস্মৃতি এবং অর্দ্ধাহারী অধিবাসিগণের অসীম দুর্গতি।]

এইরূপ অবস্থায় কলিকাতায় উক্ত আন্দোলনের সূচনা হইলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সাগ্রহে উহার সমর্থন করতঃ তদীয় FORWARD পত্রিকার মাধ্যমে উহার প্রচারের ব্যবস্থা করেন। একদিন তাঁহার আবাসে তিনি এবং শ্রীমতী বাসন্তী দেবী যখন আন্দোলনের নায়ককে উৎসাহিত করিতেছিলেন তখন শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র, শ্রীতুলসীচরণ গোস্বামী এবং ডক্টর বিধানচন্দ্র রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ক্রমশঃ অন্যান্য দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাগুলির আনুকূল্যে বহু উপেক্ষিত পৈত্রিক স্থাপত্যের নব অভ্যুদয়ের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর কালিদাস নাগ, শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ, কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, ডক্টর নন্দলাল বসু এবং কলিকাতা নগরীর 'মেয়র' শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি দেশের নেতৃস্থানীয় মহাপুরুষগণ উহার সমর্থন করিলেন। অধ্যাপক সুনীতিকুমার এবং ডক্টর নাগের আন্তরিক সহযোগিতার ফলে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন নববলে বলীয়ান হইল। তথাপি বঙ্গের বাহিরে উহার প্রভাব সুবিস্তৃত হইল না। অনতিকাল পরে United Press of Indiaর দূরদর্শী কর্ণধার শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্তের অমিত প্রভাবের মাধ্যমে মহাভারতের রূপধারণ করিয়া উহা সমগ্র ভারতে ও পৃথিবীর সুদূর প্রান্তে প্রচারিত এবং প্রসারিত হইল—দেশীবিদেশী বহুগুণিজনের সমর্থন লাভ করিল। অতঃপর ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত একটি ভারতীয় স্থাপত্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প করিয়া উহার অনুষ্ঠানপত্র পৃথিবীর প্রধান প্রধান সংস্কৃতি-কেন্দ্রে প্রেরণ করার ফলে সহানুভূতি ও শুভেচ্ছাজ্ঞাপক বহুসংখ্যক বারতা আসিয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল। সেই প্রসঙ্গে জগৎপ্রসিদ্ধ Greater India Societyর স্থাপয়িতা ডক্টর নাগ এবং ভারতীয় শিল্পের অকৃত্রিম হিতৈষী Mr. Percy Brown প্রতীচ্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্তের অনুগ্রহে ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই জাতীয় স্থাপত্যের ন্যায়সঙ্গত অধিকার স্বীকৃত হইল। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা ও মেবারের মহারাণা বাহাদুর, শ্রী ঘনশ্যামদাস বিড়লা, শ্রী জে. আর. ডি. টাটা, স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর, শ্রী জি. এল. মেটা, ডক্টর এম. আর. জয়াকর, স্যার তেজ

বাহাদুর সপ্রু, শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, ডক্টর সি. পি. রামস্বামী আয়ার, স্যার এ. রামস্বামী মুদলিয়র, পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াদিয়া, শ্রীমতী হংস মেটা, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, অ-বিভক্ত বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জনাব ফজলুল হক, নিজাম সরকারের এবং জয়পুর রাজ্যের প্রধানমন্ত্রিদ্বয় স্যর আকবর হায়দারি ও স্যর মির্জ্জা মহম্মদ ইস্‌মাইল এবং সিংহলের প্রধানমন্ত্রী স্যর ব্যারন জয়তিলক প্রভৃতি প্রস্তাবিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সমর্থন করিলেন।

অবশেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য্য ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের উদ্যোগে বিরচিত All India School of Indian Architecture and Regional Planning-এর পরিকল্পনা এবং উহার এম.এ. কোর্স পর্য্যন্ত পাঠ্যসূচীর অনুমোদন ও সমর্থন করিলেন অ-বিভক্ত বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগ ও তৎকালীন ভারতরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। তৎপূর্ব্বে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, বোম্বাই সহরে তদীয় সহোদরা শ্রীমতী কৃষ্ণা হাথিসিং-এর আবাসে অবস্থানকালে, উহাকে পরীক্ষান্তে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া দুই মাস পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন-ভাষণে উহার উল্লেখ করেন। পূর্ব্ব-পঞ্জাবের বর্ত্তমান রাজধানী চণ্ডিগড় বিন্যাসের পরিকল্পয়িতা প্রখ্যাত স্থপতি কর্ণেল এলবার্ট মায়ারও পরিকল্পনাটি পরীক্ষা করিয়া উহাকে "Superior to anything existing in the West" বলিয়া মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। ডক্টর বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে কলিকাতার 'বিড়লাপার্ক'-এ অনুষ্ঠিত একটি সভায় দেশের ধনিক এবং শিল্পপতিগণও উহার সমর্থন করেন। বর্ত্তমান লেখক ব্যতীত কয়েকজন য়ুরোপীয়ন স্থপতিও সেই আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রতীচ্যের বিবিধ বিজ্ঞানশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ অবদানসমূহের সমন্বয়ে প্রস্তাবিত স্থাপত্য শিক্ষায়তনের পাঠ্যসূচী সঙ্কলিত হইয়াছিল। উহার অন্তর্ভুক্ত সাধারণ স্থাপত্যশিল্প- ও সংস্কৃতি-পর্য্যায়ে ভারতীয় বিষয়েই শতকরা ৬৬ নম্বর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বস্তুতঃ ভারতীয় শিল্পসংস্কৃতিরই সুসঙ্গত বিকাশে পরিকল্পয়িতাগণের চরম লক্ষ্য ছিল। ইংরাজের ভারতবর্ষ পরিত্যাগের প্রাক্কালেই কলিকাতায় উক্ত শিক্ষায়তন-প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর বিধানচন্দ্র

রায় জাতীয় স্থাপত্যের অকাট্য দাবীকে প্রবলভাবে সমর্থন করতঃ লেখক-প্রণীত *Architect and Architecture*-গ্রন্থে তৎলিখিত ভূমিকার মাধ্যমে তদ্বিষয়ে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। দেশীয় স্থাপত্যের সংরক্ষণ-বিষয়ে সহযোগিতা করিতে তিনি ডক্টর এম. এ. আনসারি, ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সংস্কৃতির পরমহিতৈষী শ্রীঅর্জ্জুন প্রসাদ ডালমিয়া এবং শ্রীনরেন্দ্র সিংহ সিংঘীর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীডালমিয়া এক দিকে যেরূপ বিরাট্ Indian Chamber of Commerce (India Exchange) ভবন, পর্ব্বতপ্রমাণ শিক্ষানিকেতন Indian Institute of Technology (Hijli) এবং বহুবিধ সৌধসদন নির্ম্মাণ করিয়াছেন, অন্য দিকে তদ্রূপ নব্যভারতীয় স্থাপত্যশৈলীসমৃদ্ধ দেবায়তন, স্মৃতিমন্দির, বিদ্যায়তন প্রভৃতি গঠনে তাঁহার অসাধারণ সংগঠনী শক্তি ও কর্ম্মপটুতা প্রকটিত হইয়াছে। মন্দির প্রভৃতি নির্ম্মাণে তিনি ছাত্রদের কারিগরী শিক্ষাদান করিয়াছেন। মাসিক বৃত্তিপ্রদানে তিনি ছাত্রদের উৎসাহিত করিয়াছেন। তৎগঠিত দেবায়তনের অনুপ্রেরণায় এবং তদীয় পোষকতাপুষ্ট কৃতী ছাত্রগণের পরিচালনায় দিল্লী হইতে কুমিল্লা পর্য্যন্ত বহু মন্দির, স্মৃতিসদন ও বাসভবন নির্ম্মিত হইয়াছে। নিজব্যয়ে প্রাচীন দেবালয়ের পূর্ণসংস্কার-সাধনেও তিনি ছাত্রদের শিক্ষার সুযোগ দিয়াছেন।

শ্রীনরেন্দ্র সিংহ সিংঘী মহাশয় তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব বাহাদুর সিংহ সিংঘীর শিল্পানুরাগের স্মরণে তদীয় 'সিংঘী পার্ক' নিকেতনে দেশীয় স্থাপত্যশিক্ষার্থীদের অবৈতনিক শিক্ষাসহ মাসিক বৃত্তিদান করিয়াছেন। ছয় বৎসর পূর্ব্বে সিংঘী পার্ক-এ, তাঁহারই আনুকূল্যে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী মাননীয় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পসমৃদ্ধ আদর্শ-গ্রাম- ও আদর্শনগর-সংক্রান্ত একটি কল্পচিত্র প্রদর্শনী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মাননীয় মন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন প্রমুখ ভারতীয় এবং অ-ভারতীয় প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ্ ও স্থপতিগণ ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। তৎপরে বিহার ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের রজতজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে উক্ত প্রদর্শনী বাঁকিপুরে অনুষ্ঠিত ও প্রশংসিত হইয়াছিল। খ্যাতনামা কংগ্রেস সেক্রেটারী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার মহাশয় বহুবিধভাবে ভারতীয়

স্থাপত্যের ব্যাপক প্রচারে আন্তরিক সহযোগিতাদানে তদীয় প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় পূরণ চাঁদ নাহারের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

উড়িষ্যাভুক্ত সরাইকেল্লা রাজ্যের প্রাক্তন নরপতি, স্বয়ংসিদ্ধ দার্শনিকশিল্পী, শ্রীল আদিত্য প্রতাপ সিংহ দেও বাহাদুর ভূতপূর্ব্ব Eastern States Union-এর সর্ব্বজন-নির্ব্বাচিত সভাপতিরূপে, সম্বলপুরের প্রত্যন্তে, Union রাষ্ট্রের যে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন উহা বিশুদ্ধ ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পে অলঙ্কৃত হইত। স্বীয় রাজ্যের হস্তান্তরের প্রাক্কালে রাজধানী সরাইকেল্লায় তাঁহার বিপুল ত্রিতল প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতেছিল নববিকশিত কোণার্ক-স্থাপত্যে। তদীয় উদ্যোগে উৎকলখণ্ডে একটি Aditya Pratap Academy of Indian Architecture প্রতিষ্ঠার পাকা ব্যবস্থা এবং তৎসম্পর্কীয় প্রাথমিক কার্য্য আরম্ভিত হইয়াছিল। তাঁহার মেধাবী পুত্র, পাটনার মহারাজা স্যর রাজেন্দ্র নারায়ণ সিংহ দেও, কে.সি.আই.ই. বাহাদুর, Union-এর প্রধান কর্ম্মসচীবরূপে, ভারতীয় স্থাপত্যের পুষ্টিকল্পে, প্রভূত আয়োজন করিতেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বভারতের নরপতিগণের কামনা সফল হইল না।

বর্ত্তমান গ্রন্থরচনাপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার যে সকল মনীষীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট তিনি কৃতজ্ঞ। মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হইল। কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য ডক্টর প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যাবাচস্পতি, কলিকাতা মহানগরীর বর্ত্তমান 'মেয়র' এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের সভাপতি ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয় পরিকল্পনা পরিষদের শিক্ষাসদস্য, প্রখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্য ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা রেজিষ্ট্রার ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী গ্রন্থরচয়িতাকে বিবিধপ্রকারে অকুণ্ঠিত-ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। মহামতি বিচারপতি মহোদয়ের এবং প্রভাবশালী পৌরপ্রধান শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মহানুভবতা ব্যতীত বর্ত্তমান গ্রন্থ হয়ত প্রকাশিত হইত না। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট পরিস্থিতি সত্ত্বেও জাতীয় শিল্প-সংস্কৃতির পরম অনুরাগী শ্রদ্ধেয় কোষাধ্যক্ষ মহাশয় পুস্তকের মুদ্রণ-, প্রকাশ- ও প্রচার-কল্পে, অকাতরে, প্রভূত অর্থব্যয় করিয়াছেন।

পাণ্ডুলিপি পাঠান্তে যাঁহারা গ্রন্থরচয়িতাকে উৎসাহ দান করিয়াছেন পণ্ডিতপ্রবর ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উপাচার্য্য বিশ্ববিশ্রুত শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত, অধ্যাপক বটুকনাথ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যারত্ন, প্রবীনতম সাংবাদিক সুপণ্ডিত শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীসজনীকান্ত দাস, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের কর্ম্মনির্ব্বাহক মণ্ডলীর প্রাক্তন সভাপতি ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এল.এ., ভক্তিভূষণ শ্রীপূর্ণচন্দ্র সাহা এবং অধ্যাপক শ্রীহীরেন মুখার্জ্জী, এম.পি. মহাশয় তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। বিবিধ শ্রমশিল্প-প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার শেঠ মদন লাল ডালমিয়া বহুমূল্য নির্দ্দেশ এবং কার্য্যকরী সহযোগিতাদানে লেখককে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।

প্রবন্ধের বিশেষ বিশেষ অংশ বিশিষ্ট পণ্ডিতগণ সমর্থন করিয়াছেন। প্রবন্ধকারের মন্তব্য ইতিহাসপর্য্যায়ে অধ্যাপক ডক্টর কালিদাস নাগ এবং অধ্যাপক ডক্টর মাখনলাল রায়চৌধুরী, শাস্ত্রী, দর্শনপর্য্যায়ে স্বর্গীয় হরিদাস ভট্টাচার্য্য, দর্শনসাগর এবং বৈশালী পালি ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক ডক্টর নথমল টাঁটিয়া, পূর্ত্ত- ও নগর-নির্ম্মাণ-পর্য্যায়ে পূর্ত্তবিশারদ শ্রীঅর্জ্জুন প্রসাদ ডালমিয়া, সুকুমারশিল্প-বিষয়ে অধ্যাপক ডক্টর জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট আখ্যানভাগে ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অনুমোদনলাভ করিয়াছে। ধর্ম্ম- ও সংস্কৃতি-সংক্রান্ত অংশগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ' অধ্যাপক ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও 'ইরান সোসাইটি'র স্থাপয়িতা ও প্রধান কর্ম্মসচিব ডক্টর মহম্মদ ইসাক সমর্থন করিয়াছেন। রচনার ভাষা মনোনীত করিয়াছেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণাধ্যক্ষ ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'খয়রা' অধ্যাপক ডক্টর সুকুমার সেন। প্রবন্ধে প্রকাশিত মানচিত্রগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোলতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর এস. পি. চট্টোপাধ্যায়ের অনুমোদন লাভ করিয়াছে।

লেখকের নির্দ্দেশানুসারে এবং তদঙ্কিত অপরিণত কল্পচিত্রাবলম্বনে তদীয় স্নেহভাজন ছাত্র ও সহকারী শ্রীপাঁচুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বৈদিক মহাগ্রাম এবং আদর্শ পল্লীনগরের পরিপ্রেক্ষিত চিত্রসমূহ, বিবিধ সৌধভবন ও শিক্ষায়তনের চিত্রগুলি ভিন্ন প্রচ্ছদপট অঙ্কিত করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসের সুযোগ্য কর্ম্মচারিগণ এবং

উচ্চশিক্ষিত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীশিবেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল, বি.এস-সি., 'ডিপ্লোমা-ইন-প্রিন্টিং (ম্যাঞ্চেষ্টর)' মহাশয় পুস্তক প্রকাশে প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছেন। বিচক্ষণ সহকারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রী কে. কে. ঘোষ, এম.এ., এফ.আর.ইকন্‌-এস. (লণ্ডন), সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত প্রধান মুদ্রণীপত্র-সংশোধক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য, বি.এ., কাব্যতীর্থ, অভিজ্ঞ সহকারী মুদ্রণীপত্র-সংশোধক শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং 'ওভারসিয়র' শ্রীধীরেন্দ্রকুমার গুহ, বি.এ. মহাশয়ও গ্রন্থপ্রকাশে বহু সাহায্য করিয়া গ্রন্থকারকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। Messrs. King Halftone Co. সুলভ মূল্যে, অল্পসময়ের মধ্যে গ্রন্থচিত্রায়ণে ব্যবহৃত 'ব্লক'গুলির অধিকাংশ প্রস্তুত করিয়াছেন।

লেখকের স্নেহভাজন অনুজ শ্রীসুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহকারী-অধ্যক্ষ শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, এম.এ., এল-এল.বি., যত্নসহকারে রচনার পাণ্ডুলিপি ও 'প্রুফ' পরীক্ষা করিয়াছেন। কয়েক বৎসর যাবৎ তাঁহারা যথাক্রমে পূর্ব্বভারত, উত্তরভারত, দক্ষিণভারত ও হিমালয় এবং উত্তরভারত, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্রপ্রদেশ, দক্ষিণভারত, সিংহল ও য়ুরোপ পর্য্যটন করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা 'প্রুফ' পরীক্ষায় কার্য্যকরী হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থগারের অধ্যক্ষ শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া লেখককে বিবিধ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ দিয়াছেন।

বর্ত্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত কয়েকখানি চিত্র কয়েকটি বহুমূল্য সচিত্র পুস্তক হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে; যথা—Sir John Marshall-প্রণীত *Mohenjodaro and the Indus Civilization*, Ernest Mackay-প্রণীত *Indus Valley Civilization*, Dr. A. K. Coomarswamy-প্রণীত *History of Indian and Indonesian Art*, Percy Brown-প্রণীত *Indian Architecture* এবং Benjamin Rolland-সঙ্কলিত *Art and Architecture in India*. Dr. B. M. Barua-প্রণীত *Gaya and Buddhagaya* ও *Bharhut*, Book III এবং Dr. Jitendranath Banerjee-সঙ্কলিত বহুমূল্য সচিত্রগ্রন্থ *Development of Hindu Iconography* হইতেও লেখক সাহায্য লইয়াছেন। তজ্জন্য লেখক উক্ত গ্রন্থগুলির প্রণেতা এবং প্রকাশকগণের নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছেন। কয়েক সংখ্যক চিত্রের জন্য গ্রন্থকার

ভারতীয় প্রত্নবিভাগের নিকট ঋণী রহিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগারের প্রাচীর চিত্রগুলি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মার প্রতিভাপ্রসূত।

ভারতরাষ্ট্রের অধিনায়ক মহামহিম ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বর্ত্তমান গ্রন্থখানি তদীয় পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত করার অনুমতিদানে লেখককে উৎসাহিত করিয়াছেন। তজ্জন্য লেখক কৃতজ্ঞ রহিলেন। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব্বে দীন গ্রন্থকার বহুবিষয়ে বহুভাবে তাঁহার অকুণ্ঠিত সাহায্য ও উদার সহযোগিতা পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। পরম শ্রদ্ধেয় উপাচার্য্য শ্রীনির্ম্মলকুমার সিদ্ধান্ত, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডক্টর অতুলচন্দ্র গুপ্ত এবং ডক্টর কালিদাস নাগ মহাশয় তাঁহাদের বহুমূল্য বিবৃতিদানে প্রবন্ধকারকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

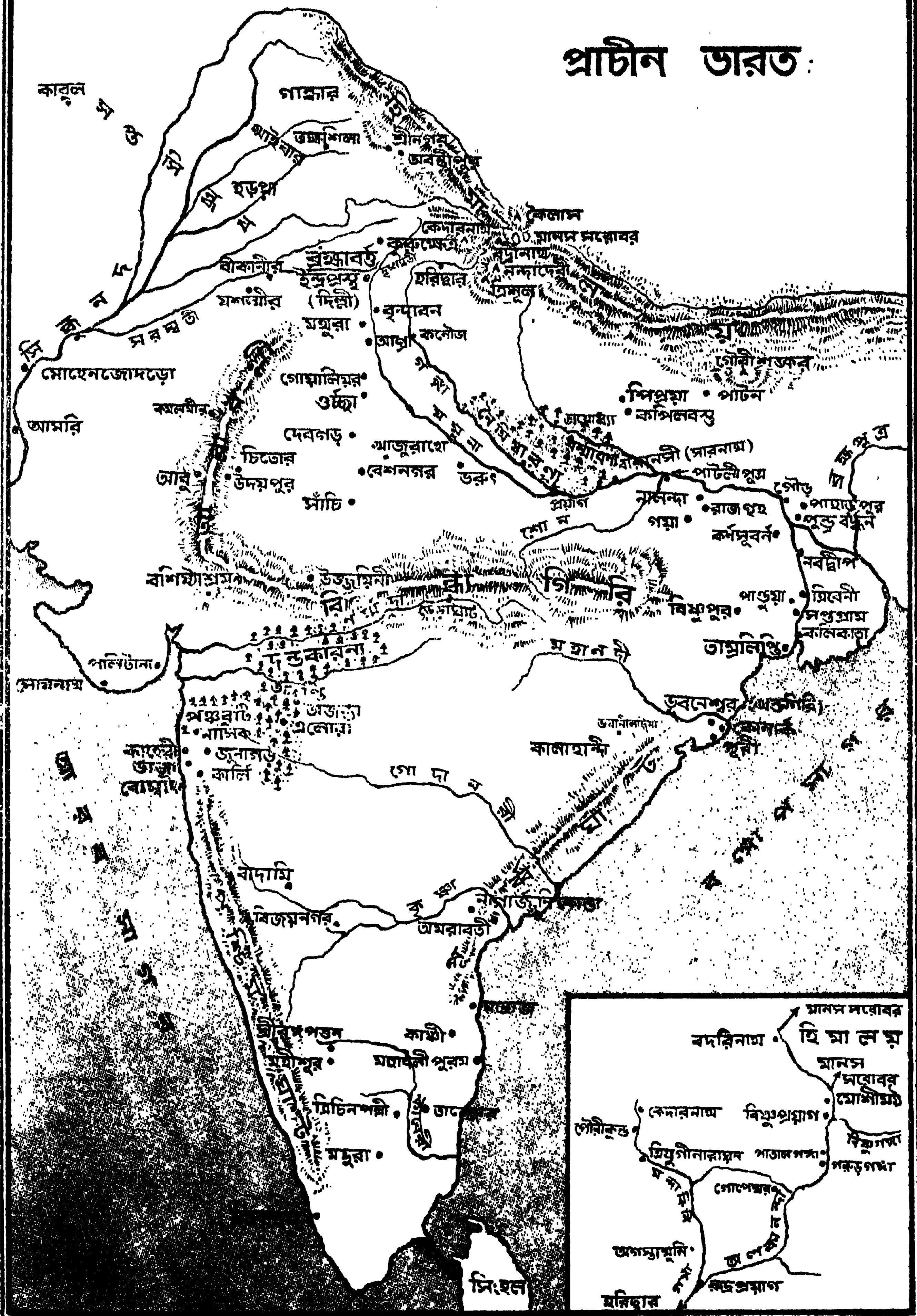
৪৯, মলঙ্গা লেন,
কলিকাতা-১২

শ্রী প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
স্থাপত্যবিশারদ

বিষয়-সূচী

চিত্রসূচী

৬—1872B,


প্রাচীন ভারত
কাবুল
গান্ধার
তক্ষশিলা
শ্রীনগর
হরপ্পা
কৈলাস
কেদারনাথ
মানস সরোবর
ব্রহ্মাবর্ত
কুরুক্ষেত্র
বদ্রীনাথ
বীকানীর
ইন্দ্রপ্রস্থ
হরিদ্বার
নন্দাদেবী
(দিল্লী)
বৃন্দাবন
মথুরা
আগ্রা
কনৌজ
সরস্বতী
মোহেনজোদড়ো
গোয়ালিয়র
ওর্চ্ছা
আমরি
দেবগড়
চিতোর
আবু
উদয়পুর
সাঁচি
পিপ্রয়া
পাটন
কপিলবস্তু
গৌরীশঙ্কর
(সারনাথ)
পাটলীপুত্র
প্রয়াগ
নালন্দা
রাজগৃহ
গয়া
কর্ণসুবর্ণ
গৌড়
পাহাড়পুর
পুণ্ড্রবর্ধন
নবদ্বীপ
ত্রিবেণী
সপ্তগ্রাম
কলিকাতা
পাণ্ডুয়া
বিষ্ণুপুর
তাম্রলিপ্ত
উজ্জয়িনী
দণ্ডকারণ্য
পালিটানা
ভুবনেশ্বর
পুরী
অজন্তা
এলোরা
নাসিক
জুনাগড়
কার্লি
বাদামি
বিজয়নগর
অমরাবতী
কাঞ্চী
মহীশূর
ত্রিচিনপল্লী
মদুরা
সিংহল
মানস সরোবর
বদরিনাথ
হিমালয়
মানস সরোবর
কেদারনাথ
বিষ্ণুপ্রয়াগ
গৌরীকুণ্ড
ত্রিযুগীনারায়ণ
গরুড়গঙ্গা
গোপেশ্বর
অগস্ত্যমুনি
হরিদ্বার
রুদ্রপ্রয়াগ

নির্ঘণ্টপত্র

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঊ

ঋ

এ

ঐ

ও

ঔ

ক

ফ

ব



ভ

সংশোধন-সংযোজন-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১০,১১ ও ২৪	'ব্রহ্মকান্ত, বিষ্ণুকান্ত, রুদ্রকান্ত'	'ব্রহ্মকাণ্ড, বিষ্ণুকাণ্ড, রুদ্রকাণ্ড'
১৫	২৩	বিরাট হিন্দুধর্ম্ম	বিরাট্ হিন্দুধর্ম্ম
২৬	১৪ ও ১৬	খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের	খৃঃ পঞ্চম শতকের
৩৪	৮	'চন্দ্রকান্ত, বিষ্ণুকান্ত, রুদ্রকান্ত'	'চন্দ্রকাণ্ড, বিষ্ণুকাণ্ড, রুদ্রকাণ্ড'
৩৯	২০	বুদ্ধপ্রতিমা সৃজনে	বুদ্ধমূর্ত্তি সৃজনে
৬১	১৪	পরিচালনায় ০০০ শ্রমণ	পরিচালনায় ৩০০০ শ্রমণ
৬২	৯	শ্রেষ্ঠ বুদ্ধপ্রতিমা	শ্রেষ্ঠ বুদ্ধমূর্ত্তি
৬৩	৮	ধর্ম্মবিজয় কাহিনীর	ধর্ম্মবিজয় বাহিনীর
৬৪	৯	বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশীয়	বঙ্গ সংস্কৃতি ব্রহ্মদেশীয়
৬৬	৬	বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান উপাচার্য্য	বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য
৬৯	৪	গণপতি সূর্য্য	গণপতি, সূর্য্য
৭৩	১০	পৌণ্ডবর্দ্ধন	পৌণ্ড্রবর্দ্ধন
৮০	৮	বাহাদুর সিং সিংঘীর	বাহাদুর সিংহ সিংঘীর
	১০	শ্রীনরেন্দ্র সিং সিংঘী	শ্রীনরেন্দ্র সিংহ সিংঘী
৯৬	২৩	তৎসৎপুরুষ মহাদেবের	তৎপুরুষ মহাদেবের ('তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি')
১১২	৮	সক্ষম হয়েন।	সক্ষম হয়েন। দ্বাদশ শতকে মুসলমান ভারত আক্রমণ করিলে বহুলক্ষ বৌদ্ধ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ হিন্দুরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাও ভারতে মুসলমান শাসনের অন্য কারণ।
১৪৬	৬	ওঁ শান্তি ॥	ওঁ শান্তিঃ ॥
১৪৯	১৩	অধিকারী রপে পূজা পাইত।	অধিকারী রূপে পূজা পাইত।
১৫০	১৫	প্রতিভূ ন:চিতি	প্রতিভূ শ্যেনচিতি
১৫২	২৪	পরিকল্পিত হইয়াছিল।	পরিকল্পিত হইয়াছিল। বেদে বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির বর্ণনায় যে অমিততেজা সিংহ, অশ্ব ও বৃষের উল্লেখ আছে, উহারা অশো ক-স্তম্ভের শীর্ষভাগে উদ্গত হইয়াছিল।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬১	২৮	সোপানশ্রেণী লঙ্ঘনান্তে	সোপানশ্রেণী অবলম্বনে
১৬৫	৬	'ব্রহ্মকান্ত-স্তম্ভসমন্বিত'	'ব্রহ্মকাণ্ড' স্তম্ভসমন্বিত
১৭১	৮	'ব্রহ্মকান্ত'-স্তম্ভবিশিষ্ট	'ব্রহ্মকাণ্ড' স্তম্ভবিশিষ্ট
১৭৫	২৬	তৎসৎপুরুষ মহাশিবের	তৎপুরুষ মহাশিবের
১৭৬	৩	খৃঃ ষষ্ঠ-সপ্তদশ শতক	খৃঃ ষোড়শ-সপ্তদশ শতক
১৭৯	২৭	পাগান (উত্তরব্রহ্ম)	পাগান (মধ্যব্রহ্ম)
	২৮	মোন (তালেইং)	মোন (তালৈং)
১৮০	২	তালেইং রাজধানী	তালৈং রাজধানী
	১১	পাগানপতি আনাওরথ	পাগানপতি অনিরুদ্ধ
	১৩	আনাওরথ....শ্যাম, বঙ্গদেশ এবং	অনিরুদ্ধ....শ্যাম, বঙ্গ এবং
১৮২	৫	সংস্কৃত বর্ণমালাই	ব্রাহ্মী বর্ণমালাই
	১৪	অরিমর্দ্দনপুরীর 'ধর্ব'	অরিমর্দ্দনপুরীর 'শরভ'
১৯৪	২	১১০ ক্রোশ উত্তরে	১১০ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে
১৯৫	৫	তুষার-কিরীটিনী শৈলশ্রেণী	তুষার-কিরীটিনী কৈলাসশৈলশ্রেণী
১৯৬	২০	আরোহণ করিতে হয়।	আরোহণ করিতে হয়। অলকানন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গমসান্নিধ্যে পর্ব্বতোপরি যোশীমঠ অবস্থিত।
১৯৮	৪	বদরিকায় গমন	পথাবলম্বনে বদরিকায় গমন
	৮	অতঃপর উত্তঙ্গ চড়াই	অতঃপর উত্তুঙ্গ চড়াই
২০১	১৪	গোল ভিত্তি-শিখর	গোল-ভিত্তি-শিখর
	১৬	উপাসনাগৃহ মক্কাতীর্থের	উপাসনাগৃহ, মক্কাতীর্থের
	১৭	গোল ভিত্তি-	গোল-ভিত্তি-
২০২	৮	বিরহবিধুর শাহানশাহের	বিরহবিধুর শাহানশাহ্ শাহ্জাহানের
	১৮	মুস্‌লিম ভারতীয় মন্দির এবং	মুস্‌লিম-ভারতীয় মন্দির, মস্‌জিদ এবং
২০৫	২	সুভঙ্গী বিদ্যাধরীগণ	সুভঙ্গী বিদ্যাধরীগণ
২১৭	১৫	বলিষ্ট	বলিষ্ঠ
„	২৬	নিদর্শনচিত্রে	নিদর্শন চিত্রে